বহ্নিমান নেতাজী সুভাষ

নয়া প্রকাশ : কলিকাতা ছয়

BANHIMAN NETAJI SUBHAS

NAYA PROKASH
206 Bidhan Sarani
Calcutta 6

First Published : August 1960

মুদ্রণ-প্রকাশন
ধীরেন রায়
দরবারী উদ্যোগ
গঙ্গানগর ঃ উঃ চব্বিশ পরগণা ঃ পঃ বঙ্গ

পরিবেশক
নয়া প্রকাশ
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা - ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ঃ প্রণবেশ মাইতি
ব্লক ঃ সম্বিৎ সাহা

॥ সূচীপত্র ॥

১। **অরুণোদয়ঃ** বিবেকানন্দের প্রতিফলন, ওটেনের সুভাষ প্রশস্তি, আই.সি.এস., দেশপ্রেমে দীক্ষা 1–22

২। **রাজবিদ্রোহীঃ** স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণ স্বাধীনতা, বারে বারে কারাগারে, মান্দালয়ের কারাগারে, ইউরোপে 23–56

৩। **নির্বাসনে দেশনায়কঃ** রোঁমা রোঁলার সান্নিধ্যে, মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস রচনা ও পাশ্চাত্য জাতির মানসিকতা, মহাসভার সভাপতি, জাতীয় পরিকল্পনা, বহিষ্কার, রবীন্দ্র-অভিষেকে সুভাষ, গান্ধী-জিন্না-সাভারকরের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার, স্বেচ্ছা-নির্বাসন 57–88

৪। **দুর্গম পথের যাত্রীঃ** বিশ্বযুদ্ধের আহ্বান, মহানিক্রমণ—কলকাতা-কাবুল-মস্কো-রোম-বার্লিন 89–121

৫। **রণক্ষেত্রেঃ** হিটলার, আমি সুভাষ বলছি, আজাদ হিন্দের অঙ্কুর, সাবমেরিনে সুভাষচন্দ্র, ইউরোপ থেকে দূরপ্রাচ্যে 122–156

৬। **আরজি হুকুমৎ-ই-আজাদ হিন্দঃ** অস্থায়ী ভারত গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা, চলো দিল্লী, ব্রহ্ম সীমান্ত, ইম্ফল আক্রমণ—নেতাজীর রণনীতি—শেষ নির্দেশ 157–204

৭। **লালকেল্লার বিচার-মঞ্চেঃ** উদ্বেলিত ভারত—কলকাতা, সৈনিকদের মুক্তি, ভারত ভাগের ধোঁয়া 205–222

৮। **নৌবিদ্রোহেঃ** ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন, স্বাধীনতার অগ্রদূত 223–244

৯। **শেষ প্রহরঃ** আত্মোৎসর্গের দলিল, অজানার পথে বিমান যাত্রা—বন্দীর উদ্দেশ্যে, ব্রিটিশ-মার্কিন মিলিটারী গোয়েন্দা অভিযান, ওয়াভেল-মাউন্টব্যাটেন-ম্যাকার্থার—তাইহোকু থেকে দাইরেন বিমানবন্দর, সাইবেরিয়া। শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশন, কি-কেন 245–300

১০। **মূল্যায়নঃ** 301–319

।। পরিশিষ্ট ।।

১। ইংরেজের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত 323
২। রেনকোজি মন্দিরের চিতাভস্ম 324
৩। আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 326
৪। প্রাইভেট লাইফ—এস. এ. আইয়ার 327
৫। ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের উদ্দেশ্যে নেতাজীর বিশেষ ও শেষ নির্দেশনামা 328
৬। 'জাতির জনক' 329
৭। ভাইসরয় ঃ লর্ড ওয়াভেলের জার্নাল 331
৮। বিদেশীর দৃষ্টিতে ঃ (১) চেকোশ্লভাকিয়ার প্রখ্যাত লেখিকা মিসেস কুর্টি, (২) ইংলণ্ডের সৈনিক-ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডস, (৩) পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত লেখক ডঃ ভোইগট, (৪) বর্মী নেতা ডাঃ বাম, (৫) থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিপুল সংগ্রাম, (৬) 'দ্য স্প্রিংগিং টাইগার' পুস্তকের বিখ্যাত লেখক হিউটয় 332
৯। ডায়েরী—ঝাঁসীর রাণী রেজিমেন্টের ডিটাচমেণ্ট কম্যাণ্ডার 334
১০। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পুরুষকার ও শক্তির উৎস 337
১১। ছাত্রজীবনে সুভাষচন্দ্র—সুরেশচন্দ্র বসু 339
১২। দুই ধর্মগুরুর বিশ্লেষণে সুভাষচন্দ্রের স্বরূপ (ক) স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী, (খ) স্বামী ভাস্বরানন্দ মহারাজ 342
১৩। নেতাজী ও কম্যুনিজম এবং ফ্যাসিজম 346
১৪। নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস (আই.এন.এ.-র গুপ্তচর বিভাগ) 353
১৫। 'হিন্দুস্থান' যুদ্ধজাহাজের নৌবিদ্রোহীর টেস্টামেণ্ট 356
১৬। পঞ্চাশের মন্বন্তরে নেতাজীর ভূমিকা 358
১৭। শৌলমারী সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার 364

।। মানচিত্র ।।

১। ভারতের মুক্তি সন্ধানে বিদেশ পরিক্রমা 320
২। সিঙ্গাপুর থেকে ইম্ফলে যুদ্ধ অভিযান 321
৩। মণিপুরের যুদ্ধ 322

।। ফটোগ্রাফ ।।

১। ক্যাডেট সুভাষ মাঝে 56–57
২। ইউরোপে চিকিৎসার জন্য স্বেচ্ছা-নির্বাসনকালে
৩। তুষারপাত দর্শনরত
৪। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টরূপে

৫। মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র মাঝে 88–89
৬। এ্যান্টি-কম্প্রমাইজ মহাসম্মেলনে ভাষণ
৭। বীর সাভারকরের সাথে নেতাজী
৮। সাবমেরিনে সুভাষচন্দ্র

৯। আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীপরিষদ মাঝে 216–217
১০। সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন
১১। আজাদ হিন্দের ক্রীড়াঙ্গনে হাস্যোজ্জ্বল সুপ্রিম কম্যাণ্ডার
১২। ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় প্রকাশিত নেতাজীর বন্দী থাকার সংশয়

॥ গ্রন্থ-বিবরণী ॥ সাক্ষাৎকার ॥ 371

প্রথম অধ্যায়

অরুণোদয়

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনী এক বিস্ময়কর জীবন্ত মহাকাব্য। স্কুল-কলেজের লেখাপড়ার সময়ে আত্মানুসন্ধান, দেশ সেবায় আত্মোৎসর্গ, মাতৃভূমি ছেড়ে দুঃসাহসিক অভিযান, অতি দূর দেশান্তরে স্বাধীন ভারত গভর্নমেন্ট গড়ে বিশ্বের দুই মহাশক্তিধর দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—এর প্রত্যেকটি অধ্যায়ই বিশ্বের যে-কোন দেশের ছাত্র-যুবকদের কাছেই শুধু নয়—সমাজের সকল মানুষের কাছে অপূর্ব ঘটনাবহুল ও রোমাঞ্চকর মহাজীবন। ভারতবর্ষের গতানুগতিক ইতিহাসের গতিকেই শুধু নয়, গতিপথই তিনি বদলে দিতে সফল হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়টি এতই তেজোদ্দীপ্ত যে, কিছুকাল পরে ভারতেরই ছেলেমেয়েদের কাছে তা কল্প-কথার বা স্বপ্নরাজ্যের রাজকুমারের অবিশ্বাস্য গল্প-কাহিনীর আকার ধারণ করবে। কিন্তু তাঁকে সঠিকভাবে জানতে হলে ছাত্রজীবনে তাঁর মনের গঠন, জীবন সম্পর্কে ধারণা ও সে জীবনকে একটা লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের কৈশোর ও যৌবন কি শক্তি ও ভাবাদর্শে গড়ে উঠেছিল—তা ভালভাবে না জানলে তাঁকে পূর্ণভাবে আমরা বুঝে উঠতে পারব না। যে এ্যাটমিক এনার্জি বা আণবিক মহাশক্তির স্ফুরণ ঘটবে তাঁর জীবনে তা জানতে হলে শক্তিকেন্দ্রের মূল উৎসভূমিতে যাওয়া চাই, এমন কি এই নব্বই বছর বয়সে তাঁর জীবিত থাকার কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ ঐতিহাসিকগণ যদি দাঁড় করাতে বা না করাতেও পারেন—তবু সে জীবন অঙ্কুরে এমন চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে আছে যা থেকে মানুষের অবশ্যই বিশ্বাস আসবে, মৃত্যু তাঁর জীবনকে অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের জন্ম। পাঁচ বছর বয়সে কটকের প্রোটেস্ট্যান্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে ভর্তি। ঐ বয়সেই বিস্ময়—ইউরোপীয় বা অ্যাংলোইণ্ডিয়ান ছাত্র ছাড়া ভারতীয় ছাত্রদের স্কলারশিপ পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয় না—দাদারা এবং নিজে ক্লাশের সেরা ছাত্র হওয়া

সত্ত্বেও এরকম অদ্ভুত ব্যবস্থার সম্মুখীন হয়ে প্রশ্ন করেও সোজা উত্তরটি পায়নি কারো কাছ থেকেই। তারপর র‍্যাভেনস কলেজিয়েট স্কুলে ট্রান্সফার, কারণ, স্যার আশুতোষের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বাংলা বাধ্যতামূলক করা হলো তখন, আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত তখন কটকের স্কুল-কলেজ। বারো-তেরো বছরের একটি জ্যোতিষ্মান ছেলে কোট-প্যান্ট পরিহিত, ক্ষুদে হলেও পাকা সাহেব, এসে ঢোকে স্কুলে ক্লাশ সেভেন-এ। বাবা জানকীনাথ বসু সরকারী উকিল, খুব বড় আইনজীবী এবং সে সময় ব্রিটিশ সরকারের রায়বাহাদুর উপাধি তাঁর বিশেষ ভূষণ।*

যাই হোক, সেদিন সব শিক্ষক ছাত্র মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো এই ছাত্রকে, দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি বুদ্ধির দীপ্তি চোখে-মুখে, সমস্ত অবয়বে। কিন্তু হেডমাস্টারমশাই ও অন্য সকলে যে ধুতি পাঞ্জাবী চাদর পরা! পরের দিন কটকের বিস্ময়, সমগ্র বোস পরিবারের বিস্ময়ভরা চোখের সামনে দিয়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরা সুভাষচন্দ্র স্কুলের ফটক দিয়ে ঢুকলো—সেই বুঝি স্বদেশচেতনার প্রথম প্রভাত। ক্ষুদিরামের ফাঁসির তৃতীয় বার্ষিকী পালনের জন্য অনাহারে থাকার প্রস্তাব দেয় সে ছাত্রবন্ধুদের—কাল উনুন জ্বলবে না, হাঁড়ি চড়বে না, আমরা সবাই উপোস করে থাকবো—স্বতঃস্ফূর্ত সার্বিক সমর্থন উছলে ওঠে। দিনটা ছিল ১৯১১ সালের ১০ই অগাষ্ট, ১৯০৮ সালে ১১ই আগষ্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল—তাই। র‍্যাভেনস কলেজ হোস্টেলে অরন্ধন, শোক দিবস, অভুক্ত অবস্থায় সেদিন পড়াশুনা করলো ছাত্রেরা অম্লান বদনে—হেডমাস্টার বেণীমাধববাবুর চোখ পড়লো সুভাষের ওপর—জিজ্ঞেস করলেন, "স্বদেশী গান জান না? তাহলে আজকের দিনে তোমরা সে গান গাও।" কিন্তু সে যে তাঁর অপরাধ—বিদেশী রাজার শাসনাধীনে স্বদেশী গান! হেডমাস্টার বেণীমাধববাবুর বদলীর হুকুম হয়ে গেল কটক থেকে কৃষ্ণনগর। পরাধীন দেশের সরকারী স্কুলের চাকুরী—তাই ছাত্রনেতা সুভাষকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধর্মঘট থেকে নিবৃত্ত করে বিদায় নিলেন বেণীমাধববাবু। কিন্তু স্টেশনে মালা হাতে চোখভরা জল নিয়ে সুভাষ যে দাঁড়িয়ে! জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন—একটা মানুষের মত মানুষ হও। এই শিক্ষকের খুব প্রভাব পড়েছিল সুভাষচন্দ্রের জীবনে এবং

জাতীয় আন্দোলনে বন্দীদের ওপর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ১৯৩০ সালে জানকীনাথ বসু ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট প্রদত্ত 'রায়বাহাদুর' উপাধি পরিত্যাগ করেন।

মানুষও হয়েছিলেন—এমনিতর যে, হেডমাস্টার বেণীমাধব দাস পরবর্তী সময়ে লিখেছেন—"…সেই সুভাষচন্দ্রকে কৈশোরে নগ্নপদে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত দরিদ্রের গৃহে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বালক-যুবক-বৃদ্ধের রোগশয্যার পাশে দু'হাতে ঔষধ-পথ্য নিয়ে দণ্ডায়মান থাকতে দেখেছি। বাল্যে খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারক সাহেবের নিকট শিক্ষালাভ করবার পর তরুণ অরুণের ন্যায় সে দেশীয় স্কুলে এসে যোগ দিল। জাতীয় ভাবসম্পদ জ্ঞানের গভীরতা, তপস্যারত জীবন ও দারিদ্র্যবরণ তাকে মহিমময় করে তুললো। …নবযুগের নববিবেকানন্দ, জ্ঞান-ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়কারী এই সুভাষ। চিররহস্যময় মেঘজালে লুক্কায়িত, আবার কখনও মেঘবিদীর্ণকারী তড়িৎপ্রবাহ-স্বরূপ মাতৃ আদর্শের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সুভাষচন্দ্র নূতন মহাভারত রচনা করে গেলেন—তাঁকে প্রণাম। জন্মসিদ্ধ ব্রহ্মচারী, শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রতধারী, মুক্তি সংগ্রামের জীবন্ত প্রতীক যিনি, তাঁকে প্রণাম। জয়হিন্দ! বন্দেমাতরম্!"

[মাঘ/১৩৫৩]

সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—"দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাঁর রচনাগুলি (স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী) মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগলাম। কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত তাঁর পত্রাবলী ও বক্তৃতা-গুচ্ছ—স্বদেশবাসীকে প্রদত্ত বাস্তব উপদেশে পরিপূর্ণ—আমাকে সর্বাপেক্ষা অনুপ্রাণিত করেছিল। পড়বার ফলে তাঁর শিক্ষার মূলকথা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হল। 'আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়'—তোমার নিজ মুক্তি ও মানব সেবা—এই হবে জীবনের লক্ষ্য। …আমার জীবনে যখন বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে তখন সবে পনেরয় পড়েছি। তার মধ্যে আমার মধ্যে সুরু হলো এক বিপ্লব এবং সমস্ত কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। তাঁর শিক্ষার পূর্ণ তাৎপর্য অথবা তাঁর ব্যক্তিত্বের বিরাটত্ব সম্যক উপলব্ধি অবশ্যই তখন করতে পারিনি। …বিবেকানন্দ থেকে ক্রমে ক্রমে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। …রামকৃষ্ণের ত্যাগ ও শুদ্ধতার দৃষ্টান্তের ফল হয়েছিল এই যে আমার সমস্ত কু-প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। আর বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচলিত পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে আমার সংঘর্ষ ডেকে এনেছিল।"

তাঁর আত্মজীবনীতে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—"আমার কাছে পড়াশুনার গুরুত্ব কমে আসছিল এবং কয়েক বছর খুব বেশী পড়াশুনা করেছিলাম বলেই আমার সর্বনাশ ঘটতে পারেনি। এখন আমার কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় ছিল মানসিক বা আধ্যাত্মিক অনুশীলন। এই সময়ে আমার কোন উপযুক্ত পথপ্রদর্শক ছিল না, বই পড়ে যাওয়া এবং তা থেকে যতটা সাহায্য লাভ করা যায় সেদিকেই মনোনিবেশ করেছিলাম। কিন্তু এসব বই-এর অধিকাংশই যে বিশ্বস্ত বা অভিজ্ঞ লোকের লেখা নয় একথা পরে বুঝেছিলাম। ব্রহ্মচর্য্য অথবা যৌনসংযম সম্বন্ধে যে-সমস্ত পুস্তক ছিল সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পড়ে ফেলেছিলাম। তারপর সাগ্রহে শেষ করেছিলাম ধ্যান সম্পর্কীয় পুস্তকগুলি। অনেক চেষ্টার পর যোগ, বিশেষতঃ হঠযোগ সংক্রান্ত পুস্তকগুলি খুঁজে বের করে কাজে লাগিয়েছিলাম।” যোগের প্রকৃত অর্থ ঈশ্বরের সহিত মিলন—রাজযোগের উদ্দেশ্য মানসিক ও হঠযোগের উদ্দেশ্য দৈহিক সংযম। শিক্ষকদের, মা-বাবার এবং আত্মীয়স্বজনদের হতাশা, নিরাশা যে—সাধু-সন্তদের পেছনে ঘোরাঘুরি, লেখাপড়া না-করা সুভাষ সম্পূর্ণ বিগড়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। কি যে দুর্ভাবনা! কিন্তু এ-কি, সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সুভাষচন্দ্রই যে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেছে। সাবাস সুভাষ! এবার কটক ছেড়ে—কলকাতা—১৯১৩ সাল। কটক থেকে তাঁর মা প্রভাবতী দেবীর কাছে লেখা স্কুলের ছাত্র সুভাষচন্দ্রের অনেকগুলি চিঠির মধ্যে একখানি চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি এখানে ঃ

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

পরম পূজনীয়া — কটক
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী — রবিবার
শ্রীচরণকমলেষু—
মা,

ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতাররূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ। দেখ মা, ভারতে যাহা চাও সবই আছে—প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, ভীষণ বৃষ্টি আবার মনোহর শরৎ ও বসন্তকাল, সবই আছে। দাক্ষিণাত্যে দেখি—স্বচ্ছসলিলা, পুণ্যতোয়া গোদাবরী দুইকূল

ভরিয়া তর তর কল কল শব্দে নিরন্তর সাগরাভিমুখে চলিয়াছে—কি পবিত্র নদী।

… … … … …

ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমাদের ধর্ম নাই, কিছুই নাই—জাতীয় জীবন পর্যন্ত নাই। আমরা এখন এক দুর্বল শরীর পরদাসত্ব-ব্যবসায়ী, নষ্ট ধর্ম, পাপিষ্ঠ জাতি! হায় পরমেশ্বর! সেই ভারতের এখন কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত। তুমি কি আমাদের উদ্ধার করিবে না? এ-ত তোমারই দেশ—

… … … … …

মামীমা ও বৌদিরা কোথায় ও কেমন আছেন? দাদারা কেমন আছেন? অন্যান্য সকলে কেমন আছেন ও আছে? আপনি ও বাবা কেমন আছেন? আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন। মেজদার খবর কি? ২/৩ মেলে আমি কোনও পত্র পাই নাই। নূতন মামাবাবু কেমন আছেন? শুনিলাম ছোট মামীমার বড় অসুখ হইয়াছে। তিনি কেমন আছেন? সারদা কি বলে?

ইতি—

আপনারই সেবক

সুভাষ

ছাত্র সুভাষচন্দ্রের এই চিঠির প্রথম মহামূল্যবান যে-দিকটি সকলকে আকর্ষণ করে তা হচ্ছে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট মতবাদই শুধু নয় তাঁর মাতৃভূমির পবিত্রতা ও সুমহান ভাবরূপ, এবং সেই ভারতের ধর্ম নেই—জাতীয় জীবন পর্যন্ত নেই, যে জন্য তাঁর মানসিক যন্ত্রণাবোধ। একটি কিশোর বালকের পক্ষে এরকম উক্তি মানুষকে হতবাক করে।

শুরু হলো কলেজ জীবন—গতানুগতিক পথ তাঁর নয়—তাঁর জীবনধারা আত্মিক কল্যাণ ও মানুষের সমাজ কল্যাণ। ছোটবেলায় ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ ও যোগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁকে জীবনের গুরুত্ব বুঝতে শিখিয়েছিল—তিনি বলেছেন, "বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে যে-দর্শন আমি খুঁজে পেয়েছিলাম তা আমার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে প্রায় যথেষ্ট ছিল এবং তাকে ভিত্তি করে আমার নৈতিক ও বাস্তব জীবন নতুন করে গড়ে তুলতে আমি পেরেছিলাম, এর সাহায্যে কয়েকটি মূলনীতি আমি শিখেছিলাম যার

দ্বারা আমার সামনে যখনই কোন সমস্যা বা সংকট দেখা দিত তখনই আমার আচরণ কিংবা কার্যধারা নির্ণয় করা সম্ভব হত। ··· আমার নিজের সঙ্গে বোধহয় সবচেয়ে তীব্র যে-সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল তা হলো যৌনপ্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ; আত্মোন্নতির জীবন মেনে না নিয়ে বরং আমার জীবনকে কোনও মহৎ কাজে উৎসর্গ করবো—তা স্থির করার জন্য প্রকৃতপক্ষে আমাকে কোনও বেগ পেতে হয়নি। সেবা আর অনিবার্য ক্লেশপূর্ণ জীবনকে মেনে নিতে গেলে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে কিছুটা প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, তবে যৌনপ্রবৃত্তিকে দমন কিংবা মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন ছিল অবিরাম চেষ্টার, অদ্যাবধি তা চলছে।”

সে সময় অরবিন্দের জীবনাদর্শ সুভাষচন্দ্রের মনে প্রভাব ফেলেছিল—দর্শনের দিক দিয়ে—তিনি, আত্মা ও জড়, ঈশ্বর ও সৃষ্টির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তখনো পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিতে আগ্রহ জন্মেনি। সমাজসেবার ব্যাপারে অভিনব ও মজার অভিজ্ঞতা তাঁর ঘটলো এসময়। খুব আগ্রহ নিয়ে গরীবদের সাহায্য করার একটা সংঘ-এ, দক্ষিণ কলকাতার ‘অনাথ ভাণ্ডার’-এ যোগ দিলেন। প্রতি রবিবার বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে প্রত্যেককে তার পালার শেষে ১ মন থেকে ২ মন চাল আনতে হতো। প্রথম যেদিন চাল সংগ্রহের জন্য থলি কাঁধে অনভ্যস্ত ভলান্টিয়ার সুভাষ, প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র সুভাষ বেরুলেন—সেদিন তীব্র লজ্জাবোধ তাঁর মধ্যে। সে লজ্জাবোধ বহুকাল তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তাঁর আত্মজীবনীতে পাওয়া যায় একটি ঘটনা—যার ফল তাঁর জীবনের ওপর ছিল সুদূর প্রসারী। “কলকাতায় আমাদের বাড়ীর সম্মুখে বসে এক জবুথবু বৃদ্ধা ভিখারী মহিলা প্রতিদিন ভিক্ষা করতো। যতবার আমি বাইরে যেতাম বা বাড়ী ফিরতাম, তাকে না দেখে পারতাম না। যখনই তাকে দেখতাম বা এমন কি তার কথা চিন্তা করতাম তার করুণ মুখখানি আর তার ছিন্ন বস্ত্র আমাকে যন্ত্রণা দিত। পাশাপাশি নিজেকে এত সচ্ছল ও সুখী মনে হত যে আমি অপরাধী বোধ করতাম। আমার মনে হতো—তিনতলা বাড়ীতে বাস করার মত এরূপ ভাগ্য লাভ করার কি অধিকার ছিল আমার যখন এই নিঃস্ব ভিখারী মহিলাটির তার মাথার ওপরে কোনও আচ্ছাদন ও প্রকৃতপক্ষে কোনও খাদ্য বা বস্ত্র জুটতো না ? পৃথিবীতে এত দুঃখ যদি থেকেই যায় তাহলে যোগের কি মূল্য ? এরকম সব চিন্তা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাকে বিদ্রোহী করে

তুলেছিল—কিন্তু কি করার ছিল আমার? একটা সামাজিক ব্যবস্থাকে একদিনে ভাঙতে বা রূপান্তরিত করতে পারা যায় না! ইতিমধ্যে এই ভিখারী মহিলাটির জন্য কিছু একটা করা দরকার—এবং নিজেকে জাহির করার চেষ্টা না করে, তা করতে হবে। ট্রামে করে কলেজে যাওয়ার জন্য বাড়ী থেকে আমি টাকাকড়ি পেতাম। তা আমি সঞ্চয় করে দান-কার্যে ব্যয় করবো স্থির করলাম। প্রায়ই আমি কলেজ থেকে হেঁটে বাড়ী ফিরতাম—যার দূরত্ব ছিল তিন মাইলের উপর—এবং কোনওদিন যথেষ্ট সময় থাকলে হেঁটেও কলেজে যেতাম। তা আমার অপরাধবোধ কতকাংশে লাঘব করেছিল।”১

সুভাষের মনে ধর্মীয় আবেগ। পড়াশুনার গুরুত্ব তাঁর কাছে বড় ছিল না তখন। বেরিয়ে পড়লেন গুরুর সন্ধানে। কলকাতা থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে নদীতীরে এক পাঞ্জাবী যুবক সন্ন্যাসীর খবর পেয়ে এক বন্ধুকে নিয়ে প্রায়ই তার কাছে চলে যেতেন। এই সন্ন্যাসীর সংস্পর্শ সুভাষচন্দ্রকে গুরুলাভের জন্য উদ্বেল করে তুলেছিল। ১৯১৪ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে আর এক বন্ধুকে সঙ্গে করে টাকা ধার করে বাড়ীতে কাউকে না জানিয়েই তীর্থযাত্রা। প্রথম আঘাত এলো হরিদ্বারে—সাধুদের সমাজে। বাঙ্গালী মাছ খায়, অতএব তারা সেখানে খৃষ্টানদের মতই অস্পৃশ্য। দ্বিতীয় বিস্ময়—বুদ্ধগয়ার কাছে সন্ন্যাসীদের মঠে সুভাষেরা অ-ব্রাহ্মণ বলে পৃথক খাওয়ার ব্যবস্থা হলো, কূয়ো থেকে জল তুলতে দেওয়া হ’লো না। হোক-না শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী পরিচালিত মঠ, যে-শঙ্করাচার্য্যের কাছে জাতপাতের সাম্প্রদায়িকতা ছিল না।২ তারপর মথুরার পাণ্ডারা ক্রুদ্ধ হলেন এঁদের ওপর, কারণ তাঁরা জানতে পেরেছেন, সুভাষচন্দ্ররা আর্য্যসমাজপন্থীদের বন্ধু, যারা মূর্তি পূজা অস্বীকার করে—অতএব সাংঘাতিক লোক—ওখানে সুবিধা হলো না। চলো যাই বৃন্দাবনে। সাধু-সন্তরা শুনলেন—এঁরা গুরুকুল আশ্রমের সন্ধান করছে—কানে আঙ্গুল দিলেন তাঁরা, কী ভীষণ কথা, একটি কথাও বললেন না তাঁরা এদের সঙ্গে তারপর। তবে ওঁদের অঞ্চলের বড় মহারাজ রামকৃষ্ণদাস বাবাজী

১। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী—প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬

২। ‘সর্বতোৎসৃজ ভেদ-জ্ঞানম্’—মহামতি শঙ্করাচার্য্যের এই শ্লোকটি সুভাষচন্দ্র মঠে উদ্ধৃত করেছিলেন।

হিন্দু দর্শনে সুপণ্ডিত। তিনি অবশ্য বললেন, বৈষ্ণবীয় মতবাদ শংকরাচার্য্যের মায়াবাদকে ছাড়িয়ে কতদূরেই না এগিয়ে গিয়েছে। সুভাষের কাছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষা অধিকতর বাস্তবমুখী। তথাপি, এ বিশ্ব সংসার সমস্তই মায়া—শুধু ব্রহ্মই সত্য—মহামতি শংকরের এই মতাদর্শ তাঁর কাছে ঐ কৈশোর বয়সেই জীবনের সার বলে প্রতিভাত হয়েছিল—সেজন্য শংকরাচার্য্যের বিরুদ্ধে আলোচনা অপ্রিয় বোধ হলো। দিকে দিকে হতাশা—কোথা ধর্ম—কোথা পথ—কে দেবে নির্দেশ! সে এক অসহনীয় অবস্থা।

বারাণসীর রামকৃষ্ণমিশন মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ) তখন মঠাধ্যক্ষ। তিনি একদিন দেখতে পেলেন একটি ছেলে এসে ঢুকলো বিকেলবেলা। মহারাজের কাছে সুভাষকে হাজির করা হলো। স্বামীজী তাঁকে গৃহে ফিরে যাবার উপদেশ দিলেন এবং বললেন তাঁদের মত সুভাষকে সন্ন্যাস নিতে হবে না—দেশ তাঁর কাছে অনেক জিনিস প্রত্যাশা করছে। এইভাবে গুরু অন্বেষণের কাজ শেষ করে দু-মাসের শেষে বাড়ীর সকলের দুর্ভাবনার অবসান ঘটিয়ে হারিয়ে যাওয়া সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন। এসেই কঠিন টাইফয়েড্ রোগে শয্যাশায়ী হলেন। এই-ই সুভাষ, যৌবনের দ্বার-প্রান্তে—তরুণ-তাপস, অশান্ত ব্রহ্মচারী—বহ্নিশিখা।

সন্ত্রাসবাদের বিপ্লবী পথে সুভাষচন্দ্র আকৃষ্ট নয়, তিনি তখন সম্পূর্ণ তাঁর নিজের ভাবনার জগতে। অবশ্য ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের দুর্ব্যবহার, অপমান তাঁর মনেপ্রাণে প্রচণ্ড জ্বালা ধরায়। তাঁর কথায় বলা যায়, "যখনই এরকম কোন ঘটনা ঘটতে দেখতাম আমার স্বপ্নগুলি প্রচণ্ড আঘাত পেত, এবং শংকরাচার্য্যের মায়াবাদের ভিত্তিমূল পর্যন্ত একেবারে নড়ে উঠতো। নিজেকে বোঝানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হত যে, কোনও বিদেশীর হাতে অপমানিত হওয়া একটি মায়া যা উপেক্ষণীয়। অবস্থাটা আরও জটিল হত যদি কলেজের কোন ব্রিটিশ অধ্যাপক আমাদের প্রতি রূঢ় বা অপমানকর আচরণ করতেন।"

ভারতে চাকুরীরত প্রায় সব ইংরেজ অফিসারদেরই ব্যবহার ছিল উদ্ধত—রেলে, স্টীমারে, জাহাজে কিংবা ট্রামের মধ্যে যেমন, তেমনি স্কুল-কলেজের মধ্যেও ওদের ভাবমূর্তি অনেক সময়ই দুঃসহ ছিল বিবেকবান মানুষের কাছে—কিন্তু পরাধীনতার বড় জ্বালা—বড় হীনমন্যতা! কিন্তু ওরা যে তরতাজা যৌবনের স্ফুলিঙ্গ—ওরা দেশের সেরা তরুণের দল। প্রেসিডেন্সী

কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক তখন এড্‌ওয়ার্ড ফার্লি ওটেন। সেটা ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাস। কলেজের ক্লাসে বা হোস্টেলের সভায় মাঝে মাঝে ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি তিনি অত্যন্ত অশালীন কটূক্তি করতেন। তাঁর এক প্রিয় ছাত্র প্রমথনাথ ব্যানার্জী (পরবর্তীকালে ভাইস্‌ চ্যান্সেলার) তাঁকে হিন্দু হোস্টেলের সভায় নিয়ে এসেছিলেন। ওটেন এই সভায় বলেন, "England's mission in India is to civilize the barbarians"— ভারতে ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্বরদের সভ্য করা। এর প্রতিক্রিয়ায় সুভাষের নেতৃত্বে ছাত্ররা ধর্মঘট করেছিল—সেজন্য ওঁদের জরিমানা হয়। তাছাড়া তারই সমর্থনে, 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার দেশ'—তখন নিষিদ্ধ গান, তা-ই সভায় গাওয়া হল—আর কিনা স্বয়ং ওটেন সেই সভায় সভাপতি! অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষ, মনস্তত্ত্বের খগেন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক পিক, প্রভৃতি। ক্রুদ্ধ ওটেন সভামণ্ডপ ত্যাগ করেই চলে গেলেন শুরুতে। তারই কয়েকদিন পরের ঘটনা—সজোরে ধাক্কা দিয়ে ছাত্র কমল বসুকে বারান্দায় ফেলে দেন তিনি। অপরাধ, তার জুতোর শব্দ অঙ্ক ক্লাশঘরের মধ্যে এসেছে এবং কমলকে পড়ে যাওয়া থেকে সাহায্য করতে এসে আর এক ছাত্রকে আবার আঘাত। ব্যস, আর নয়। ধর্মঘটে এ অশিক্ষকোচিত অন্যায়, এ বিজাতীয় ঘৃণার প্রতিবিধান সম্ভব নয়। —"এর পরে একদিন নীচে কমনরুম ও লাইব্রেরী হলে যাওয়ার সময় সিঁড়িতে অবতরণকারী একদল ছেলের মধ্যে একজন সম্ভবতঃ ওটেনকে ধাক্কা দেয়, তাতে তিনি যখন পড়িতে পড়িতে নিজেকে সামলাইয়া দাঁড়াইলেন তখন ঐ ছাত্রেরা চারদিকে দৌড়াইয়া পালাইতে লাগিল। ঠিক এইসময় আমি ও আমার সহপাঠী বিপিনচন্দ্র দে (তিনি দর্শনে ঈশান স্কলার ছিলেন, পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছিলেন) তাঁহাকে দু-চার ঘা দেওয়ার পর বোধ হয় আরো কয়েকজন ছাত্র আসিয়া তাহাতে যোগ দেয়। এই মারামারির মধ্যে সুভাষচন্দ্র ছিলেন না। তবে ছাত্রদের আন্দোলনে পুরোবর্তীদের অন্যতম ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম এ সম্পর্কে উঠিয়াছিল।"—অনঙ্গমোহন দাম[৩]

"এই ঘটনাকে নিয়ে রচিত হয়েছে কত গল্প, লিখিত হয়েছে সুভাষচন্দ্রের জীবনীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার প্রায় সর্বত্রই সুভাষকে মিঃ ওটেনের

৩। স্মরণে-মননে সুভাষচন্দ্র—রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা ৩১

প্রহারকারীদের দলপতিরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে মুক্তকণ্ঠে বলছি, না, এ কথা সত্য নয়। মিঃ ওটেনের প্রহারের ব্যাপারে কোন স্তরেই সুভাষের কোনরূপ সহযোগিতা ছিল না। না তার নেপথ্য পরিকল্পনায়,. না তার প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে। বস্তুতঃ সুভাষ মিঃ ওটেনের ত্রাতা ও প্রাণরক্ষক। তবে কেন শাস্তি হলো তার? কারণ সে কায়মনোবাক্যে নেতা—সে ছিল আদর্শ ছাত্রনেতা। তাই ওটেন নিগ্রহের সর্বদোষ দায়িত্ব অকুণ্ঠচিত্তে মাথায় তুলে নিয়েছিল।"—নলিনীকিশোর রায়[৪]

অধ্যাপক লাঞ্ছনার তদন্ত কমিশন, প্রিন্সিপ্যালের পদত্যাগ, সুভাষচন্দ্রের বহিষ্কার। তদন্ত কমিশনের সামনে সুভাষচন্দ্র তাঁর নেতৃত্বদানের দায়িত্ব অস্বীকার করলেন না, উত্তর দিলেন—মিষ্টার ওটেনের ওপর এই আক্রমণ সমর্থন করা যায় না কিন্তু দিনের পর দিন ছাত্রদের প্রতি তাঁর দুর্ব্যবহার বিজাতীয় ঘৃণাবোধ প্রভৃতিতে ছাত্রদের উত্তেজিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। অনুতপ্ত বা ক্ষমাপ্রার্থী হলেন না সুভাষচন্দ্র—তখন তাঁর বয়স ১৯ বছর। শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বহিষ্কার ঘোষণা করা হলো। সৌম্য, শান্ত ভাবগম্ভীর সুভাষ, লেখাপড়ায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণকারী আত্মবিশ্বাসে অটল সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ জেমসকে ধন্যবাদ দিয়ে কলেজ ত্যাগ করলেন। পরাধীন দেশ ও জাতির পক্ষে অন্ততঃ একজন তরুণের সে দিনের সে ত্যাগ, সে কম কথা নয়। সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন—"বিচার করিয়া দেখিলাম আমার ছাত্রজীবন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার ও অনিশ্চিত। কিন্তু আমি দুঃখিত হই নাই···নিজেকে বুঝাইলাম ত্যাগ বিনা জীবনের মূল্য কি।"

এই প্রসঙ্গে যে-ঘটনা আজ দীর্ঘযুগ পেরিয়ে সকলকে চমৎকৃত করবে তার বর্ণনা প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র পরবর্তীকালে ভারতবাসীর কাছে, ভারতের ইতিহাসের কাছে শুধু প্রবাদ পুরুষরূপেই নয়, তাঁর জীবন ও জীবনী নিয়ে বিশ্বের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষতঃ আমেরিকায় গবেষণার কাজ চলেছে গভীরে। আর এক ইংরেজ অধ্যাপক যিনি এদেশে এসে ইতিহাস বিষয়ে ছাত্রদের পড়াতেন, আমাদের স্বাজাত্যবোধে যথেষ্ট আঘাত দিয়েছিলেন, ছাত্রদের দ্বারা লাঞ্ছিতও হয়েছিলেন, তারপর এক প্রদেশে ডি. পি. আই বা শিক্ষাধিকর্তা হয়েছিলেন, সেই ফার্লি ওটেন

৪। স্মরণে-মননে সুভাষচন্দ্র—রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা ৩৯

এদেশে চাকুরী ত্যাগ করে বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারী পড়ে আইন ব্যবসা করেন ; বেঁচে ছিলেন ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত এবং অন্ধত্বপ্রাপ্ত হন এবং ১৯৭৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। 'Anglo Indian Literature,' 'Glimpses of India's History', 'European Travellers in India' প্রভৃতি কয়েকখানি বই তিনি লিখেছেন। শেষে আর যে-বইখানি লেখেন তা কবিতার বই—'Song of Aton and Other Verses', ছাপা হয় ১৯৬৭ সালে। এই বইখানির এক খণ্ড উনি তাঁর ৮৫ বৎসর বয়সে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার পাঠিয়ে দেন (এঁর কাছেই অধ্যাপক ওটেন কলকাতায় বাংলা শিখেছিলেন)। এই কবিতা বই-এর ৫৩ পৃষ্ঠায় একটি কবিতা আছে—তা পড়লে শুধু ভারতবাসী হিসাবে নয় ব্রিটিশ উপনিবেশের সঙ্গে যুক্ত যে-কোন দেশের মানুষই বিস্মিত না হয়ে পারবে না—কারণ নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মধ্যে যে-ভয়ানক কঠোর কলুষ সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগতভাবে নেতাজী ও তাঁর আদর্শের প্রতি ইংরাজ রাজপুরুষদের বিষাক্ত ভাব-বিভীষিকা, তা অবশ্যই অপসৃত হওয়ার বিষয়বস্তু—এই কবিতার প্রতিপাদ্য।

ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনী ও তার মহান অধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি কি অকপট শ্রদ্ধা ও ভালবাসা একসময়ের অত্যাচারী ইংরেজ অধ্যাপক জীবনের সায়াহ্নে এসে প্রদর্শন করেছেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচায়ক। একদা ছাত্র সুভাষচন্দ্রের বিশ্ব ইতিহাসে মহতী প্রতিষ্ঠা অধ্যাপক ওটেনের ভাবরাশিকে উদ্বেলিত করে কবিতার আকার পরিগ্রহ করেছে—

'Subhas Chandra Bose Oblit 1945'

Did I once suffer Subhas, at your hand ?
Your patriot heart is stilled ! I would forget !
Let me recall but this, that while as yet
The Raj that you once challenged in your land
Was mighty, Icarus—like your courage planned
To meet the skies, and storm in battle set
The ramparts of high Heaven, to claim the debt
Of freedom owed, on plain and rude demand.

High Heaven yielded, but in dignity
Like Icarus you sped towards the sea
Your wings were melted from you by the sun
The genial patriot fire that brightly glowed
In India's mighty heart and flamed and flowed,
Forth from her Army's thousand victories won !

'১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ওটেন যখন সংবাদপত্রে পড়িলেন যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির নেতা সুভাষচন্দ্র বসু বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন তখন তাঁহার স্মৃতিতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা ভাসিয়া উঠিল। তিনি প্রথমেই নিজেকে প্রশ্ন করিলেন—সুভাষ! তোমার হাতেই কি আমি একদিন লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম ? তোমার সেই স্বদেশভক্ত হৃদয়ের গতিবেগ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এ কথা যে ভুলিতে পারিলেই ভাল হইত। আজ মনে পড়ে যে তোমার দেশে তুমি যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলে তাহা ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু তুমি সাহসের সহিত আইক্যারাসের মতন আকাশে উঠিয়া অমরাপুরীর দুর্গপ্রাচীর সংগ্রামের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার দুঃসাহসিক সংকল্প করিয়াছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার দেশের যে স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছিল—যাহার জন্য ছিল নিয়মতান্ত্রিক এবং রূঢ় রক্তাক্ত দাবী তাহা ফিরাইয়া পাওয়া। ক্যাবিনেট মিশন পাঠাইয়া সেই রাজশক্তি তোমাদের দাবী মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছিল, কিন্তু তোমার সম্মান ও মর্যাদাবোধ তোমাকে আইক্যারাসের মতন সমুদ্রের অভিমুখে চালিত করিয়াছিল। তোমার পাখা সূর্যের তাপে গলিয়া গেল। ঐ তাপ হইতেছে ভারত মাতার বিশাল হৃদয়ের যে স্বদেশ ভক্তির আগুন প্রোজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইতেছিল তাহাই। ভারতীয় সেনা দলের সহস্র বিজয়ে ঐ দীপ্তি ভাস্বর রূপে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।…

ভারতীয় মুক্তি অভিযান ও তাহার অদ্বিতীয় অধিনায়কের প্রতি কি অকপট শ্রদ্ধার্ঘ একদা নির্যাতিত ওটেন সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন,… ওটেনের অসাধারণ মহত্বের পরিচায়ক সুভাষচন্দ্রের অপূর্ব ত্যাগ, অনন্যসাধারণ সংগঠনী প্রতিভা ও অভূতপূর্ব সাহস ওটেনের ভাবরাশিকে উদ্বেল করিয়া কবিতায় আকার পরিগ্রহ করিয়াছে… ।'[৫]

কবি ওটেন, গ্রীক কাহিনীর মহাবীর আইক্যারাসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের তুলনা করেছেন। আইক্যারাস ছিলেন ডিডালাসের ছেলে। আইক্যারাস যখন ক্রীট দ্বীপ থেকে উড়ে যাবার সংকল্প করেছিলেন তখন ডিডালাস তাঁর গায়ের সঙ্গে গালা দিয়ে দুখানা ডানা জুড়ে দিয়ে বলেছিলেন—যেন আইক্যারাস বেশী ওপরে উঠবার চেষ্টা না করেন। আইক্যারাস সে উপদেশ ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি এত উপরে উড়ে গেছিলেন যে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে তাঁর দুখানা ডানাই গলে গিয়েছিল এবং তিনি সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলেন। বর্তমানের আইকেরিয়ান উপসাগর তাঁর নামে পরিচিত।

১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের ঘটনা অধ্যাপক ওটেন তাঁর 'আমার ভারতের স্মৃতিকথা' (My Memories in India) বইতে উল্লেখ করেছেন। ঐ ঘটনায় সুভাষচন্দ্রকে তিনি কোনভাবেই দায়ী করেননি বরং তাঁকে 'তরুণ আদর্শবাদী' বলে অভিহিত করেছেন। মনুষ্য চরিত্রের এ বড় বিচিত্র ধারা! নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিশাল ব্যক্তিত্বের কাছে যেন মহতী সমর্পণ, সূর্য-মহিমার ভাবরাশির আলোয় দীপশিখার কোমল দ্যুতি। যাই হোক—এক বছর শাস্তি ভোগের পর তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হলেন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রের লেখায় পাওয়া যায়—'স্মরণ আছে এই সময়েই মনের এক দিক দিয়ে আমার স্পষ্ট উন্নতি হয়েছিল—তা হলো আত্মবিশ্লেষণের অভ্যাস। সেই সময় থেকে বরাবর আমি নিয়মিত ভাবে এরকম অভ্যাস করে আসছি এবং এর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েছি। এর উদ্দেশ্য নিজের মনের উপর তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজেকে আরও ভাল করে জানা।' স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ার সময়ে, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল, গর্ভনমেণ্ট ভারত-রক্ষা বাহিনীর একটা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গঠন করে। তার আগে তাঁর চোখের দোষ ছিল, সেজন্য প্রচণ্ড চেষ্টা সত্ত্বেও মিলিটারীতে ঢোকার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয় যখন 49th Bengalee Regiment-এ তাঁকে ডাক্তারী পরীক্ষায় 'আনফিট' করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাডেট্ কোরে ঢোকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১ নং প্লেটুনের 'এ-কয়' ভুক্ত একজন ক্যাডেট রূপে তিনি ১৯১৭-১৮ সালে ট্রেনিং নিলেন (বর্তমানে রূপান্তরিত এন.সি.সি.),—ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মির সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের প্রথম রাইফেল শিক্ষা—মিলিটারী ট্রেনিং-এর হাতে খড়ি। তিনি এবিষয়ে লিখেছেন, "সন্ন্যাসীদের পায়ের কাছে বসে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা এবং

রাইফেল কাঁধে দাঁড়িয়ে সৈন্যবাহিনীর একদল ব্রিটিশ অফিসারের হুকুম তামিল করা—কি পরিবর্তন! ··· এই শিক্ষা আমাকে এমন কিছু দিয়েছিল যা আমার প্রয়োজন ছিল অথবা যা আমার মধ্যে ছিল না। মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস বোধ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।"

দর্শনে প্রথমশ্রেণীর অনার্স পেলেও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে দ্বিতীয় স্থান হলো সুভাষের। দর্শনশাস্ত্রে এম. এ পড়ার প্রবৃত্তি তখন আর নেই। ভারতের মাটিতে লেখাপড়া শেষ। বাবার প্রস্তাবে একটু দ্বিধা থাকলেও আই. সি. এস পড়ার জন্য বিলাত যাত্রা। সবচেয়ে ধীরগামী তখনকার 'সিটি অব ক্যালকাটা' জাহাজে পাঁচ সপ্তাহ শেষে ব্রিটিশ শাসকদের একেবারে গুহা গহ্বরে! —কি অপূর্ব সুন্দর সম্পদশালী দেশ এই ইংলণ্ড। পরিচ্ছন্ন সুন্দর নগর জীবন, চমৎকার শিক্ষা ব্যবস্থা। স্বাধীনতা, আইনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, আনন্দ! আর ভারতবর্ষ? সে যে এদের পদানত শৃঙ্খলিত একটা উপনিবেশ। পরাধীন দেশ—কি আছে তার? কিন্তু কি ছিল না তার, কি নেই তার? কেন নেই? এর যথার্থ উত্তর দিতে হবে ভাল ছাত্রকে! সে জানে, ভারতবাসীকে দিয়েই ভারতকে অধিকার করেছে ওরা। তারপর ব্যবসাদার ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে হস্তান্তরের নামে বিক্রী হয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজসিংহাসনের কাছে। তার সাম্রাজ্য বিস্তারে বার্মায়, আফ্রিকায়, পারস্যে—দেশ দেশান্তরে যত সৈন্য এবং যুদ্ধ ব্যয় সমস্তই, এমনকি ভারতবর্ষকে রক্ষার নামে ভারতবাসীকেই সরবরাহ করতে হয় সৈন্য ও রসদ। ইংল্যাণ্ডে পোষা ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর একটা অংশের জন্যও সমস্ত দায়িত্বের বোঝা ভারতের জনসাধারণের! অবরুদ্ধ রক্তে তরঙ্গ ওঠে বুকের মাঝখানে শিরায় শিরায়! চীনদেশে, পারস্যে ব্রিটিশ কূটনৈতিক-মিশনের যত ব্যয়—তারও ব্যয়ভার ভারতবাসীর নুয়ে পড়া কাঁধ দুটোয়। ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত তামাম বহু সহস্র মাইল পাহাড় মরুভূমি সমুদ্র দিয়ে যে টেলিগ্রাফ লাইন, বিপুল ব্যয়ে ভূমধ্য সাগরে ব্রিটিশ নৌবহর রাখার জন্য যত খরচ, এমন কি লণ্ডনের রাজপ্রাসাদে তুরস্কের সুলতানকে রাজকীয় অভ্যর্থনার ব্যয় বহন-ও ভারতেরই দায়িত্ব।৬ হায় পরাধীনতা, হায় দাসত্বের গ্লানি—এ

৬। ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া—জওহরলাল নেহরু, পৃষ্ঠা ৩০৫
"Thus India had to bear the cost of her own conquest, and then of her transfer (or sale) from the East India Company to the British Crown, for the extension of the

যন্ত্রনার উত্তরণ কে ঘটাবে—বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য শক্তির এ বজ্রকঠিন কলুষ নিষ্পেষণ থেকে ভারত আত্মার মুক্তির পথ কি! অন্ধকার ভেদ করতেই হবে, দেশমাতৃকার সেই ভূলুণ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি সুভাষকে উদ্বেল করতে লাগলো—প্রস্তুতি—প্রতিক্ষা—প্রতিজ্ঞা—'দ্রৌপদীর বেনী বাঁধা পণ'।

প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও শ্রীঅরবিন্দের একান্ত ভক্ত, কবি ডি. এল. রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায় বিলেতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর সুবিখ্যাত বই—'আমার বন্ধু সুভাষ'-এ লিখেছেন—'আমার ধারণা হল এই—(১) সুভাষ অসাধারণ বিদ্বান, (২) পবিত্র তার চরিত্র, (৩) তার অকলঙ্ক জীবনে কোনদিন কোন রমণীর ছায়াপাত হয়নি, (৪) স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত, (৫) বাল্যকালেই একবার ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল—এই শেষের তথ্যটিই আমার কল্পনা ও চিন্তাশক্তিকে নিশ্চল করে দিল। এত বড় বিস্ময় আমার কাছে আর কিছু নয়। দিকে দিকে সুভাষ দিকপাল।' সুভাষচন্দ্র বন্ধুদের বলতেন--ভারতের লোক নিজেদের ওপর এতটুকু ভরসা করতে পারে না—শেক্সপীয়ার পড়তে, নিজের শক্তির চরম পরীক্ষার জন্য সবসময় তৈরী থাকতে পরামর্শ দিতেন, তাহলে কোথাও হটে যাবার ভয় থাকে না। দেশ আর সত্য তাঁর কাছে পৃথক কোন ভাব বা ভাবমূর্তি ছিল না—একই ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। "—কিন্তু সবচেয়ে বড় বিপদ কি জানো দিলীপ, সেটা আত্মাকে নিয়ে নয়। হয়ত শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে দেখলে জানা যাবে যে, মানুষের স্বভাবের সঙ্গে আত্মবোধ এত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যে সেটাকে বাদ দিয়ে চলা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা কি জানো, যদি তোমার মধ্যে

> British Empire to Burmah and elsewhere, for expeditions to Africa, Persia, etc., and for her defence against Indians themselves. She was not only used as a base for imperial purposes, without any reimbursement for this, but she had further to pay for the training of part of the British Army in England—'capitation' charges these were called. Indeed India was charged for all manner of other expenses incurred by Britain, such as the maintenance of British diplomatic and consular establishments in China and Persia, the entire cost of the telegraph line from England to India, part of the expenses of the British Mediterranean fleet, and even the receptions given to the Sultan of Turkey in London."
>
> —Jawaharlal Nehru, Discovery of India, Page 305

ভালবাসার বীজ না থাকে তাহলে কিছুতেই তোমার দেশাত্মবোধ জাগবে না, কেউ তা জাগিয়ে দিতে পারবেনা হাজার চেষ্টা করলেও। কত তরুণকে দেখেছি ছুটে এসেছে, দেশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তারা—দেশ উদ্ধার করবার জন্যে। দেখে মনে হয়েছে এরা আগুনের শিখার মত সত্যি। কিন্তু তাদের এ অগ্নি ততদিনই থাকে যতদিন পর্যন্ত একটা ভাল রকম ব্যবস্থা না হয়। কাজ গুছিয়ে তারা আস্তে আস্তে স্বার্থের কেন্দ্রে দুর্গ রচনা করে—তারা তখন নিজের পারিবারিক, আর্থিক সব ব্যবস্থা নিয়ে উঠে পড়ে লাগে—যত পায় তত চায়। যদি তুমি অহরহ এই সব মনের চেহারাই দেখ কেবল, তাহলে কি তোমার মনে হবে না যে, দেশের কাজ বলে যা কিছু করা হচ্ছে সেগুলোর আড়ালে রয়েছে মানুষের স্বার্থলোলুপ সুবিধাবাদী চেহারা। মুখোস খুললে দেখবে সুবিধাবাদী, নিরাপত্তাপ্রয়াসী গৃধ্নু মানুষ।”[৭]

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কেম্ব্রিজে আর একজন বাঙ্গালী ছাত্র-বন্ধু ছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ‘সহপাঠী সুভাষ’ প্রবন্ধ থেকে জানা যায়—‘ব্যক্তিগত জীবনে সুভাষ বাঁধা নিয়মে চলতো। সকালে উঠে মুখ হাত ধুয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে ধ্যান করে তারপর পড়াশুনা আহারাদি করত। পড়ার সময় ওর সমস্ত বই একটি শেলফে সাজানো থাকতো—যে দু-একটি বই ও পড়ছে সেগুলি ছাড়া। একটা বই শেষ করে অন্য একটা পড়তে শুরু করার আগে প্রথম বইটা তাকে রেখে অন্য বইটা নিয়ে এসে পড়তে বসতো।’

১৯২০ সালে আই. সি. এস. বা ইনডিয়ান সিভিল সার্ভিসে (ভারত গভর্ণমেণ্টে সর্বোচ্চ চাকুরীর জন্য ইংরেজ ছাত্রদের সঙ্গে কিছু ভারতীয় যুবকদেরও লণ্ডনে পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল) ভারতীয়দের জন্য ৬টি সিট খালি ছিল। এই তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১২ জন ছাত্র দু-বছরের বেশী সময় ধরে বিলেতে প্রস্তুত হচ্ছিল। তাদের সঙ্গে কয়েকজন মেধাবী ইংরেজ ছাত্রও ছিল যারা ঐ বছরের আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফল হয়ে ভারতে তখনকার দিনের বড় চাকুরীতে আসতে চায়। এ অবস্থায় সে বছর শুধু ঐ পরীক্ষায় পাশ নম্বর পেলেই হবে না—সুভাষকে ৬ জনের

৭। আমার বন্ধু সুভাষ—দিলীপকুমার রায়, পৃষ্ঠা ২৫

মধ্যে স্থান করে নিতে হবে। সে প্রায় এক অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ প্রস্তুতি যেন। পরীক্ষার জন্য আর মাত্র ৮ মাস বাকী, তখন কলকাতা থেকে সুভাষচন্দ্র সবে এসে ভর্তি হয়েছেন। পাশ করতে পারবেন না, সে প্রায় নিশ্চিতই ছিল—তবু ভাবীকালের অনেক অসম্ভবের নায়ক দৃঢ় সংগ্রামের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠলেন, ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে চললেন যেন ভারতীয় সিভিলিয়ান চাকুরীতে প্রবেশে উন্মুখ; পরীক্ষার মাত্র একমাস আগেও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন জীবিকা অর্জনের জন্য কোন ধরনের বৃত্তি বেছে নেবেন যাতে করে স্বাধীনভাবে নিজস্ব পথে দেশের জন্য কাজ করতে পারেন—কিন্তু বিস্ময়ে ও শঙ্কায় সুভাষ দেখলেন—পরীক্ষার ফলাফলে যে শুধুমাত্র কৃতকার্য হয়েছেন তাই নয়—চতুর্থ স্থান অধিকার করে বসেছেন।

বিবেকানন্দ বলেছেন, "আমাদের এখন এমন একজন আদর্শ বীর চাই যার পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতি শিরা উপশিরায় বয়ে চলবে রজঃ শক্তির দুর্দমনীয় জীবন প্রবাহ, যে বীর সত্যকে পাবার জন্য দুঃসাহসে ভর করে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে, ত্যাগের আদর্শ হবে তার বর্ম, আর জ্ঞানের আলো তার তরবারী। ··· বলবীর্যহীন দেহ, উদ্দীপনাহীন হৃদয়মন আর মৌলিক চিন্তা বর্জিত মস্তিষ্ক—এই জড়পিণ্ডদের দিয়ে কি হবে! ওদের উজ্জীবিত করতে চাই—প্রাণসঞ্চার করতে চাই—এই কাজে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি।" এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সুদৃঢ় ভাব ও বাণী এবং তাঁর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁকে আপনমনে অনুচ্চস্বরে বলতে শোনা গিয়েছিল—'বিবেকানন্দ কি করিয়া গেল—তাহা বুঝিবার জন্য আর একজন বিবেকানন্দ চাই—তেমন অনেক বিবেকানন্দ সময় হইলেই আসিবে'।[৮]

সন্ন্যাসীর এ বাণী-আহ্বান, ভাবময় মহাপ্রকৃতির কোন অজানা রহস্য জগৎ থেকে রূপ প্রকাশের মাহেন্দ্রক্ষণ এগিয়ে নিয়ে আসে কে জানে!

কেম্ব্রিজে থাকাকালে দিলীপকুমার রায়, ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সি.সি. দেশাই একই বাড়ীতে থাকতেন। শুধু এঁরা নয়, লণ্ডন প্রবাসী ভারতীয় যুবকেরা সুভাষের দিকে চেয়ে থাকতো, আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতো সুভাষচন্দ্রের বীরত্ব-ব্যঞ্জক শক্তি কোথা থেকে আসে। এর সংগত কারণ যাদের বুদ্ধিতে আসতো না, তারা তাঁর বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রশংসা করতো।

---

[৮] স্বামীজী ও নেতাজী—মোহিতলাল মজুমদার, 'স্মরণে-মননে সুভাষচন্দ্র', পৃষ্ঠা ৩৫৮

"কারণ সারা ইংলণ্ডে তখন তপশ্চর্যায় তার মত আর কারও এত তীব্র নিষ্ঠা ছিল না। বিশেষ করে তারা সবাই অবাক হয়ে যেতো সুভাষের আত্মশক্তি দেখে, কারণ মেয়েরা তার সঙ্গ পাবার জন্য অধীর, অস্থির! কেবল সুভাষের রূপ আর যৌবন দেখেই যে শুধু তারা চঞ্চল হয়ে উঠতো—তা নয়, তাকে পাওয়া যাবে না এই দুর্বলতার আকর্ষণও বড় সামান্য ছিল না।··· তাই সুভাষ ছিল আমাদের সামনে শক্তির স্তম্ভ, পবিত্রতার পরম গৌরব। ··· আমাদের সময়ে এমন আর কোন ছেলে ইংলণ্ডে ছিল না, যে নাকি সুভাষের দশভাগের একভাগ গুরুত্বও আরোপ করতে পারতো জীবন সম্বন্ধে এবং ভারতের মুক্তিপতাকা বহনের অধিকার অর্জনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে চেষ্টা করত। সুভাষের যে আধ্যাত্মিক বৃত্তি মোড় ঘুরে এগিয়েছিল দেশপ্রেমের পথে এই তার হলো ধ্যান-জ্ঞান, এই দেশাত্মবোধই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং চেতনার উৎস।"

সুভাষের আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়—"আমরা ভারতীয়রা ইউরোপকে গ্রেট ব্রিটেনের একটা বৃহৎ সংস্করণ হিসাবে গণ্য করতে শিখেছি। কাজেই ইংলণ্ডের চোখ দিয়ে ঐ মহাদেশকে দেখার একটা অভ্যাস আমাদের আছে। এটা অবশ্য একেবারেই ভুল, কিন্তু ইউরোপে যাইনি বলে, আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাস ও তার কিছু মূল সূত্রগুলি, যথা বিসমার্কের আত্মজীবনী, মেটারনিকের স্মৃতিকথা, কাভুরের পত্রাবলী না পড়া পর্যন্ত এই ভুল আমি উপলব্ধি করিনি। কেম্ব্রিজে পড়া এই মূল সূত্রগুলি আমার রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির আভ্যন্তরীণ ধারাগুলি সম্বন্ধে আমার ধারণা গড়ে তুলতে সর্বাধিক সাহায্য করেছিল।"

ইংলণ্ডে ছাত্রজীবনে সুভাষচন্দ্র পোষাক পরিচ্ছদ পরার ব্যাপারে এবং সামাজিক আদব কায়দায় একেবারে কেতাদুরস্ত সাহেবী ধাঁচে চলতেন। ইংরেজ জীবন যাপন প্রণালী যে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল তা নয়, তাঁর মনোভাব ছিল প্রতিটি ভারতীয় ছাত্র তার দেশের তরফ থেকে এক রকমের দূত বিশেষ। দৃঢ়চেতা এবং মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া ছাড়াও ভারতীয় ছাত্ররা এমন ধারণার সৃষ্টি করবে না যাতে করে তাদের শিক্ষা সভ্যতাহীন, অমার্জিত বা কিম্ভূতকিমাকার মনে হয়। তাঁর অশান্ত সন্ধানী জিজ্ঞাসু স্বভাব কোন তামসিকতা সহ্য করতে পারত না। তাই ইংরেজদের স্বভাবের অনেক কিছুরই সে প্রশংসা করতো, "ওদের কর্মস্পৃহা, নিয়মানুবর্তিতা—এ সবই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজে সাহায্য করে, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। তাঁর বক্তব্য

ছিল—এখানকার লোকেদের সময় সম্বন্ধে চেতনা আছে, আর প্রত্যেক কাজেরই একটা ধারা আছে ··· হ্যাঁ দোষ ত্রুটি এদের অনেক থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে এদের মধ্যে যেগুলো ভালো সেগুলো নমস্য।"

ছাত্ররূপে সুভাষচন্দ্র ইংলণ্ডে ছিলেন প্রায় তিনবছর, ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২১। কারুর কারুর মতে তাঁর জীবনের এই হলো সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। তাঁর উজ্জ্বল তারুণ্য, বুদ্ধিদৃপ্ত ভঙ্গী ও বিশ্ব ইতিহাসে গভীর জ্ঞান সাধারণ নিয়মেই তাঁকে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের আসন দিয়েছিল। ছাত্র ইউনিয়ন বা ক্লাবের মত ভারতীয় ছাত্রদের মজলিস ছিল, আর তার মধ্যমণি ছিলেন সুভাষ। মাত্র আট মাসের চেষ্টায় আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ও ক্রমশঃ আনুষঙ্গিক সমস্ত পরীক্ষাগুলিতে সফলতা এবং পূর্ব সংকল্প মত আই.সি.এস. পদত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সচমকে তাঁর দিকে চেয়ে দেখলো ; কিন্তু দেশকে ভালবাসার একমাত্র নিদর্শন এটা নয়—যা তাঁকে রাতারাতি ইউরোপ ও এশিয়ার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোর উচ্চমানের মানুষের মধ্যে খ্যাতিমান করে তোলে। আসলে তাঁর সৌম্য গম্ভীররূপ, চিন্তা ও গভীর দৃষ্টির সামনে দাঁড়ালে শ্রদ্ধা আপনি জেগে উঠতো মানুষের। আই.সি.এস. প্রত্যাখ্যান করায় বাবার সঙ্গে কলকাতায় দ্বন্দ্বের ফলে তাঁর মানসিক আঘাত প্রচণ্ড হয়েছিল। জানা যায় রাত্রে ভাল ঘুমাতে পারতেন না সে সময়—তীব্র কষ্টে তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বিভাগ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কিন্তু যে শিক্ষা, আত্মিক সংযমের যে সাধনা—কলকাতায়—স্কুল-কলেজ জীবনেই তাঁর করায়ত্ত, সেই শক্তি তাঁকে স্থির রাখতে পেরেছিল। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রিয় অধ্যাপক স্যার উইলিয়াম ডিউক, ভারতে তাঁর শ্রদ্ধেয় কত শুভাকাঙ্ক্ষী, দেশে বিদেশে বন্ধুর দল, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা, পরমপূজ্য পিতৃদেব—সুভাষচন্দ্রের সেই অনমনীয় দৃঢ়তা, স্থিরতা থেকে কণামাত্র সরাতে পারেনি। সুভাষ যখন সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে জানালেন যে, কোন বৈদেশিক রাজতন্ত্রের অধীনে তিনি চাকুরী করতে পারবেন না—তখন ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারী লর্ড লিটন ডেকে পাঠিয়ে বৃথাই ফেরাবার চেষ্টা করলেন। সুভাষের উক্তি হলো "আমার মনে হয় কোন মানুষ একই সঙ্গে ব্রিটিশ রাজের অনুগত হয়ে ভারতবর্ষের সেবা করতে পারবে না, তা সে যতই চেষ্টা করুক না কেন।" বাবার কাছ থেকে টেলিগ্রাম এবং এক দাদার দীর্ঘ চিঠির উত্তরে সুভাষচন্দ্র লিখলেন যে, যে-প্রতিজ্ঞা তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে এমন সংকল্প মৌখিকভাবেও

তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না। এরপর আর এক বড় ভাই জানালেন—সুভাষ তাঁর বাবার পরমায়ুক্ষয়ের কারণ হয়ে উঠেছে—তাঁর জন্য তাঁর ঘুম চলে গিয়েছে—এই দুশ্চিন্তায় যে, যে-মুহূর্তে সুভাষ ভারতবর্ষে এসে জাহাজ থেকে নামবে অমনি তাঁকে বন্দী করবে ইংরেজ। সুভাষের বিবর্ণ-নিষ্প্রভ সে রূপ শুধু কল্পনায় আজ আমরা আঁকতে পারি অর্ধশতাব্দীর কালগণ্ডী পেরিয়ে। "কিন্তু আমাদের আদর্শ গঠনের মধ্যে পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথাই যদি একমাত্র চিন্তা হয়ে থাকে—তবে সে আদর্শ হাস্যকর নয় কি? আমি আর কিছু ভাবি না, শুধু ভাবনা এই যে, বাবাতো এরপর আর এক পয়সাও পাঠাবেন না—যা বুঝতে পারছি। এখন দেশে ফিরি কি করে?" সুভাষচন্দ্রের এ উক্তি বন্ধুকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করলো। বন্ধু দিলীপকুমার রায়ের কাছে সেদিন নব্বই পাউণ্ড ধার নিলেন—দিলীপকুমার ধন্যবোধ করলেন ঐ অর্থ ধার দিতে পেরে।

"কয়েক হাজার টাকা ক্ষতি এর জন্য আমাদের পরিবারের বইতে হলো। কারণ বিলেতে সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত খরচ খরচা তিনি পেয়েছিলেন তা সমস্তই ফিরিয়ে দিতে হল ··· এই পদত্যাগের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। গান্ধীজীর অহিংসা এবং অসহযোগ আন্দোলন ভারতের জনগণের জাগরণ এনেছিল পূর্বেই। যখন সুভাষ বোস আই.সি.এস. থেকে পদত্যাগ করলেন দেশের স্বাধীনতার কাজ করবার জন্য তখন বেশ কিছু ব্রিটিশ আই.সি.এস. অফিসার শঙ্কিত হলেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পারলেন উপরোক্ত কারণে অনতিদূরবর্তীকালের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং তাঁদের দেশে ফিরে চলে যেতে হবে।"[৯]

সুভাষ ইংলণ্ডে থাকতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার একটি লাইন প্রায়ই বলতেন, কখনো আপন মনে, কখনো বন্ধুদের উপস্থিতিতে—'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন', আর ভারতের সেইসব মানুষের মনোভাবকে দাসমনোবৃত্তি বলে অবজ্ঞা করতেন—যাদের সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দুঃখজনক উক্তির পুনরুল্লেখ তিনি করতেন—'সব চেয়ে দুঃখের কথা আমাকে স্বরাজের জন্যে লড়তে হয়েছে ইংরেজদের সঙ্গে—তার চেয়ে ঢের বেশী বাধা পেয়েছি আমার দেশবাসীর কাছ থেকে।'

---

[৯] ছাত্র জীবনে সুভাষচন্দ্র (ইংরেজী হইতে অনূদিত)—সুরেশচন্দ্র বসু (নেতাজীর অগ্রজ), স্মরণে-মননে সুভাষচন্দ্র, পৃষ্ঠা ১৩১

জ্বলে উঠতো সুভাষের চোখ,—তাঁর সংকল্প, তাঁর আজন্ম সাধনার সম্মুখে ঐ একই পর্বতপ্রমাণ বাধার প্রাচীর সহস্রশির উঁচিয়ে ভ্রূকুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠবে।

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯২০ তারিখে তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে আই.সি.এস. পদে যোগ না দেবার যুক্তিতে সুভাষচন্দ্র লিখলেন,—"দাসত্বে যদি যথেষ্ট কুশলতা অর্জন করি তাহলে একদিন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হবার আশা আছে। যোগ্যতা থাকলে, গোলামিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে, হয়তো একদিন কোন প্রদেশ-সরকারের মুখ্য সচিব হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু চাকুরীকেই কি আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য বলে মেনে নিতে হবে? চাকুরীতে সাংসারিক সুখ পাওয়া যাবে, কিন্তু সেটা কি আত্মার মূল্যের বিনিময়ে? ··· সংগ্রাম ছাড়া, বিপদ ছাড়া, জীবনের স্বাদই অনেকখানি অন্তর্হিত হয়ে যায়। ···এক কথায় সিভিল সার্ভিসের আইন কানুনের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে জাতীয় ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে মেলানো চলে না।"

১৯২১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লিখলেন, "যদি চিত্তরঞ্জন দাশ এই বয়সে সংসারের সবকিছু ছেড়ে জীবনে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে পারেন, তবে আমার সাংসারিক সমস্যাবিহীন তরুণ-জীবনে এ ক্ষমতা আরো অনেক বেশী। চাকুরী ছাড়লেও আমার কাজের বিন্দুমাত্র অভাব ঘটবে না। শিক্ষকতা, সমাজ-সেবা, সমবায় প্রতিষ্ঠানাদি, গ্রাম সংগঠন ইত্যাদি বহু কাজ আছে—যা হাজার হাজার কর্মঠ তরুণকে ব্যাপৃত রাখতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বর্তমানে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছি···আত্মত্যাগের আদর্শ নিয়েই জীবন আরম্ভ করতে চাই, আমার কল্পনায় ও প্রবণতায় অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চচিন্তা এবং দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত জীবনের আকর্ষণ প্রবল। তাছাড়া বিদেশী শাসকের অধীনে কাজ করা অতি ঘৃণিত বলে মনে করি। অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার কাছে মহৎ, নিঃস্বার্থ ও অনুপ্রেরণার পথ···দারিদ্র্য ও সেবার ব্রত গ্রহণ করার অধিকার ভিক্ষা করে বাবা-মার কাছে চিঠি লিখেছি।"

ওই বছরের ২৬শে ফেব্রুয়ারীর চিঠি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। "···বাবার ধারণা আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন সিভিল চাকুরিয়ার পক্ষে নতুন শাসন ব্যবস্থায় জীবন মোটেই দুর্বিসহ হবে না। দশ বছরের মধ্যে এদেশে স্বায়ত্ত শাসন অনিবার্য। ··· আমার প্রধান প্রশ্ন নীতিগত। বর্তমান অবস্থায় কি আমাদের এক বিদেশী আমলাতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করে এক কাঁড়ি টাকার জন্য আত্মবিক্রয় করা সমীচীন? ··· সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে একজন ভারতীয়ও

স্বেচ্ছায় দেশসেবার জন্য সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করেনি। দেশের সর্বোচ্চ কর্মচারীদের নিম্নতর শ্রেণীর লোকেদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার সময় এসেছে। সরকারী উচ্চ চাকুরিয়ারা যদি বশ্যতার প্রতিজ্ঞা পরিহার করেন, এমনকি তার ইচ্ছাটুকুও প্রকাশ করেন তা হলেই আমলাতন্ত্রের যন্ত্র ধসে পড়বে। সুতরাং এই ত্যাগ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না। এই ত্যাগের অর্থ আমি সম্যক জানি। দারিদ্র্য, দুঃখ, ক্লেশ, কঠিন পরিশ্রম তো আছেই আরও নানা ভোগ আছে যার কথা স্পষ্টভাবে বলার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনার পক্ষে বুঝে নেওয়া সহজ···সুতরাং নতুন জীবনের কিনারায় দাঁড়িয়ে আজ আমাকে বাবা-মার সুস্পষ্ট ইচ্ছা ও আপনার উপদেশের বিরোধিতা করতে হচ্ছে—অবশ্য আপনি 'যে কোনও পথে আমি চলি না কেন'—আপনার সাদর অভিনন্দন জানিয়ে রেখেছেন।”

“ফিরবার সব পথ রুদ্ধ করে আমি ঝাঁপ দিলাম।”

ইতিহাসের প্রবাদপুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র,—কিন্তু মাত্র ২৪ বছর বয়সের তরুণ সুভাষের এ অনন্য মানসিকতা—এ তাঁর নিঃশেষে ও নিঃশর্তে আত্মদানের যে ভবিষ্যৎ জীবন সংগঠন তারই পূর্ণ-সূর্যোদয় বলা যায়।

নেতাজীর চরিত্রে এই বীর্যবত্তা ও ত্যাগের বিচিত্র সমন্বয়ের বিজ্ঞানসম্মত এক ব্যাখ্যা হয়তো পাওয়া যাবে তাঁর পিতৃ-মাতৃকুলের অতীত সূত্র অনুসন্ধান করলে। বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দশরথ বসুর এগারো পুরুষ পরবর্তী বংশধর মহীপতি বসু (মাহীনগর, বারুইপুর, জয়নগর, কোদালিয়া অঞ্চল) গৌড়ের বাদশা কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে অর্থ ও যুদ্ধমন্ত্রীর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁকে 'সুবুদ্ধি খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁর পৌত্র গোপীনাথ বসু সুলতান হোসেন শাহের অর্থমন্ত্রী ও নৌ-সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁর অসামান্য দক্ষতার জন্য তাঁর উপাধি হয় 'পুরন্দর খাঁ'। রাজস্ব ও নৌ-বল তাঁর করায়ত্ত থাকায় তিনি সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী হন এবং তাঁর সময় থেকে বসু পরিবার সুবিখ্যাত হয়। সুভাষচন্দ্রের ধমনীতে প্রবাহিত হয়েছে পিতৃ পুরুষের সেই বীরত্ব, কর্মনিষ্ঠা ও অদম্য উচ্ছ্বাস আর মাতৃকুল হাটখোলার দত্ত পরিবারের রক্তধারা নানা শাখা-প্রশাখায়। স্বামী বিবেকানন্দও নেতাজী সুভাষের ধমনীতে সঞ্চারিত। তারই ফলে হয়তো সুভাষের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে অসামান্য এক ক্ষাত্র সন্ন্যাসীর নির্বেদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজবিদ্রোহী

"আমরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—একটা বাণী প্রচারের জন্য। আত্মদানের মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দে আমরা বিভোর হইব, সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া পৃথিবীও ধন্য হইবে। ··· আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে; সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সংকীর্ণতা—সেইখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র ব্যবসায় মুক্তির পথ চিরকাল কণ্টকশূন্য রাখা, যেন সে পথ দিয়া মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে। মনুষ্য জীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্য। সুতরাং যে স্বাধীনতা আমরা চাই—সে স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনধারণই একটা বিড়ম্বনা—যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুগে যুগে আমরা হাসিতে হাসিতে রক্তদান করিয়াছি—সে স্বাধীনতা সর্বতোমুখী! ··· এতদিন পরে নিজের শক্তি আমরা বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম চিনিয়াছি। এখন আমাদের শাসন বা শোষণ করে কে? এই নবজাগরণের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা, সবচেয়ে বড় আশা—তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। তরুণের প্রসুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে—তখন জীবনের মধ্যে সকল দিকে সকল ক্ষেত্রে যৌবনের রক্তিমরাগ আবার দেখা দিবে।"

১৯২৩ সালে 'তরুণের স্বপ্ন' প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবন-স্বপ্ন এইভাবে দেশের হাজারো তরুণের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। কিন্তু এ যে শুধু স্বপ্নের জাল বোনা—তা তো নয়—দিকে দিকে জাগরণের পালা তখন শুরু হয়ে গেছে কারণ সুভাষচন্দ্রের আই. সি. এস. পদ পেয়েও সে যুগের সেই 'দেবতা-ঈপ্সিত' চাকরি প্রত্যাখ্যান, সারা ভারত এবং ভারতের বাইরে—প্রবাসী তরুণদের বিমুগ্ধ করেছিল—বিস্মিত করে দিয়েছিল। ১৯২১ সালে ইংলণ্ড

থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যাত্রারথের ধ্বজা দেখা গেল পশ্চিম থেকে পূবের পথে—তারপর দিক-দিগন্তে। বোম্বাইতে নেমেই তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তাঁর প্ল্যান-প্রোগ্রাম কি সে নিয়ে আলোচনা করলেন, কিন্তু গান্ধীজীর অস্পষ্ট কথাবার্তা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না। সোজা চলে এলেন কলকাতায়—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট। শুরু হলো তাঁর কর্মজীবন। দেশবন্ধুর দেশপ্রেম এবং জীবনের গভীরতা সুভাষকে খুবই স্পর্শ করেছিল। দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদে, মান্দালয় জেলে বসে সুভাষচন্দ্র যে 'দেশবন্ধু স্মৃতি' লিখেছিলেন, তার মধ্যে আছে—"জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গূঢ় কারণ কি, অনেকে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিতে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। তাঁহার ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে, সুতরাং তাঁহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিত না ··· ··· যাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়েন নাই তাঁহারা পর্যন্ত ঐ বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ··· ··· যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন না তাঁহারা দেশবন্ধুর সংঘ গঠনের অপূর্ব শক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইতেন—হইবারও কথা। কারণ দেশবন্ধু যাহা দেখাইয়া গেলেন তাহা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন। আমি এ-স্থলে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, তিনি যে পর্বতের ন্যায় অটল সংঘ গঠন করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল নায়ক ও অনুচরবর্গের মধ্যে প্রাণের সংযোগ।"[১]

এইভাবে চুম্বক চুম্বককে আকর্ষণ করলো—সমাজ সংগঠন আর সেবাব্রতে হলো আগামীকালের দেশনায়কের দীক্ষা! ইংলণ্ড থেকে ভারতের মাটিতে পদার্পণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল অগ্নিশিখা—সুভাষকে ইংরাজ শাসকমণ্ডলী কারাগারে নিয়ে আটক করলো ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর। হয়তো সেদিন তারা ভেবেছিল অঙ্কুরেই শুকিয়ে দিতে পারলে আর তার

১। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র-রচনাবলী—প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৯-৩০০
(দেশবন্ধু স্মৃতি—মান্দালয় জেল : ২০।২।২৬)

মহীরুহ হবার ভয় নেই। কিন্তু কে কবে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ পাথর চাপা দিয়ে রোধ করতে পেরেছে। এ যেন গুরুগৃহে তাঁর পাদমূলে বসে শ্রেষ্ঠ যা কিছু তার প্রশিক্ষণ। ১৯২১ ও ১৯২২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আটমাস কলকাতার জেলে বন্দী করা হলো সুভাষচন্দ্রকে, তার মধ্যে দু-মাস প্রেসিডেন্সী জেলের পাশাপাশি 'সেলে' আর ছ-মাস আলাদা করে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সে অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কাল। জেলের প্রত্যেকের নামে যে টিকিট থাকতো তাতে দেখা যায়, দেশবন্ধুর পাচক হিসেবে নাম ছিল—সুভাষচন্দ্রের এবং চাকর হিসেবে হেমন্তকুমার সরকারের। একদিন বাংলা গভর্ণমেণ্টের মেম্বার-ইনচার্জ অব জেলস—স্যার আবদুর রহিম জেল পরিদর্শনে এসে দেশবন্ধুকে বললেন—"C. R., you are a very expensive prisoner. An I.C.S. is serving as a cook and a University Lecturer as your servant!" চিত্তরঞ্জন, আপনি আমাদের পক্ষে একজন বড়ই মহামূল্য বন্দী। একজন আই.সি.এস. আপনার পাচকের কাজে নিযুক্ত, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক আপনার ভৃত্যের কাজ করছেন।

কি বিপুল অন্তর-সম্পদের মহৎ অধিকারী সুভাষ! সর্ববিষয়ে কত পারদর্শী, কত বিবেকবান! তাঁর সেবা-শ্রদ্ধার ক্ষেত্রেই বা ব্যতিক্রম কেন হবে! উপরিউক্ত ঐ একই অসহযোগ আন্দোলনে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, দেশবন্ধু এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একই কারাগারে পাশের ঘরে বন্দী। সে-সময় দেশপ্রাণ শাসমল জেলের মধ্যে জ্বরে আক্রান্ত হন। সুভাষচন্দ্র তাঁকে যেভাবে অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন, সেকথা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ তাঁর 'স্রোতের তৃণ' গ্রন্থে লিখেছেন : "…তখন বন্ধুবর সুভাষবাবু আমাকে ভায়ের চেয়েও বেশী যত্ন করেছিলেন। এই ভদ্রলোকটি দাশ ম'শায় প্রভৃতি আমাদের সকলের সদাসর্বদা এমন খোঁজ নিতেন যে এঁকে দেখে মূর্তিমান সেবাব্রত বলেই মাঝে মাঝে ভ্রম হতো।"[২]

এক সময়ের সহপাঠী ও সহকর্মী অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার জেলের মধ্যে বসন্ত রোগে আক্রান্ত। বসন্তের ঘা ধুয়ে দেওয়া, তাতে ঔষধ লাগান, খাইয়ে দেওয়া, বাতাস করা, তাঁর কোলে বসন্ত রোগীর মাথাটি রেখে সারারাত কাটান—সে সেবার কথা, অধ্যাপক হেমন্ত সরকার রচিত

২। স্রোতের তৃণ : বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, পৃষ্ঠা ৯৪

'সুভাষের সঙ্গে বারো বছর' বইখানা পড়তে পড়তে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে, শ্রদ্ধায় অবনত না হয়ে কেউ কি পারে? দেশবন্ধুর জীবনাদর্শ এবং জেল-জীবনে ঘনিষ্ঠ সাহচর্য সুভাষচন্দ্রকে আরো একটি বিষয়ে খুবই চমৎকৃত করেছিল। সে বিষয়টি হলো দার্শনিকতা। সে বিষয়ে তিনি লিখেছেন, "বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দেশবন্ধুকে নাস্তিকতা হইতে টানিয়া লইয়া নীরস বেদান্তের ভিতর দিয়া প্রেমমার্গে লইয়া গিয়াছিল, দার্শনিক মত হিসাবে তিনি অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদকে সবচেয়ে খাঁটি মত বলিয়া মনে করিতেন। ...তাই বৈষ্ণব ধর্ম হইয়াছিল তাঁহার জীবনের শেষ আশ্রয়। তিনি কথাবার্তায় এবং বক্তৃতায় প্রায়ই বলিতেন যে, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম—এসব আলাদা করিয়া দেখিলে চলিবে না, পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে এবং একটিকেও বাদ দিলে জীবন পূর্ণ হইবে না।"

বিবেকানন্দের আত্মিক চেতনায় তাঁর কৈশোরের উদ্বোধন, তারই মহিমময় প্রকাশ দেখলাম যৌবনের দুরন্ত তেজে এবং অরবিন্দ ও দেশবন্ধুর বাস্তব জীবন সম্মুখে রেখে সুভাষচন্দ্র ভারতের কৃষক ও শ্রমিকের জীবনটাকেও বুঝে নিলেন —মহান দ্রষ্টার মত—একেবারে পরিণত মহাবিজ্ঞ মানুষের মতো। কি আশ্চর্য-জ্ঞান ও বিচার-বিশ্লেষণীর সে বাস্তব সত্য উপলব্ধি। ১৯২৪ সালে 'আত্মশক্তি' পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করে তার কয়েকটি অতিগুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় লিখলেন—বাংলা ভাষাভাষী মানুষ, অবহেলিত জনসমাজ তা পড়ে তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ সন্ধান পেলো; অন্যেরা তাঁর রাষ্ট্রজীবনে প্রত্যক্ষ পদধ্বনি শুনতে লাগলো। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখলেন, "...কৃষক সাগরের মতো ক্ষুব্ধ হলেও আপনার বিরাট গভীরতার জন্যে প্রশান্ত, শ্রমিক কিন্তু কালবোশেখীর মত দুর্জয়—এই দুয়ের মিলন ঘটলে কি অঘটন সংঘটন হতে পারে তা বোধহয় আজ আর চিন্তার তত্ত্ব নয়, ঐতিহাসিক তথ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।" তখন সুভাষচন্দ্র ২৭ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন।

বিপ্লবের চারণকবি কাজী নজরুল ইসলাম যেন সুরে সুর মিলিয়ে আহ্বান ঘোষণা করলেন,

"... নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনি,
জাগোরে জোয়ান! ঘুমায়ো না ভুয়ো-শান্তির বাণী শুনি...।"

১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্র লিখলেন, "আমরা কি চাই? আমরা চাই ভারতের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা। ...স্বাধীনতা মানুষের সবচেয়ে বড় সত্য। সুতরাং স্বাধীনতাকে

এইভাবে কায়মনোবাক্যে জীবন ও মরণ দিয়ে স্বীকার করাই সত্যাগ্রহ। স্বাধীনতার জন্য নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বিদ্রোহের মতই সত্য। মানুষের অন্তরের চিরদিনের সত্যাগ্রহ মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনের সত্যাগ্রহ সাধনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই নবযুগে মহাত্মা গান্ধীকেই এই মন্ত্রের দ্রষ্টা বলে সমস্ত জগৎ স্বীকার করেছে। কিন্তু মহাত্মা একটা ভুল করেছিলেন, সত্যাগ্রহের অধিকার তাঁরই নিজস্ব হয়তো—এরকম ভেবেছিলেন ; তাতে মানুষ মাত্রেরই একান্ত দাবী রয়েছে তা তিনি ভুলে গেছিলেন। এজন্য তিনিই একা বার্দোলিতে সত্যাগ্রহ শুরু করতে চেয়েছিলেন এবং বন্দী ও কারারুদ্ধ হবার পর এই অভিযান চালাতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মানুষের এই দাবী একবার জাগলে আর দমবার নয়, তাই পাঞ্জাব, বাংলা ও দাক্ষিণাত্যে জনগণ স্বেচ্ছায় এই সত্যাগ্রহ শুরু করেছে। মহাত্মা যাকে সমাজের মস্তকে ও মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত করে রাখতে চেয়েছিলেন, তা আজ সমাজের হাতে-পায়ে ছড়িয়ে পড়েছে ও কাজ করছে। তাতে করে সত্যেরই জয় হয়েছে।"

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে বামপন্থী বা চরমপন্থী নেতা সর্বজনশ্রদ্ধেয় লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক। আর কংগ্রেসে যোগদানের কয়েক বছরের মধ্যেই দক্ষিণপন্থী বা নরমপন্থীদের নায়ক হয়েছেন গান্ধীজী। তাঁর চারিদিকে পরিবৃত বল্লভ ভাই প্যাটেল, এম. এ. আনসারী, মতিলাল নেহরু, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ মহম্মদ আলম, সরদার শার্দূল সিং, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, রাজা গোপালাচারী, সরোজিনী নাইডু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জয়রাম দাস, দৌলতরাম ও ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ; আর আছেন—মৌলানা মহম্মদ আলী ও শওকৎ আলী ভ্রাতৃদ্বয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও এ্যানি বেসান্ত্ লোকমান্য তিলকের অনুগামী, কিন্তু হঠাৎ এই প্রাজ্ঞ মহামান্য দেশপ্রেমিক তিলকের তিরোধান ঘটলো। ফলে গান্ধীজী তাঁর মতাদর্শ কার্যকর করতে প্রায় নিরঙ্কুশ বাধাশূন্য হলেন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজীরই জয় হলো যদিও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, এ্যানি বেসান্ত্, মহম্মদ আলি জিন্না এবং বিপিনচন্দ্র পাল বিরোধিতা করলেন—আর দেশবন্ধু দাশ, গান্ধীজীর বিশেষ দক্ষ যুক্তি-পরামর্শে প্রভাবান্বিত হলেন, গান্ধী-বিরোধিতা প্রত্যাহার করলেন। অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলনই ছিল বিষয়বস্তু।

অথচ বাম/ডান—অর্থাৎ চরম কিংবা মধ্যমপন্থী সমস্ত বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বয়ঃপ্রাপ্ত ভারতের প্রথম সারির কংগ্রেস বা মুসলিম—কোন নেতাই নীতিগত ভুলের কথা, প্রকাশের কথা ভাবতেই পারেননি, এরকম সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিতভাবে। এই মন্ত্রের (সত্যাগ্রহ) দ্রষ্টা বলে স্বীকার করে নিয়েও—'কিন্তু মহাত্মা একটা ভুল করেছিলেন, সত্যাগ্রহের অধিকার তাঁরই নিজস্ব হয়ত—এরকম ভেবেছিলেন ; তাতে মানুষ মাত্রেরই একান্ত দাবী রয়েছে তা তিনি ভুলে গেছিলেন,'—এ-সুস্পষ্ট উক্তির সৎসাহস সম্ভবতঃ একজনমাত্র তরুণেরই তখন সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল—তিনি সুভাষচন্দ্র। এখানেই সুভাষচন্দ্র অনন্য, এখানেই তাঁর অসাধারণত্ব। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী—কি রাজনীতির মধ্যে, কি বিদেশী রাষ্ট্রনেতা, সৈন্যাধ্যক্ষ কিংবা কারাগার অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর বাহিনী বা সম্মেলনের মধ্যে দাঁড়িয়ে গান্ধীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কণামাত্র দৈন্য প্রকাশ হয়নি কোনদিন—যদিও অহিংসার মূর্তপ্রতীক মহাত্মাজীর সুভাষচন্দ্রের প্রতি রাজনৈতিক হিংসার প্রকাশ অতি স্থূলভাবেই ইতিহাসে মুদ্রিত রয়েছে। কিন্তু সে কাহিনী আমার এ-বই-এর বিষয়বস্তু নয়—আমার বক্তব্য ঃ রাজনীতিতে নবাগত, বয়সে নবীন সুভাষচন্দ্র আত্মবিশ্বাস ও বিজ্ঞতায় এবং দেশের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতালাভের ভাব-ভাবনায় এতই দৃঢ়চিত্ত যে, গান্ধীজীর 'সত্যাগ্রহ' বিষয়ে বলতে গিয়ে তাঁর প্রবন্ধের গোড়াতেই তিনি উল্লেখ করেছেন—আমরা কি চাই! শুধু বর্দোলিতে নয়, চৌরীচৌরায়, এমন কি মেদিনীপুরে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন প্রভৃতি বহুক্ষেত্রে আন্দোলন আরম্ভ করা, মধ্যপথে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া, কিংবা প্রস্তুতির দোরগোড়ায় এসে পশ্চাৎ অপসরণ প্রভৃতি মনোভাব ও কার্যধারা শুধু অগণতান্ত্রিকই হয়নি—লক্ষকোটী মানুষের উপলব্ধি ও জাগ্রত চেতনাকে গান্ধীজী কখনো কখনো দুর্বল করে দিয়েছেন, এমনকি অবমাননাও করেছেন ; কখনো কখনো তাঁর কর্মপদ্ধতি তাঁর একান্ত অনুগতদের কাছেও হেঁয়ালী এবং অসংগত প্রতীয়মান হয়েছে। অথচ তাঁর ব্যক্তিত্বের মোহ বা ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ ক্ষমতা এতই প্রবল ছিল যে, ভুলকে ভুল বলবারও সাহস তাঁদের কারুরই ছিল না। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাই তাঁর পথ ভিন্ন—তাই তিনি ফাল্গুনি—তাই তাঁর দীক্ষাদানের মন্ত্রও সকলকে সচকিত করে তুলেছিল প্রথম আবির্ভাবেই।

১৯২১-এর জুলাইয়ে প্রথম যেদিন বোম্বাইতে গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়, সেদিন থেকে ১৯৪০-এর জুনে ওয়ার্ধাতে যখন শেষবারের

মতো জাতীয় সংগ্রাম যজ্ঞের এই দুই মহাযাজ্ঞিকের মুখোমুখি সাক্ষাৎ ও ভাব বিনিময় হলো সেদিন পর্যন্ত এই দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিদেশী শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার যথার্থ পদ্ধতি কি হবে—এই বিষয়ে একই সঙ্গে মতের মিল আর অমিলের সুর, মত পার্থক্য ও মতৈক্যের ধারা অব্যাহত ছিল শেষ দিনটি পর্যন্ত।

"মহাত্মা গান্ধীর নিকট অহিংসা ছিল একটি সক্রিয় বীজমন্ত্রের মতো, আর সুভাষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন অস্ত্রের প্রয়োগ ছাড়া কখনো কোন বিদেশী শাসককে দেশ থেকে বিতাড়িত করা যাবে না, বিতাড়িত করা সম্ভব নয়। সুভাষ নিজেই লিখে গিয়েছেন—মহাত্মার সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ সাক্ষাৎকারের সময়ে মহাত্মা তাঁকে বলেছিলেন যে, দেশের স্বাধীনতা অর্জনে যদি সুভাষের প্রচেষ্টা ফলবতী হয়, তবে সর্বপ্রথম মহাত্মার টেলিগ্রাম গিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছবে তাঁকে অভিনন্দিত করে।"৩

মূলতঃ, সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতার বোধ এবং তা অর্জনের পথাদর্শ ছিল সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও তীব্রগতি-সম্পন্ন এবং খাপখোলা তলোয়ারের মত ছিল তার প্রয়োগের ধারা। আর গান্ধীজীর ছিল—ধর্মীয় এবং মানবিক দর্শন সংমিশ্রণে এক নীতিসর্বস্ব নীতি যার প্রয়োগের পথও ছিল তাঁর আপন কৌশল অনুযায়ী। এই দুই মহাপুরুষের নামের ছোঁয়ায়, কি অপরূপ সম্পদে, সৌরভে ও গৌরবে আমাদের জাতীয় ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত। কিন্তু তা বিচার-বিশ্লেষণে, যতদূর অদ্যাবধি প্রতীয়মান—সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, অনুদার রাজনৈতিক হীনবুদ্ধির সঙ্গে বৈদেশিক কূটনীতির মিলিত প্রয়াসে—নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে ইতিহাসে অবহেলিত করার অপপ্রয়াস হয়েছে এবং সে অপপ্রয়াস বর্তমান কালের দৃষ্টিতে অবশ্যই নিন্দিত।

'সত্যাগ্রহ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ সত্যের প্রতি অবিরত নিষ্ঠা বা নিমগ্নতা। বিভিন্নভাবে এর প্রকাশ হয়েছে, যেমন—অসহযোগ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, আইন অমান্য, গণপ্রতিরোধ প্রভৃতিরূপে। মূলতঃ, 'এশিয়াটিক ল' অ্যামেণ্ডমেন্ট অর্ডিন্যান্স'-এর বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্স্‌বার্গ শহরে—১৯০৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর, জনসভায় সর্বপ্রথম এই সত্যাগ্রহের শপথ গৃহীত হয়। গান্ধীজীর

মতে, সবরকমের হিংসার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা এবং প্রতিপক্ষের কোনভাবেই ক্ষতি না করা সত্যাগ্রহের যথার্থ স্বরূপ।

১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট 'রাওলাট বিল' আইন সভায় উত্থাপন করে, যার সাহায্যে যে-কোন ভারতীয়কে বন্দী ও বিনা-বিচারে আটকের স্থায়ী আইন প্রচলন করা যায়। গান্ধীজী, জাতীয়তা-বিরোধী এই ভয়ঙ্কর 'বিল'-এর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন কিন্তু তাঁর সে 'সত্যাগ্রহ'কে সম্পূর্ণ মূল্যহীন করে দিয়ে গভর্ণমেন্ট ১৮ই মার্চ কুখ্যাত বা 'ব্ল্যাক বিল'কে 'রাওলাট এ্যাক্ট'-এ পরিণত করলো—আর পাঞ্জাবে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে অমানবিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন হলো—তারই কুৎসিত ও ভয়াবহ পরিণতি—অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র নর-নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ওপর বন্য পশুদের মত নরহত্যার তাণ্ডব। এর বিরুদ্ধে গান্ধীজী নন, অন্য কোন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ নন, সারারাত্রি নিদ্রাহীন অবস্থার পর এশিয়ার মহত্তম কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নাইটহুড্' অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজমুকুট প্রদত্ত 'স্যার' উপাধিটি অতি মর্মাহতচিত্তে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন—ইংরাজ-রাজ অবশ্যই সেজন্য অপমানিত বোধ করেছিলেন সেদিন। তখন জানা যায়, বড়লাটের সঙ্গে অধিকতর রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য গান্ধীজী সলা-পরামর্শে খুবই ব্যস্ত ছিলেন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর মতান্তর অত্যন্ত প্রকট ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—তাই জালিয়ানওয়ালাবাগ বিষয়ে কিছু করার সময় ও সুযোগের অভাব ছিল তাঁর।[৪]

সুভাষচন্দ্র তখন কেম্ব্রিজে। তারপর ভারতে ফিরে আসার পর দেশের কাজে সর্বস্ব পণ করে নেমেছেন। প্রথমে তাঁকে দেখা যায়—কলকাতায় 'বয়কট' আন্দোলনে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দেওয়া উপাধি ত্যাগ-এর সঙ্গে 'ট্রিপল্ বয়কট' অর্থাৎ বিদেশী পণ্য, বিদেশী আইন-আদালত ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জন। এই সময় ইংলণ্ডের মহামান্য যুবরাজ অর্থাৎ প্রিন্স্ অব ওয়েল্স-এর ১৭ই নভেম্বর ভারত দর্শনের ঘোষণা হলো, কংগ্রেস তা বর্জনের

---

[৪] 'মহাত্মা গান্ধী ছাড়া আর সমস্ত প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাগণ পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায় ও দেশবন্ধু দাশ জেলে অন্তরীণ হলেন। এদিকে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রীডিং-এর সঙ্গে গান্ধীজীর সলা-পরামর্শ একটি রাজনৈতিক মীমাংসার উদ্দেশ্যে··· ।'
—স্বাধীনতার অগ্রদূত, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬

নীতি ঘোষণা করলেন। বোম্বাইতে তাঁরা ব্যর্থ হলেও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলে কলকাতায় যুবরাজের ২৪শে ডিসেম্বর কলকাতা-আগমন সূচী প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো। সে অগ্নিগর্ভ রূপ 'স্টেটস্ম্যান' ও 'ইংলিশম্যান'—এ দেশের দুই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খবরের কাগজ পত্রের দিন ছাপালো—কংগ্রেস ভলাণ্টীয়াররা শহর দখল করে ফেলেছে এবং গভর্নমেণ্ট্ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, অবিলম্বে কংগ্রেস ভলাণ্টীয়ারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার সুপারিশ উভয় সংবাদপত্রই করলেন, আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের বেআইনী বলে সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারী করা হলো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পূর্ব-ভারতে কংগ্রেস আন্দোলনের নায়ক, হরতালের প্রধান সেনাপতি ভলাণ্টীয়ার সুভাষচন্দ্র, সঙ্গে দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জন, সহধর্মিণী বাসন্তীদেবী এবং বহু সহস্র স্ত্রী-পুরুষের সেদিনের কারাবরণ এক ইতিহাস বহির্ভূত—নিরস্ত্র যুদ্ধ দৃশ্যই বলা যায়। দু-দুটো বড় জেলখানা যখন পূর্ণ হয়ে গেল—'ক্যাম্প্-প্রিজন্' অর্থাৎ তাঁবু খাটিয়ে জেলখানা খোলা হলো ; তাতেও স্থান সঙ্কুলান হয়নি সেদিন।

১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সুভাষচন্দ্রের ব্রিটিশ রাজ-কারাগারে সেই প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী তাঁর মাতৃভূমি ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে ১১ বার কারারুদ্ধ করা হয়। প্রথম পর্বে তাঁকে যখন বন্দী করা হয় তখন তিনি ছিলেন একই সঙ্গে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রচার সচিব এবং ন্যাশনাল ভলাণ্টীয়ার কোর-এর ক্যাপটেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং ভারতে আরো পাঁচবার গান্ধীজী তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সার্থকতা লাভ করলেও ১৯১৯-এর "কালাকানুন' বিরোধী তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল—কারণ পূর্বেই বলেছি, যে 'রাওলাট বিল'-এর বিরুদ্ধে তাঁর যে সত্যাগ্রহ, তা 'এ্যাক্টে'-এ পরিণত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, জালিয়ানওয়ালাবাগে গণহত্যা সংঘটিত করেছিলেন ইংরাজ প্রশাসকগণ অতি গর্বের সঙ্গে। কিন্তু ১৯২১-এ দেশবন্ধুর নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় কলকাতায় কংগ্রেস ঘোষিত প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স-এর ভারত দর্শনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতাকে যে বিশাল বিরাট রূপদান করা হলো তা সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছিল, ব্রিটিশ প্রশাসনকে বিপর্যস্ত করতে অবশ্যই সফল হয়েছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবাসীর মনে প্রবল আত্মবিশ্বাস ও শক্তির সঞ্চার করেছিল। এইভাবে হলো সুভাষচন্দ্রের

জীবনযজ্ঞে প্রথম লগ্নটির শুভ উদ্বোধন—স্বাধীনতার বেদীমূলে সার্থক প্রথম অঞ্জলি দান।

১৯২২ সালের প্রথমে কারামুক্তির পর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে বন্যাত্রাণ কার্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির জন্য এই বন্যাত্রাণ সমিতি জনসাধারণের বদান্যতায় বিরাট সাফল্যলাভ করলো। বন্যাত্রাণ কার্যে সুভাষচন্দ্র নিজেকে ব্যাপৃত করলেন। গান্ধীজীর গোঁড়া ও রক্ষণশীল মনোভাব-বিরোধী কংগ্রেস নেতৃবর্গ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে স্বরাজ্য পার্টির প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলেন এবং কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে কাজ করার সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেন। আর সুভাষচন্দ্র 'বাংলার কথা' এবং স্বরাজ্য পার্টির মুখপত্র 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করলেন। ১৯২৩ সালে 'ফরোয়ার্ড' প্রকাশ শুরু হয় এবং অনতিকালের মধ্যে ভারতে প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির অন্যতম হিসেবে বিশিষ্টতা অর্জন করে। ১৯২৪-এর মার্চ মাসে চিত্তরঞ্জন কলকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলে ২৭ বৎসর বয়সে সুভাষচন্দ্র হলেন চীফ একজিকিউটিভ অফিসার। সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের বহু সুদক্ষ কর্মকাণ্ডের মধ্যে করপোরেশনের সঙ্গে কলকাতার নাগরিকদের সম্পর্কের বিস্ময়কর উন্নতি সাধন—অর্থাৎ অফিসাররা যে জনগণের সেবক এই মর্মকথা রূপায়িত করলেন, আজো সে মহতী আদর্শবাদ ও তাঁর কর্মনৈপুণ্য ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে রয়েছে।

১৯২৩ সালে স্বরাজ্যপন্থীগণ গোঁড়া গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বোম্বাইতে আর একটি ক্ষুদ্র বিদ্রোহী সমাজতন্ত্রবাদী দলের জন্ম হয় শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের নেতৃত্বে—যা ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম প্রভাত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা (যেমন—জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি), সাংবাদিকতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে 'স্বরাজ্য'পন্থীদের সাফল্যে (স্বরাজ্য পার্টির লক্ষ্য—গান্ধীবাদের অসহযোগিতা ত্যাগ করে ব্রিটিশ প্রশাসন ও আইন সভাগুলিতে ক্ষমতা লাভ করে তাদের শাসন ব্যবস্থা অচল করে দেওয়া) সন্ত্রস্ত হয়ে পুলিশ বাহিনী ১৯২৪-এর অক্টোবর মাসে হঠাৎ সুভাষচন্দ্রকে ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করে। কলকাতা করপোরেশনের 'চীফ একজিকিউটিভ অফিসার' সুভাষচন্দ্র বসুর অপরাধ—পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী একটি বিপ্লবী দলের দুরভিসন্ধির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগসূত্র। বিপ্লবের-আঁতুড়ঘরে যাঁর আবির্ভাব—শিক্ষায়-ধর্মে-

কর্মে-ভাষ্যে, লেখনীতে, ভাবে-ভাবনায়—এমনকি দৈহিক উজ্জ্বলতায় যাঁর বিপ্লব-বহ্নির কিরণচ্ছটা দীপ্যমান—তাঁর জন্য সামান্য পুলিশী রিপোর্টের প্রয়োজন কোথায় ? কিন্তু বঙ্গ প্রদেশের ঐ কারাপ্রাচীরগুলো কি সুভাষচন্দ্রের জন্য ব্রিটিশ রাজের পক্ষে নিরাপদ ? ১৯২৪ সালের ২৪শে অক্টোবর মধ্যরাত্রে বড়লাট কর্তৃক ঘোষিত অংশত ১৮১৮ আইনের ৩ নং ধারা এবং আংশিকভাবে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স—জরুরী আইনের বলে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য ভারত গভর্নমেন্টের অনুমোদন ছাড়াই বাংলায় প্রয়োগের সুবিধার্থে এই বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স ! এ আঘাত হানা হলো শুধু বাংলার বুকে। কারণ, ভারত উপমহাদেশের বিপ্লবতীর্থ যে বাংলা ! এই প্রদেশেই যে গভর্নমেণ্ট-বিরোধী শক্তি সর্বাধিক ! কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার, সে-যে তারুণ্যের, সে-ত জাতির অপমান ! সারা দেশ জুড়ে তীব্র আলোড়ন, কালবৈশাখীর ঝড় উঠলো যেন—সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে। নওজওয়ানদের জন্য নজরুল লিখলেন,

‘চলরে নওজোয়ান
শোনরে পাতিয়া কান
মৃত্যু তোরণ দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান—’

কলকাতার মহামান্য মেয়র সি. আর. দাশ প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর এক অনবদ্য বক্তৃতায় গভর্নমেণ্টকে চ্যালেঞ্জ জানালেন—করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তারূপে সুভাষচন্দ্র যা করেছেন—তার পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোক।

‘If Subhas Chandra Bose a criminal, I am a criminal. If Subhas Chandra Bose is a revolutionary, I am a revolutionary. Why have they not arrested me ? I should like to know why, why ? If love of country is a crime, I am a criminal. Not only the Chief Executive Officer of this corporation, but the Mayor of this corporation is equally guilty. I plead guilty to the charge. If that is a crime, I am ready to be hanged for it rather than shirk the duty which I feel to be the duty of every Indian today.’ সুভাষচন্দ্র যদি বিপ্লবী, অপরাধী, তাহলে আমিও তাই, তারা আমাকে কারারুদ্ধ করছেনা কেন, আমি জানতে চাই। দেশকে

ভালবাসা যদি অপরাধ হয়, আমি একজন অপরাধী। কলকাতা করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তাই শুধু নয়, সেক্ষেত্রে মেয়রও সমানভাবে দোষী। সেকাজ যদি অপরাধ হয়, সে কর্তব্য অবহেলার চেয়ে ফাঁসীর দড়ি গলায় পরতে প্রস্তুত।

২৯শে অক্টোবর, ১৯২৪। সূচীপতন নিঃশব্দ করপোরেশনের সভায় দাঁড়িয়ে কলকাতার মেয়র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, করছেন এই প্রশ্ন। তাঁর চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, কণ্ঠে বজ্রমন্ত্র ; দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত বার বার সজোরে সশব্দে নেমে আসছে তাঁর আসন সম্মুখস্থ টেবিলের উপর।

“সে বক্তৃতা কোনদিন পারব না ভুলতে। ঠিক এর চারদিন আগে, ২৫শে অক্টোবর, করপোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র বসুকে রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গেই অতর্কিতে তাঁর বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে প্রেসিডেন্সী জেলে পোরা হয়েছে—দেশবন্ধুর আরো কজন অনুগামী সহকর্মীর সঙ্গে—ইংরেজের অস্ত্রশালার সেই পুরনো মরচে-পড়া হাতিয়ার ১৮১৮ সনের তিন আইনের জোরে। কংগ্রেসের স্বরাজ্যদলের কুক্ষিগত করপোরেশনকে ইংরেজ সরকার সুনজরে পারেননি দেখতে।”[৫]

মূলতঃ, আই. সি. এস. চাকুরীত্যাগ করে খদ্দরধারী সাতাশ বছরের বাঙ্গালী যুবক সুভাষচন্দ্রের এককালে ঝুনো ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত সর্বোচ্চ আসনে করপোরেশনের চিফ্ একজিকিউটিভ অফিসারের পদে আসীন হয়ে অধীনস্থ ইংরেজ অফিসারদের ওপর নির্দেশদান এবং কোন কোন ঘটনায়—তাদের শিষ্টাচারের, শৃঙ্খলার অভাবের জন্য ভর্ৎসনা করা—এসব ইংরেজ প্রশাসকদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠলো।[৬] তাছাড়া তিনি

৫। সুভাষ স্মৃতিকথা, অমল হোম। (সুভাষচন্দ্র, করপোরেশনের Municipal Gazette-এর Editor-এর পদে, ২০শে অক্টোবর, ১৯২৪ সনে দার্জিলিংয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অমল হোমকে নিয়োগ করেন ; ইনি প্রথমে রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারীর পদ অলংকৃত করেছিলেন।)

৬। “One of the most difficult officers to deal with was Mr. J. R. Coats, the Chief Engineer. It was Mr. Coats' habit to show as much of negligence towards the elected representatives of the people as possible. He wanted to annoy them as if to create a scene. One day Subhas got the chance to pull him right. Mr. Coats entered in a casual and jaunting manner into the Chief Executive's cabin. He started talking with a cigarette in his mouth

কলকাতার নাগরিক জীবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জনসংযোগ বিষয়ে এতই নিষ্ঠাবান, অক্লান্তকর্মী এবং দরদী ছিলেন যে, তিনি দাবী করতেন করপোরেশনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সমস্ত কর্মী ও অফিসার যেন কঠোর কর্তব্যপরায়ণ হন। তাঁর জনসংযোগ ব্যবস্থা এবং গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করার জন্য ফাইল-পত্র বাড়ী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং মধুর-গম্ভীর ব্যক্তিত্ব অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলে এবং তাঁর প্রতি মেয়র দেশবন্ধুর পূর্ণ আস্থা ও সহযোগিতা তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ কর্মোন্মাদনাকে তীব্রতর করে। দেশবন্ধু বলেছিলেন, "Well, I have given you Subhas, the best of my jewels. Wait and you will have everything." এসব অবস্থা ইংরেজের মনঃপূত হয়নি, বিশেষতঃ স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির আশঙ্কায়।

কিন্তু সরকার রাজী হলেন না তা করতে—দেশবন্ধুকে অভিযুক্ত করতে। অতএব গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে মামলা করা হলো। অবশ্য গান্ধীজী সে সময় রাজনীতি থেকে দূরে, স্বরাজ্যপন্থীদের তখন সারা ভারতব্যাপী প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা—তিনি তখন খাদি আন্দোলনে গভীর মনোযোগ দিয়েছেন। গভর্নমেণ্টের মিথ্যা অজুহাতে সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করার জন্য মামলা পর্যন্ত করা হলো ; তাঁর বিরুদ্ধে এখানকার শুধু নয়, ইণ্ডিয়া হাউস পর্যন্ত চেষ্টা করে ইংরেজ পুলিশ ও প্রশাসকগণ ব্যর্থ হলেন—তবু সে মামলা কয়েক মাস পরে খারিজ হয়ে গেল। প্রথমতঃ আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল—সেখান থেকে মুর্শিদাবাদে বহরমপুর জেলে ট্রান্সফার করা হলো সুভাষচন্দ্রকে। না, সেখানেও সাহস হয় না ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের। অতএব সমুদ্র পেরিয়ে—বহু দূরে বর্মামুলুকে অস্বাস্থ্যকর পার্বত্য কারাগার মান্দালয়ের জেলে সুভাষচন্দ্রের নির্বাসন—রাজকীয় ব্যবস্থাই বটে!

মান্দালয় জেলখানায় বসে কত স্মৃতিচারণ—এই কারাগারেই লোকমান্য তিলকের ৬ বছর আর পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়ের ১ বছর বন্দীত্ব—

with an unraffled face, but in tone of biting but sweet irony. Subhas asked : "Is it proper, Mr. Coats, to smoke before a superior officer ?" Mr. Coats had many juniors to deal with and he knew immediately the consequences if he failed to take the hint. He said, 'sorry', and threw away the cigarette. After that no one had any reason to complain about Mr. Coats' misconduct !"

—N. G. Ganpuley : Netaji in Germany—pp. 8-9.

সে তো ভারতবর্ষকে ভালবাসারই অপরাধে। সে স্মৃতি-শুভ্র মৌনতা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শক্তিতে শক্তিমান সুভাষচন্দ্রকে কিছু পরিমাণ মানসিক শান্তি দিতে পেরেছিল সেই নিঃসঙ্গ অবস্থায়। মান্দালয় থেকে বহু চিঠিপত্রে তাঁর ব্যক্তিত্ব, দেশ ও সমাজ গঠনের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানবিকতা কি অপূর্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ তা সকলকে মোহিত না করে পারে না। সে উপলব্ধি ও প্রকাশের কিছু কিছু প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করলাম, কেন না তাঁর জীবন-চরিত্রের কতগুলি বৈশিষ্ট্য—তাঁর পরবর্তী 'সাইক্লোনিক' জীবন-প্রবাহের মধ্যে হয়তো সহজে পাঠকের খোঁজবার অবসর থাকবে না।

মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে—১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫ তারিখে লেখা—
(ইংরাজী থেকে বাংলা অনুবাদ) ঃ

"…যদি আপনি মাদক-বর্জন বিলটি উত্থাপন করেন, আনন্দিত হব। এটি উত্থাপন করা দরকার এবং দেশবাসী এটিকে সমর্থনও করবে। করপোরেশনের পাম্পিং ষ্টেশনে অথবা জল সরবরাহের যে কোনও কেন্দ্রে ইঞ্জিন ড্রাইভারের কাজের জন্য এন্তাজ আলি নামে একটি লোক দরখাস্ত করেছিল। বাঁশের মত গোলাকৃতি একটি টিনকেসের মধ্যে পুরে সে তার দরখাস্তের সঙ্গে প্রশংসাপত্রগুলি আমাকে দিয়েছিল। সেটি আমার অফিসে হয় টেবিলের উপর নতুবা আমার চেয়ারের বাঁদিকে what not-এর মধ্যে আছে। টিনকেসটি দেখতে এত অদ্ভুত ছিল যে, ভুল হবার নয়। লোকটি আমাকে ঐ প্রশংসাপত্রগুলির কথা লিখেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এটি তাকে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। কারণ এটি না পেলে সে অন্য কোথাও চাকরীর জন্য দরখাস্ত করতে পারছে না।…

"আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলতে পারি যে, জেলে আসার পর এই প্রথম আমি অসুস্থ বোধ করছি। এখানে আসার দিন থেকেই আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না, … মান্দালয় জেলকে বর্মার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর জেল বলে ধরা হয়, তবে আমি শুনেছি যে, প্লেগ ও বসন্তে এখানে প্রতিবছর অনেকের মৃত্যু হয়ে থাকে। প্লেগেই নাকি মৃত্যু হয় বেশী …।

অনুগ্রহ করে বাবা কিংবা মাকে বলবেন না যে আমার শরীর ভাল নাই।"

বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে লেখা—মান্দালয় জেল—মে, ১৯২৫ ঃ

"তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে এমনই কোমলভাবে স্পর্শ করে চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে, আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন, এ-চিঠিখানাকে যে আবার 'censor'-এর হাত অতিক্রম করে যেতে হবে সেও

আর এক অসুবিধা, কেন না, এটা কেউ চায় না যে, তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহগুলি দিনের উন্মুক্ত আলোতে প্রকাশ হয়ে পড়ুক। ··· জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস এ-কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয় অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাসকালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরো হীন হয়ে পড়ে। ··· আমার মনে হয় না, আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তাহলে একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির চোখে দেখতে পারতাম। ··· কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যে তাঁর জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতখানি ঋণী সেকথা বোধহয় ভেবে দেখা হয় না ···।

“লোকমান্য তিলক কারাবাসকালে গীতার সমালোচনা লিখেছেন। এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটিয়েছেন। কিন্তু এ-বিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে, মান্দালয় জেলে ছ-বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ। ··· আমার বিশ্বাস, বেশী দিনের মেয়াদীর পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ এই যে, আপনার অজ্ঞাতসারে তাকে অকাল বার্ধক্য এসে চেপে ধরে সুতরাং এদিকে বিশেষ সতর্ক থাকাই উচিত ··· আমি নিজে ত দুঃখবাদ বা নিরুৎসাহের কোন কারণ দেখি না বরং আমার মনে হয়, দুঃখ-যন্ত্রণা উন্নততর কর্ম ও উচ্চতর সফলতায় অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে কর, বিনা দুঃখ-কষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোন মূল্য আছে? ···।”

২৪-৮-২৬ তারিখে মান্দালয় জেল থেকে শরৎচন্দ্র বসুর নিকট একখানি চিঠির অংশবিশেষ ঃ

“··· তাহলে, শেষ পর্যন্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। ময়মনসিংহের বাংলা সাপ্তাহিক 'চারুমিহিরে' পুনঃ প্রকাশিত, তাঁর বিখ্যাত চিঠির বঙ্গানুবাদের এক টুকরো অংশ পড়ে আগ্রহবোধ করলাম।

“জেনে বিস্মিত হলাম যে, মেদিনীপুর ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে মিঃ শাসমলের নির্বাচন গভর্নমেন্ট বাতিল করে দিয়েছেন এবং দেবেন্দ্রলাল খানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। সমস্ত স্থানীয় সংস্থার কাছে এটি একটি খারাপ নজির হয়ে থাকবে, এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মূল শর্তও এক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়েছে। এই রকম কাজ করার জন্য গভর্নমেন্ট কি কোন কারণ দেখিয়েছেন?

“চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের কাজ কি রকম চলছে? প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব কাদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে? প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা কি কোন ট্রাষ্টির হাতে, না তার চাইতে ক্ষুদ্রতর কোন গোষ্ঠীর?

“মফঃস্বলে এতরকম সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হল, মফঃস্বলের কথা কলকাতার নেতৃবর্গ একরকম ভুলেই গেছেন। তাঁরা কদাচিৎ বাইরে যান এবং তাঁদের ও মফঃস্বলবাসীর মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ কোন সম্পর্ক নাই···।”

মান্দালয় জেল থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে বর্মার ইনসিন সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হওয়ার পর লিখিত ৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭ তারিখের চিঠি ঃ

“··· মিঃ মোবার্লী প্রকৃতপক্ষে বলেছেন যে, দুটি পথ অবশিষ্ট আছে। (১) জেলে বন্দী হয়ে অবস্থান কিংবা (২) কোন বিদেশে গিয়ে স্বাস্থ্য অর্জনের চেষ্টা ও অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান।

“··· গত আড়াই বছর আমাকে কি রকম কষ্টভোগ করতে হয়েছে সরকার বোধহয় তা ভুলে গেছেন। আমি কষ্ট পেয়েছি—তাঁরা নন। বিনা কারণে তাঁরা এতদিন ধরে আমাকে আটক রেখেছেন। ··· এ বিষয়ে আমি বড়লাটের কাছে আবেদন করলে বাংলা সরকার সে আবেদন চেপে রেখেছিলেন। তারপর আবার আমাকে তিন বছর বিদেশে থাকতে বলা হচ্ছে। ইউরোপে নির্বাসনের সময় আমার নিজের খরচ আমাকে চালাতে হবে। এ কেমন যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব বুঝতে পারি না। ··· ইউরোপে যতদিন হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার না করতে পারি ততদিন আমার সমস্ত খরচ সরকারের বহন করা উচিত। কতদিন সরকার এসব বিষয়ে অনবহিত থাকবেন? সরকার যদি ইউরোপে যাবার আগে আমাকে একবার বাড়ি যেতে দিতেন, যদি ইউরোপে আমার সব ব্যয়ভার বহন করতেন ও রোগমুক্তির পর আমাকে বিনা বাধায় দেশে ফিরতে দিতেন, তাহলে এই দান সহৃদয়তার পরিচায়ক বলে মনে করতাম।”

৫ই এপ্রিল, শ্রীগোপাললাল সান্যালকে লিখিত ঃ

“বেশীদিন রুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে হইলে অন্তরের শান্তিই একমাত্র সম্বল—তাই সুদীর্ঘ কারাবাসের সম্ভাবনায় আমি এক অপূর্ব শান্তি পাইতেছি। Emerson বলিয়াছেন, “We must live wholly from within” এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই সত্যের উপর আমার বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে। ··· আদর্শের সহিত নিজের অস্তিত্ব যদি মিশিয়া থাকে—

তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট—আমার জীবন জগতের কাছে ব্যর্থ হইলেও আমার (এবং বোধহয় ভাগ্যবিধাতার) কাছে ব্যর্থ নয়। জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর—শুধু একটা বস্তু ভাঙ্গে না বা নষ্ট হয় না—সে বস্তু—ভাব বা আদর্শ। আমাদের আদর্শ সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা। আমাদের চিন্তাধারা—অবিনশ্বর। ভাবকে প্রাচীরের দ্বারা কি কেহ ঘিরিয়া রাখিতে পারে?”

বর্মার তদানীন্তন আই. জি. অফ্ প্রিজন্স্‌কে লিখিত—১১ই এপ্রিল, ১৯২৭ সালের চিঠিতে বাংলা সরকারের প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তব্যের কিছু বিশেষ অংশ (ইংরাজী থেকে অনূদিত) ঃ

“…প্রথম থেকেই আমি যে কথা বলে আসছি তা হল গভর্নমেণ্ট আমাকে বিনা বিচারে অন্যায়ভাবে আটক করে রেখেছেন এবং এ কাজ যুক্তিহীন। … কোন সভ্য রাষ্ট্রেই এ-ধরনের আইন ২৪ ঘণ্টার বেশী টিকতে পারে না। বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য হিসেবে আমি নির্বাচিত হওয়ার পর অবিচারের মাত্রা আরো বেড়ে চলেছে, আমার কারাবাসই তার প্রমাণ। পৃথিবীর সর্বত্র আইন সভার সদস্যেরা যে অধিকার ভোগ করে থাকেন—যা প্রাচীন ও তর্কাতীত, তা থেকে আমাকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।”

২৯/৪/২৭ তারিখে শরৎচন্দ্র বসুর নিকট লিখিত পত্রে সুভাষচন্দ্র যে যক্ষ্মায় আক্রান্ত, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (বর্মার অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও পরিবেশ, খাদ্য দেশ-সেবকের জীবন বিপদাপন্ন করে) ঃ

“পরম পূজনীয় মেজদাদা,

বড়দাদা (ডঃ সুনীলচন্দ্র বসু) এসে চলে গেছেন। তাঁর কাছে আমার অভিমত জানতে পারবেন। যদি আগামী সপ্তাহে আপনাকে দীর্ঘ চিঠি লিখিবার মত শক্তি সংগ্রহ করতে পারি, তাহলে আমার সিদ্ধান্তের বিষয় বিশদভাবে লিখে জানাব। বর্তমানে সে সামর্থ্য আমার নাই।

গত কয়েকদিন ধরে রোজই জ্বর বাড়ছে …, ওজন কমে দাঁড়িয়েছে ১২৮ পাউণ্ড। এখনও শয্যাশায়ী। মাঝে মাঝে খুব বিরক্তিকর মনে হয়, কিন্তু ধৈর্য আমাকে ধরতেই হবে।

যদি বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশের কোন পরিবর্তন না হয় তা হলে রোগ সারাবার চেষ্টায় কোনও সুফল হবে কিনা সন্দেহ। বস্তুত, আমার অবস্থা দিন-দিনই খারাপের দিকে। প্রতিকারের জন্য যোগাভ্যাস শুরু করবো কিনা চিন্তা করছি। অবশ্য তার বিপদও আছে অনেক, আর সে জন্যই ইতস্ততঃ করছি। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই। একমাত্র যোগের

দ্বারাই আমার জীবন রক্ষা হতে পারে। একথা গোপন করে লাভ নেই যে, যক্ষ্মা মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাধি। এবং এ-রোগ একবার যাকে ধরেছে, তাকে বাঁচার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে।

আশাকরি সকলে ভাল আছেন।

ইতি

আপনার স্নেহের সুভাষ

পুনঃ—কোনও কারণেই আমার জন্য চিন্তিত হবেন না। কারণ যে কোন খারাপ অবস্থার জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়ে আছি। স. চ. ব.”

সুভাষচন্দ্রের জন্মসত্তার মধ্যে সব সময় যে অনুভূতি ও আবেগের নিরন্তর প্রবাহ, স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গের মধ্যে তারই সার্থকতা। সেই জীবনবোধই তাঁকে বারবার দুঃসাহসিক পথে ঠেলে দিয়েছে—সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত সুখ বা স্বার্থ বলে কিছুই ছিল না। সন্ন্যাসীর মতো নির্লিপ্ত ও উদাসীন এমন কি ধর্মের সাধারণ ধ্যান-ধারণায় যে আত্মিক মুক্তির পথ, তাও তিনি স্বহস্তে রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এ-এক অতি বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য ঘটনা। মানব চেতনার এ উন্মেষ সমগ্র বিশ্ব-ইতিহাসেই সম্ভবতঃ দুর্লভ। বন্ধু দিলীপকুমার রায়ের পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ—পণ্ডিচেরী আশ্রমে তাঁর গুরু—ঋষি শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে যাওয়ার বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের কথোপকথন এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে।

‘—দিলীপ, আমি জানি তা। কিন্তু আজ যদি “যোগ” করতে যাই তা হলে জীবনের মত পরাজয় স্বীকার করে যেতে হবে।’ বলতে বলতে তার ওষ্ঠ কেঁপে গেল, দৃষ্টি দীপ্ত, উজ্জ্বল, ভাস্বর হয়ে উঠলো।

‘—কিন্তু তুমি তো পরাস্ত নও। আজ তোমায় বাংলার যুব সমাজ আদর্শ বলে স্বীকার করে। কিন্তু এরপর যদি চলো এমনি করেই—পথের শেষে সঙ্গীবিহীন, কঠিন একাকীত্ব ছাড়া আর কিছুই পাবে না। সময়ের আশায় মানুষকে সবুর করতেই হয়, সুভাষ। আচ্ছা, ধরো যদি তুমি রাজনীতির রাস্তা ছাড়তে না চাও তা হলে নয় কিছুদিনের জন্যেই আমার সঙ্গে চলো, ঘুরে আসবে। হয়ত তাতে তোমার দৃষ্টি স্বচ্ছতর হবে, পথের দিশা দেখতে পাবে।’

কয়েক মুহূর্ত ভেবে সে ঘাড় নেড়ে বলল—‘না দিলীপ, তাও সম্ভব নয়—’

‘—কেন জানতে পারি কি?’

'—কারণ, আমার মনে হচ্ছে, যদি সাময়িকভাবেও তোমার সঙ্গে নিভৃতবাসে যাই তাহলে কি জানি হয়ত আমার মনের এ অগ্নি ঠিক এমনি থাকবে না—হয়ত যুদ্ধের স্পৃহা হারিয়ে যাবে।'৭

এই-ই সুভাষচন্দ্র বোস, এই-ই সুভাষত্ব। ভারতের অন্ধকারময় বেদনার্ত রূপের চিন্তায় গাঢ় হয়ে উঠতো তাঁর মুখমণ্ডল। এ-শুধু দেশকর্মীর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়, ভারতবর্ষ তাঁর কাছে একটা মানচিত্র মাত্র নয়—একটা মাটির দেশ মাত্র নয়—সে ছিল ভারতমাতা। দেশমায়ের দুঃস্থ, শোষিত, দরিদ্র অসহায় মানবাত্মার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম মমত্ববোধই তাঁকে সব দুঃখ নির্যাতন বরণ করে নিতে কি অপূর্ব মহিমায়ই না উদ্ভাসিত করেছিল—অন্তরে-বাহিরে প্রস্তুত করে তুলেছিল। পরপদানতা দেশমাতৃকার ক্রন্দনের মধ্য দিয়েই তিনি শুনতে পেয়েছিলেন পরমাত্মার আহ্বান!

১৯২৬ সালের শেষ দিকে আইন সভাগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং নভেম্বরে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। আয়ারল্যাণ্ডে—'সিন ফিন' আন্দোলনের ধারায় নির্বাচনের মত রাজনৈতিক বন্দীদেরও প্রার্থী দাঁড় করানো হলো। ইট-পাথরের জেলখানা নয়—বার্মার মান্দালয় জেল কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরী, প্রকৃতির করুণার উপর নির্ভরশীল। বন্দীরা শীতের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা আর গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপে জর্জর এবং তাদের প্রচণ্ড গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশ মান্দালয়ের বর্ষা থেকে রক্ষা পাওয়ার মতন কিছুই ছিল না। সেখানে শৃঙ্খলাবদ্ধ সুভাষচন্দ্র কলকাতার একটি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে বঙ্গীয় আইন পরিষদে নির্বাচিত হলেন। সে নির্বাচনে কলকাতায় হ্যাণ্ডবিল ও ছোট ছোট পুস্তিকা-প্রচারে রকেট ব্যবহার করা হয়েছিল—এসব প্রচাব মাধ্যমে প্রার্থীকে জেলখানার গরাদের আড়ালে বন্দী অবস্থায় দেখানো হতো। ভোটদাতাদের ধারণা ছিল—তাঁদের ভোটের সাফল্যে সুভাষচন্দ্রের প্রতি দেশবাসীর আস্থা প্রমাণিত হবে এবং তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু তা হয়নি—কারাপ্রাচীর স্তব্ধ হয়েই বিদ্রূপ করতে লাগলো।

ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পর সুভাষচন্দ্রকে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়া হলো পুলিশ প্রহরায় ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য। তারপর ইনসিন জেলে স্থানান্তর। স্বাস্থ্যের দুরবস্থা দেখে মেজর ফিগু্‌লের কড়া মন্তব্যে এবং কলকাতায় আইন পরিষদে তুমুল আলোড়নের ভিত্তিতে নিজের খরচে

৭। দিলীপকুমার রায়ঃ আমার বন্ধু সুভাষ, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮

সুইজারল্যাণ্ডে চিকিৎসার জন্য যেতে ইচ্ছুক হলে গভর্নমেন্ট্ তাঁকে মুক্তি দিয়ে রেঙ্গুন থেকে ইউরোপগামী জাহাজে সরাসরি পাঠিয়ে দিতে রাজী। কিন্তু ইউরোপে চিকিৎসার খরচ বহনের দায়িত্ব ও ফিরে এলে আবার বন্দী না করার প্রতিশ্রুতি না থাকায় সুভাষচন্দ্র তা প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর অতি গোপনে তাঁকে ১৯২৭ সালের মে মাসে উত্তর প্রদেশের আলমোড়া জেলে নিয়ে চলে যাওয়ার হুকুমসহ রেঙ্গুনের জাহাজে করে ডায়মণ্ড হারবারে পৌঁছে দেওয়া হলো—কিন্তু জাহাজ থেকে নামতে দেওয়া হলো না। বিশ্বব্যাপী এতবড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এত দুর্ধর্ষ পুলিশ বাহিনীর সে কি ভয়—সে যে বিপ্লবের 'টাইফুন', তাকে বিশ্বাস কি! বাংলার এ-মহাবিদ্রোহী, এর সংস্পর্শ কি অঘটনই সৃষ্টি করতে পারে তাঁর শারীরিক আর্বিভাবে। কিন্তু স্বয়ং বাংলার মহামান্য গভর্নরের একটি লঞ্চ এসে ভিড়লো জাহাজের গায়ে, তাঁর কেবিনে—স্যার নীলরতন সরকার, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, লেফটেন্যান্ট্ কর্ণেল স্যাণ্ড্স এবং গভর্নরের নিজস্ব ডাক্তার মেজর হিংস্টন। মেডিক্যাল বোর্ড সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গভর্নরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী দার্জিলিং-এ টেলিগ্রামযোগে বোর্ডের রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন—আর পরের দিনই ১৬ই মে, মুক্তিপত্র পুলিশ অফিসার মিস্টার লোম্যান সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মেডিক্যাল বোর্ডের ওপর তার বিভাগের সর্বশক্তি দিয়ে বাধা সৃষ্টি করা এবং সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি না দিয়ে আলমোড়া জেলে গোপনে এবং সরাসরি বদলি অথবা সুইজারল্যাণ্ডে দেশান্তরিত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল সেদিন—স্যার স্ট্যান্‌লী জ্যাকসন, নতুন গভর্নরের দৃঢ়তা ও ন্যায় বিচারের ফলে। পুলিশী শাসনের অপশাসন ও লৌহপাশ বাংলার বুকে কিছুদিন স্বস্তি এনেছিল এ-কথা সুভাষচন্দ্র অকপটে স্বীকার করেছেন।[৮]

রজঃগুণের মহাপ্রকাশ ঘটেছিল। সুভাষচন্দ্রের ক্ষত্রিয়ের ভূমিকায় আবির্ভাব এবং সে অবস্থায় নেতাজীর স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের উপস্থিত হতে হবে রণক্ষেত্রের মধ্যেই। তাই ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী সংগঠিত জাতীয় কংগ্রেসের কার্যধারায় তাঁর যুব সংগঠন ও এই বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠানে গতি ও প্রগতিশীলতায় তাঁর দান এবং জাতীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতকে তার গৌরবময় ক্ষমতায়

৮। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র-রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১-৮২

উজ্জীবিত ও পরিচালিত করা, গান্ধীজী ও তদানীন্তন ভারতের সকল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রায় একক সংগ্রামে জয়লাভ, ভারতের জন্য প্রথম 'প্ল্যানিং কমিশন' গঠন এবং কংগ্রেস সংবিধানের নিয়মে নির্বাচনে দু-বারই গান্ধীবাদীদের পরাজিত করে ১৯৩৮-এ হরিপুরায় এবং ১৯৩৯-এ ত্রিপুরীতে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট্ পদে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে নীতি বহির্ভূতভাবে গান্ধীজীর অসহযোগিতা ও বিরোধিতা. এবং তার ফলস্বরূপ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিত্যাগ তথা সে সংগঠন থেকে তাঁর বহিষ্কারের পর—নতুন রাজনৈতিক দল ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন—প্রভৃতির ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন।

১৯২৮ সালে ভারতবাসী, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং এদেশে বিদেশী কূটনীতিকগণ সুভাষচন্দ্রকে এক নতুনরূপে দেখতে পেলেন বাংলার কলকাতা মহানগরীর বুকে। সে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য। হাওড়া স্টেশন থেকে শুরু করে কলকাতার সমস্ত বড় বড় রাজপথ জনপথ ভেদ করে দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্কসার্কাস ময়দান পর্যন্ত ৫০,০০০ হাজার তরুণ-তরুণীর এক বিশাল আধাসামরিক বাহিনীর মার্চ—অশ্বারোহী বাহিনী, মোটর সাইকেল, সাইকেল বাহিনী, গাড়ী এবং ব্যাণ্ড্, পদাতিক বাহিনী আর তার সর্বাধিনায়ক—'জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং' অশ্বারোহী সুভাষচন্দ্র। সে বিস্ময়কর সুশৃঙ্খল দৃশ্যরূপ. সে বিশাল-বিরাট বৈভব ১৯২৮ সালের পূর্বে ও পরে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই একশত বৎসরের ইতিহাসে কখনো কেউ দেখেনি। বিষয় ছিল কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন, সভাপতিরূপে মতিলাল নেহরু। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট্ ও হয়ত বা ভারতের রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দ এ দৃশ্যে বিশেষ বিচলিতবোধ করেছিলেন সেদিন।

অমৃতবাজার পত্রিকা এ বিষয়ে যে দীর্ঘ লেখা লিখেছিলেন—তার অতি সামান্য অংশ এখানে উল্লেখ করছি ঃ

"No session of the Indian National Congress held either in Calcutta or elsewhere has been as spectacular as that of 1928 when it met in Calcutta Park Circus Maidan under presidentship of Pandit Motilal Nehru. It was this session that proudly presented Subhas Chandra Bose himself as the General Officer Commanding of the Volunteer corps ... The force was composed of units of cavalry, drummers, buglers, heralds with flags, band parties, etc. It was drawn on a semi-military scale, and had to be trained through regular drills and exercises ... A grand sight was presented when the presidential procession led by Subhas Chandra Bose and more than a mile long passed through Calcutta streets ... A grand reception, it was one which a triumphant Roman Emperor might well envy."[১]

সত্য সত্যই, বিজয়গর্বী যে কোন রোম্যান্ সম্রাটের পক্ষেও এরকম সম্বর্ধনা একটা ঈর্ষার বিষয় এবং আমাদের মনে রাখতে হবে বর্তমানের সময় থেকে ৫৮ বৎসর আগে ঘটেছিল এ-ঘটনা। তাছাড়া তখনকার লোকসংখ্যা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রচ্ছদপট এবং পুলিশ বিভাগ বিশেষত সদা জাগ্রত ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের শ্যেন দৃষ্টি আর ইংরেজ রাজভক্ত উচ্চশ্রেণীর দাসসুলভ মানসিকতাপূর্ণ বাতাবরণে আচ্ছন্ন কলকাতা। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সংগঠনী প্রতিভা সমস্ত দেশকে চমকিত, উদ্বেলিত করলো সেদিন।

১৯২৮-এর নিখিল ভারত কংগ্রেসের মহাসম্মেলনে মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে গান্ধীজী প্রস্তাব উত্থাপন করেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে 'পূর্ণ-ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন।' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অকুতোভয়, পূর্ণব্রহ্মচারী তরুণ সুভাষচন্দ্র সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—"ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্ অথবা পূর্ণ স্বাধীনতা—এর কোনটা ভারতবর্ষ কামনা করে, স্পষ্ট ভাষায় অভিমত প্রকাশের সময় এসেছে। স্বরাজ শব্দের ধোঁয়াটে বা খোলা ব্যাখ্যা নহে। ··· ভারতের আদর্শের প্রতি ঐকান্তিকতা—প্রাচীন শ্রদ্ধেয় নেতাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রেম থাকা সত্ত্বেও আমাকে নবীন প্রেরণায় উদ্বোধিত করিতেছে—পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের দাবী হওয়া সমীচীন।" গান্ধী-মতিলাল-আজাদ-নাইডুর নীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ভাবধারা এর আগে এমন সর্বভারতীয় বৃহত্তম মঞ্চে আর কেউ কোনদিন শোনেননি। সকলে বিস্মিত ও চমৎকৃত। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সুভাষচন্দ্রের প্রগতিশীল এবং অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত শক্তিশালী প্রস্তাবের প্রথমত সমর্থক—কিন্তু পরমুহূর্তে যেন এক যাদুমন্ত্রে একান্ত মুগ্ধ চিত্তে সরে দাঁড়ালেন বা বলা যায় আত্মগোপন করলেন।

সুভাষের এই সংশোধনী প্রস্তাব ভোট গণনায় পরাজিত হলো। এক বৎসর বাদে আবার লাহোরে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে। সেবার কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য কংগ্রেসের প্রস্তাব গৃহীত হলো প্রচুর উল্লাস ও উন্মাদনার মধ্যে।

---

[১] অমৃতবাজার পত্রিকা—২৮-১২-৭২ (পুনর্মুদ্রণ)

স্বামী প্রেমানন্দ গিরি লিখেছেন—"কংগ্রেস অধিবেশনের এই সংবাদ ও সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব যখন শ্রদ্ধেয় সুধীরচন্দ্র মিত্র শুনাইতেছিলেন—বুড়িবালামের বীর বিপ্লবী বাঘা যতীনের গুরুদেব স্বামী ভোলানন্দ গিরিজী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন 'সুভাষ যো কহ্তা হ্যায়, ওহী ঠিক হ্যায়।' আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মহারাজ পরে হিন্দীতে যাহা বলিলেন—তাহা বাংলায় লিখিতেছি—'বেদান্ত তো নিত্যমুক্ত আত্মারই উপদেশ করেন—'ন মে বন্ধঃ ন মে মোক্ষঃ নিত্য মুক্ত স্বভাববান্।' ক্রমমুক্তি দ্বৈতবাদের কথা—যাহারা জীব-জগতকে যথার্থ বলেন ! বেদান্ত জীব-জগৎ স্বীকার করেন না।

১৯২৮ সালে গান্ধীজীর প্রস্তাবিত ও প্রতিশ্রুত এক বৎসরের মধ্যে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' বা স্বায়ত্তশাসন ভারতবাসী লাভ করেননি—তা ছিল অবাস্তব। ইতিপূর্বে তাঁর আরও একবার সুদৃঢ় ঘোষণা অসত্যে পরিণত হয়েছে—১৯২১ সালে বাংলার প্রাক্তন বিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেছিলেন—১৯২১-এর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই "স্বরাজলাভের বিষয়ে তিনি এতই নিশ্চিত যে, ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পর স্বরাজলাভ না করলে তিনি নিজে বেঁচে আছেন, এমন ধারণা করতে পারেন না। তিনি আরো বলেছিলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টে দ্বৈতশাসন তিনি চাইবামাত্র পেতে পারেন, কিন্তু তিনি চান পুরোপুরি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং তা যদি পান তা হলে তিনি তাঁর আশ্রমের উপর ব্রিটেনের পতাকা ওড়াতে প্রস্তুত থাকবেন।"[১০]

কিন্তু হায়, গান্ধীজীর 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' প্রতিশ্রুতি দু-দুবারই সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়—গ্রেট ব্রিটেন তাঁর এই দাবীর প্রতি কোন গুরুত্বই আরোপ করেনি; তিরিশের দশকে তাঁর আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে—কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তিনি ঐ দশকে কংগ্রেস থেকে তাঁর সদস্যপদ খারিজ করে নেন এবং সরে দাঁড়ান—যদিও তাঁর নৈতিক কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবেই বজায় থাকে। এমন কি ১৯৪২ সালের তাঁর, তথা কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনেও ব্রিটিশরাজ ভারত ছাড়েনি—যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে গান্ধীজীসহ কংগ্রেসের ডান-বাম উভয় পন্থীর নেতৃবৃন্দকে ও লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে কারাগারে বন্দী করে।

১০। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র-রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০

এই পুস্তকে গান্ধীজীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা কিংবা অদূরদর্শিতা, সফলতা কিংবা বিফলতা লেখা আমার বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু তিনি পুরোপুরি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করলে তাঁর আশ্রমের ওপর ব্রিটেনের পতাকা ওড়াতে প্রস্তুত—তাঁর এ উক্তি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অতি কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে। ফাঁসীর মঞ্চে, চামড়ায় গ্রীজ লাগান দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া, অন্ধকার কারা-প্রাচীরের অন্তরালে লোহার নাল লাগান বুটে চেপে ধরা, বন্দে মাতরম উচ্চারণের জন্য আদালতে চাবুকে চাবুকে ছাত্র-যুবকদের আর্তনাদ, দুমাসেরও বেশী অনশন করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন—সে কি ঐ গান্ধীজী কল্পিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য —না ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা, পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য! কত শত-সহস্র সংসার ছারখার—কত মায়ের বুক খালি হয়ে যাওয়া, গৃহসুখ, সহায়-সম্পত্তি-পদ-মান-বিসর্জন। আন্দামানে নির্বাসনে হাতেপায়ে বেড়িবদ্ধ পশুর জীবন যন্ত্রনা।[১১] সে-ত মাতৃভূমিকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ভারতকে তার স্বাধীন সত্তায় ভাবীকালের সন্তানদের জন্য আবার ফিরিয়ে আনতে রক্তক্ষরণ, আত্মবলিদান!

১১। “ভারতীয় সকল জেলেই কয়েদীর আহারের স্থান আছে। কিন্তু আন্দামানে তাহা নাই। এখানে বৎসরের মধ্যে প্রায় ৮ মাসই বৃষ্টি-ধারার বিরাম নাই। ··· আহার করিবার স্থানাভাবে অধিকাংশ দিনই কারখানার পাশে দাঁড়াইয়া কম্পিত কলেবরে আহার্য্য উদরসাৎ করিতে হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইলে অনেক সময় ডাল-ভাতে বন্যার প্লাবন দেখা দেয়। কারো বা ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, কারো বা পেটের ক্ষুধা পেটেই থাকিয়া যায় ··· রাত্রিকালে তৃষ্ণা পাইলে নিবারণের উপায় নাই। সন্ধ্যার পূর্বে বন্ধ হওয়ার কালে সকলকেই লোহার বাটিতে এক বাটি জল সঙ্গে করিয়া কুঠিবদ্ধ হইতে হয়। [৯×৭ হাত, সম্মুখে ৪×১॥ হাত একটা দ্বার, পশ্চাতে ভূমি হইতে ৬ হাত উঁচুতে ২×১ হাত একটি বাতায়ন] ··· আবার মলত্যাগের পর রাত্রিকালে এই জলের সাহায্যেই শুদ্ধ হইতে হয়। জেলে মলত্যাগের হুকুম নাই। যদি এ আদেশ কেহ অমান্য করে তবে তাহাকে এ আইনে গ্রেপ্তার করা হয় তাহার ফলে তাহাকে সে দিবস সাগু খাইয়া দিন কাটাইতে হয় ইহাই এ আইন ভঙ্গের দণ্ড। প্রস্রাব ত্যাগের জন্য একটা অপ্রশস্ত মুখবিশিষ্ট ঘটির আকারে একটা পাত্র রাখে। দায়ে পড়িলে উহাতেই উভয় কার্য শেষ করিতে হয়। কারাগর্ত (cell) অন্ধকার ··· চন্দ্র-সূর্যের মুখ খুব অল্প দিনই দেখিতে পাওয়া যায়। ··· ক্ষুদ্রায়তন অপ্রশস্ত মুখবিশিষ্ট একটি

"… কংগ্রেসের অধিবেশনের কিছুদিন পরে—ওয়েলিংটন স্কোয়ারে হিন্দু মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সত্যানন্দজীর নেতৃত্বে বিরাট হিন্দু সমাজ সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরির সাক্ষাৎকার ঘটে। আমরা মহারাজের সঙ্গে গিয়াছিলাম। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতি। সুভাষচন্দ্র মহারাজকে প্রণাম করিলেন। মহারাজ আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—'তুমি কেবল সাবাস্ সুভাষ নহ—তোমার প্রস্তাব আমি শুনিয়াছি। তোমার ভাষা স্থিত প্রজ্ঞেরই ভাষা। তুমি যথার্থ সু+ভাষ।' সুভাষচন্দ্রের মহারাজের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল তাহার কারণ বোধহয়, সুভাষচন্দ্র জানিতেন যে স্বামীজী বাঘা যতীনের গুরু।

"… এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে বলা বিধেয় যে, কৈশোরে স্বামীজীর সহিত সুভাষচন্দ্রের একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে সময়ে স্বামীজী তাঁহার প্রতি অতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। 'সদাচার স্তোত্রমালা' বই উপহার দিয়াছিলেন।"[১২]

এরপর মহাবিপ্লবীর পথ-পরিক্রমা, জীবনের বিপ্লব, প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাস, রোমাঞ্চ, জাতীয় উন্মাদনা। অনড় পর্বত মহম্মদের দিকেই যেন অগ্রসর হতে থাকে—সৃষ্টি হয় মহাজীবনের কথা। রাজবিদ্রোহী তিনি—তাই রাজদ্রোহের কারণে ১৯৩০-এ কারাবরণ আবার।

ঘট যাহার মধ্যে ১ বা ১॥ সের আন্দাজ জল ধরে এরূপ ক্ষুদ্র পাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়। অমানিশার গভীর অন্ধকারের ন্যায় অন্ধকারে ক্ষুদ্র পাত্রটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া আবার তাহার মুখটি খুঁজিয়া লইতে হয়। এই ক্ষুদ্র পাত্রে একসঙ্গে দুই কাজ করিবার হুকুম নাই। সুতরাং প্রথম মূত্র ত্যাগ করিয়া পরে মল ত্যাগ করিতে হইবে। যদি তাহা না পারে মাটিতে পড়িলে তাহার ফলস্বরূপ জেল দণ্ড, দ্বিতীয়তঃ নিজের ঘরও দুর্গন্ধময় হয়। … এই মলত্যাগের পর জল খরচ করা আরো কঠিন ব্যাপার। … এখানে পানীয় জল বিতরণকারী ভিন্ন অন্য কারো স্পর্শ করার হুকুম নাই … এই জল ছোঁয়ার জন্য এখানে এক সময়ে ত্রিশ চাবুক ও দণ্ড পুরস্কার পাইয়াছে।"

আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দী শ্রীমদনমোহন ভৌমিক লিখিত—'আন্দামানে দশ বৎসর নির্বাসন'-প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত (ছাত্রঃ ১ম সংখ্যা) ১৯২৮।

[১২] 'সুভাষচন্দ্র ও স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ'—স্বামী প্রেমানন্দ গিরি।

১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী। ২৬শে জানুয়ারীকে স্বাধীনতা দিবসরূপে প্রতিপালনের ঘোষণা করা হলো। এবং গান্ধীজীর কথায়—"যেহেতু দেশে হিংসাত্মক নীতি বিশ্বাসী একটি দল আছে যারা বক্তৃতা, প্রস্তাব বা সম্মেলনাদিতে কর্ণপাত করবে না, বরং কেবল প্রত্যক্ষ সংগ্রামেই বিশ্বাসী—একমাত্র আইন অমান্যের দ্বারাই আসন্ন অরাজকতা ও গুপ্ত অপরাধ থেকে দেশ রক্ষা হতে পারে।"

১৯২৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় তিনি লিখেছিলেন—"এবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হলে নীরব সক্রিয় অহিংসা নয় বরং সবচেয়ে সক্রিয় ধরনের কাজে লাগানো হবে, যাতে ভারতের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী একজনও সংগ্রামের শেষে মুক্ত বা জীবিত না থাকেন ··· ।" অবশ্য সংগ্রামের শেষে তা সত্য প্রমাণিত হয়নি কিন্তু তাঁর কথা ও কাজের দার্শনিকতা কালবৈশাখীর রুদ্ররূপ নিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

গান্ধীজীর আইন অমান্য-ঘোষণায় ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন বড়ই দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। যা-ই হোক গান্ধীজী ৬ই এপ্রিল সমুদ্র স্নানের পর ডাণ্ডী গ্রামে সমুদ্রতীরে পড়ে থাকা নুনের খণ্ড টুকরো সংগ্রহ করে আইন অমান্য শুরু করলেন। 'স্টেটস্‌ম্যান' এক বিশেষ প্রবন্ধে গান্ধীজীর প্রতি বিদ্রূপাত্মক লেখা লিখলেন এবং বহু কংগ্রেস সত্যাগ্রহীর মধ্যেও সন্দেহ প্রকাশ পেলো। ··· কিন্তু জনসাধারণ ও নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে আনুগত্য ও আত্মবিশ্বাস জাগরণের ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর ভাবাদর্শ ও সাধু-সন্তসুলভ জীবন যাপন—এ ভাবমূর্তি এদেশের সমাজ জীবনে এমনই বিস্ময়কর ছিল যে—তাঁর কথা ও প্রচার এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। গুজরাটে তাঁর ব্যক্তিগত ডাণ্ডী গ্রামের লবণ-সত্যাগ্রহ বাস্তব বিচারে নিরর্থক হয়েছিল—কিন্তু তাঁর লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলন বাংলার বঙ্গোপসাগরের কাঁথি উপকূলে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে যে রূপ নিয়েছিল তা সর্বাত্মক এবং বিশাল। কিন্তু তাঁর আহ্বানে যে সারা-উপমহাদেশব্যাপী আইন-অমান্য বিদ্রোহের ঝড় সম্প্রসারিত হলো তার স্বরূপ ছিল ভিন্ন। নির্যাতনের ক্ষেত্রে বাংলার মেদিনীপুর জেলার জনসাধারণই বিশেষত সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা জীবন-মান সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছিলেন—আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুর্ধর্ষ সামরিক ঐতিহ্যময় আফগানেরা শুধু কর

বন্ধ করেই ক্ষান্ত হননি, খান আবদুল গফ্ফর খানের নেতৃত্বে জন্ম দিল লাল কোর্তা পরিধানকারী 'খোদাই খিদমৎগার' বা ঈশ্বরের সেবক দল। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ালো তারা। কারণ এদের মধ্য থেকেই তৈরী করা হতো সর্বোৎকৃষ্ট সৈন্যবাহিনীর কয়েকটি রেজিমেণ্ট। সে আনুগত্য এই আইন-অমান্য আন্দোলনের আঘাতে বিধ্বস্ত হলো। একি অহিংস আইন-অমান্যের কম শক্তি!

১৯৩০ সালের এপ্রিলে কলকাতার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যেই রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর পুলিশ আক্রমণ করলো। আইন অমান্যকারী অত্যন্ত পদস্থ-ব্যক্তিদেরও কোন সম্মান—এমন কি দৈহিক নিরাপত্তা—সারা ভারতবর্ষব্যাপী জেলের বাইরে বা ভেতরে কোথাও ছিল না। এমনি নৃশংস হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ পুলিশ বিভাগ। কলকাতার জেলে যাঁদের ওপর দৈহিক আক্রমণ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুভাষচন্দ্র, মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কংগ্রেস সেক্রেটারী কিরণশঙ্কর রায়, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী, 'লিবার্টী' পত্রিকার এডিটর সত্যরঞ্জন বক্সী প্রভৃতি। সামনের সারিতেই ছিলেন সুভাষচন্দ্র, তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে লাঠির আঘাতে জর্জরিত, রক্তাপ্লুত করা হলো এমন নির্মমভাবে যে, এক ঘণ্টারও অধিক তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকতে হয়। জনসাধারণের প্রচণ্ড আন্দোলনেও গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে তদন্তে অস্বীকৃত হয়। শেষে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে রিপোর্ট দেওয়া হয়—সেই বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। কিন্তু এর অপরূপ প্রতিশোধ নিল তরুণের দল—হলো বিনয়, বাদল, দিনেশের অলিন্দ যুদ্ধ; প্রাণের আহুতি দিলেন তাঁরা। আর গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, মেদিনীপুরে আইন-অমান্যকারী জনসাধারণের ওপর আক্রমণকারী গভর্নমেণ্টের পুলিশ-মিলিটারীর অত্যাচার নির্যাতন সহজেই অনুমেয়।

কলকাতার মানসিকতা বিপ্লবী-মানসিকতা—যুগে যুগে তা নথিভুক্ত আছে। তার আর একটি স্বাক্ষর—১৯৩০ সালের আগস্ট মাসের করপোরেশন নির্বাচন। জেলের মধ্যে বন্দী সুভাষচন্দ্র বসুকে কলকাতার নাগরিকগণ মেয়র নির্বাচিত করলেন। সে সময় তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও ছিলেন—মেদিনীপুরে হিজলী জেলে বন্দীদের ওপর পুলিশের গুলি চালানর

প্রতিবাদে সভাপতির পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন তিনি। এদিকে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুযায়ী রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হলো। এইভাবে ভারতবর্ষব্যাপী হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ মানুষ তিনদশকেরও বেশী নিরস্ত্র-অসহযোগ আন্দোলনে কারাগারে যাতায়াত করে চলেছেন ; চরকায় সুতো কাটা, খদ্দরের জামা-কাপড় ও টুপি পরা, সভা-সমিতিতে প্রস্তাব—গোল-টেবিল বৈঠক হয়েই চলেছে, কিন্তু স্বাধীনতা কোথায়, কত দূরে—আর কত বাকি! আর মরণজয়ী ক্ষুদিরাম-কানাই-যতীন-প্রফুল্ল-প্রদ্যোৎ-ভগৎ সিং-মাস্টারদা-বিনয়-বাদল-দিনেশের পিস্তল-রিভলভারের গর্জনে মাঝে মাঝে অন্ধকার আকাশে রুপোলী আলোর ইশারা শুধু। তারপর ওরা, ঐ আত্মার অমরত্বের সাধক—মাতৃসাধকের দল কেমন সহজে বন্দে মাতরম বলতে বলতে ফাঁসীর মঞ্চটার দিকে এগিয়ে যায়। তবে ওজন নেওয়া হয় ফাঁস পরাবার আগে—কারুর কারুর ওজন শুধু একটু বেড়ে যায় মাত্র, কিংবা ফাঁসীর বদলে আন্দামানে নির্বাসনের আদেশ হলে একটু হতাশা—এই যা!

ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার এক ব্যর্থ চেষ্টা। সেই সময় ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাত্রির অন্ধকারে সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের বাড়ী বাড়ী চারটি পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে ধরপাকড় করে, আসবাবপত্র তছনছ করে ও লোকেদের ওপর চড়াও হয়ে মূল্যবান সমস্ত জিনিস লুঠ করে নিয়ে যায়। সে অবস্থায় কলকাতার জনসাধারণ একটি তদন্ত কমিটি ঢাকাতে প্রেরণ করেন। সুভাষচন্দ্র এই কমিটির সদস্য। ঢাকায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গায়ের জোরেই ঢাকা জেলা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আবার তিনি ঢাকায় যাবার চেষ্টা করলে তাঁকে জেলে বন্দী করা হয় এবং কিছুদিন পরে মুক্তি দেওয়া হয়। সেটা ১৯৩১ সাল।

১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী কলকাতার মহামান্য মেয়র স্বয়ং তাঁর প্রধান কার্যালয় থেকে একটি শোভাযাত্রা নিয়ে চলেছেন ময়দানের দিকে। সমস্ত শহর তখন ভারতীয় আইনের ১৪৪ ধারা অনুযায়ী সভা-শোভাযাত্রা নিষেধের মধ্যে বন্দী। কিন্তু এই শহরের প্রথম নাগরিক যে মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু—তিনিই আইন-অমান্য করছেন সহস্র অনুগামীসহ। অতএব, ব্রিটিশ পুলিশের হাতে শুধু বন্দীই হলেন না, লাঠির ঘায়ে মেয়র গুরুতর আহত। পরদিন ডেপুটি মেয়র সভাপতির আসন থেকে মেয়রের রক্তাক্ত উত্তরীয় উপস্থিত করলেন

পুলিশ কোর্টের বিচারালয়ে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের মূল অধিকারকেই যিনি স্বীকার করেন না, তিনি আদালতে অংশগ্রহণ করলেন না। অতএব, মাননীয় বিচারক ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন সুভাষচন্দ্রকে।

বর্মার কারাগৃহে, যন্ত্রণাময় বন্দী জীবনে কঠিন রোগের আক্রমণ, দেশ সেবার কর্মে অক্লান্ত পরিশ্রম, বিরামহীন কর্মপ্রবাহ এবং তারপর পুনঃ পুনঃ কারাবাস তাঁর শরীরে গুরুতর রোগের সৃষ্টি করলো। এরপর—ইউরোপ মহাদেশের ভিয়েনা। হয়তো বা নির্বাসন। ১৯৩২-এর গোড়ায় সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্রকে 'সিয়নী' (Seoni) সাব-জেল ও পরে জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ করা হয়। ভীষণভাবে অসুস্থ হওয়ায় সুভাষচন্দ্রকে ঐ বছর আগস্টে Madras Penitentiary-তে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়। ডাঃ স্কীনার, ডাঃ কেশব পাই, ডাঃ নীলরতন সরকার ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গঠিত Medical Board সর্বসম্মত রিপোর্ট দেয় সুভাষচন্দ্র টি. বি. ও তলপেটের (abdomen) কঠিন রোগে আক্রান্ত। তারই ফলস্বরূপ দেশে আলোড়ন ও বিদেশে চিকিৎসার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অনুমতি দান। Madras Penitentiary-তে থাকার সময় তিনি যে থিসিস রচনা করেন, তারমধ্যে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়া, সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ বিভাগে অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত, ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ভবিষ্যতে সশস্ত্র বিপ্লব-সংগ্রামে রূপদানের প্রচ্ছন্ন ভাবধারা প্রকাশ করেন।

ভিয়েনা যাত্রার সময়ে জাহাজে বসে সুভাষচন্দ্র তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে ৫ই মার্চ, ১৯৩৩ তারিখে একখানি চিঠি লেখেন। চিঠিটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—তাই কিছু অংশ এখানে উল্লিখিত হলো: "··· গোটা জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারী মাস দুটো আমার এক মানসিক অশান্তিতে কেটেছে—এর কারণ অবশ্য সরকারের অতি উৎসাহ। ঠিকই ছিল না যে শেষ পর্যন্ত ইউরোপ যাত্রা ঘটে উঠবে। সরকারের বদান্যতায় মা-বাবা বা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পাইনি ··· অনেক দূর দূর থেকে বন্ধুরা বোম্বাইয়ে এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েই তাঁদের ফিরতে হয়েছে। পুলিশ অফিসার যাঁরা আমাকে তুলে দিতে এসেছিলেন, তাঁরা শিকারী কুকুরের মত আমাকে ঘিরে রেখেছিলেন, জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত। এই ধরনের যন্ত্রণা আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল বোম্বাই ছাড়ার আগে পর্যন্ত।"

খাস ইংল্যাণ্ডের 'ডেলী হেরাল্ড' পত্রিকা এই বিষয়ে এক আকর্ষণীয় রিপোর্ট ছেপেছিলেন।[১৩]

"··· আমি জেলে ছিলাম বলে তুমি খুব কষ্ট পেয়েছ আমি জানি। আমি ঠিক এতটা আশা করিনি। আমি ভেবেছিলাম—পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে তুমি সবকিছু ভুলে 'যোগে' মগ্ন হয়ে পড়েছ। সত্যি কথা বলবো দিলীপ, যোগ আর অধ্যাত্মবাদ আমি বুঝি না; কিন্তু তোমার অসাধারণ মানবতা, মানুষের প্রতি তোমার ভালবাসা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। পার্থিব সবকিছুর মায়া কাটিয়েছ, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছ তুমি। অথচ সেই তুমিই যে আমার বন্দীদশার জন্যে মানসিক কষ্ট পাবে—এ আমি ভাবতে পারিনি। একটা চিঠিতে তুমি জানতে চেয়েছিলে 'শিব' সম্বন্ধে আমার ধারণা কি? সত্যি কথা বলতে 'শিব', 'কালী' আর 'কৃষ্ণ' সবাইকে আমি সমান চোখে দেখি, সবাইকে আমি শ্রদ্ধা করি সমানভাবে। যদিও তাঁরা মূলতঃ একই, কেউ একটা রূপে তাঁদের আরাধনা করে, কেউ করে অন্যরূপে। ··· তুমি জানো, সম্প্রতি (প্রায় ৪/৫ বছর যাবৎ) আমি মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করি। এর আগে সাধারণ বিচারবাদী যুক্তিতে আমি মনে করতাম মন্ত্র একটা প্রতীক মাত্র, শুধু মনঃসংযোগের সহায়তা করে। কিন্তু তান্ত্রিক দর্শন পড়ে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, কতকগুলো মন্ত্রের সত্যিই শক্তি

১৩। Daily Herald published on 24 Feb, 1933 :

Gandhi Lieutenant Leaves Country on Stretcher—Police Escort him out to Sea—Former Mayor of Calcutta for Europe.

The man who is regarded by the Indian authorities as the brain behind Mr. Gandhi's Congress movement left India today in an Italian steamer for Europe. He was carried on a stretcher from the train to the steamer and was escorted by Police until the Ship was well away from the shore. His escort returned by special tender. This man of whom the authorities are so afraid is Subhas Bose, the Bengal Congress leader and former Mayor of Calcutta.

Subhas Bose, who was detained last February, has been released to go to Switzerland for tuberculosis treatment. He is very weak, having lost 64 lb. in weight during recent months. Yet the Government feels his influence in Calcutta is still so great that he was refused to visit his dying mother before sailing for Europe.

আছে—এক এক মানসিক অবস্থার পক্ষে এক-একটা বিশেষ মন্ত্রের প্রয়োজন। তারপর থেকে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি আমার মানসিক অবস্থাটা ঠিক কি রকম, কোন ধরনের মন্ত্র আমার পক্ষে কার্যকরী হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা পেরে উঠিনি, কারণ আমার মানসিক অবস্থা অনবরতই পাল্টায়। কখনও আমি শৈব, কখনও শাক্ত আবার কখনও বা বৈষ্ণব। আমার মনে হয় এই কারণেই গুরুর প্রয়োজন—কারণ যিনি যোগ্য গুরু তিনি আমাদের সম্বন্ধে, আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী বুঝতে পারেন।

… … … পোর্ট সৈয়দে পৌঁছাবার আগে পর্যন্ত খুব ভালই ছিলাম—ভূমধ্যসাগরে পড়বার পর থেকে আবার খারাপ লাগছে … … … … অশেষ প্রীতি নিও।"

শ্রীঅরবিন্দ এই চিঠিটা শুনে বলেছিলেন (তারিখ ১৭-৩-৩৩) ঃ

'দিলীপ—

কৃষ্ণ, শিব আর শক্তি নিয়ে সুভাষের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা শুনে আমি না হেসে থাকতে পারিনি। যদি কেউ ঈশ্বরের একটা বা দুটো রূপের প্রতিই অনুরক্ত হয় তা হলে ঠিকই আছে। কিন্তু যদি কেউ একই সময়ে অনেকগুলো রূপের দিকে আকৃষ্ট হয় তাহলেও উদ্বিগ্ন হবার কিছু নাই। খানিকটা উন্নত স্তরের সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষ হলে তার চরিত্রে অনেকগুলো দিক থাকাই স্বাভাবিক। আর তা হলে বিভিন্ন প্রকাশ তার বিবিধ ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করবে এ আর আশ্চর্য কি? সে সবগুলোকেই গ্রহণ করে এক ঈশ্বর আর এক আদ্যাশক্তির মধ্যে তাদের সমন্বয়সাধন করতে পারে।'

দিলীপকুমার রায় লিখেছেন—"যখন সে সাধারণ মানুষের পর্যায়েই ছিল তখনকার সেই সুভাষকে আমার বেশী ভাল লাগে। আমি মনে করি সে তখনই ছিল মহামানব, মানবতার পরিধি ছিল তার বিরাট। ভিয়েনা যাবার পথে জাহাজে বসে সে যে চিঠি (উপরিউক্ত) লিখেছিল আমাকে, সেইটাই তার আসল পরিচয়।"১৪

ভিয়েনায় বিঠলভাই প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এবং ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে সুভাষ ও প্যাটেলের সুদৃঢ়, সুকঠোর যে মনোভাবের প্রকাশ হলো তা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে—নতুন নেতৃত্বের আর বিলম্ব নেই এবং তার প্রকাশভঙ্গীও সম্পূর্ণ আলাদা। গান্ধীজীর আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার

১৪। আমার বন্ধু সুভাষ, পৃষ্ঠা ৭৪, ৭৫, ৭৬

ও গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট প্যাটেল-সুভাষের দৃষ্টিতে গান্ধীজীর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছু নয়।

যে সাংবাদিক তাঁদের ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন তাঁর সেই বর্ণনা দেওয়া হলো ঃ[১৫]

Patel : 'My young friend believes that an attack must be sharp like a dagger, whereas I hold one should not be careless in one's own house.'

Bose intervened : 'Gandhiji is an old, useless piece of furniture. He has done good service in his time but is an obstacle now.'

—'May be he is', replied the older man, 'as an active politician. But his name is of great and permanent value.'

The Round Table Conference, Bose held, had been a waste of time, for 'no real change in history has ever been achieved by discussion.'—'But the only alternative is war.' 'What of it ? India can well afford to bring a blood sacrifice for her liberation. 350 million miserable lives are waiting for deliverance.'

'There speaks the mind of young India.' said Patel, 'it may be a brilliant mind and it may be a foolish one. It may be creative and it may be suicidal. But it is here and if the gods are thirsty what can we do but offer our blood ?'

সত্যই, এ দিয়ে কিছু হবার নয়, কোন দিন হয়নি। বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ আইনজ্ঞ পার্লামেন্ট সদস্য এডমণ্ড্ বার্ক—আমেরিকাকে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধন থেকে স্বাধীনতাদানের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কি অভূতপূর্ব যুক্তিজাল বিস্তার করে দিনের পর দিন বুঝিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের রাজ প্রতিনিধিদের। রাষ্ট্রনীতিবিদ ও যুদ্ধবিশারদের দল কখনো বোঝেনি সে কথা। কিন্তু শুনেছিল, শুনতে বাধ্য হয়েছিল একদিন[১৬] কিন্তু বড় উচ্চমূল্যে—রক্তমূল্যে!

১৫। Mr. Alfred Tyrnauer's writing in the Sunday Evening Post : March 11th, 1944.

১৬। The Outline of History—H.G. Wells : Pages 870–871 :

Thomas Paine : "The blood of the slain, the weeping voice of nature cries, ' 'Tis time to part'," (Separation of colonies from Britain and War of Independence of America)

Thomas Jefferson : "… We must endeavour to forget our former love for them (the British).

(The document of the 'Declaration of Independence' of America was drawn up by Jefferson.)

কামানের গোলার সামনে। যদিও কামান-বন্দুকের সংখ্যা ছিল না প্রচুর, তবু কোটি কোটি আমেরিকানের বুকের তীব্র জ্বালা তাঁদের বীর দেশপ্রেমিক নেতা জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ছয়-সাত বৎসরকালে ইংরাজ রাজশক্তি ও সমরশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে স্বাধীন 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র' পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে। পৃথিবীতে সদ্যোজাত প্রথম প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সকে অঙ্কুরেই বিনাশের জন্য ইউরোপের সমস্ত রাজ-সম্রাটের দল লক্ষ-লক্ষ সৈন্যসম্ভার, যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ফ্রান্সকে অবরোধ করেছিলেন ফরাসী বিপ্লবের পর। কিন্তু অনন্য সমর প্রতিভা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের তরবারির সম্মুখেই সকলে নতজানু হয়ে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। জার্মানী, ইটালী, জাপান, যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক, কিংবা চীন, রাশিয়া প্রান্তরে এবং পরবর্তীকালে ইসরাইল, ভিয়েৎনামে অথবা প্রাচীন ভারতের কুরুক্ষেত্রে—কোন বিনয় অথবা সাধুর বাণী-লালিত্যে কোন সম্মানজনক ফললাভ ঘটেনি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যর্থই হয়েছিলেন এবং অবশেষে তিনি একান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছিলেন অর্জুনকে।

পরাধীনতার গ্লানি ও অতীতে তার স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে বারে বারে ব্যর্থতা এবং বিশ্ব ইতিহাসের সুস্পষ্ট জ্ঞান সুভাষচন্দ্রকে এই সত্যে উপনীত করেছিল যে, কোন অহিংসা মন্ত্র বা আপোষমর্মিতা বহুযুগের রক্তস্বাদে পুষ্ট ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিবর্তন আনতে সমর্থ হবে না। সমগ্র জাতির জন্য শুধু নৈতিক পরাজয় ও হীনমন্যতা নয়, তার দাসত্বের বন্ধন আরো কঠিন কঠোর হয়ে উঠবে—অতএব ক্লীবত্ব, ভীরুতা এই মুহূর্তে ত্যাগ করতে হবে। ইংরেজের সঙ্গে গান্ধীজী ও তাঁর পরিচালিত কংগ্রেসের আপোষ-নীতিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভে আমরা ব্যর্থ। তেজ, বলবীর্য প্রকাশ, অস্ত্রধারণ ভিন্ন, জাতির রক্তস্নান ভিন্ন মাতৃভূমির মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নেই। এই মানসিকতা গড়ে উঠেছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত আন্তর্জাতিক শান্তিবাদী মহামনীষীরও। সত্য ও সুন্দরের পূজারী, যিনি গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' আখ্যা দিয়েছিলেন, তিনিই বললেন, বলতে বাধ্য হলেন—"মহাত্মার অহিংসায় হবে না।"

তখন ১৯৩০ সাল। লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের কাল। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় কিছুদিন লণ্ডন শহরে 'রেজিনা হোটেলে' (Regina Hotel) অবস্থান করছেন। ভারতীয় নেতাদের সেখানে মিলিতভাবে জাতীয় দাবী উত্থাপনে ব্যর্থতা ও হীনতা প্রকাশ দেখে তিনি ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ বোধ করেন। কবির

স্নেহধন্য শান্তিনিকেতনের ছাত্র (পরবর্তীকালে মন্ত্রী) ব্যারিস্টার নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার গুরুদেবকে নেতাদের ডেকে এই বিষয়ে বলার অনুরোধ জানান এবং তাঁরই চেষ্টায়, স্যার প্রভাস মিত্র ও মহম্মদ আলি জিন্না পৃথক পৃথকভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘরে সাক্ষাৎ করেন। প্রায় মধ্য রাত্রে দর্শনার্থীরা তাঁর ঘর থেকে চলে যাবার পর ম্লান মৌন মুখে বসে রইলেন কবি। শেষে বললেন—"এঁদের দিয়ে কিছু হবার নয়। হবে নারে, মহাত্মার অহিংসায় হবে না।" চমকে উঠে আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। ক্ষণমাত্র মৌন থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অনুসন্ধিৎসুভাবে বলে উঠলেন, "অস্ত্র-শস্ত্রই বা তোরা পাবি কোত্থেকে ?"[১৭]

শক্তির সাধনমন্ত্রে এর উত্তর একদশক পার হতেই ইতিহাস শুনেছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের রণক্ষেত্রে সমুদ্র-পর্বতে, আকাশ-বাতাস, বনভূমিতে বিচিত্র বৈভবে সে উত্তর আমরা শুনেছি। কবির কামনা, সে ক্ষুব্ধ মনের আলোড়ন কি রুদ্র রূপেই না প্রকাশ হতে আমরা দেখলাম—নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশ-আমেরিকান রণশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবো—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সুভাষচন্দ্র ভারতের যথার্থ প্রয়োজনটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং পরম নিষ্ঠা সহকারে বিস্ময়করভাবে, বিশ্ব ইতিহাসে বহু শতাব্দীর নিমজ্জিত ভারতের ক্ষাত্রধর্মকে সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর সে কর্মক্ষেত্র ও রণক্ষেত্র বিস্তারিত ছিল পৃথিবীর সমস্ত মহাসমুদ্র ও স্থলভাগের দুই-তৃতীয়াংশ।

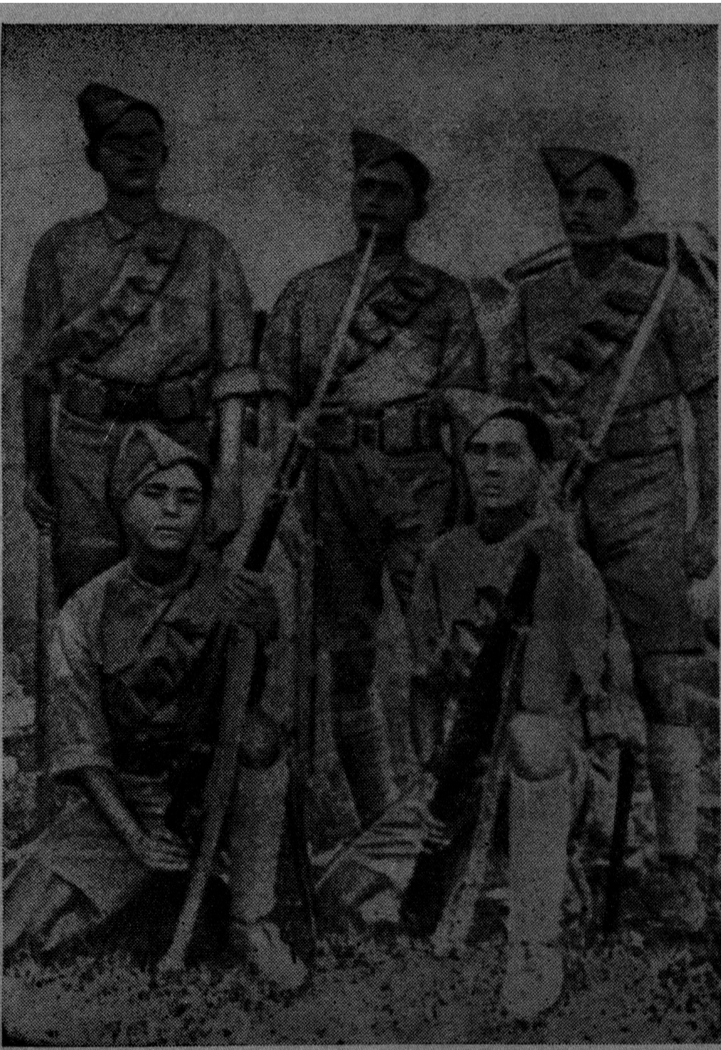

ইউ.টি.সি. ক্যাডেট—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৭-১৮)

(সুভাষ—বাম থেকে দাঁড়িয়ে প্রথম)

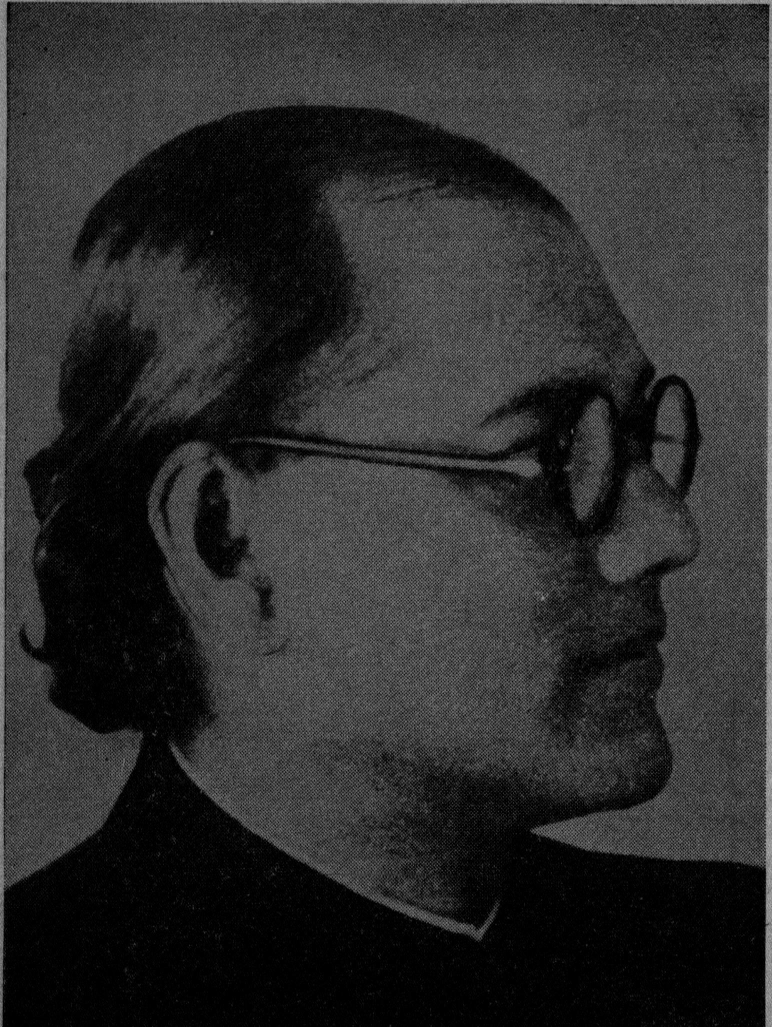

ইউরোপে চিকিৎসার জন্য স্বেচ্ছা-নির্বাসিত সুভাষচন্দ্র (প্রাগ ঃ ১৯৩৩)

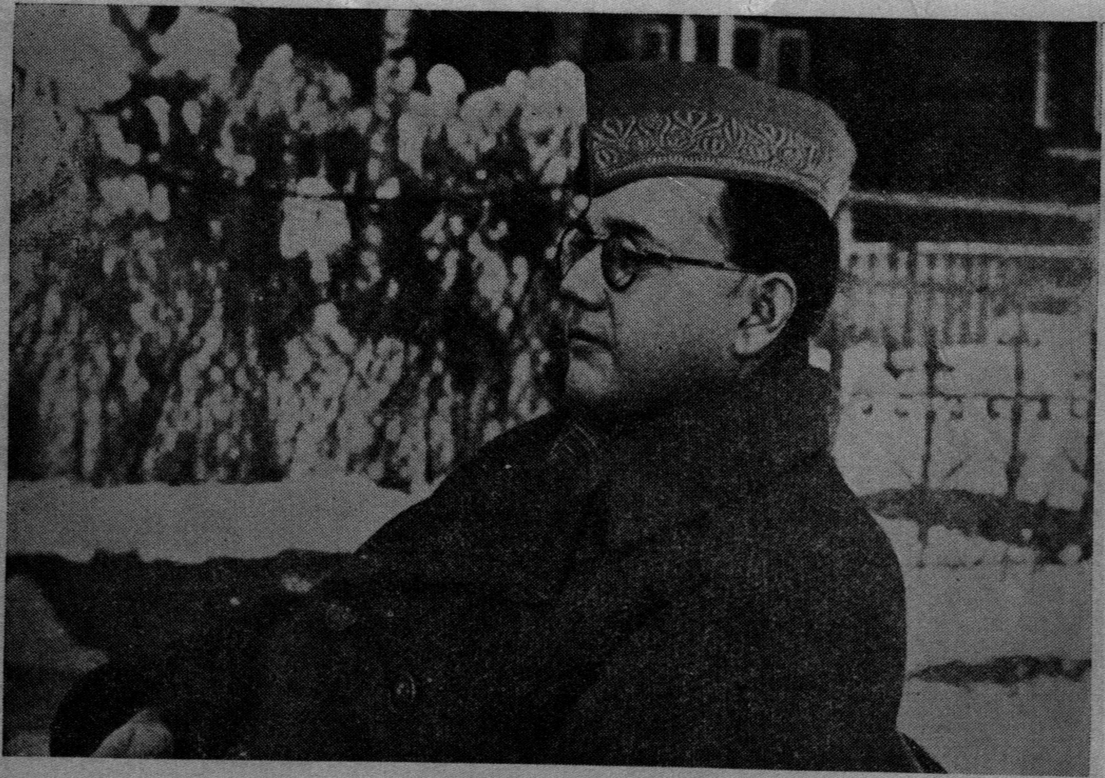

তুষারপাত উপভোগরত সুভাষচন্দ্র (বাদগাস্টাইন, অস্ট্রিয়া ঃ ১৯৩৭) এইখানে নেতাজী তাঁর আত্মজীবনী 'ভারতপথিক' (অ্যান ইণ্ডিয়ান পিলগ্রীম) রচনা করেন

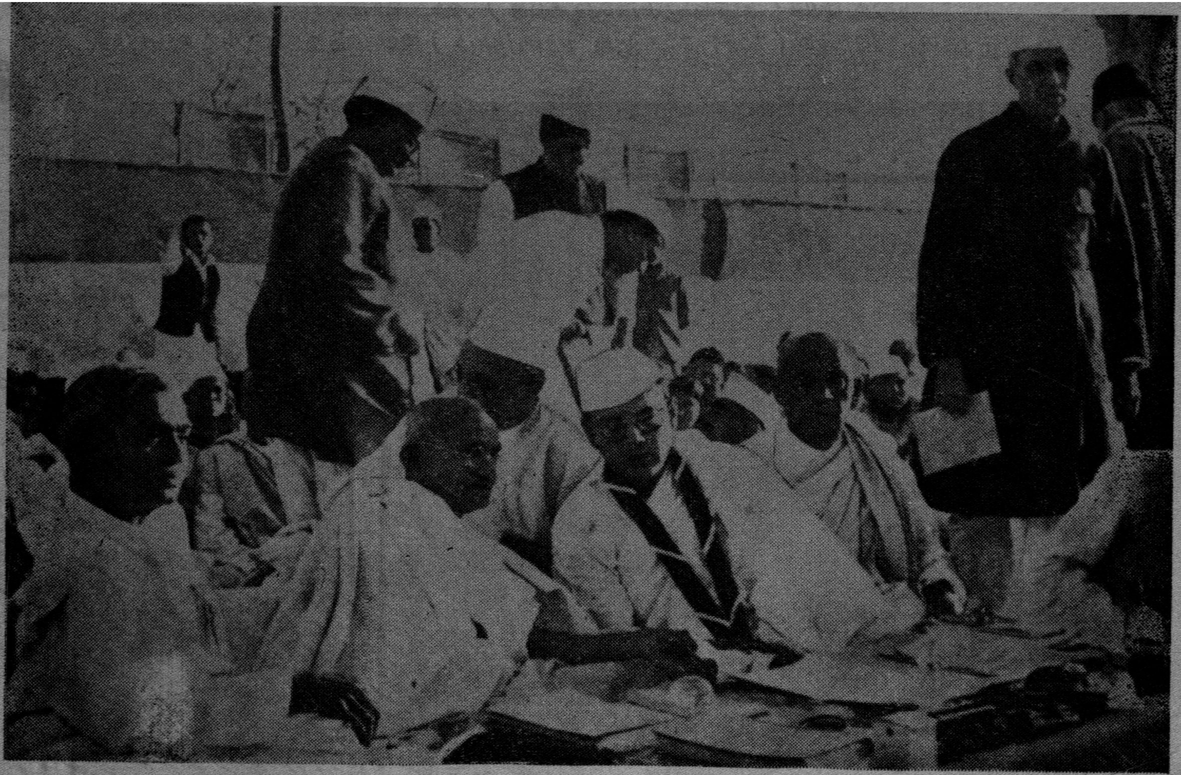

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র, পাশে গান্ধীজী, পশ্চাতে দাঁড়িয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (হরিপুরা ঃ ১৯৩৮)

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাসনে দেশনায়ক

ভিয়েনায় ডাক্তার ফার্থের স্যানিটোরিয়ামে রোগী সুভাষচন্দ্র। ১১ই মার্চ ১৯৩৩ সাল। দীর্ঘ সময়ের চিকিৎসার জন্য প্রেসক্রিপশন তৈরী করলেন ডাক্তার-সার্জেনরা মিলে, কারণ রোগ তখন গুরুতর আকার ধারণ করেছে। কিন্তু শুয়ে থাকার অবস্থা পেরিয়ে যেতেই আর নয়। ঘনিষ্ঠ মিলন ঘটলো প্রবীণ জাতীয়তাবাদী নেতা বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে। প্যাটেল একজন দেশপ্রেমিক ও ভারতীয় আইনসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ, প্রবীণ নেতা। রাষ্ট্রসংঘের সংগঠন বিষয়ে অনুধাবন এবং ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের কার্যালয় জেনেভাতে মিলিত হলেন উভয়েই। ১৯৩২ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনে গান্ধীজীর কারাবরণ, অনশন ও শর্তাধীনে মুক্তিলাভ-ঘটনা সুভাষচন্দ্র ও প্যাটেলের উভয়ের নিকট ব্রিটিশ রাজের কাছে ভারতের নগ্ন আত্মসমর্পণ রূপে প্রতিভাত হলো।

গান্ধীজীর 'রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স'—শুধু কালক্ষেপ ; আলোচনার দ্বারা, অধিবেশনের দ্বারা ইতিহাসের আসল কোন সমস্যার সমাধান কোনদিন হয়নি। একমাত্র উপায়—যুদ্ধ! ভারত তার মুক্তির জন্য রক্তস্নান করতে প্রস্তুত—পঁয়ত্রিশ কোটি যন্ত্রণাকাতর প্রাণ মুক্তির অপেক্ষায় দিন গুনছে। সুভাষচন্দ্রের দিকে দেখিয়ে প্যাটেল বলে ওঠেন—ও-ই তরুণ ভারতের বাণীমূর্তি!—Sunday Evening Post সংবাদপত্রের সাংবাদিক আলফ্রেড্ ট্রাইনার-এর সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রবীণ আর নবীন দুই মহান দেশসেবকের উক্তি সেদিন ইউরোপকে চমৎকৃত করলো।

১৯৩৩-এ বিঠলভাই প্যাটেল হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করলেন সুইজারল্যাণ্ডের এক স্বাস্থ্যনিবাসে—কিন্তু তার আগে তাঁর এক লক্ষ টাকা ও সম্পত্তির সঙ্গে তাঁর আদর্শবাদের উইল করে তার অছি নিযুক্ত করে গেলেন—গান্ধীজী-নেহেরু বা বল্লভভাই প্যাটেলকে নয়, ভারতের ভবিষ্যৎ কর্ণধার সুভাষচন্দ্রকেই। তাঁর

বিবেচনায় ভারতের জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব দানে সুভাষচন্দ্রই যোগ্যতম এবং সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।*

সুভাষ রাষ্ট্রনীতিবিদরূপে ছিলেন অতি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ—ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বীর সাভারকর ছাড়া অহিংস কিংবা বিপ্লবী জননায়কদের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি এমন সুস্পষ্ট এবং বাস্তববুদ্ধিসম্মতভাবে আর কেউ বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যথেষ্ট মেধাসম্পন্ন এবং রাজনীতি বিশারদ ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি গান্ধীজীর মানসিকতা ও তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের গণ্ডী অতিক্রম করে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাই সুভাষচন্দ্রের নীতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তথা ভারতের প্রয়োজনীয়তা গান্ধী-প্রীতির দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

ইউরোপে ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত চিকিৎসার জন্য নির্বাসিত সুভাষচন্দ্রের অন্তরীণ থাকা স্বাধীনতা সংগ্রামের সৃষ্টিধর্মী ইতিহাসে এক বিরাট পর্ব, এক আশ্চর্য অধ্যায় রচনা করলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন যার প্রতিফলন ছিল সুদূর প্রসারী। ইউরোপ প্রবাসী ভারতীয়, বিশেষত সেখানকার ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করলেন যে, তাঁরা যেন কখনো বিস্মৃত না হন, তাঁরা ভারত-ইতিহাস ও তার কৃষ্টির প্রতিভূ, তাঁরা ভারতের রাষ্ট্রদূত! তিনি ইণ্ডিয়ান স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন গড়লেন; বিশেষ করে সে-সময়ে জার্মানীতে হিটলারের নাজী-গভর্নমেন্টের ঔদ্ধত্যের শিকার যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর অবদান কোনদিনই বিস্মৃত হননি। এই সময়কালের মধ্যে তিনি ডঃ বেনস্, ডি. ভ্যালেরা, রোঁম্যা রোঁলা, হিটলার, রিবেনট্রপ, মুসোলিনী প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও নিকট ভবিষ্যতে গ্রেট্ ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ও সংগ্রামের রূপরেখা তুলে ধরেছেন; এবং তাঁদের মনোভাব যাচাই করা, তাঁদের সমীহ ও সাহায্য আদায় করার বিভিন্ন

---

* স্বর্গতঃ বিঠলভাই প্যাটেলের উইল অনুসারে সুভাষচন্দ্রের যে এক লক্ষ টাকা (বর্তমানের হিসাবে তিন কোটিরও বেশি) পাওয়ার কথা ছিল আইনের ফ্যাঁকড়া তুলে উইলের অন্যতম অছি, উইলকর্তার ভ্রাতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আদালতের সাহায্যে তা নাকচ করে দেন। তার ফলে ইউরোপে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সংগঠন কাজে সুভাষচন্দ্র প্রচণ্ড আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হন (১৯৩৫ সাল)।

কূটনৈতিক বিষয়ে মত বিনিময় ছিল তাঁর অন্যতম কর্মপ্রচেষ্টা। বস্তুতপক্ষে তিনি সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া—অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও বলকান দেশসহ ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশ ভ্রমণ এবং সেখানকার শিল্প, কলকারখানা ও শ্রমিকদের অবস্থা, কৃষি-শিল্পে উন্নতির কারণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ, ভারতবর্ষ বিষয়ে সেই সমস্ত দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আগ্রহ জাগানো এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেন। নগর উন্নয়ন বিষয়ে রোম, সোফিয়া, ভিয়েনা প্রভৃতি শহরে মেয়রদের আমন্ত্রণে বহু আলোচনা ও ভবিষ্যৎ ভারতে তাঁর পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন তিনি।

উপরিউক্ত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংগঠন, ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনার কথা বাদ দিলে, সুভাষচন্দ্রের ভিয়েনা প্রবাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান—বিখ্যাত বই 'The Indian Struggle' রচনা। অবশ্য ইউরোপে অবস্থানকালে সর্বত্র ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের শ্যেনদৃষ্টি তাঁর ওপর সর্বদা সজাগ ছিল। সেজন্য বিভিন্ন গভর্নমেণ্ট ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ক্ষেত্রে বহু বাধার ব্যবধান গড়া হয়েছিল বিভিন্ন ছলচাতুরী ও আইনের সাহায্যে। জার্মানী-ইটালী প্রভৃতি দেশে তাঁকে কমিউনিস্টরূপে এবং সমাজতন্ত্রী, গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে তাঁকে ফ্যাসিস্ট বলে চিত্রিত করেছিল ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট, যাতে করে তাঁর সঙ্গে ঐ সব দেশ ও রাষ্ট্র-প্রধানদের সম্পর্ক নষ্ট হয়।

ভিয়েনায় সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শে নতুন নতুন অধ্যায় রচিত হতে থাকে, গভীর থেকে গভীরতর পটভূমিতে হয় তাঁর মহৎ উত্তরণ। অস্ট্রিয় লেখক রেনে ফুলুপ মূলারের বাড়ীতে সুভাষচন্দ্র স্যানিটোরিয়াম থেকে ছাড়া পেয়ে কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। শ্রীমতী মূলার লিখেছেন—'ওঁর মত কয়েকজন মহাপ্রাণ রাষ্ট্রনেতা যদি ইউরোপ ভ্রমণ করেন তাহলে ভারতবর্ষের জন্য অন্য কোন প্রচারের আর প্রয়োজন হবে না'। দিলীপকুমার রায় বলেন, 'আমার যতদূর মনে পড়ে সেই বছরই সুভাষ ও উদয়শঙ্করের জন্য তিনি বিরাট সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন।'[১]

চেক-লেখিকা শ্রীমতী কুর্টির মন্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য—'We sense him to be pre-eminently a man of spirit; a man of deep true

---

[১] আমার বন্ধু সুভাষ, পৃষ্ঠা ১১৪।

insight and experience, who at the sacrifice of his personal inclinations, has assumed the role of a politician. Our respect for him is deep and real.' (Subhas Chandra Bose—As I Know Him. p. 2)[২]

১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র—'The Indian Struggle', বা 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' ইউরোপে বসে এক বছরের মধ্যে লিখলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য, প্রয়োজনীয় বইপত্র ও প্রামাণ্য তথ্য সবেরই অভাব, নিজের স্মরণ-শক্তির ওপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল হতে হলো তাঁকে। লণ্ডনের 'লরেন্স এ্যাণ্ড উইশার্ট' কোম্পানী ছেপে প্রকাশ করলেন ১৯৩৫-এর ১৭ই জানুয়ারী The Indian Struggle. কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সুভাষচন্দ্রের এই বইটির ভারতবর্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলো। ভারতীয় এক মহান ইতিবৃত্ত, ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজে এক বিদগ্ধ-বিদ্বান্ ব্যক্তির রচিত ইতিহাস গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী লণ্ডন শহরে প্রকাশ ও বিক্রী হতে লাগলো কিন্তু ভারতে প্রবেশ করতে পারলো না। ভারতের সীমানায়—চৌদ্দ বছর পরে সে বই আসতে পেরেছিল—তাঁর দেশবাসী পড়তে পেরেছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে, তাঁর রচিত ইতিহাসকে ও মুক্তির পথকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এতই ভয়! তিনি এই বইতে সুপ্রাচীন ভারতের জ্ঞান, তপস্যা, তার বিভিন্ন যুগের শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনীতি এবং সমাজ-সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ব্রিটিশরাজের কূটনীতি ও ভেদনীতির সাহায্যে ভারত অধিকার—অর্থনৈতিক শোষণ ও অত্যাচার, উৎপীড়ন আর সে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামের ধারা বর্ণনা করলেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। এই বইয়ে গান্ধীজী প্রদর্শিত আপোষ মীমাংসার পথে স্বাধীনতা লাভের পন্থা বাতিল করে দিয়েছেন, নতুন পথের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন সেখানে। প্রাচ্যের মহান নেতা মুস্তাফা কামাল পাশা কি করে বিশ্বের এক অতি পেছনে পড়ে থাকা তুর্কী জাতিকে বিপ্লবী ধারায় আধুনিক শিক্ষা, সমর বিজ্ঞান, শিল্পের পথে অগ্রগণ্য জাতিতে পরিণত করেছেন—তার প্রশস্তি। সেখানে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, ভারতে কিছুদিনের জন্য একজন একনায়কের পরিচালনায় সামরিক শৃঙ্খলার কঠোর নিয়মে বদ্ধ একদলীয় কেন্দ্রীয় সরকারের কথা এবং যুদ্ধোত্তর বিশ্বে সমগ্র মানবজাতির ভাগ্যের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হওয়ার আস্থা।

২। স্মরণে-মননে সুভাষচন্দ্র, পৃষ্ঠা ৩৬৮

এই বইতে সুভাষচন্দ্র সার-সংক্ষেপ করলেন ঃ "The future of India ultimately lies with a party with a clear ideology, programme and plan of action—a party that will not only fight for and win freedom, but will put into effect the entire programme of post-War reconstruction—a party that will break the isolation that has been India's curse and bring her into the comity of nations—firm in the belief that the fate of India is indissolubly linked up with the fate of humanity."[৩]

যে বইখানির ভারতে প্রবেশ নিষেধ, সেই 'The Indian Struggle' সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মন্ত্রী স্যামুয়েল হোর বলেন যে, বইটিতে সাধারণভাবে 'সন্ত্রাসবাদ ও সক্রিয় প্রতিরোধ'-এর সমর্থন আছে—সেই জন্যই ঐ নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু ইতিহাসের ভূমিকা—সে এক নির্মম বিচারকের ভূমিকা; সে কোন রাজ-সম্রাটের ভ্রূকুটিকে ক্ষমা করে না, কালের মহাচক্রে সমস্তই নিষ্পেষিত করে সত্যের জয়ধ্বজা সম্মুখে রেখে চির ধাবমান।

ইংলণ্ডের Manchester Guardian-এর (ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান)-সপ্রশংস প্রতিবেদন :

"This is perhaps the most interesting book which has yet been written by an Indian politician on Indian politics. We have only to compare it with the kind of stuff written by the men of Lajpat Rai's generation to realise how rapidly Indian thought is developing towards political maturity. The importance of the book is, of course, immensely enhanced by the fact that the author is one of the youngest of the three most interesting figures in Indian politics ··· Mr. Gandhi has been dealt with more severely than any one else, but even Mr. Gandhi's followers will admit that there is substance in the criticisms and that the tone is not malicious ··· Mr. Bose tells us a good deal about other aspects of Young India. He is interested in Trade Union Movements, the peasants' revolt, and the growth of Socialism···'Altogether the book leaves us with a wish to see Mr. Bose take a lead in Indian politics ···'[৪]

৩। The Indian Struggle—Netaji : Collected Works : Volume-2, Page—354

৪। Netaji Collected Works—Vol-2 Foreword : vi.

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান-এর দীর্ঘ আলোচনার কোন কোন অংশের বাংলা অনুবাদ এই রকম : "এখন পর্যন্ত কোন ভারতীয় লেখক ভারতীয় রাজনীতির ওপর এত ভাল বই লেখেননি। ··· আমরা বুঝতে পারবো কত দ্রুত ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। গ্রন্থটির গুরুত্ব আরও এই কারণে বেড়ে গিয়েছে যে, লেখক ভারতের রাজনীতিতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় তিন ব্যক্তির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। ··· গত চৌদ্দ বছরের যে ইতিহাস তিনি লিখেছেন সেটা বামপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হলেও একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ-এর কাছ থেকে সব দল ও ব্যক্তি যতটা সুবিচার আশা করতে পারেন, তা পেয়েছেন। অন্যদের চেয়ে শ্রীগান্ধীকে কঠোরতর সমালোচনা করা হয়েছে কিন্তু শ্রীগান্ধীর অনুগামীরাও স্বীকার করবেন যে, সমালোচনায় যুক্তি আছে এবং কোন অংশই ঈর্ষা বা দ্বেষপ্রসূত নয় ··· আমরা দুঃখিত যে, তিনি ভিক্টোরিয়া ধাঁচের গণতান্ত্রিক প্রথায় আস্থা রাখেন না, সংখ্যালঘু বিভিন্ন মতাবলম্বীদের নির্মমভাবে চেপে রেখে সামরিক অনুশাসনের ভিত্তিতে সংগঠিত শক্তিশালী একদলের সরকারে বিশ্বাসী···"।

অন্য একটি পত্রিকা—Daily Herald-এর কূটনৈতিক সংবাদদাতা সুভাষচন্দ্রের উপরিউক্ত বই সম্বন্ধে লিখলেন :

"It is calm, sane, dispassionate. I think it is the ablest work I have read on current Indian politics. He has his own opinions, vigorously held but never unfairly expressed. This is the book of no fanatic, but of a singularly able mind, the book of an acute, thoughtful, constructive mind of a man who while still under forty, would be an asset and, ornament to the political life of any country."[৫]

ডেলি হেরাল্ডের মন্তব্যের বাংলা ভাবানুবাদ এইরকম : শান্ত, যুক্তিযুক্ত ও ধীরচিত্তে লেখা। সাম্প্রতিক ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে পঠিত বইগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। লেখকের নিজের খুব দৃঢ় মতবাদ আছে—কিন্তু তা প্রকাশে অন্যের প্রতি অবিচার করেন না। লেখক আদৌ গোঁড়া নন, খুব সুস্থ মানসিকতার অধিকারী এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চিন্তাবিদ ও গঠনমূলক চরিত্রের লোক যিনি বয়সে চল্লিশের কম হলেও যে কোন দেশের রাজনৈতিক জীবনের গর্ব ও অলঙ্কার হতে পারেন।

৫। *Ibid.*, Foreword : vi & vii.

The News Chronicle পত্রিকার প্রতিবেদনের মধ্যে ছিল : "... He is unusually clear-headed for a revolutionary and as he was himself a prominent actor in the 'movement' which he describes, his evidence has the importance which attaches to the depositions of a very articulate first-hand witness... That is not to say that it is unprejudiced ; ... His picture of Gandhi is very interesting as an Indian view. It is firmly and convincingly drawn. He does full justice to the marvellous qualities of the saint without condoning in the least the 'Himalayan blunders' of the politician ...."

অর্থাৎ 'নিউজ ক্রনিকল্' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ লিখলেন : "সুভাষচন্দ্রের 'দ্য ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইখানা একজন বিপ্লবীর রচনা—তাঁর চিন্তা অস্বাভাবিক-ভাবে স্বচ্ছ। যে 'আন্দোলন' এক কথায় তিনি বিবৃত করেছেন, নিজেই সেই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন, সুতরাং যে কোন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দীর মত তাঁর সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য বলছি না যে, তাঁর লেখায় পক্ষপাতিত্ব নেই। ... ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীর যে ছবি তিনি এঁকেছেন, সেটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর মতামত দৃঢ় ও যুক্তিপূর্ণ। তিনি সন্তের আশ্চর্য গুণাবলী অকপটে স্বীকার করেছেন, কিন্তু রাজনীতিবিদ্-এর ভূমিকায় তাঁর 'হিমালয়সদৃশ ভুলগুলি' লেখক মেনে নিতে রাজী নন।"

সুভাষচন্দ্র তাঁর এই কালজয়ী বইটি লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাট্রাণ্ড্ রাসেল্ ও এইচ. জি. ওয়েলস্ প্রভৃতি বিশ্বের বিখ্যাত চিন্তাবিদ্দের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন। মহামনীষী রোঁমা রোঁলা ১৯৩৫-এর ২২শে ফেব্রুয়ারী এই বই সম্বন্ধে তাঁকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন—তা সকল পাঠককে চমৎকৃত করবে। "... বইটি আমার কাছে এতই আকর্ষণীয় লাগলো যে, আমি আরও একটি কপি অর্ডার দিয়ে দিলাম যাতে আমার স্ত্রী ও বোন একটি করে কপি পান। ভারত বিপ্লবের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এটি একটি অবশ্য পাঠ্য-গ্রন্থ। আপনি বইটিতে ঐতিহাসিকের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী স্বচ্ছ চিন্তা ও বিচারবুদ্ধি দেখিয়েছেন। আপনার মত একজন সক্রিয় ব্যক্তি জনমতের ঊর্ধ্বে থেকে সবকিছু বিচার করেছেন এটা খুব কমই দেখা যায়। আপনার সব মতের সঙ্গে একমত না হলেও আমি স্বীকার করছি আপনার যুক্তি আছে এবং অনেক কিছু পুনর্মূল্যায়ন করলে আমরা লাভবান হব। আপনি গান্ধীর ভূমিকায় ও চরিত্রে দুইটি দিক সম্বন্ধে যা লিখেছেন সেটা আমাকে গভীরভাবে

স্পর্শ করেছে। আসলে ঐ দ্বৈত চরিত্রের জন্যই তাঁর ব্যক্তিত্ব এত অনন্য-সাধারণ।

"আমি আপনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রশংসা করি। কি দুঃখের কথা, জওহরলাল নেহরু ও আপনার মত ভারতের সমাজবাদী অন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতারা হয় কারারুদ্ধ, নয় নির্বাসিত ...।"[৬]

এই প্রসঙ্গে বিনায়ক দামোদর সাভারকর, যিনি 'বীর সাভারকর' নামে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী রূপে ইতিহাসে বিখ্যাত, তাঁর অক্ষয় কীর্তি—'The Indian War of Independence 1857'—বইখানির প্রকাশ বিষয়ে বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। মারাঠী ভাষায় ১৯০৮ সালে তাঁর মূল রচনা এই বইয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের সামনে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ (সিপাহী বিদ্রোহ) অর্থাৎ ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চিত্রটি তুলে ধরে তাঁদের অনুপ্রাণিত করা এবং পুনরায় জাতীয় সশস্ত্র বিপ্লবের আত্মিক প্রস্তুতি।[৭] বইখানি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মহামূল্যবান অবদানরূপে স্বীকৃত, আজ সে পুস্তক গবেষণার পর্যায়ে উপনীত এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্য ইতিহাসের আলোকে উদ্ভাসিত।

এই বইখানি ছেপে প্রকাশ করা তাঁর ইউরোপে ব্যারিস্টারী পাঠকালে যদিও দুরূহ ছিল—কিন্তু শুধু ইংল্যাণ্ড নয়, ইউরোপের বহুদেশের গভর্নমেন্টের দৃষ্টি এড়িয়ে তার প্রকাশ, ইউরোপে ও ভারতে নিষিদ্ধকরণ এক মহাচাঞ্চল্যকর ঘটনা। তারপর ১৯৩৫ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভারতের মুক্তি সংগ্রাম বা 'The Indian Struggle' গ্রন্থই মহাআলোড়ন সৃষ্টি করে।

সুভাষচন্দ্র ভারতের গৌরব মহিমার বীরত্ব-বীর্যের বাণীমূর্তি। তাঁর আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরূপ ভারতের মুক্তিসজ্ঞে মন্ত্রের মহাশক্তির আবেশে আপ্লুত, তার প্রকাশ ঘটেছে তাঁরই আপন রচনার মধ্যে, কোন কুয়াশাচ্ছন্ন ভাবাবেশের মধ্যে নয়; সে রচনা তাঁর অন্তরের উপলব্ধি যা প্রকাশমান হয়েছে শুধু এদেশে নয়, বিশ্বের দরবারেও তা স্বচ্ছ রূপ নিয়েছে—শস্ত্র ও শাস্ত্র দু-এতেই সমান দক্ষতা যে তাঁর! দুয়েরই প্রয়োগে সমানভাবেই তিনি সার্থকতা লাভ করেছেন একান্ত সহজ ভঙ্গিতে। এই অধ্যায়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ফরাসী পণ্ডিত রোঁম্যা রোঁলার সঙ্গে জেনেভায় তাঁর গ্রাম্যবাড়ী

৬। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু : সমগ্র-রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড, (নিবেদন : শিশিরকুমার বসু)।

৭। বীর সাভারকর—মণি বাগচি, শিক্ষাভারতী, পৃষ্ঠা ৭০-৭১।

'ওলগা ভিলা'তে ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার এখানে বিবৃত করছি। এই সাক্ষাৎকার এবং ভাব-বিনিময় ঘটেছিল সুভাষচন্দ্রের লিখিত বই পাওয়া ও উপরিউক্ত অভিনন্দনের একমাস ন'দিন পরে।

'রোঁম্যা রোঁলা কি ভাবেন'—সুভাষচন্দ্র বসুঃ[৮] ১৯৩৫, ৩রা এপ্রিল, বুধবার। ···সেদিনের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে জেনেভা তার শ্রেষ্ঠ রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত। আমি বেরিয়েছি তীর্থযাত্রায়। এর আগে ইউরোপে যখন এসেছি বছর দুয়েক আগে, তখন থেকেই সেই মহান মানব ও মনীষী, ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম সুহৃদ মঁসিয়ে রোঁম্যা রোঁলাকে দেখবার জন্য কত গভীরভাবে না আগ্রহান্বিত হয়ে আছি। ···উৎসাহ আমার প্রচুর, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা উদ্বেগ ও সন্দেহের শিহরণও কখনও কখনও অনুভব করতে লাগলুম। মানুষটিকি আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন, নাকি বিফলমনোরথ হয়েই ফিরে আসতে হবে! এই মহান স্বাপ্নিক এবং আদর্শবাদী কি জীবনের কঠোর বাস্তবতার রূপকে বুঝতে চাইবেন, যে বাস্তব প্রতিবন্ধকতাগুলি সর্বযুগে সর্বদেশের সংগ্রামীর পথকে বন্ধুর করে তোলে? ···

আমি ঘণ্টা বাজাতেই একজন মাথায় ছোটখাটো মহিলা দরজা খুলে দিলেন। গভীর সহানুভূতিতে মাখানো প্রাণবন্ত তাঁর মুখচ্ছবি। ইনি মাদাম রোঁম্যা রোঁলা। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে না জানাতেই সামনের আর একটি দরজা খুলে গেল। সেখানে এসে দাঁড়ালেন এক দীর্ঘ পুরুষ যাঁর ফিকে রংয়ের মুখ আর একটি অদ্ভুত অন্তর্ভেদী চক্ষু। হ্যাঁ, এই তো সেই মুখ, আগে আমি কতবার যা ছবিতে দেখেছি; যে মুখ মানবজাতির জন্য বেদনায় ভারাক্রান্ত। তাঁর পাণ্ডুর মুখের ওপর একটি বিশুদ্ধ বেদনার ছায়া পড়েছে। কিন্তু তাতে পরাজয়ের অভিব্যক্তি নেই। কারণ কথা শুরু করা মাত্র শ্বেতাভ কপোলে লালিমা এসে উপচে পড়লো, এক অস্বাভাবিক দ্যুতিতে তাঁর চোখ দুটি দীপ্ত হয়ে উঠলো এবং যে শব্দরাশি নির্গত হলো তা প্রাণবন্ত ও প্রত্যাশায় অগ্নিগর্ভ।···

মঁসিয়ে রোঁলা ইংরাজী বলতে পারেন না, বা বলেন না এবং আমিও ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারি না। সুতরাং মাদমোয়াজেল রোঁলা এবং মাদাম রোঁলাকে আমরা দোভাষী হিসেবে পেলুম। ···ভারতের অবস্থা আমি যা হৃদয়ঙ্গম করেছিলুম তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলুম। মৌল দুটি নীতির উপর বিগত চৌদ্দ বছরের আন্দোলন গড়ে উঠেছে। প্রথমত, সত্যাগ্রহ বা

৮। মডার্ন রিভিউ—সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫, পৃষ্ঠা ৩১৯।

অহিংস অসহযোগিতা ; দ্বিতীয়ত, ধনিক-শ্রমিক-জমিদার ও কৃষকের, ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের এক যুক্ত আন্দোলন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন শান্তিপূর্ণ সমাধানে ফলবতী হবে—এ বিষয়ে ভারতের গভীর আশা। ভারতের অভ্যন্তরে এই আন্দোলন ক্রমে দেশের অসামরিক শাসন-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেবে এবং বহির্ভারতে সত্যাগ্রহের এই আদর্শ ব্রিটিশ জাতির বিবেককে জাগ্রত করবে। এইভাবে সংঘাত এক সমাধানের পথে আসবে আর ভারত প্রতিঘাত না হেনে রক্তপাত না ঘটিয়েও স্বাধীনতা লাভ করবে। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ। ···বহির্ভারতে মুষ্টিমেয় উচ্চমনা ইংরেজ অবশ্যই গান্ধীজীর নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন কিন্তু সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ জাতি একেবারে নির্বিকার, নীতির আবেদন স্বার্থপরতার মধ্যে ডুবে গিয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের ব্যর্থতা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে তীব্র আত্মজিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। একদল কংগ্রেসী প্রত্যাবর্তন করেছে প্রাচীন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের কার্যধারায়···অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত চরমপন্থী যাঁরা হতাশ হয়ে পড়েছেন তাঁরা নতুন আদর্শ ও কর্মপন্থার দিকে ঝুঁকেছেন এবং তাদের অধিকাংশ মিলিত হয়ে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমার দীর্ঘ মুখবন্ধের পর আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'মঁসিয়ে রোঁলা, যদি যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায় এবং গান্ধী সত্যাগ্রহের সঙ্গে মিল না রেখে এক নতুন আন্দোলন শুরু হয় তবে আপনার সে সম্পর্কে কি রকম মনোভাব হবে' ? মঁসিয়ে রোঁলা জানালেন, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে গান্ধীর সত্যাগ্রহ যদি ব্যর্থ হয় তবে খুবই দুঃখিত ও হতাশ হব। প্রথম মহাসমরের শেষে সমগ্র পৃথিবী যখন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও বিদ্বেষের রূপ দেখে পীড়িত হয়ে আছে, সেই সময় গান্ধী যখন রাজনৈতিক সংগ্রামের এই অভিনব হাতিয়ার নিয়ে এলেন তখন দিগন্তে এক নতুন আলোর প্রভাতের সূচনা হয়েছিল।···

আমি বললুম, কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি এই বস্তুবাদী বিশ্বের পক্ষে গান্ধীজীর পথ নাগালের বাহিরে এবং রাজনৈতিক নেতা হিসাবে বিপক্ষদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার নিতান্ত সরল ··· পরিশেষে সত্যাগ্রহ আন্দোলন যদি ব্যর্থ হয়ে যায় চূড়ান্তভাবে, তাহলে জাতীয় উদ্যোগ ভিন্ন পথে অগ্রসরিত হউক, মঁসিয়ে রোঁলা কি এই চাইবেন, না কি তিনি ভারতীয় আন্দোলন সম্পর্কে নিরাসক্ত হয়ে পড়বেন ? 'সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে—তা যেভাবেই হোক'—সজোরে উত্তর এলো। ···সত্যাগ্রহ অসফল হলে তিনি দুঃখিত

হবেন, কিন্তু তা যদি সত্যই ব্যর্থ হয় তবে জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে মোকাবিলা করতেই হবে এবং আন্দোলনের ধারা অন্য পথে চলেছে এই তিনি দেখতে চাইবেন।

…রাজনৈতিক দল আমার কাছে বড় নয়। তার থেকে অনেক বড় জিনিসকে আমি গণ্য করি—তা হল পৃথিবীর শ্রমিকদের স্বার্থ। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে যদি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির ফলে গান্ধী (বা অন্য কোন দল) শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে নামেন, অথবা তাদের প্রয়োজনীয় সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় বিবর্তনের বিরুদ্ধাচরণ করেন, যদি গান্ধী (কিংবা অন্য কোন দল) শ্রমিকদের স্বার্থ থেকে দূরে সরে যান বা ঘুরে দাঁড়ান—তাহলে চিরকালই আমি নির্যাতিত শ্রমিকদের পক্ষ নেব, তারা আমাকে চিরদিন তাদের আন্দোলনের সহযোগিতায় পাবে, কারণ তাদের দিকেই আছে মানব সমাজের প্রয়োজনীয় বিকাশের আদর্শরূপ।

আমি আনন্দে চমকিত হলুম। এই মহান মনীষী এমন মুক্তভাবে শ্রমিক স্বার্থের সমর্থন করবেন—এ যে আমার অতিবড় আশাবাদী মনও প্রত্যাশা করেনি।

…তিনি বললেন, আমার অন্তর্দ্বন্দ্ব অতি ব্যাপক এবং বহুবিধ বিষয় নিয়ে, অহিংসার প্রশ্ন তার একটি অংশমাত্র। অহিংসার বিরুদ্ধে আমি কিছু স্থির করেছি, আমাদের সমগ্র সমাজকর্মে অহিংসা মতবাদ মধ্যমণি হতে পারে না। খুব বেশী হলে একটা পথ হতে পারে—অনেকগুলি মত-পথের একটা যা এখনও কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষাধীন। …বিদায়ের আগে আমি গৃহকর্তাকে তার সহৃদয়তার জন্য আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানালুম। যে সত্য তিনি প্রকাশ করলেন তার জন্য জানালুম আমার পরম পরিতৃপ্তি।

…'ভিলা ওলগা' থেকে বেরিয়ে এলুম। …মন থেকে বিরাট ভার নেমে গেছে। ভারতের ভাগ্যে যাই হোক না কেন এই মহান মনীষী ও শিল্পী ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াবেন—এই নিঃসংশয় প্রত্যয় আমার হল। এই প্রত্যয় নিয়ে পূর্ণচিত্তে ফিরে গেলুম জেনেভায়।"

'রোঁমা রোঁলার ডায়েরী' (Journal Inde 1915-1943)[৯]

---

[৯] ফরাসী ভাষায় লিখিত রোঁমা রোঁলার ডায়েরী—'Journal Inde 1915-1943' থেকে এই অংশের অনুবাদ করেছেন জাতীয় অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসু—এই অনুবাদ 'কম্পাস' পত্রিকায় ৫ই মার্চ, ১৯৬৬তে প্রকাশিত হয়।

“সুভাষচন্দ্র বোস এসেছিলেন। কলকাতার প্রাক্তন মেয়র, বামপন্থী সোসিয়ালিস্টের একজন নেতা। ছয় কি আট বৎসর বন্দী ছিলেন। নিজের স্বাস্থ্যের দরুন ইউরোপে এসে এখন রয়ে গেছেন, কার্যত ভারতে এর ফেরাও (প্রায়) অসম্ভব। বয়সে এখন যুবা, তবে সবসময় নানা ভাবনা নিয়ে আছেন—গম্ভীর কপালের চিন্তারেখাগুলি একটুক্ষণের জন্যও চপলতায় মুছে যায় না।

সম্প্রতি ইংরাজীতে ভারতের গত দশ বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাস লিখেছেন—তাতে এঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত রাজনীতি-বিদের মত, নিজের ব্যক্তিগত মতনিরপেক্ষ হয়েই ঘটনাগুলি ও নায়কদের বর্ণনা করেছেন, এটি লক্ষ্য করবার বিষয়। যদিও কোন কোন নেতাদের সঙ্গে তাঁর নিজের তফাৎ যে কোথায়—তাও (বলেছেন) লুকিয়ে যাননি।

এসে আমাকে বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, তাঁর মতে গান্ধীর কূটনৈতিক নির্দেশ আজ পথহারা নির্জীব কোণে পৌঁছে দিয়েছে (ভারতকে), সেই পথ ছাড়তে হবে ভারতকে, যদি আরও অগ্রসর হয়ে সে স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়। তাঁর মতে অহিংসভাবে দেশের শাসনকার্যে বাধা সৃষ্টির চাল যে নিষ্ফল হয়েছে তা আজ পরিষ্কার। তাতে জয়ের সম্ভাবনা ছিল—যদি একেবারে সর্বত্র রাজকর্মচারীদের বিপর্যস্ত ও শাসনকার্য লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া যেত।··· অন্যদিকে ইংরেজ সরকার বহুদিন অস্থিরভাবে Civil Resistance-এর বিরুদ্ধে নানা ব্যবস্থার চেষ্টা করে শেষকালে এমন একটি পাল্টা কর্মপন্থা আবিষ্কার করেছে যাতে গান্ধীজীর চাল মাৎ হয়ে গিয়েছে। পূর্বেকার কয়েক বৎসরের মত সরকার আর হাজার হাজার ভারতীয়দের জেলে আটকাচ্ছে না (তখন সব জেলখানা ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছিল, বিচার ও শাস্তিদানেরও শেষ ছিল না।) এইবার সে শুধু সেই নেতাদেরই বহুবৎসর কারাগারে আটকাবে —যারা এই আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ। (যেমন জহরলাল বা বোস, ইত্যাদি)। কোথাও (এবার) আন্দোলন বিন্দুমাত্র শুরু হলেই তাকে কঠোরভাবে দমন করেছে। গান্ধীর অহিংস নীতিতে তাদের সুবিধা তারা আরামেই আছে। তারা বুঝেছে, তাদের সম্পর্কে ভয় করার কিছুই নেই। এমনকি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সোসিয়ালিস্ট নেতা Wedgwood-Ben, যিনি ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক সহানুভূতিশীল, তিনিও সম্প্রতি (প্রো) রাধাকৃষ্ণনকে বলেছেন, ‘শেষ অবধি ভেবে দেখ, কেনই বা আমরা ভারত ছেড়ে চলে আসব—যদি ভারতীয়েরা নিজেরাই আমাদের বহিষ্কৃত করতে অপারগ হয়’ ?

সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপে বোস নিজে সম্মতি না দিলেও বললেন, এরাই কেবলমাত্র ভারতে ইংরাজদের সমস্যায় ফেলেছে। বস্তুত, সংখ্যায় অল্প ও মাত্র বাংলাদেশেই সীমিত থাকলেও এদের কার্য (এবং) তার প্রতিক্রিয়া, (শাসনতন্ত্রকে) গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। কারাগারে থাকতে বোস এই স্বীকারোক্তি ইংরাজ কর্মচারীদের মুখেই শুনেছেন। ··· তবু বোস বললেন, এই সন্ত্রাস সৃষ্টি একটা সুস্থ রাজনৈতিক আচরণ হতে পারে না। তিনি সুসম্বদ্ধ খোলা প্রতিরোধের পক্ষে, অবশ্য হিংসাকে বর্জন করতে চান না, এই পথে বিদেশী শক্তির সহিত যুদ্ধ করতে তিনি কৃত সংকল্প হয়েছেন।

··· দেশের সর্বস্তরে, সর্বদলীয় লোকের কাছে গান্ধীজীর জনপ্রিয়তা প্রচণ্ড। তবু সত্যই ফলপ্রসূ হবে এমনভাবে সেটিকে নিয়োগ করছেন না। অবশ্য গত পনের বৎসরে ভারতে জাতীয়তাবোধ গান্ধী যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন, ভিন্ন-বর্ণ, ভিন্ন-জাতীয়দের যেভাবে একত্র করেছেন, তার ফল অপরিমেয়। ··· শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ অথচ কর্তাদের বিরুদ্ধে তাদের সংঘবদ্ধ হতে বাধা দিচ্ছেন। ··· কৃষাণকে ভূমির মালিক করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সোসিয়ালিস্ট আন্দোলন পল্লীদেশে গড়ে তুলতে হবে। ··· তবে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সমরে ভারতীয়দের নিস্পেষিত হয়ে যাবার মত বর্তমানের নিকৃষ্টতা বহুদিন ধরে থাকবে, বোস সে কথা গোপন করলেন না। সেই জন্য সরলভাবেই প্রকাশ করলেন, (তার মত) ইউরোপীয় সমরে ইংলণ্ড যখন বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকবে, সেই সময়েই ভারতের বিজয়ের আশা আরও সুদৃঢ়! আমি বললাম—আমরা চাই না যে এই যুদ্ধ বাধে। কারণ আমাদের এই মনোভাবের তরফে বহু সুযুক্তি রয়েছে। (এতে তিনি একটু হতাশ হলেন, বেচারী—ভাল মানুষের পোলা।)

··· ··· ···

আমার কাছে আসার কারণ, আমার মত কি জানবার আগ্রহ! (ভারতে যে আমার মতের মূল্য আছে তা আমি নিঃসন্দেহে জানি!)—এক বিষয়ে। যদি তাঁরা স্বাধীনতার সংগ্রামে নামেন যাতে হিংসানীতি বর্জিত হবে না, তাহলে আমি কি তাঁদের পক্ষে থাকবো? ··· বিপ্লবের প্রতি, (তা হিংসাত্মক বা অহিংসই হোক) আমার মনোভাব যা—আমি নতুন করে 'পনের বৎসর যুদ্ধ' নামক পুস্তকে প্রকাশ করেছি, সেইটি তর্জমা করে বোসকে জানাবার চেষ্টা করলাম। (বোস শুধু ইংরাজী বলেন ও বোঝেন) যদিও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অটুট থাকবে (এ বিষয়ে বোস ও

আমি একমত) তবু তাঁর মতবাদে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত বলে নিজেকে মনে করি না। ... সর্বোপরি সংঘাত যখন অনিবার্য হয়ে উঠবে ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে—তখনও সবদিক ভালভাবে বিবেচনা করেও যদি তিনি শ্রমিকদের পক্ষে না দাঁড়ান, তবে তার প্রতিকূলে আমি শ্রমিকের পক্ষেই বলবো—একথা (আমি) কখনও গোপন রাখিনি।

...কিন্তু বোসের মত লোকেদের বোঝা দরকার, গান্ধীর মত একজনকে তাঁদের দলে পেলে জয়যাত্রা তাঁদের কতদূর এগিয়ে যাবে। আসলে তাঁরা কেউই গান্ধীকে স্বদলে নিয়ে আসতে বেশী ব্যগ্র নন। কারণ, তাহলে তাঁরাই গৌণ পংক্তিতে পড়ে থাকবেন। বোধহয় জওহরলাল নেহরুরও সেইরকম অবস্থা। ভাব-ভাবনায় গান্ধীর থেকে তিনি অনেক তফাতে, প্রায় কম্যুনিজমের চৌকাঠ পার হতে চলেছেন—যদি ইতিমধ্যেই সে ভাবরাজ্যে না প্রবেশ করে থাকেন। কিন্তু গান্ধীর প্রতি পুত্রজনোচিত শ্রদ্ধার বশে কার্যে দুর্বল ও অনিশ্চিত মতি বলে মনে হয়।

এবিষয়ে বোসকেও মনে হলো কম্যুনিজমের ধারে পৌঁছেছেন ; কিন্তু এই ভাবের কথা তিনি শুনতে চান না, বোধহয় এই বিতৃষ্ণার কারণ নিজের ব্যক্তিগত, যারা ভারতে এই দলের প্রতিনিধি, তাদেরই সম্পর্কে এটি দাঁড়িয়েছে। কারণ খোলাখুলি তিনি বলেন, U.S.S.R. ভারতকে যদি স্বাধীন হতে সাহায্য করে তার মধ্যে সত্যই কোন দোষ তিনি দেখছেন না। এবং এখন U.S.S.R.কে এই জন্যেই নিন্দা করছেন যে, স্বদেশাত্মিক রাজনীতি করতে গিয়ে আজ তার বিশ্ব বিপ্লবে পূর্বের মত কৌতূহল বা ঈর্ষা নেই।"

'নির্বাসনে দেশনায়ক' অধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ে, লেখক, ভিয়েনায় সুভাষচন্দ্রের চিকিৎসার জন্য অবস্থানের সময় ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান ও বিভিন্ন মনীষীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেছেন। তারমধ্যে রোঁম্যা রোঁলার বিষয় সবিস্তারে উল্লেখ করা হলো, তা থেকে সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান, ও ভারত এবং ইউরোপীয় রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট ধারণা কি তা জানা যায় এবং স্বাধীনতার পথে ভারতকে কোন্ পথে পরিচালনার মানসিক প্রস্তুতি চলেছে তা বুঝতে কোনভাবেই অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর তৃতীয় বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ সরকারের অনুক্ষণ সজাগ দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়ে সুভাষচন্দ্র রাশিয়া ও ইটালী হয়ে বার্লিনে এ্যাডলফ্ হিটলারের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু তারও আগে, তাঁর ভিয়েনায় অবস্থান সময়ে হিটলারের

সঙ্গেও সাক্ষাৎকার[১০] ঘটেছিল ১৯৩৬-এ এবং সম্ভবত সেই-ই প্রথম সাক্ষাৎকার, তার প্রমাণও পাওয়া যায়। এখানে সেই বিষয়ের একটি বিবরণ দিচ্ছি,—এই বিবেচনায় যে, যার ফলে আমরা বুঝতে পারি ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ রাজশক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে এই অকুতোভয় মহাপরাক্রমশালী বীর—তাঁর স্ট্রাটেজী বা যুদ্ধ কৌশল কত পূর্বেই এবং কত নিখুঁতভাবে মহাপ্রাজ্ঞ যুদ্ধবিশারদের মত প্রস্তুত করেছিলেন—সেখানে তাঁর নিজের বিশ্রাম সুখের ক্ষণিকের ভাবনাও ছিল না,—'Warrior Saint' বা যোদ্ধ-সন্ন্যাসীর মহান স্বরূপেই তাঁর উদ্ভাসিত মূর্ত্তি—পাশ্চাত্ত্য এবং পাশ্চাত্ত্যে বসবাসকারী ভারতীয়দের মন্ত্রমুগ্ধ করতে পেরেছিল।

অটো জারেক এক মধ্যবিত্ত জার্মান ইহুদি, তিনি প্রখ্যাত নাট্যকার। মিউনিখে প্রথম নাজী অভ্যুত্থান হয় এবং অটো জারেক মিউনিখ ত্যাগ করে ভিয়েনায় পালিয়ে যান, সেখানে ঐতিহাসিক রেনে ফুলপ্ মুলার এক বিখ্যাত ব্যক্তিকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন,—তাঁর বক্তব্য: "…I was rather surprised to find this foreigner an Indian …a remarkable personality…"[১১]

অটো জারেকের বক্তব্যের বাংলা ভাবানুবাদ এইরকম: 'আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম এই বিদেশীকে দেখে। এক ছোট্টখাটো কিন্তু চোখা চেহারার ভারতীয়—তাঁকে অসুস্থ দেখাচ্ছিল, কিন্তু তাঁর চোখগুলো জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলছে, নাম তার চন্দ্র বোস এবং যুবা বয়সে সে কলকাতার মেয়র ছিল। খুব গুরুতর একটি অপারেশনের জন্য সে ভিয়েনায় এসেছিল, কয়েক সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে সঙ্কটাপন্ন রোগীদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল সে, নিঃসঙ্গ মনে করে তাকে আমি প্রায়ই দেখতে যেতাম। ইউরোপ সম্বন্ধে তার জ্ঞান

---

[১০] "Whenever he could, Bose made political contacts and constitutional studies. He met Dr. Benes several times, in 1936 he saw Mr. de Valera, he visited and was much encouraged by Mr. Romain Rolland, he was received by Adolf Hitler, Ribbentrop and other members of the Nazi hierarchy."—Springing Tiger : Page 43.

[১১] Otto Zarek (with the assistance of J. Eastwood)—German Odessey : Janathan Cape, London 1941, pp. 202-205.

[লীলা রায় সম্পাদিত 'জয়শ্রী' (পৌষ ; ১৩৭৩) পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত]

যে কোন ইউরোপীয়দের চেয়ে বেশী। সে ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও জীবন্ত বর্ণনা দিত এবং আমার জীবনে এই প্রথম দূরপ্রাচ্য সম্বন্ধে একজন সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রাচ্যবিদের কাছ থেকে সত্যকার কিছু শিখলাম। কিন্তু একটা বিষয়ে ফুলপ্‌ বা আমি কেউই তার সঙ্গে সহানুভূতিশীল হতে পারিনি, সে তার ইংরেজ বিদ্বেষ। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইংরেজরা আধুনিক সভ্যতার মূল তত্ত্বটা অন্তত যদি ভারতকে না শেখাতো তাহলে তার দেশের কি হাল হতো? সে উত্তর দিয়েছিল, তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা শেখবার ভারতের দরকার নেই, তার যে মৌলিক সভ্যতা যা অত্যন্ত প্রাচীন ও গভীর—তাতেই সে সন্তুষ্ট এবং তার দেশবাসীর চিত্তবৃত্তির পক্ষে এই উত্তম।

একদিন, সুস্থ হওয়ার অব্যবহিত পরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক দু'সপ্তাহ পরে সে হাসতে হাসতে ধোঁয়ায় ভরা আমাদের কাফে 'এ্যাটাচে'-তে এসেই আনন্দের সঙ্গে বললে 'কোথায় ছিলাম? বার্লিনে! হিটলারের সঙ্গে দেখা করে এলাম।'

বাস্তবিকই এ এক বিস্ময়কর খবর আমার পক্ষে। আমার ধারণা, ভারতীয় তরুণ, জার্মানী ও তার নাজী গভর্নমেণ্ট সম্পর্কে সবচেয়ে খারাপ ধারণার কথা বলবে, কিন্তু আমার ভুল ভেঙ্গে গেল; দেখলুম 'রাইখ' তাকে কি চমৎকারভাবেই না খুশী করেছে। জার্মানীর পুনরভ্যুত্থানের জন্য হিটলারের প্রস্তুতি! আমি জিজ্ঞেস না করে পারলুম না—কি ধরনের পুনরভ্যুত্থান?

'নিশ্চয়ই যুদ্ধ, ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ। এছাড়া তার অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নয় এবং সে এমন একজন ব্যক্তি, যা কিছু সে চায় তাই তার মুঠোর মধ্যে পাবে।' যাই হোক সে সবকিছুর শেষে বললে, হিটলার আমাদের স্বাভাবিক নিয়মে মিত্র এবং তিনি তা' জানেন; আমি তাঁর কাছে জার্মানী ও আগামী দিনের স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তির এক পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা রেখেছি। তিনি সে প্রোজেক্ট পরীক্ষা করে দেখছেন। আমরা যখন রিভোল্ট করবো তাঁর সহযোগিতা পাবো। তারপর শীঘ্রই সে ভারতে ফিরে যায়—সত্যই এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব।'

ভারতবাসীর নিকট প্রায় অজ্ঞাত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষণার আগেই, ভারতে জাতীয় মহাসভার রাষ্ট্রপতি হওয়ার পূর্বেই আসন্ন অশনির সংকেত সুভাষচন্দ্রের দূরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার নিকট দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, যা' তখন রোঁম্যা রোঁলা, গান্ধী, নেহরু এমনকি চেম্বারলিন, চার্চিলেরও চিন্তার অগম্য ছিল। এবং সেই কারণেই কত বিচক্ষণতার সঙ্গে

জার্মানী, তথা অক্ষশক্তির সর্বময় যুদ্ধবেত্তা হিটলারের সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র (ভারত ত্যাগের প্রায় পাঁচ বছর আগেই) গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্ব পরিকল্পনা তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এশিয়া-ইউরোপের সম্পর্ক এবং সেই অবস্থায় ভারত তথা এশিয়ার মুক্তির পথে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন—যা সম্ভবত এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়ার কোন রাষ্ট্রবিদই বুঝতে পারেননি। এমনকি তিনি জার্মান কর্তৃপক্ষকেও তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের ফলেই আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত যুক্তিজালের প্রভাবে বিস্মিত করেছিলেন—

“··· He plainly asked when they were going to strike in Britain, ‘so that we might also take up arms simultaneously against the British.’ The Germans said they had no thought of this and that they hoped for a compromise. In the end Bose told them : ‘Britain is our traditional enemy. We will fight her, whether you support us or not.’ He had no doubt that war in Europe would come and carried away the overwhelming impression of its imminence when he went home in 1936.”[১২]

তাঁর বিখ্যাত মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস রচনা—The Indian Struggle-এর বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছি। ভিয়েনায় সার্জেন ডেমেল তাঁর গল-ব্লাডার অপারেশন্ করেন ১৯৩৫-এর এপ্রিল মাসে ; ধীরে ধীরে রোগমুক্তি হতে থাকে—তারপর আবার ভারতের জন্য, তার মুক্তি সংগ্রামের জন্য পরিকল্পনা, চিন্তা ও প্রস্তুতি। এই পর্বেই তাঁর সমগ্র ইউরোপ সফর এবং কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগের অনুষ্ঠান উপরিউক্তভাবে ঘটেছিল। মাতৃভূমির জন্য আত্মোৎসর্গের প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখা, অকুতোভয় ইস্পাতসদৃশ মানসিক শক্তিসম্পন্ন নেতাজী সুভাষ তাঁর শুধু দেহ নয় সমগ্র সত্তাটিকে নচিকেতার ন্যায় সমর্পণ করেছিলেন দেশমাতৃকার পদপ্রান্তে।

১৯৩৬-এর শুরুতে ভারতবর্ষে তার স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিপথে প্রতিধ্বনিত হয় এক অনাস্বাদিত স্পন্দনের সুর। গান্ধীজী ইতিমধ্যে সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে যে অনেকখানি সরিয়ে নিয়ে তাঁর গ্রামকল্যাণ ও খাদি আন্দোলনে মনোযোগ দিয়েছিলেন, তখনও তাঁর প্রত্যাবর্তন হয়নি। এদিকে ১৯৩৫-এ নতুন ভারত শাসন আইন কার্যকর এবং তার আগেই

১২। The Springing Tiger : Hugh Toye, Page 43.

১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীরা কংগ্রেস সোসিয়ালিষ্ট দল গঠন করেছেন এবং সুভাষচন্দ্রের লেখা 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' ইউরোপ মহাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে প্রচণ্ডভাবে—আর তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার উপকূলে। পণ্ডিত জওহরলাল তখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন—আর মাত্র কয়েকটা দিনই তো বাকি, সুভাষচন্দ্রকে ভারতে ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহী হয়ে উঠলেন তিনি।

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে ইংরেজ রাজের সঙ্গে আপোষের বিরুদ্ধে নিজের সমস্ত কর্মশক্তি ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে সমর্থ হবেন—এই আবেগে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৬-এর মার্চে ঘোষণা করলেন তাঁর ভারত প্রত্যাবর্তনের প্রোগ্রাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-সাম্রাজ্য শক্তিও ঘোষণা করলেন, নির্বাসন থেকে তাঁর এ প্রত্যাবর্তনের খারাপ পরিণামের কথা। ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবনে অভিজ্ঞতাপুষ্ট, কংগ্রেসের নতুন পরিস্থিতিতে আশান্বিত, চিরকালের বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র খোলা চিঠিতে ইংরেজ শাসকবর্গকে কঠোর অবজ্ঞা জ্ঞাপন করেই ভারত যাত্রা করলেন আর ৮ই এপ্রিল বোম্বাইতে জাহাজ থেকে ভারতের মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই—"দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বন্দী ; জাহাজ হইতে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার ও হাজতে প্রেরণ—জনমতের প্রতি নিদারুণ উপেক্ষা প্রদর্শন—বোম্বাই বন্দরে দর্শনার্থী জনতার ভিড়—কংগ্রেসের জয়ধ্বনি-সহকারে বিপুল সম্বর্ধনা। কলিকাতা ৮ই এপ্রিল, এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস সংবাদ পাইয়াছেন যে, অদ্য প্রাতে বোম্বাইতে জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার পর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে গ্রেপ্তার করিয়া আর্থার রোড পুলিশ ফাঁড়িতে লইয়া গিয়া আটক রাখা হইয়াছে।—এ. পি"[১৩]

"SJ. SUBHAS CHANDRA BOSE ARRESTED—SJ. BOSE'S ARREST—Will Congress Change Its Programme ? ANXIOUS ENQUIRIES IN CONGRESS CIRCLES—How They View The News Of The Arrest"[১৪]

ভারতের বৃহত্তম নগরী, ইংরেজ সাম্রাজ্য শক্তির কেন্দ্র, আতঙ্কিত নগরী এবং সুভাষচন্দ্রের প্রাণপ্রিয় কলকাতা, তার দুটি শ্রেষ্ঠ বাংলা ও ইংরাজী খবরের কাগজ—আনন্দবাজার ও অমৃতবাজার পত্রিকা—প্রথম পৃষ্ঠায় সবচেয়ে

১৩। আনন্দবাজার পত্রিকা [কলিকাতা—বৃহস্পতিবার ২৭শে চৈত্র, ১৩৪২
April, 9, 1936.

১৪। Amritabazar Patrika—Thursday, April 9, 1936.

বড় হরফের প্রথম সংবাদটি এইভাবে ছাপলেন, আর খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী-চাদর-টুপি পোশাকে যেন 'সিংহাসনারূঢ় রাজবেশে' সুভাষচন্দ্রের একখানি পূর্ণ ছবি। ঐ আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায়ই 'রাষ্ট্র-মহাসভার সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল'-এর চিরন্তন খাদির জহরকোট ও টুপিতে স্মিত সুন্দর সহাস্য মুখ, দু-হাত পেছন করা বাঁদিকে ছোট্ট একটি ছবি এবং একটা ক্ষুদ্র ডিম্বাকৃতি ছবিতে পার্শ্বমুখ গান্ধীজী আর দ্বিতীয় পর্যায়ের বড় হরফে সংবাদ—"লক্ষ্ণৌ নগরীতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ—সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে প্রস্তাব রচনার ভার জওহরলালজীর উপর ন্যস্ত।"

তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ও প্রতিভাধর রাজনীতিক সুভাষচন্দ্র স্পষ্টই বুঝেছিলেন এবং চেয়েছিলেন যে, ব্রিটিশ-রাজশক্তির কঠোরতা তাঁর প্রতি যতই আক্রোশে উন্মত্ত হয়ে উঠবে কংগ্রেসের দুই দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ততই প্রশমিত হয়ে আসবে, কংগ্রেস অর্থাৎ ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা অচিরে তাঁকে বরণ করে নিতে বাধ্য হবে, দেশবাসীর জাগ্রত চেতনাকে স্বাধীনতা লাভের উদগ্র প্রাণোচ্ছ্বাসকে কোন মোহিনী মায়ার দ্বারাই আচ্ছন্ন করে রাখা আর সম্ভব নয়; কাল সমাগত প্রায়। বোম্বাইতে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য সহস্র সহস্র কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক, নৌ-শ্রমিক, ছাত্র, জনসাধারণ ও অন্যদিকে বিরাট পুলিশ বাহিনী সুবিস্তৃত বন্দর ঘাটে প্রস্তুত ছিলেন। হেলমেট, বন্দুক, পিস্তলধারী ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসাররা তাঁকে এ্যারেস্ট করতে এগিয়ে এলেন—বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে দশদিক ভরে উঠলো—সৌম্য সুন্দর বীর সুভাষচন্দ্র সুগম্ভীর কণ্ঠে চীৎকার করে বললেন—"Keep the flag of India's freedom flying."—'ভারতের স্বাধীনতা পতাকা উড্ডীন রাখুন।' (যতদূর জানা যায় জাহাজে থাকা অবস্থাতেই তাঁকে নিয়মমাফিক গ্রেপ্তার করা হয়।) এই জনপ্রিয় মহান নেতাকে অন্যায়ভাবে বন্দী করার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠলো ইংলণ্ডে এবং ভারতীয় পার্লামেণ্টে; তা সত্ত্বেও তিনি নাকি আয়ারল্যাণ্ডের যুদ্ধ পরিকল্পনার ধাঁচে ভারতে যুদ্ধ-বিদ্রোহের আয়োজন করছেন—এই কারণে তাঁকে কারাগারের বাইরে রাখা যায় না। ভারতে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের এই অপরূপ 'সুভাষ অভ্যর্থনা'র ব্যবস্থাকে লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ-যথাযোগ্যই হয়েছে মনে করলেন। কারণ সুভাষচন্দ্র এমন একটি ব্যক্তিত্ব, (তাঁদের ভাষ্য ও ভাব অনুযায়ী) যার নিপুণ কর্মদক্ষতা ব্রিটিশ শাসন বিধ্বস্ত করার লক্ষ্যেই সব সময় পরিচালিত।[১৫]

১৫। Springing Tiger—Hugh Toye—Page 45.

এবারের বন্দী জীবনে সুভাষচন্দ্রের দৈহিক কষ্ট সীমিত। দার্জিলিং-এর নিকটবর্তী কার্শিয়াং-এ গিধা পাহাড়ে দাদা শরৎচন্দ্র বসুর বাড়ীতে অন্তরীণ থাকার পর ১৯৩৭-এর ১৭ই মার্চ তাঁর নিঃশর্ত মুক্তি হয়।

দেহে-মনে উন্নত উল্লসিত উদ্ভাসিত সুভাষচন্দ্র! ১৯৩৫-এর ভারত আইন অনুসারে ১৯৩৬ মে ভারতে ১১টা প্রদেশের মধ্যে ৭টিতেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মন্ত্রীসভা গঠন করে শান্তিতে শাসন পরিচালনায় রত—সে বিষয়ে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই! কার্শিয়াং থেকে কলকাতার এলগিন রোড়ের বাড়ী, তারপর গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। ১৯৩৭-এর মার্চেই গান্ধীজীর আবার প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন হয়েছে। গান্ধীজীর প্রস্তাব ও অনুরোধে আগত ১৯৩৮-এ জাতীয় মহাসভা অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট-এর পদ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন সুভাষচন্দ্র। প্রেক্ষাপটের রূপ ও রং-এর কতই না পরিবর্তন তখন। আর গান্ধী-নেহরুর শুভেচ্ছার ওপর কংগ্রেসের নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রের প্রবেশ নয়, স্ব-গরিমায় সুভাষচন্দ্র এখন মহান রাষ্ট্রনায়ক। তারপর হঠাৎ সুভাষচন্দ্র অল্পকালের জন্য ইংলণ্ড পাড়ি দিলেন। ১৯৩৮ সালের ১০ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ইংলণ্ডে পৌঁছলে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিগণ লর্ড কিনোউলের নেতৃত্বে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করেন ১১ই জানুয়ারী প্যাংক্রাশ টাউন হলে ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট নেতা মিঃ আর. পাম. দত্ত সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১২ই জানুয়ারী ক্যাক্সটন হাউসের সভায় লর্ড এটলী, লর্ড স্নেইল, সোরেন সেন (এম পি), স্যার জন মেনাড, লর্ড ক্যারিংডন, মিঃ ব্রাডলী উপস্থিত হন। ১৪ই জানুয়ারী লণ্ডনের কনওয়ে হলে ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে বিরাট সম্বর্ধনা সভায় শ্রমিক দলের নেতা জর্জ লন্স্ বেরী, আর্থার গ্রীন উড (এম. পি.), লর্ড লিস্টওয়েল, বেসিল ম্যাথুস প্রভৃতি সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানালেন। সভাপতির ভাষণে মিঃ লন্স্ বেরী বল্লেন, "যাঁরা মনে করেন মিঃ বসু ভারতীয় জনগণের আস্থাভাজন নন কিম্বা একজন ভয়ঙ্কর মানুষ, কংগ্রেসের সভাপতি পদে তাঁর এই (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়) নির্বাচন, তাঁদের প্রতি যোগ্য উত্তর। আশা করা যায় মিঃ বসুর সভাপতিত্বকালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে দৃঢ়তর পদক্ষেপ করবে।" একই দিনে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের অভ্যর্থনা সভায় বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক টনি সভাপতিত্ব করেন। ছাত্রদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ। বার্ট্রাণ্ড রাসেল, হ্যারল্ড লাস্কী, স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়। ডর্চেসষ্টারে

তাঁর এক অভিনন্দন সভারও অনুষ্ঠান হলো—"English people who met him for the first time were impressed alike by his pleasant, quiet manner and the decisiveness with which he discussed Indian affairs."[১৬] ভারতীয় সমস্যা, তার স্বাধীনতা, স্বাধীনোত্তর ভারতে সমাজ সংগঠন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে তাঁর দ্বিধাহীন সুচিন্তিত খোলা বক্তব্য সেদিন লণ্ডনের যে-সব উঁচু মহল অর্থাৎ রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের শাসক ও বিরোধীপক্ষের লোকেরা প্রথমবারের মত নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে সাক্ষাতে দেখতে ও জানতে এসেছিলেন তাঁদের সত্যই মুগ্ধ করল—এই ৪১ বছর বয়সের ভারতীয় বিপ্লবী। ঐ বছরের ২৩শে জানুয়ারী তাঁর শুভ জন্মদিনটিতে জাহাজ থেকে করাচী বন্দরে অবতরণ করলে এক সাংবাদিকের প্রশ্ন ঃ 'Matrimony ?' (বিয়ে- ?) সুভাষচন্দ্র প্রশ্নকর্তাকে বললেন, 'I have no time to think of that' (ও নিয়ে ভাববার আমার সময় নেই)।

বিচিত্র সব পথ যাত্রায় তাঁর জীবনে কত কত অধ্যায়! একজন ভারতীয় বীর বা নেতারও অনেক উচ্চে এখন তাঁর আসন। চিন্তার গভীরতায়, জ্ঞানে, ত্যাগে, অভিজ্ঞতায়, কারাগারে কিংবা নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্র এই সময়কালের মধ্যে—গান্ধী-সুভাষ-নেহরু এই তিন ভারতীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভারতীয় জনগণের নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণীয় চরিত্র। পুরুষাকারের মহনীয় প্রকাশ। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে সুভাষচন্দ্র যে-সম্মানের অধিকারী হলেন, তা যে-কোন ভারতীয়ের পক্ষে প্রভূত গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয়। বিদেশে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র জাতীয় মহাসভার রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হলেন—গুজরাটের হরিপুরাতে অনুষ্ঠিতব্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন উপলক্ষে। ঐ সময়ে তিনি বিশ্বের অন্যতম মহান দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও বিপ্লবী বিখ্যাত আইরিশ নেতা ডি. ভ্যালেরার সঙ্গে সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকরার পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

"... তবু তৃপ্তি নেই। আরো বড় যুদ্ধ চাই। রণাঙ্গনের যুদ্ধে বিজয়ী ভারতের বিজয় মিছিল আমরা দেখবার জন্য উন্মুখ। সেই সুযোগ আসন্ন। ইউরোপ থেকে খবর নিয়ে এলেন হরিপুরা কংগ্রেসের (১৯৩৮) নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র। কলকাতার সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি এক বৈঠকে মিলিত হলেন। একজন তরুণ সাংবাদিক হিসাবে আমিও সেখানে উপস্থিত

১৬। Manchester Guardian, January 11th, 1938. Toye—46.

(দক্ষিণারঞ্জন বসু)। আগামী বছর বসন্তেই ইউরোপে একটা ডামাডোল বেধে যাবে, জার্মানীর যুদ্ধায়োজন সম্পূর্ণ—এই বলে সুভাষচন্দ্র সেদিন আমাদের সামনে ইউরোপের যে-চিত্র তুলে ধরেছিলেন এবং ভারতের জাতীয় মুক্তিকে করায়ত্ব করার জন্যে সেই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণে যেরূপ উদ্গ্রীব তিনি হয়ে উঠেছিলেন, কংগ্রেস নেতারা যদি তাঁর কথামত সে-সময়ে ছয় মাসের চরমপত্র দিয়ে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম শুরু করতে রাজী হতেন, তাহলে কি আর পরবর্তীকালে দেশ বিভাগের পাপে আজকের এই দুর্ভোগ আমাদের ভুগতে হতো?

"গান্ধীজী সে-সময় বলেছিলেন যে, দেশ তখন ঐরূপ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কথাটা যে ঠিক নয়, দেশের মানুষ পরবর্তী বছরেও গান্ধীজীর আপত্তি সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রকেই ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করে তা বুঝাতে চেয়েছিলেন। জনগণ সুভাষচন্দ্রকেই চায়, তাঁর পথই তারা নিতে চলেছে, এই ভয় থেকেই প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন গান্ধীবাদীরা। সুভাষচন্দ্র কিন্তু তাঁদের সকলকে নিয়েই চলতে চেয়েছিলেন ··· পরে সব মিলিয়ে দেখে আশ্চর্য হয়েছি, সুভাষচন্দ্র একজন পাকা যুদ্ধ-বিশারদের মতোই সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।"১৭

গান্ধী-নেহরু এবং বামপন্থী কংগ্রেসের ভিন্ন ভিন্ন ভাব-ভাবনার, সকল জাতীয়তাবাদীর মিলিত ঐক্যে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার তরুণ প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্রকে একান্নটি সুসজ্জিত তোরণের মধ্যে দিয়ে বিরল অভ্যর্থনার ভেতর হরিপুরা কংগ্রেসে সেদিন উপস্থাপিত করা হলে ভারতের জনচিত্ত যেভাবে সেদিন উত্তাল-উদ্দামরূপ নিয়েছিল তার সঙ্গে আরো কিছু কিছু ঘটনার সম্ভবত তুলনা করা যায়। এক—সামরিক পোশাকে অশ্বারূঢ় ভলান্টিয়ার বাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে জি. ও. সি. স্বয়ং সুভাষচন্দ্র কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসভার সভাপতি মতিলাল নেহরুকে যেভাবে ১৯২৮ সালে, ঠিক দশবছর আগে অভ্যর্থিত করেছিলেন। আর—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানলের মধ্যে দীর্ঘ নব্বই দিন সাবমেরিনে পাশ্চাত্ত্য জগৎ থেকে প্রাচ্যে পৌঁছানর পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইনডিপেণ্ডেন্স লীগ-প্রেসিডেন্ট মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বোস আয়োজিত সামরিক ও অসামরিক সুবিশাল এশিয়াবাসীর জনসভায় যেভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে বরণ করা হয়েছিল, তার তুলনা নেই।

১৭। আমার দেখা আমার জানা সুভাষচন্দ্র—দক্ষিণারঞ্জন বসু

সুভাষচন্দ্র জানালেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিতে কংগ্রেসের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, স্বাধীনতা অর্জনের পরেই শুধুমাত্র কংগ্রেসের শাসনক্ষমতা হাতে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত। ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের অধীনে কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বের অযৌক্তিকতার কথা এবং দ্রুত শিল্প-বিপ্লবের পথে ভারতের অগ্রগতির ঘোষণার সঙ্গে গান্ধীজীকে তিনি স্বাধীনতালাভের প্রধান স্থপতিরূপে অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট্‌রূপে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল, একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন যার চেয়ারম্যানের পদে তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে নিযুক্ত করলেন। ভারতে সেই প্রথম আমাদের প্ল্যানিং কমিশন যার উদ্বোধক স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানের প্রসারে অনিচ্ছুক এবং ঐ নীতিতে সন্দেহবাদী গান্ধীজীর অনীহা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের এই 'All India National Planning Committee' গঠন নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক ইতিহাস-রাজনীতিতে ভারতের দ্রুত গতিতে পদক্ষেপ, তাঁর প্রগতিশীল অতি শক্তিশালী এবং যথার্থ রাষ্ট্রচেতনার পরিচয়। গান্ধীজীর কূটরাজনৈতিক কৌশল ছিল—ভারতে ও বহির্ভারতে সুভাষচন্দ্রের বিরাট ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবী বামপন্থী, বিশেষত বাংলার তরুণ সম্প্রদায়কে গান্ধী-অনুগামীদের সঙ্গে মিলিত করে কংগ্রেস পরিচালনা ও স্বাধীনতা লাভ। আর সুভাষচন্দ্রও ঐক্যশক্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্য ছিল, বিশাল ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে, তার শক্তি-শাসনকে পরাধীন, লাঞ্ছিত, ব্যথিত ভারতের মাটি থেকে সমূলে উৎপাটিত করা ; আর শিল্প-বিজ্ঞান-অর্থনীতিতে উন্নত ভারত বিশ্বের অগ্রসর দেশ ও জাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত হোক।

"It was no longer simply a matter of the way to freedom ; Bose wanted to see a plan for Free India. To Gandhi it was enough to win freedom ; the disturbance of India's economic structure and the writing of the constitution could wait. In fact Gandhi did not mind if that were done by some other leader or party afterwards. To Bose the three were inseparable. He was a Socialist and could not leave the reconstruction of India to capitalism, nor could he trust the making of a constitution to the process of a democracy. The hand that won freedom must not lose its grip..."[১৮]

১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি (Science & Culture) পত্রিকার তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথিরূপে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র তাঁর জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি (All India National Planning Committee) সম্বন্ধে ভারতের বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্যে যে মনোজ্ঞ বক্তব্য রেখেছিলেন, সে-সময় থেকে পঞ্চাশ বছর পরেও আজ তা যথেষ্ট প্রণিধান-যোগ্য।

"... বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের সহায়তা ব্যতীত এই কার্য সম্ভব নয়। আপনাদের অনুমতিক্রমে আমি আপনাদের সম্মুখে জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যাগুলি পেশ করছি। ... বাংলা গভর্নমেন্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বাংলার শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য একখানা মোটা বই লিখেছেন। (মিঃ সতীশচন্দ্র মিত্র, এখন বিচারাধীন) কিন্তু আমাদের সমস্যা রয়েছে শিল্পের পুনরুজ্জীবন নহে, আধুনিক যুগোপযোগী ব্যাপক যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা। আমরা এখনও যান্ত্রিক-বিপ্লবের পূর্বস্তরে রয়েছি। এই যান্ত্রিক-বিপ্লবের (Industrial Revolution) ভিতর দিয়ে না গেলে কোনওরূপ শিল্পের প্রসার সম্ভবপর নয়। আমরা পছন্দ করি আর নাই করি এ-ভুললে চলবে না যে, ইতিহাসে বর্তমান যুগ 'যন্ত্রবিদ্যার যুগ'। যান্ত্রিক-বিপ্লব হতে কোন দেশই নিষ্কৃতি পেতে পারে না।"...

"... বর্তমান সনের (১৯৩৮) মে মাসে আমার সভাপতিত্বে বোম্বাইতে যে কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীদের সভা আহূত হয়, সেই সভাতে এই প্রস্তাব পুনর্গৃহীত হয়। এর পরে জুলাই মাসে কংগ্রেসের কার্যকরী সভা ঠিক করেছেন যে, শীঘ্রই আমি দিল্লীতে প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রীদের একটি সভা আহ্বান করে এই বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন করবো।... (সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে দিল্লীতে লালা শ্রীরামের গৃহে শিল্পমন্ত্রীদের সভা আহ্বান করে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গঠন করেন) যদিও আমি কুটির শিল্পকে একেবারে উড়াইয়া দিতেছি না, এবং যদিও আমি বিশ্বাস করি যে, কুটির শিল্পের রক্ষা ও উন্নতির জন্য আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে।

১৮। Hugh Toye, Page 52.

“… এখন আমি জাতীয় পরিকল্পনার মূলসূত্র সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করছি।

১। … অবশ্য-প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই দেশে উৎপাদন করতে হবে।

২। আমাদের পলিসি হবে যে, সমস্ত মাতৃশিল্পকে (অর্থাৎ যে-সমস্ত শিল্প না গড়ে উঠলে অন্য শিল্পের সংগঠন হয় না, যেমন—শক্তির সরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্র ও হাতিয়ার তৈয়ারী, প্রধান প্রধান রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন, রেল, স্টীমার, মোটর ইত্যাদিযোগে গমনাগমনের জন্য দরকারী সমস্ত জিনিস) দেশে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩। শিল্পকরী বিদ্যা ও গবেষণার সমস্যাকে আমাদের সমাধান করতে হবে। জাপানের মত আমরাও শিল্পকরী বিদ্যা শিক্ষার্থে প্রত্যেক বৎসরই বহু ছাত্রকে বিদেশে প্রেরণ করব।…

৪। সমগ্র দেশের জন্য চিরস্থায়ী ‘জাতীয় গবেষণা মন্ত্রণাসভা’ (National Research Council) স্থাপিত হওয়া উচিত।

৫। সর্বশেষতঃ জাতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তরের কার্যের জন্য, প্রথমে সমগ্র দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ধারণ করা উচিত।…

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তাঁর বক্তৃতায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, ব্যাপকভাবে শিল্প-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কংগ্রেসের মত কি ? আমার বলা উচিত যে, এ-বিষয়ে সমস্ত কংগ্রেসীদল একমত পোষণ করেন না। তা সত্ত্বেও আমি বলতে পারি যে, কংগ্রেস নব্যপন্থীদলে সকলেই ব্যাপকভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। কারণ, ব্যাপক শিল্প প্রতিষ্ঠা না হলে বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে না। বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিকার্যের সংগঠন না করলে দেশের উৎপাদিকা শক্তি বাড়তে পারে না… ।”[১৯]

কিন্তু একবারের জন্য অর্থাৎ মাত্র এক বছরের জন্য জাতীয় মহাসভার সভাপতির পদে বৃত থেকে তাঁর পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভারত-সংগঠনের কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী বছরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—তাই তিনি দ্বিতীয়বার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলেন, তাতে গান্ধীজীর মোটেই অনুমোদন ছিল না।

১৯। নেতাজীর দৃষ্টিতে জাতীয় পরিকল্পনা—মেঘনাদ সাহা, সদস্য, অল ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি—১৯৩৮

সমগ্র দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হ'লো। হিন্দু, মুসলমান, কবি, বৈজ্ঞানিক, কংগ্রেস-সোসিয়ালিস্ট সমস্ত মহলে গভীরভাবে অনুভূত হলো, ভারত ও আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার জাতীয় মহাসভার রাষ্ট্রপতি হওয়া খুবই প্রয়োজন। কংগ্রেস-সোসিয়ালিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাজ্জাদ জাহির, জেড. এ. আহ্‌মেদ, পি. রামমূর্তি, পি. সুন্দরায়া এবং ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ সুভাষচন্দ্রের পুনর্বার প্রেসিডেণ্টরূপে নির্বাচনের দাবী করে ১৭ই অক্টোবর (১৯৩৮) ইস্তাহার প্রকাশ করলেন ; ২২শে অক্টোবর বাংলার জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাগণের মধ্যে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, নবাবজাদা সৈয়দ হাসান আলি চৌধুরী, মোয়াজ্জাম আলি চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, আবুল মনসুর আহমেদ ও রশিদ খান একই দাবী উত্থাপন করলেন সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের জন্য। আর ৭ই নভেম্বর ভারতবর্ষের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলকাতায়, আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করলেন—

"Having thought over the matter deeply and after considering the current national and international political situation, I have come to the conclusion that Subhas Chandra Bose is the fittest person for the presidentship of the Congress at the present time. I earnestly appeal to Mahatma Gandhi and the Congress High Command to seriously consider the advisability of letting Subhas Chandra continue as President for another year."[২০]

আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বের আসন্ন যুদ্ধাবস্থা এবং ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (কংগ্রেস) প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি তাঁর অন্যতম সেক্রেটারী শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে ডিসেম্বর মাসে ওয়ার্ধা আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর নিকট প্রেরণ করলেন এবং লিখিত পত্রে, দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থায় সুভাষচন্দ্রকে প্রেসিডেণ্টের পদে নির্বাচনের অনুরোধ জানালেন। একই সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে পত্র লিখে তিনি সুভাষচন্দ্রের পক্ষে তাঁর মনোভাব জ্ঞাপন করলেন এবং অনতিকালের মধ্যে জওহরলাল নেহরুর শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের সময় ঐ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘ আলোচনাও করলেন। মহাত্মাজী রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তর

২০। Dr. Asoke Nath Bose—My Uncle Netaji : pp.—164-5

দিলেন এবং নেহরুকে তাঁর নিজস্ব মতামত কবির নিকট প্রেরণের পরামর্শ দান করলেন।[২১]

সকলের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলো, ভারতের মহান চিন্তাবিদগণের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে তাঁর মনোনীত প্রার্থী ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়াকে জাতীয় মহাসভার প্রেসিডেণ্টের পদে প্রার্থী দাঁড় করালেন। যতদূর জানা যায়, এই নির্বাচনে, জয়ের জন্য সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে টেলিগ্রাম করেছিলেন। সমগ্র ভারত উপমহাদেশে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কংগ্রেসের সদস্যগণ ১৫৮০-১৩৭৭ ভোটে সুভাষচন্দ্র বসুকে বিজয়ী করলেন। নির্বাচনে গান্ধীজী নিজে সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়েও ডঃ সীতারামাইয়ার পরাজয়কে নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করলেন—তাঁর নীতি অনুসরণকারী কংগ্রেসের প্রাচীন-পন্থী সদস্যগণকে প্রগতিশীল কংগ্রেস সেবীদের বিরুদ্ধে তথা সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে পরোক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশভাবে উত্তেজিত করলেন এবং তিনি ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ নব-নির্বাচিত প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে অসহযোগ করলেন। এঘটনা অহিংসা নীতির পরিচায়ক নয়, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন নয়—কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে অসহযোগ।[২২]

দেশের জন্য, দেশবাসীর দেওয়া আঘাতই সম্ভবত যুগে যুগে দেশে দেশে নেতৃবৃন্দকে বেশী করে বহন করতে হয়—যা দেশবন্ধুর খেদোক্তির মধ্যে আমরা পাই। সুভাষচন্দ্রকে আরো কঠিন কঠোর আঘাত তাই মাথা পেতে নিতে হয়—স্মিত হাসিতে—নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীরের আঘাত সইতে হয়। অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে অবতীর্ণ না হলে যে শুদ্ধি আসে না।

১৯৩৯-এ ত্রিপুরীতে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রনায়কের মহত্তম আসন লাভ করায় গান্ধীজীর মত তাঁর অনুগামীরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন—"গোবিন্দ বল্লভ পন্থ প্রস্তাব আনিলেন যে, দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে একমাত্র গান্ধীজীই দেশকে পরিচালিত করিতে পারেন। সুতরাং কংগ্রেস সভাপতি যেন মহাত্মাজীর মত

---

[২১] Pandit Jawaharlal Nehru : A Bunch of Old Letters : pp. 270-71.

[২২] 'Gandhi now turned the technique of noncooperation, not against the British, but against Congress's own President. Bose was forced to resign.'—

Michael Edwards : The Last Years of British India : P 67.

অনুসারেই কংগ্রেস-কার্যকরী সমিতি গঠন করেন। প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরে সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজীর কাছে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভ্যদের নাম চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু গান্ধীজী একটি নামও পাঠাইলেন না। ফলে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করিলেন। পরের দিনই রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। সমস্ত চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়া, জগৎসমক্ষে কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করাইয়া মহাত্মাজীর কংগ্রেস তাহার জেদ বজায় রাখিল।”

“...মহাযুদ্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাত্মাজী বলিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতার কথা আমি এই মুহূর্তে ভাবিতেছি না। স্বাধীনতাতো একদিন আসিবেই, কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পতনের পথে যদি ভারতের স্বাধীনতা আসে তবে সে স্বাধীনতার মূল্য কি? ...পণ্ডিত জওহরলালতো আরও একধাপ আগাইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, আজিকার যুদ্ধ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্যাসিজমের! অর্থাৎ ইংলণ্ড আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শিবিরে। তাই বিনা শর্তে এই সংগ্রামে ভারতের ইংলণ্ডের পক্ষে অর্থাৎ ন্যায় ও সত্যের পক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়! ভাগ্য ভাল যে সেদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলালের প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই।”[২৩]

ভারতবর্ষ বড় বিচিত্র দেশ। তাই পন্থ প্রস্তাবের মত এক অবিশ্বাস্য ঘটনা, কারও কারও মতে কুখ্যাত প্রস্তাবও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস যোদ্ধাগণের অতি নগণ্য সংখ্যক প্রতিনিধির সিদ্ধান্ত অনুসারে কংগ্রেস সংবিধানের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। রাজনীতির এ এক বিচিত্র কাহিনী!

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে স্থির হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিশ্বভারতী’ সংলগ্ন শ্রীনিকেতন শিল্প ভবনের একটি স্থায়ী ভাণ্ডার কলকাতায় স্থাপন করা হবে এবং তার দ্বার উদ্ঘাটন করবেন—নবনির্বাচিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ শারীরিক অসুস্থতার জন্য

২৩। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধী—নিকুঞ্জ সেন (প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ‘B. V.’ বা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের এ্যাকশন স্কোয়াডের নেতা। ১৯৩১ সালে বন্দী হয়ে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বিনা বিচারে সিকিউরিটি প্রিজনার হিসাবে বন্দীজীবন যাপন করেন। রাইটার্স বিল্ডিংস—অলিন্দ যুদ্ধের অন্যতম শহীদ বাদল গুপ্ত এই বিপ্লবী সংগঠক নিকুঞ্জ সেনেরই হাতের তৈরী বিপ্লবী। দেশ বিভাগের পর গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।)

উপস্থিত না হতে পারায় তাঁর লিখিত ভাষণটি সভায় পাঠ করা হয়। এই ভাষণের শেষাংশে বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান ব্যক্তিদের মতামত উল্লেখ করে কবিগুরু বলেন—"দেশের বিরোধীবৃত্তি অনেক সময় এই বলে আস্ফালন করে যে—আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। এ কথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি শেষ কথা বলে যাচ্ছি পরীক্ষা করে দেখো এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কিনা, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কিনা।" রবীন্দ্রনাথের ভাষণে এই আক্ষেপ লক্ষ্য করে সুভাষচন্দ্র বললেন, "শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন শ্রীরবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের পর বর্তমান থাকিবে না, ইহা মিথ্যা কথা। ইহাতে শাশ্বত সত্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা অবিনশ্বর। হয়তো ইহার বর্তমান আকার (শান্তিনিকেতন) স্থায়ী না হইতে পারে কিন্তু তাহা হইলেও ইহার সত্য অংশ 'ভিন্ন আকারে' চিরস্থায়ী হইবে।"[২৪]

পূর্বেই লেখক উল্লেখ করেছেন, ১৯৩৯-এ গান্ধী মনোনীত ডক্টর সীতারামাইয়া সুভাষচন্দ্রের নিকট প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে পরাজিত হন এবং অবশ্যম্ভাবী ফলাফলে গান্ধীজী নতুন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে অসহযোগ ঘোষণা করেন। এ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ১৯৩৯-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর ওয়ার্ধা আশ্রমে যান। এদিকে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ ঐ মাসেই সুভাষচন্দ্রকে তাঁর—'তাসের দেশ' নাটিকার দ্বিতীয় সংস্করণ উৎসর্গ করলেন এই নাম-ভূমিকায়—"কল্যাণীয় সুভাষচন্দ্র! স্বদেশের চিত্তে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম" (মাঘ ১৩৪৫ ॥ ১৯৩৯)।

সুভাষচন্দ্রের দৃপ্ত পৌরুষ—দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে তাঁর আদর্শবাদ ও বলিষ্ঠ চেতনা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তাই গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের মধ্যে একের অপরের প্রতি ঘনিষ্ঠ

২৪। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে—সরোজকুমার দাশ, সর্বাধ্যক্ষ দর্শন বিভাগ, প্রেসিডেন্সী কলেজ। তিনি লিখেছেন: "এই উদ্ধৃতি শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক' হইতে গৃহীত, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই ঋণ স্বীকার করিতেছি।"

শ্রদ্ধাবোধ থাকা সত্ত্বেও কবিগুরু সত্যকে, সুন্দরকে স্বচ্ছভাবে গ্রহণ করতে তাঁর সুতীক্ষ্ণ বিচার জ্ঞানকে এতটুকুও আচ্ছন্ন হতে দেননি।* তাই অত্যন্ত অসংগতভাবে সুভাষচন্দ্রকে যখন জাতীয় মহাসভার নির্বাচিত প্রেসিডেন্টরূপে গান্ধীজী ও তাঁর অনুরাগীগণ গান্ধীজীরই অসহযোগিতার ফলে কাজ করতে দিলেন না এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কলিকাতা অধিবেশনের সভায় সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্ট পদ (স্ব-ইচ্ছায়!) ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন (এপ্রিল ১৯৩৯)। বাংলায় তার প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল—এবং সে সংবাদ রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে পেলেন। কালবিলম্ব না করে বিশ্বকবি "দেশনায়ক" নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করলেন। [১৯৩৯-এর মে মাসে লিখিত ও মুদ্রিত হয়, কিন্তু তখন উহা প্রকাশ করা হয় নাই—'রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণ পরোক্ষভাবে কংগ্রেস-পক্ষীয়দের সমালোচনা'—"আমাদের মনে হয় কবির সুহৃদ ও বিশ্বভারতীর হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে এই প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় নাই"। (শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনা হইতে উদ্ধৃত। রবীন্দ্র জীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮১)] এখানে সে প্রবন্ধটির কিছু অংশ তুলে দেওয়া হলো। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রবন্ধ "দেশনায়ক"-এ লিখলেন—

"বাঙ্গালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা

---

* ১৯৩৯-এর ১৯শে মার্চ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে লিখলেন, "প্রিয় মহাত্মাজী, বিগত কংগ্রেস অধিবেশনে অশোভন জেদের বশবর্তী হয়ে কিছু রূঢ় প্রকৃতির মানুষ বাংলাকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। আপনার করুণাভরা দুটি হাতের স্পর্শে সত্বর এই ক্ষতির উপশম করুন এবং ক্ষতি যাতে মারাত্মক না হয়ে উঠে তার প্রতিবিধান করুন।"

উত্তরে গান্ধীজী ১৯৩৯-এর ২রা এপ্রিল দিল্লী থেকে লিখলেন, "প্রিয় গুরুদেব, আপনার স্নেহপূর্ণ পত্র পেয়েছি, আমার নিকট যে সমস্যার কথা লিখেছেন; তার সমাধান কঠিন। আমি সুভাষকে যা কিছু বলবার বলেছি। অচলাবস্থা দূর করবার অন্য পথ দেখছি না।"

তারপরও কবিগুরু গান্ধীজীকে একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন ঃ

I earnestly appeal to you to arrange meeting immediately with Subhas and save situation from tragic disaster.

গান্ধীজী বা কংগ্রেসের কোন নেতা বাঙ্ নিষ্পত্তি করলেন না।

বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। ... এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয় যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন। ... সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্টলগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি ... আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তা থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনী শক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারা-দুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি, তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে।

...আমার দেশের দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতর পরিচয় সেইখানেই আমাদের আশা প্রচ্ছন্ন ভূগর্ভ থেকে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করেছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ প্রাণবান ও ফলবান করবার ভার নিতে হবে তোমাকে; বাঙ্গালির স্বভাবের যতকিছু শ্রেষ্ঠ তার সরলতা, তার কল্পনা বৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপ সৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর করে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে নব বসন্তে তার নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃত্ব গ্রহণ করো তুমি।

... আমি আজ তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি; সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে। ...

সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আমার শেষ ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপর আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন ভারতবাসীকে অথবা পৃথিবীর কোন মহাপুরুষকে এমন ভাব ও ভাষায় অভিনন্দিত করেছেন কিনা এই গবেষকের সীমিত জ্ঞানে তা অজ্ঞাত। এ এক অনবদ্য ঘটনা নিঃসন্দেহে।

১৯৩৯ সালেই সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নতুন রাজনৈতিক দল 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করলেন এবং দু-দুবার নির্বাচিত সর্বমান্য কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান তিন বৎসরের জন্য বহিষ্কার করলেন। ইতিহাসের গতিপথ বড় রহস্যময়—তার বিচার বড় বিচিত্র। সুভাষচন্দ্রের এই বহিষ্কারই তাঁকে অত্যল্পকালের মধ্যে বিশ্ব ইতিহাসের উদ্ভাসিত পাদপ্রদীপে নেতাজীরূপে উপস্থাপিত করল। সেখান থেকে কে কাকে বহিষ্কার করে!

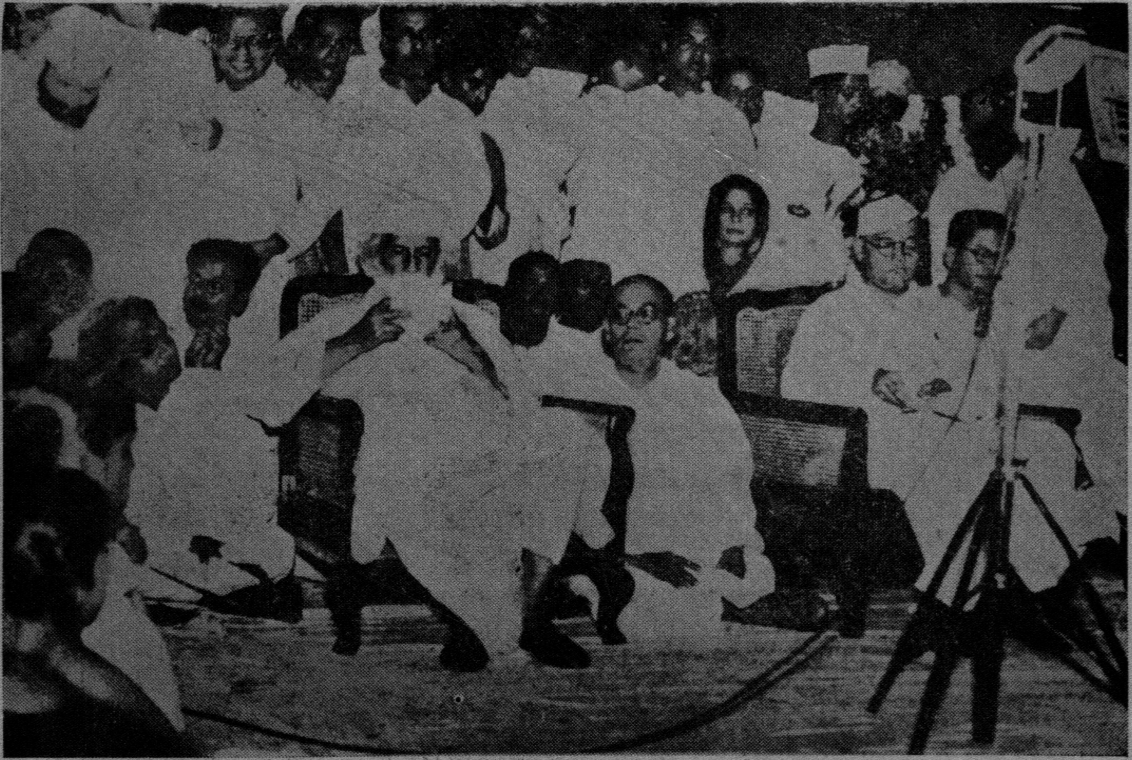

মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠা—রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (কলকাতা ঃ ১৯৩৯)

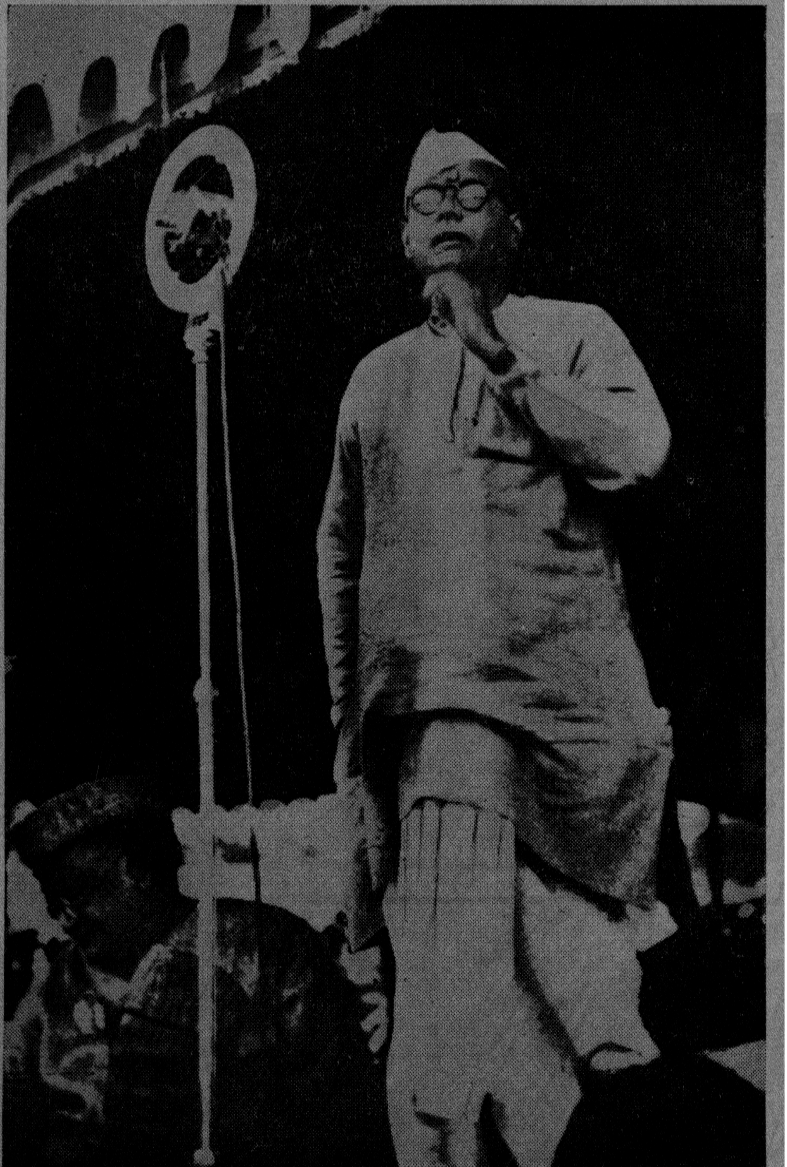

রামগড় আপোষবিরোধী মহাসম্মেলন (অ্যান্টি কমপ্রোমাইজ কনফারেন্স)
কংগ্রেস বহিস্কৃত দেশনায়ক সুভাষ (রামগড় ঃ ১৯৩৯)

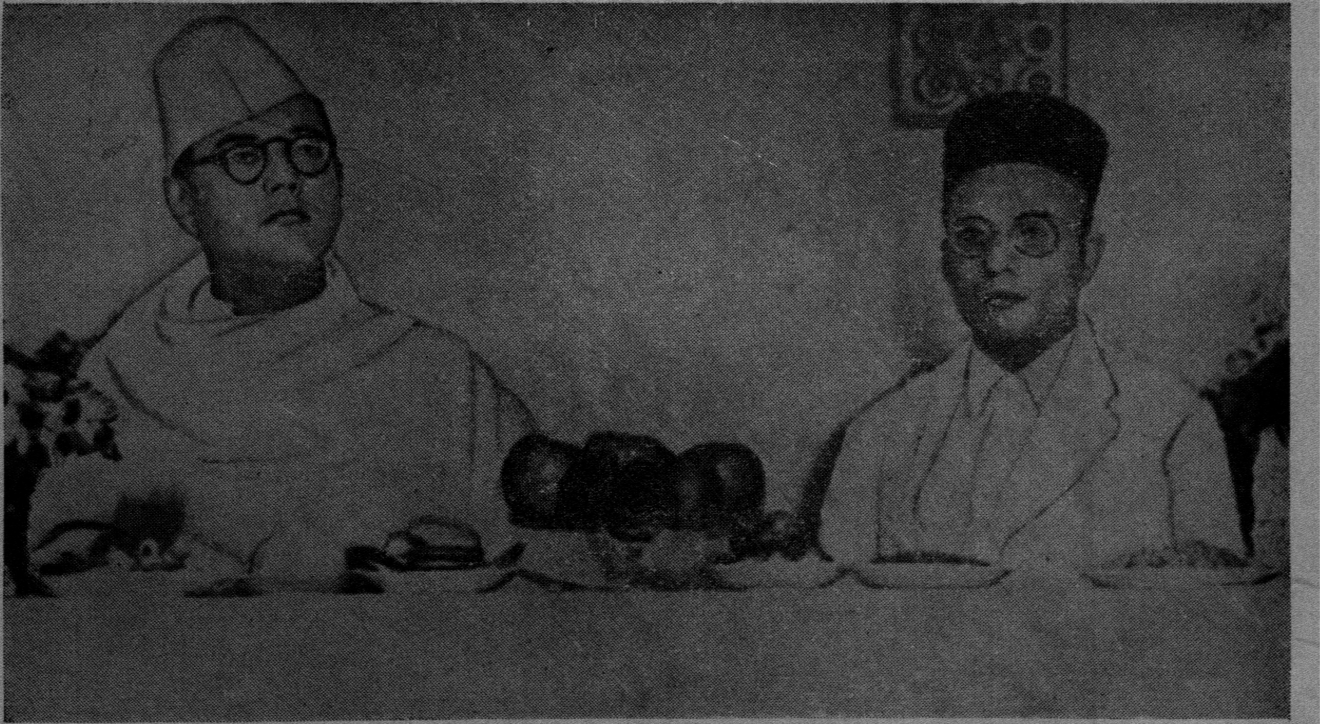

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দুই প্রবাদ পুরুষ—নেতাজী ও বীর সাভারকর [নেতাজীর দেশত্যাগের পূর্বে সংঘটিত তিন ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের (গান্ধী-জিন্না-সাভারকর) অন্যতম—১৯৪০]

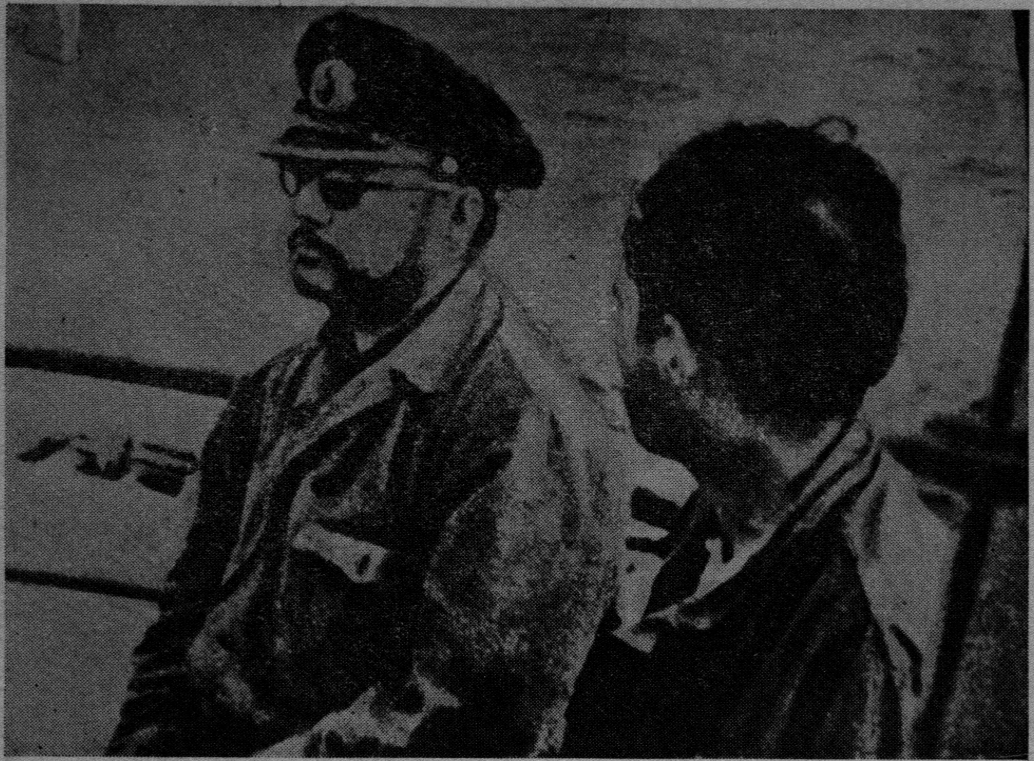

ইউরোপ থেকে পূর্ব এশিয়ার পথে সাবমেরিনে—সঙ্গে আবিদ হাসান সাফরাণী (১৯৪৩)

চতুর্থ অধ্যায়

দুর্গম পথের যাত্রী

পশ্চিম পৃথিবীর আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠলো—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বগ্রাসী দাবানল জলে-স্থলে-আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঠিক ছয় মাস বাদে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে ইউরোপে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল—ঘোষিত হলো দ্বিতীয় মহাসমর। জাতীয় মহাসভার প্রেসিডেন্টের পদ থেকে নিষ্কৃতির এক মাসের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র তাঁর দুর্জয় আত্মবিশ্বাসে কংগ্রেসের মধ্যেই 'ফরওয়ার্ড ব্লক' প্রতিষ্ঠা করলেন। ঐতিহাসিক হরিপুরা কংগ্রেসে তিনি স্পষ্টই জানিয়েছিলেন—'মহাত্মার মতই তিনি স্বতন্ত্র'। গান্ধীজী ও গোঁড়া রক্ষণশীল কংগ্রেসের সেদিনকার সুভাষ-বিরোধিতার ফলেই যে পরবর্তীকালে জাতির জীবনে নেমে এসেছিল দেশ বিভাগ ও লোকক্ষয়ের সর্বনাশা ফলশ্রুতি—এটি আজ বহুজন স্বীকৃত ঘটনা। ত্রিপুরীতে সেদিন দূরদর্শী সুভাষচন্দ্রের নীতি গৃহীত হলে এই উপমহাদেশের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র একবারের জন্যও কোন অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেননি বা অশোভন ব্যবহার করেননি মহাত্মাজীর সঙ্গে। সুভাষচন্দ্র তাঁর মহত্তম চারিত্রিক ঐশ্বর্যে প্রমাণ করেছিলেন—'মতান্তর মনান্তর নয়, ব্যক্তিত্বের প্রতিবাদ ব্যক্তির প্রতি অসম্মান নয়'। তাঁর ওপর ত্রিপুরীতে অসহনীয় রাজনৈতিক নির্যাতনের পরও অপরাজেয় মহিমায় তাঁর জীবনাদর্শের যে মহত্তম দিকটি প্রকাশ পেয়েছিল, ইতিহাসে তার তুলনা অল্পই পাওয়া যায়। সেদিনের তাঁর সে উক্তি, তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম, ভারতের জন্য তাঁর সর্বস্ব ত্যাগের পরিমাণ-জ্ঞাপক আকৃতি—সে এক অপূর্ব সুষমামণ্ডিত বিস্তৃত হৃদয়ের আত্মিক প্রকাশ—"One thing I know. This is the India for which one toils and suffers. This is the India for which one can even lay down his life. This is the real India in which one can have undying faith, no matter what Tripuri says or does."

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর মাদ্রাজের সমুদ্র উপকূলে সুভাষচন্দ্র এক বিশাল জনসমুদ্রের সম্মুখে—সম্ভবত ভারতে তাঁর উপস্থিতিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম সভায় দুইলক্ষ জনতার সভামণ্ডপে ভাষণরত। হঠাৎ দর্শকদের গ্যালারী থেকে একজন মাদ্রাজের একটি সান্ধ্য পত্রিকা তাঁর হাতে শশব্যস্তে এগিয়ে দিলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু বিদ্যুৎ চমকে বদলে গেল—ব্রিটেন জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত। ভারতের পক্ষে সুবর্ণসুযোগ। ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আর ঐ দিনই ভারতের ভাইসরয় ভারতকে যুদ্ধমান অর্থাৎ এই যুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশ রূপে ঘোষণা করে জরুরী অবস্থা জারী করেছে —যার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ যা কিছু অসন্তোষ গোলমাল কঠোরভাবে দমন করা হবে। হায় রাষ্ট্রনীতি, হায় ইতিহাস। ভারতবর্ষ কি একটা স্বাধীন রাষ্ট্র যে তাকে 'বেলিজারেন্ট' বা যুদ্ধমান দেশ ও জাতি আখ্যা দেওয়া যায়?

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল তার তিন দিন পরে, অর্থাৎ ৬ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী বড়লাট লর্ড লিনলিথ গো-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এক প্রেস-স্টেটমেণ্ট[১] বার করলেন যাতে বলা হলো—ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের স্বরাজ লাভের বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও ব্রিটেনের এ বিপদের সময় ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা করা উচিত।

১৯২৭ সাল থেকে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ দেশবাসীর কানে কানে মনে মনে এই বুঝিয়ে এসেছেন যে, পরের কোন যুদ্ধই হবে ভারতের পক্ষে তার স্বাধীনতা লাভের একমাত্র সুযোগ—আর কিনা সেই কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসভার সর্বোচ্চ নেতা গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে সংবাদপত্রে ঘোষণা করলেন—ইংরেজের বিপদের দিনে ভারতবাসীর সাহায্য করা উচিত। এ ঘোষণা সমগ্র দেশের বুকে বোম্ব-শেলের আঘাতের মত বাজলো।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা সুভাষচন্দ্রকে দেশবাসীর চোখে যুক্তিবাদী মননের কাছে, ভারতের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক রূপেই প্রমাণিত করলো। তখন তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক সারা দেশ জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী এক আন্দোলন গড়ে তুললেন। আশ্চর্য সংগঠন শক্তি। কিছুতেই ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজ রাজশক্তিকে তার যুদ্ধ জয়ের জন্য সৈন্য, যুদ্ধাস্ত্র, রসদ সংগ্রহ করতে দেওয়া হবে না—যুদ্ধের প্রয়োজনে, উৎপাদনে ভারতবাসীকে তার অংশীদার করতে

---

[১] The Indian Struggle 1920-1942, Chapter XXII, Page 379

দেওয়া হবে না ; কারণ জার্মানী বা অক্ষশক্তি ভারতের শত্রু নয়। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজশক্তিরই পদানত—তার অবিচার অত্যাচারে নিপীড়িত। এইতো মাহেন্দ্রক্ষণ, ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজকে এক একটা চরম আঘাতের অর্থ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-শক্তির এক একটি স্তম্ভ গুঁড়িয়ে যাওয়া।

সুভাষচন্দ্র ১৯৪০-এর জুন অধিবেশনে ঘোষণা করলেন “With every blow that she receives in Europe the Imperialist might of Britain is bound to loosen its grip on India.......”[২]

এই সুযোগ। কালবিলম্ব না করে ভারতবাসীর এখন দাবী হওয়া উচিত সাময়িক জাতীয় সরকারের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর। রণনীতি, কূটনীতি ও রাষ্ট্রনীতির অপূর্ব যুক্তিজাল এবং নির্ভুল হিসাব। কিন্তু হিসাব যে মেলে না—সেইখানেই ভুল। তাহলে যে-বিপ্লবী আদর্শের জয়কে, যৌবনের জয়কে স্বীকার করে নিতে হয়। সেইত ভুল। সেখানে আছে গতিশীলতা—বিজ্ঞান-শিল্প-সমর বিজ্ঞানের প্রসার—আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে একই তালে তালে দৃপ্ত ভঙ্গীমায় চলার পথের দাবী—এই-ই গান্ধীবাদীদের বিচারে ভুল। এই ভুলের বিচার বা বিচারের ভুলের বিরাট মাসুল দিয়ে চলতে হলো আরো সাতটি বছর। এবং আজও।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সাল। নাৎসী-জার্মানী পোলাণ্ডের ওপর তার প্রথম থাবা বসালো। ৩রা সেপ্টেম্বর—ইংলণ্ডের উপায় ছিল না জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে। দাউ দাউ করে সমরানল জ্বলে উঠতে থাকে আর বিশ্বের প্রধান শক্তিসমূহ এক এক পক্ষ অবলম্বন করতে থাকে। ৬ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী কংগ্রেসের হয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে সাহায্যের আবেদন জানালেন ভারতবাসীর কাছে, ভারতবর্ষকে একান্ত বিস্মিত করে দিয়ে। আর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে তিন বৎসরের জন্য বহিষ্কৃত সুভাষচন্দ্র ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক ও বামপন্থী দলগুলি এবং প্রকৃত স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ ব্রিটিশ বিদ্বেষে উত্তাল উদ্দাম হয়ে উঠলো। স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অভিজ্ঞ তাঁরও বিস্ময়ের সীমা নেই, সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী—ছ'মাসের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—সত্য সত্যই শুরু হয়ে গেছে দেখে। তখন বহিষ্কৃত সুভাষচন্দ্রকেই যুদ্ধ শুরুর পক্ষকালের মধ্যে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বিশেষ আমন্ত্রণে নিয়ে যাওয়া

২। Presidential address at All India Forward Block Conference, Nagpur, June 18, 1940.

হলো। ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতা বা আপোষের ক্লীব-নীতির সকল পরামর্শ সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে অতি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ভাষায় বললেন, যুদ্ধ চলাকালেই ব্রিটিশ শাসকবর্গকে ভারত ত্যাগ করানোর শক্তিশালী নীতি ও অসহযোগ আন্দোলন এবং যুদ্ধের জন্য ভারত শোষণের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে বাধাদান—স্বাধীনতা অর্জনের তা-ই একমাত্র পথ। বিহারের রামগড়ে তাঁর আপোষ বিরোধী মহাসম্মেলন—সে এক সুবিশাল জনসমাবেশ, তা দিল্লীর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ উভয়কেই বিমূঢ় করে দিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসকবর্গ এবং গান্ধী-নেহরু শাসিত কংগ্রেস নেতৃবর্গ উভয় সম্প্রদায়ই প্রমাদ গুণলেন—আর সুভাষচন্দ্র তাঁর সংকল্পে অটল।

১৯৪০ সালের জুন মাসে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেশ-নায়ক সুভাষচন্দ্র গেলেন এক সাক্ষাৎকারে। দুই মহাপুরুষের সে মিলন দৃশ্য বড়ই চিত্তাকর্ষক, নিঃসন্দেহে স্মরণীয়—কারণ সেই-ই ছিল দুই জীবনের শেষ সাক্ষাৎ। গান্ধীজী তাঁর সহকর্মীগণসহ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় মুখোমুখি, দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল সে মিলনাত্মক ও বিচ্ছেদাত্মক ঐতিহাসিক নাটক। সেই সময়ের মধ্যে ফ্রান্স, বিজয়ী জার্মান বাহিনীর নিকট সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত—ইংলণ্ডে ও ভারতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সম্মুখে তখন আতঙ্ক ও বিভীষিকা। ভারতে অকংগ্রেসী ও ফরওয়ার্ড ব্লকের হাজার হাজার কর্মী ও নেতা কারারুদ্ধ হয়ে চলেছেন, সুভাষচন্দ্র তাঁর আবেগময় আবেদনে গান্ধীজীকে শেষ আহ্বান জানালেন– তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস অন্তত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলুন—কারণ দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পর্ব, ভারতের মুক্তির এইতো শুভলগ্ন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর মত প্রকাশ করলেন– দেশ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয়। মুসলীম লীগের অধিপতি মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র মিলিত হলেন—হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তিতে ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির মূলোৎপাটন করার এই সুযোগ যাতে হারিয়ে না যায়। কিন্তু তিনি তাঁর পাকিস্তানের পিতৃত্বদানের স্বপ্নে নিমগ্ন —ইংরাজ শাসনের সাহায্যে কি উপায়ে ভারত উপমহাদেশকে ভাগ করে পাকিস্তান-পরিকল্পনা কার্যকরী হয়, একমাত্র সেই ভাবনায় জিন্না বিভোর। তারপর একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হলো সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যার বিবরণ দেওয়া এই পরিপ্রেক্ষিতে খুবই প্রয়োজন। ভারতের, তথা বিশ্বের অন্যতম মহাবিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের পূর্বে এই সাক্ষাৎকার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ইউরোপে, ভারতের মূল ভূখণ্ডে এবং আন্দামানে সাভারকরের মোট শাস্তির পরিমাণ ঘোষিত হয়েছিল পঞ্চাশ বছর। ছাব্বিশ বছর কারাগার জীবনের পর (১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন অনুযায়ী) অবশ্য ১৯৩৭ সালের ১০ই মে অবশেষে তিনি মুক্তিলাভ করেছিলেন। তাঁর অপরাধ ছিল, সন্ত্রাসবাদের পথে ভারতে ও ইউরোপে এবং ব্রিটিশভারতীয় সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিপ্লব-বিদ্রোহ সংগঠনের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন প্রচেষ্টা। বীর সাভারকর হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসেবে, ১৯৩৭-এর ১৩ই ডিসেম্বর নাগপুরের জনসভায় একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন—"পাকিস্তানের পরিকল্পনাকে বানচাল করবার জন্য হিন্দুদের প্রস্তুত হতে হবে।" সাম্প্রদায়িকতাময় হলেও তাঁর এ কথার যথেষ্ট তাৎপর্য ছিল। দুই কিস্তিতে পঞ্চাশ বছরের নির্বাসনে আন্দামান যাত্রার পূর্বে ব্যারিস্টার বীর সাভারকরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল একটি কুর্তা, একটি ছোট জলপাত্র, একটি লোহার থালা আর অন্য হাতের বগলদাবায় দুখানি কম্বল ও একটি নারকেল ছোবড়ার তৈরী শতরঞ্চি···বোম্বাই থেকে মাদ্রাজের পথে রেলের এক বিশেষ কামরায় হাতে হাতকড়ি ও পায়ে শেকল পরা অবস্থায় চারদিকে ভারতীয় প্রহরী বেষ্টিত ও একজন ইংরেজ পুলিশ অফিসারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ভারতীয়—ইংলণ্ডে বন্দী করে ব্রিটিশ ভারতে বিচারের জন্য চালান হওয়ার পথে যাঁর পক্ষে ফ্রান্সের মার্সাই-বন্দরে জাহাজের পোর্টহোল দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে পালানো সম্ভব, সে রকম বিপজ্জনক বন্দীকে ভারতের রেলগাড়ীতে কত সতর্কতার সঙ্গে গোপনে চালান করে দিতে হবে না? [লেখক জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর নৌ-বিভাগীয় জনৈক অফিসার রূপে আন্দামান সফরকালে ১৯৬৬-র সেপ্টেম্বরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভয়ঙ্কর সেই কুখ্যাত সেলুলার জেল ও তার দুটি বিশেষ 'সেল' (কুঠরী) দর্শন করেন—যেখানে বিভিন্ন সময়ে বীর সাভারকরকে বন্দীরূপে রাখা হয়েছিল। ১৯৬৬-র ২৬শে ফেব্রুয়ারী এই দুর্ধর্ষ বীর দেশসেবকের মৃত্যু হয়।]

১৯৪০-এ সাভারকর-সুভাষের যোগাযোগটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নেতাজীর ভারত পরিত্যাগ ও বহির্ভারতে জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন ও যুদ্ধ পরিকল্পনায় এই অসীম সাহসিক দেশপ্রেমিক বীর সাভারকরের সমর্থন ছিল অত্যন্ত প্রবল। সুভাষচন্দ্র শেষবারের মত ভারতে ব্রিটিশের কারাগারে বন্দী হওয়ার পূর্বে গান্ধী-জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাভারকরের সঙ্গে মিলিত

হন। এই সময় সাভারকর সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ডক্টর এন. বি. খারের আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রতি সাভারকরের উক্তি জানা যায়।[৩]

সুভাষচন্দ্রের বিপ্লব চেতনা যুদ্ধপরিকল্পনার সঙ্গে এমন একাত্মতা রাসবিহারী বোস ও সাভারকর ভিন্ন প্রথমস্তরের ভারতীয় অন্য কোন নেতার মধ্যে সামান্যটুকুও প্রতিফলিত হতে আমরা দেখিনি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 'ইণ্ডিয়ান ইনডিপেণ্ডেন্স লীগ'-এর প্রেসিডেন্ট রাসবিহারী বোসের প্রসঙ্গ ও প্রস্তুতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সাভারকরের আলোচনায় ছিল যা সুভাষচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করে। যুদ্ধলিপ্ত ব্রিটিশের সংকটে তাকে ভারতের মাটি থেকে বহিষ্কারের একমাত্র পথ সুভাষচন্দ্রের মত দুঃসাহসী তরুণের ভারত থেকে সরে পড়া, ইংরেজের শত্রুপক্ষের সাহায্যে সংগ্রহ সমরসম্ভার দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে আক্রমণ ও বিতাড়ন করা—এই ছিল বীর সাভারকরের মতামত। ভারতের ভাগ্যাকাশে শাস্ত্র ও শস্ত্রের মন্থনে উদ্ভূত মহাযোগী বীর ধনঞ্জয়ের সত্য সত্যই যেন প্রকাশকাল এগিয়ে আসতে থাকে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কার্যসূচী নিলেন সুভাষচন্দ্র। কলকাতার বুক থেকে ইংরেজের মিথ্যা ইতিহাস মুছে দিতে হবে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা—দেশপ্রেমে, স্বাধীনতা রক্ষায় যিনি আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, যাঁর নামে 'অন্ধকূপ হত্যা'র প্রত্যক্ষ কলঙ্কের নিদর্শন 'হলওয়েল মনুমেণ্ট'—সেই মিথ্যা কুখ্যাত ইতিহাস মুছে দিতে হবে। তাই সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন সুভাষচন্দ্র—ফরওয়ার্ড ব্লকের সহস্র সহস্র অনুগামী, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, বহু নারী-পুরুষ, শ্রমিক-জনতার নেতৃত্বে শত-সহস্র পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে এগিয়ে চলার প্রস্তুতি নিলেন বিপ্লবের মহানায়ক সুভাষচন্দ্র। বাঙ্গালী ঐতিহাসিক গবেষক অক্ষয়কুমার মৈত্র তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণায় প্রমাণ করেছিলেন—ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে 'অন্ধকূপ হত্যা' বা ব্ল্যাকহোল ট্রাজেডী—অবাস্তব এবং অসত্য, এবং ঐরূপ ঘটনার সঙ্গে সিরাজউদ্দৌল্লার কোন সংস্রব নেই। অতএব ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত এ কলঙ্ক-স্মৃতিচিহ্ন অপসারিত

৩। "This is the only way to drive out the British by taking advantage of their difficulties. A daring and enterprising young man like you should slip away from India, secure help from the enemies of the British and invade India to drive away the British by an armed conflict."
মণি বাগচী—বীর সাভারকর : পৃষ্ঠা ১৯৯

করতে হবে। তাছাড়া যে হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে দীর্ঘকাল—যেন তারই মূল ধরে টান দিলেন সুভাষচন্দ্র। কারণ, সিরাজউদ্দৌল্লা মুসলমান নবাব। ইংরেজ ভেদনীতি কূটনীতির সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটলো সেদিন, সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করা হলো।[৪] ইংরাজ নির্মিত হলওয়েল মনুমেণ্ট চিরকালের জন্য বাংলার জনমানস থেকে অপসারিত হলো।

বিনা বিচারে কারাগারে আবদ্ধ সুভাষচন্দ্র। কিন্তু ভারতে ফরওয়ার্ড ব্লকের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনই শুধু নয়, বহু প্রদেশে বহু গান্ধী-নেহরু অনুগামীগণ নেহরু ও গান্ধীর নির্দেশ অমান্য করেও ইংরাজ বিরোধী আন্দোলনে অগ্রসর হলেন। কংগ্রেসের বহু নেতার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হলো এবং গান্ধীজী প্রচণ্ডভাবে মানসিক ও দলীয় চাপের সম্মুখীন হলেন। অবশেষে ১৯৪০-এর অক্টোবর মাসে ব্রিটিশের প্রতি কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি স্থির করেছেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের যুদ্ধোদ্যমে বাধাদান করবেন কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়।

কারান্তরালে বসে সুভাষচন্দ্র তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। "প্রথমত, যুদ্ধে ব্রিটেনের পরাজয় হবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়েও ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীদের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবেন না এবং স্বাধীনতার জন্য তাঁদের লড়াই করতে হবে। তৃতীয়ত, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারত যদি তার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং যে সব শক্তি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়ছে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তবে সে স্বাধীনতা লাভ করবে। তিনি নিজে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, ভারতের সক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত।"[৫]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ মিত্রশক্তির জয় হয়েছিল ঠিকই কিন্তু পৃথিবীর ভূগোলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে শুধু দ্বীপপুঞ্জটি 'যুক্তরাজ্য' নামের অস্তিত্বে বিরাজমান। বিজয়ী হয়েও নিজের সামরিক

৪। ১৯৪০ সালের ২রা জুলাই তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়, এবং ১৯৩৯-এর ১১ই এপ্রিল তারিখে মহম্মদ আলি পার্কে একটি হিন্দী বক্তৃতা ও ঐ বছর ১৮ই মে তারিখে 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-পত্রিকায় 'দ্য ডে অব্ রেকনিং' নামে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা দায়ের হয়।

৫। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু—সমগ্র রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০০

শক্তি, শিল্প-বাণিজ্য সম্ভার এবং সেরা যুব সম্প্রদায় ইংলণ্ড হারিয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় মধ্য পথেই। যুদ্ধের শেষেও ব্রিটিশ ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। শেষ দিনটি পর্যন্ত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের যুদ্ধ, ব্রিটেনের চরম আর্থিক দেউলিয়া অবস্থা, মহাযুদ্ধের পর গ্রেট ব্রিটেনে চার্চিল সরকারের পতন ও নৌবিদ্রোহ শেষে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

আরো এগারো বার ব্রিটিশ কারাগারে তিনি বন্দী হয়েছেন কিন্তু এখন তাঁর পক্ষে জেলে পড়ে থেকে থেকে পচতে থাকা এক প্রকাণ্ড ভুল হবে; বাইরের বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে তখন ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে চলেছে মুহূর্তে মুহূর্তে। অথচ কোন্ উপায়ে কারা প্রাচীরের বাইরে আসবেন তিনি? ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অবরুদ্ধ রাখতে বদ্ধপরিকর। সুভাষচন্দ্র ১৯৪০-এর নভেম্বরে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আশ্চর্য তাঁর দৃঢ় চিত্ততা—ভীষণ তাঁর সে প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু কি উপায়ে ভারত আন্তর্জাতিক রাজনীতি-রণনীতির সহায়তা পাবে। কোন দেশ তার রণসম্ভার ভারতের প্রয়োজনে দিতে প্রস্তুত হবে—এর সহজ উত্তর প্রস্তর-কারাগার জানে না। একবার মুসোলিনীর কথা মনে হয়—ইটালীর সেই দুর্ধর্ষ মিলিটারী নায়ক বেনিটো মুসোলিনী—যিনি রোমে সুভাষচন্দ্রকে একদা সম্বর্ধিত করেছিলেন।* আর একবার এ্যাডলফ হিটলারের কথা। যার সন্ত্রাসে সমগ্র ইউরোপ এখন কম্পমান। যদিও তাঁর মনে হয় এই অক্ষশক্তির জয় অনিবার্য; কিন্তু হিটলারের প্রতি তাঁর মনে কোন আচ্ছন্ন ভাব নেই। তাঁর সহযোগিতার হাত শুধু ভারতের স্বাধীনতার জন্য অগ্রসর হবে তা তিনি সুনিশ্চিত নন; সেখানে আছে জার্মানীর স্বার্থের গন্ধ। রাশিয়ার মানসিকতা ভারতের অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা এবং সে ধারণা যুক্তিনিষ্ঠ। কারণ, জারতন্ত্রের সুকঠিন নিষ্পেষণ থেকে রুশ-জনগণের ১৯১৭তে রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে স্বাধীনতার সাথে (স্মৃতি হয়তো) ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অক্টোপাশ থেকে ভারতবাসীর মুক্তির সামঞ্জস্য বর্তমান। কিন্তু কে সেই কূটনীতিক, যিনি রাজদূতের কাজ সমাধা করতে সমর্থ? সুভাষচন্দ্র আর স্ট্যালিনের মধ্যে

---

* ১৯৩৩–৩৬ সালের মধ্যে রাশিয়া বাদে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রনায়কসহ রোমের সিনর মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মুসোলিনী কর্তৃক উষ্ণভাবে অভার্থিত হন।

(ক) স্বাধীনতার অগ্রদূত, পৃষ্ঠা ৪০৪
(খ) সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী (২য় খণ্ড), পৃষ্ঠা ১৮৯

আন্তর্জাতিক রাজনীতির তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন একান্ত বিশ্বাসভাজন সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব থাকা চাই। অজানা দুর্গমের হাতছানি বন্দী সুভাষচন্দ্রকে পাগল করে তুললো।

সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন, আমৃত্যু অনশন। বাংলার গভর্নরকে চিঠিতে লিখলেন যে, 'ভারত রক্ষা আইনে' তাঁকে আটক করা হয়েছে। তাঁর মতে এই আইন 'ভারত দমন আইন'। এই আইনের প্রতিবাদেই তাঁর অনশন। তাঁকে বলপূর্বক খাওয়ানোর চেষ্টা যেন না হয়, সেক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয় বাধাদান করবেন। তেমন ব্যর্থ চেষ্টা না করে তাঁকে নীরবে মরতে দেবার আশা প্রকাশ করলেন তিনি।

' "At last", he says, "I decided myself to get out of India". ...he announced that he would starve himself to death.'[৬]

এই বিষয়ে বাংলার গভর্নরকে ২৬-১১-৪০ তারিখে লেখা তাঁর চিঠি[৭] ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি রাজনৈতিক দলিল। শুধু রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে একটি 'টেস্টামেণ্ট' বা উইল হিসাবে নয়, জীবনবাদের বিচারেও এটি একটি অতি স্মরণীয় ও মহামূল্য সম্পদ।

এই চরম পত্রটিকে গভর্নমেণ্ট প্রথমত বিশেষ গুরুত্ব দেননি এবং এটি একটি উন্মাদ পরিকল্পনা ও এ বিষয়ে কিছুই করার নেই—এরকম মন্তব্য করে হোমমিনিস্টার সুভাষচন্দ্রের মেজদাদা বঙ্গীয় আইন সভার বিরোধী নেতা শরৎচন্দ্র বসুকে জানিয়ে দেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী ২৯শে নভেম্বর জেলের মধ্যে অনশন শুরু করলেন। সাতদিন পর অবস্থা

৬। The Springing Tiger—Hugh Toye, p. 62.

৭। 'H. E. the Governor of Bengal, The Hon. Chief Minister, The Council of Ministers.' (November, 26, 1940)

'Government are determined to hold me in prison by brute force. I say in reply—Release me or I shall refuse to live—and it is for me to decide whether I choose to live or to die.

'Though there may be no immediate, tangible gain, no sacrifice is ever futile. It is through suffering and sacrifice alone that a cause can flourish and prosper and in every age and clime the eternal law prevails —'the blood of the martyr is the seed of the church.

'In this mortal world everything perishes and will perish —but ideas—ideals and dreams do not. One individual may die for an idea—but that idea will, after his death, incarnate itself in a thousand lives. That is how the

গুরুতর আকার ধারণ করলো। দুর্বল শরীরে তাঁকে বলপূর্বক খাওয়ানোর সরকারী চেষ্টাকে তিনি বাধা দিলেন—মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিল। বাংলার প্রধানমন্ত্রী (সে সময় প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হতো) খাজা নাজিমুদ্দীন সুভাষচন্দ্রের কারাগারে অনশনে মৃত্যুর ঝুঁকি নিলেন না—সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজকর্মচারীদের জরুরী গোপন বৈঠকে সুভাষচন্দ্রকে স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ার পর আবার কয়েক মাসের পর গ্রেপ্তার করার প্ল্যান করে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হলো। ৩৮/২, এলগিন রোডের বাড়ীতে চল্লিশ দিন অন্তরীণ রইলেন সুভাষচন্দ্র স্বাস্থ্যোদ্ধারের কারণে। তার বিভিন্ন পোশাকে রাস্তায়, গলিতে, মোড়ে মোড়ে, ছোট বড় দোকানের মধ্যে এবং বাড়ীর ওপর শ্যেনদৃষ্টিতে গোয়েন্দার বিশাল বাহিনী কতভাবেই না তাঁর গতিবিধির ওপর সদা সতর্ক পাহারা দিয়ে চললেন। সম্ভবত, বীর সাভারকর ছাড়া আর কোন বিপ্লবী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে এমন সন্ত্রস্ত করে তোলেনি।

১৯৪১-এর ২৬শে জানুয়ারী তারিখটা ছিল তাঁর রাজদ্রোহের বিচারের দিন। ব্রিটিশ রাজের ভারতবর্ষ শাসনের অধিকারকেই যিনি স্বীকার করেন না—তাঁকে বিচারের অধিকার কি? তাই তাঁকে পাওয়া যায়নি সেদিন। কোথায় তিনি? কেউ জানে না। মাসাধিক কালই জানতে ব্যর্থ হলো তদানীন্তন বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা বিভাগ—সেই দুঃসাহসী বাঙালী বিপ্লবী

> wheels of evolution move on and the ideas and dreams of one generation are bequeathed to the next. No idea has ever fulfilled itself in this world except through an ordeal of suffering and sacrifice.
>
> 'To my countrymen I say—'Forget not that the greatest curse for a man is to remain a slave. Forget not that the grossest crime is to compromise with injustice and wrong. Remember the eternal law—you must give life if you want to get it. And remember that the highest virtue is to battle against inequity, no matter what the cost may be.
>
> 'To the Government of the day I say—'Cry halt to your mad drive along the path of communalism and injustice. There is yet time to retrace your steps. Do not use a boomerang which will soon recoil on you. And do not make another Sind out of Bengal.'
>
> '...I shall commence my fast on the 29th November 1940. As in my previous fasts I shall take only water with salt. But I may discontinue this later on, if I feel called upon to do so.'

সুভাষচন্দ্র বোস কোথায়? ভারতের রাজধানী, বন্দর, নগর, বিমান ঘাঁটি থেকে শুরু করে পাহাড়-পর্বত সীমান্তের যত রাষ্ট্র দূতাবাসের ঘাঁটি—ভয়চকিত শিহরিত হয়ে উঠলো সমগ্র ভারতবর্ষ। তোলপাড়—বোস এসকেপড, বোস এসকেপড! কোথায় বোস!

ইংরেজী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী তারিখটা ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪১ সাল। স্থান কলকাতা মহানগরীর দক্ষিণাংশে এলগিন রোডের জানকীনাথ বসুর বাড়ী অর্থাৎ ভবানীপুরের বর্তমান মেট্রোরেল স্টেশন অঞ্চল। আর নাটকের একদিকে ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্রিটিশ-ভারত গোয়েন্দা বিভাগের ৬২ জন সি. আই. ডি. পুলিশ—সময় ঘোর রাত্রিকাল। সেই স্থান-কাল-পাত্রগণের আয়োজিত ইতিহাস-মঞ্চের পাদপ্রদীপে একজনই মাত্র অভিনেতা; তারই দুর্জয় অভিযান। দুর্গম পথের সে পথিক। এই রহস্যময় ছদ্মবেশীর পথ পরিক্রমা শুরু হলো একটা দেশ ও জাতির—তার সমগ্র জাতীয় সংগ্রামের নতুন দিকের দিশারী হিসাবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—'কেবল যুদ্ধ, অবিরাম যুদ্ধ, প্রতিবার পরাজয় জেনেও যে যুদ্ধ তাই শ্রেষ্ঠ বীর ধর্ম।' স্বামীজী বীর হতে, নির্ভয় হতে ডাক দিয়েছেন। তাঁর কথা ছিল মাতৃমন্ত্রের যথার্থ সাধক যারা তাদের হতে হবে অতি কঠিন এবং সিংহের ন্যায় অকুতোভয়, সমস্ত বিশ্বজগৎ যদি তাদের সম্মুখে ভেঙে পড়ে তথাপি তারা বিপর্যস্ত হবে না।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনে সেই অরুণোদয় মুহূর্তে আমরা যে ভাব সমন্বয় দেখেছি, স্বামীজীর প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তদর্শন যাঁর শিরা-উপশিরায় অনুরণিত হয়েছে যৌবনের শুরুতেই, তাঁর সেই আত্মোপলব্ধি, আত্মবিশ্বাস তাঁকে কতখানি অকুতোভয় করতে পেরেছে—আজ তাঁর নিজেকে অজানা ভবিষ্যতের কালগর্ভে সঁপে দেবার মুহূর্তে যদি মিলিয়ে দেখতে পারি—তাহলে হয়তো প্রমাণ করতে সুবিধা হবে—ইনিই বিবেকানন্দের দ্বিতীয় সত্তা, "তেমন অনেক বিবেকানন্দ সময় হইলেই আসিবে"—স্বয়ং বিবেকানন্দের সে ভবিষ্যদ্বাণীর মূর্তিমান প্রকাশ।

প্রস্তুত হলো ইতিহাসের এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা, ভাগ্যের সঙ্গে দাবা খেলা। ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যের গণ্ডি ভেঙে পাশ্চাত্যের কোন্ এক দুরধিগম্য যুদ্ধোন্মত্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাজধানীতে যেতে হবে। সেখানে রাষ্ট্রনায়কদের শিবিরে সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করে যুদ্ধাস্ত্র কামান, বিমান নিয়ে স্থলপথে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ব্রিটিশ ভারত

আক্রমণ, দিল্লী অভিযান! রাজধানী থেকে শত্রু নিপাত। এ যেন কল্পলোকের রাজকুমারের পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে কোন দূর দূর শূন্য পথে দুর্গম পাহাড়-পর্বত মরু-সাগর পেরিয়ে যাওয়ার এক স্বপ্নিল কাহিনী। অথচ মায়ারাজ্যের কোন স্বপ্নলোকের চেয়েও সত্য সুভাষচন্দ্রের সে কাহিনী।

এই লেখক আগেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, নেতাজীর রাশিয়ার পথে চলে যাওয়ার মনোভাবের কথা—অক্ষশক্তির প্রধান দেশ জার্মানীতে নয়। এর কারণ, কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ সুভাষচন্দ্রের কাছে যে অধিক গ্রহণীয়, তা নয়, তবে ফ্যাসিবাদের প্রতি অনীহা ছিল তাঁর আরো অনেক বেশী। (লেনিনের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শে তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আধুনিক যুগের বিশ্বের যে কোন রাজনীতিজ্ঞ অপেক্ষা লেনিনের দর্শন-ই তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিল সব থেকে বেশী)। উত্তম চাঁদ মালহোত্রা—পলাতক সুভাষচন্দ্রকে কাবুলে আশ্রয় দেওয়ার জন্য যাঁর সমস্ত ধন-সম্পত্তি, রেডিওর ব্যবসা গভর্নমেণ্ট সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল, বাড়ীটি ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছিল এবং যাঁর পরিবারের সকলকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মধ্যে কাবুল থেকে বহিষ্কার ও স্বয়ং সেই মহান দেশপ্রেমিককে শৃঙ্খলিত করে কঠোর নির্যাতন করেছিল কারাগারের মধ্যে, সেই শ্রীমালহোত্রার বক্তব্য থেকে জানা যায় সুভাষচন্দ্রের রাশিয়া চলে যাওয়া বিষয়ে মনস্থির করার কথা।

তা ছাড়া জানা যায়, সুভাষচন্দ্র যখন ভিয়েনায় চিকিৎসার জন্য অবস্থান করেছিলেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ চলছিল, সেই সময় ভিয়েনায় কম্যুনিস্ট পার্টিকে হিটলার তখনো বেআইনি ঘোষণা করেননি, ফ্যাসিস্ট হাইমভিয়ারের আক্রমণে তখনো মিউনিখের পতন হয়নি, এমনই এক সময় সুভাষচন্দ্রের কথামত সেখানকার কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী এম. মাথুরকে ভ্রাতুষ্পুত্র, মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের খনিবিদ্যার পি.এইচ.ডি. গবেষক অশোকনাথ বসু উপস্থিত করলেন। এই মাথুরের সাহায্যে সুভাষচন্দ্র তাঁর সোবিয়েৎ রাশিয়ায় চলে যাবার জন্য সে দেশের গভর্নমেণ্টের কাছে ভিসার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু সোবিয়েৎ সরকার নারাজ। ইতিহাসের গতি বড় রহস্যময়, রাশিয়া তাঁকে নিয়ে যেতে সেদিন আগ্রহী হলো না—তখনো যে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে তার আঁতাত রয়েছে—এই ইঙ্গ-রুশ চুক্তি ভঙ্গের ভয়ে রাশিয়া অনিচ্ছুক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক নম্বর ভারতীয় বিপ্লবী মহাশত্রুকে সাহায্য করতে।

কিন্তু কাবুল বহুদূর, পথ দুর্গম, তাই আমাদের পাড়ি দিতে কতই না অপেক্ষা, অন্তর্লোকে কত শঙ্কা, কত বজ্র-বিভীষিকা!

যে দুঃসাহসিক ইতিহাসের প্রবেশ পথে আমরা উপস্থিত, সমগ্র জাতির পক্ষে একজনেরই কঠিনতম সিদ্ধান্ত—গোটা দেশের ইতিহাসকে যা ওলট-পালট করে দেবে, তার পশ্চাতে রয়েছে বহু রোমাঞ্চকর জীবনের কাহিনী। ফরওয়ার্ড ব্লকের জেনারেল সেক্রেটারী লালা শঙ্করলাল, নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইলা বসু, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঞ্জিৎকুমার বসু (কার্তিক), শ্রীঅরবিন্দ বসু, অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু ও তাঁর স্ত্রী বিভাবতী বসু এবং তাঁদের দুই পুত্র ডঃ অশোকনাথ ও ডাঃ শিশিরকুমার বসু এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সতীশচন্দ্র বসুর পুত্র দ্বিজেন বসু এই ভয়ঙ্কর জীবন্ত নাটকের অংশীদার। ১৭/১৮ বছরের তরুণী ইলা বসুর জন্যে জেলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের সরকারী অনুমতি নেওয়া হলো। প্রেসিডেন্সী জেলের দোতলায় সবার পশ্চিমের ঘরখানায় বন্দী সুভাষচন্দ্র। তাঁর কাছে জেলের ফটকে সাক্ষাৎকারের সময় গরাদের ওপার থেকে প্রায় প্রতিদিনই মুখশুদ্ধির মশলার কৌটো হস্তান্তর হতে থাকে। এ্যারেস্ট করতে না পারা বিপজ্জনক বিপ্লবী শঙ্করলাল একবৎসরকাল পর ইউরোপ-এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ ও বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগসাজস এবং ভারত ত্যাগের সে দুর্গম যাত্রার বিস্তৃত প্ল্যান প্রস্তুত করে ৩৮/২, এলগিন রোডের বাড়ীতে অতি সঙ্গোপনে উপস্থিত হয়েছেন। অন্ততঃ দশটা দিন ত তাঁকে দরজা-জানলা বন্ধ অবস্থায় আত্মগোপনে থাকতে হবেই। এ সংবাদের 'নোট' মশলার কৌটোর ভেতর দিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইলার মারফৎ পৌঁছে যায়। কিন্তু সেই অতি গুপ্ত 'প্ল্যান'টি পাচার করা—সে বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার, ধরা পড়লে—'এনেমী এজেন্ট অর্ডিন্যান্স'-এ ফাঁসীর দণ্ডেরও সম্ভাবনা অনেকের, তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, 'নেতাজী'তে উত্তরণ হওয়া হয়তো অলীক স্বপ্ন বিলাসে পরিণতি! কলকাতা, দিল্লী, ভারতের সমতল ভূমির পথের নিশানা; পাহাড়-পর্বতে উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ, সমরখন্দ, রাশিয়া বরাবর সীমান্ত পর্যন্ত দেড় হাজার মাইল পথে বিভিন্ন রাজ্য—গোয়েন্দা ঘাঁটী—রেলস্টেশন, বিমানঘাঁটীতে, কে কোথায় রাত্রির অন্ধকারে সুভাষ বোসকে কি বেশে কি উপায়ে একে অপরকে হস্তান্তর করবে, মোটর গাড়ী, রেলপথ, নদী-পর্বতের পায়ে-হাঁটা পথে কোন্ রাজ্যের কোন্ ভাষাভাষী কি নামের মানুষ কোন পোশাকে কোথায় সঙ্গী, দেহরক্ষী হবে—এ দুস্তর পথের মানচিত্র-প্ল্যান বর্ণনা।

প্রেসিডেন্সী জেলের কুঠরীতে একটা ভাল রেডিও রাখার আবেদন মঞ্জুর হলো—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি, কলকাতার মহামান্য প্রাক্তন মেয়র সুভাষচন্দ্রকে—হোক না ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এক নম্বর শত্রু সে, কিন্তু সেই-ত মহাত্মা গান্ধীর একমাত্র সমকক্ষ ভারতীয়। অতএব সবার সেরা একটি এইচ. এম. ভি রেডিও সেট আর. এল. সাহা এ্যাণ্ড কোম্পানী থেকে সরবরাহ করা হলো। কিন্তু রেডিও সেটটা মাঝে মাঝে গণ্ডগোল করছে। অতএব মেকানিকের জন্য আবেদনপত্র মঞ্জুর হয়ে গেল। সাহা এ্যাণ্ড কোং-এর মালিক, কর্পোরেশনের কাউন্সিলার যোগেন সাহার নিকট হাজির হলেন নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র পঁচিশ বছরের তরুণ রঞ্জিৎকুমার বোস, যাঁর মস্তিষ্ক ও দেহ সমানভাবে এবং প্রচণ্ডভাবেই ক্রিয়াশীল। তখনও তাঁদের এলগিন রোড-এর বাড়ীতে রেডিও নেই—কলকাতা শহরে আজ থেকে প্রায় ৪৬ বছর আগে কটি বাড়ীতেই বা চালু হয়েছে! অতএব ১ নম্বর উডবার্ন পার্কের বাড়ীতে রেডিও শুনতে যাওয়া হয় মাত্র সন্ধ্যাবেলা। অতএব রেডিও সার্ভিসিং একটু দেখা-শেখা—এই আর কি। আবার সেই স্পেশাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ, সিম্পসন সাহেবের নিকট যেতে হয় রঞ্জিৎ বোসকে। দু-কপি অনুমতিপত্র রেডিও মেকানিককে দিয়ে দিলেন ভাল মানুষ সিম্পসন সাহেব। এক কপি জেলারের জন্য, আর এক কপি মেকানিকের নিজের কাছে থাকবে। থরো সার্চ-এর পর সাহেব-সার্জেণ্ট সঙ্গী-সাথী সদলবলে মেকানিককে মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুর জেলকুঠরীতে ঢুকিয়ে দরজায় 'এ্যাটেনশান'। কিছুক্ষণ-ত ঐ বড় এইচ. এম. ভি. রেডিওর ক্যাবিনেটের পিছনটা খুলে চেক করা এবং সেটটা বাজিয়ে দেখা। আরো কিছু বোধহয় ট্রাবল ছাদের এরিয়াল পয়েণ্টে, সে জন্য তা চেক করতে একটা মই চাই যে—ওপরে ওঠার জন্য। সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে তখন সার্জেণ্ট একটু এগিয়ে সম্পূর্ণ পিছু ফিরে শান্ত্রীদের বল্লেন সিঁড়ি জোগাড় করে আনতে। আর ঐ পলক টুকুর মধ্যেই রোল করা সেই মহা-ঐতিহাসিক প্ল্যানটি রাঙাকাকুর বিছানার গদীর তলায় ঢুকে গেল। মই বেয়ে ওপরে ওঠা-নামার পর মিস্টার বোস হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সার্জেণ্টের দৃষ্টির সামনে ভালভাবে নবগুলো দেখে সার্টিফাই করলেন—'অল রাইট, থ্যাঙ্কু'। ঝোলা হ্যাফ প্যাণ্ট পরা মেকানিক-বেশী রঞ্জিৎকুমারকে আবার পর পর ফটকের দরজা পেরিয়ে বাইরে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া হলো এবং অনুমতিপত্রের কপিটি ফেরৎ নেওয়া হলো।

আমেরিকার ম্যানহাটান প্রোজেক্ট থেকে আলবার্ট আইনস্টাইন পরিচালিত পরমাণু বোমার ফর্মুলার মাইক্রোফিল্মের রিলটা হিরোসিমায় বোমা বর্ষণ-সাফল্যের রাতেই আনন্দ-উৎসবের মধ্যে সিগারেটের প্যাকেটের ভেতর চালান করে মস্কোতে পৌঁছেছিল। ঘটনার বিচিত্রতা কিছুটা তুলনীয় বই কি! গুপ্তচর মারফৎ ঠিকই লালবাজার সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছিল—এলগিন রোডের বাড়ীতে আত্মগোপনকারী লালা শঙ্করলালের উপস্থিতি; প্রচণ্ড বিক্ষোভে পুলিশ ফেটে পড়েছিল তাঁর ওপর। নিরাপদে সীমান্ত পারাপারের স্লিপটা একদিন ইলার কাছে ঠিক সময়েই পৌঁছেছিল। আর কি প্রশান্তি! তারপর যেন, 'কাম হোয়াট মে'—আসুক সাইক্লোন—প্রলয়ের রুদ্ররূপ নিয়ে।*

নেতাজীর এক ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঞ্জিৎকুমার বসুর মাধ্যমে নেতাজীর ভারতবর্ষ থেকে মহানিক্রমণের প্রস্তুতিপর্বের আভাস পাওয়া গেল। আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র ডঃ শিশিরকুমার বসুর কথায় জানতে পারা যায় সেই প্ল্যান কিভাবে কার্যকরী হয়েছিল।

ডঃ শিশিরকুমার বসু লিখছেন, "সমস্ত ব্যাপারটা এমনভাবে প্ল্যান করতে হবে যে, সব কিছু যেন ফুল-প্রুফ হয়। অবশ্যই আমি এ সম্বন্ধে একটি প্রাণীকেও কিছু বলতে পারবো না। রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, তিনি গোপনে গৃহ ত্যাগ করে অজানা পথে পাড়ি দিয়েছেন—এলগিন রোডের বাড়ীতে সে কথা জানে একমাত্র ইলা। ইলা আমার খুড়তুতো বোন, আমার চাইতে বছর দুয়েকের ছোট। রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, ইলাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন আর 'তাঁর বিশ্বাস যে, সে পারবে।"৮

---

* নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র, অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসুর পুত্র প্রায় সত্তর বৎসর বয়স্ক শ্রীরঞ্জিৎকুমার বসু আত্মপ্রচারে সম্পূর্ণ বিমুখ, তাঁর ৩৩০, গড়িয়া মেন রোডের বাড়ীতে বারে বারে ঠেলে ওঠা চোখের জল চেপে রাখতে পারলেন না। দুই বোন ইলা ও বেলার (ইলা দত্ত ও বেলা মিত্র) কথা আর পরমশ্রদ্ধেয় রাঙা কাকাবাবু সুভাষচন্দ্রের মহানিক্রমণের পরিকল্পনা বর্ণনা করলেন লেখকের বিশেষ অনুরোধে ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৮৬ তারিখে। সে বড় সুন্দর, ভাবগম্ভীর অশ্রুময়, এক মহারোমাঞ্চের ইতিবৃত্ত।

৮। শিশিরকুমার বসু—মহানিক্রমণ: শারদীয়া দেশ ১৩৮১, পৃষ্ঠা—৪৫ (ডাক্তার শিশিরকুমার বসু নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শরৎচন্দ্র বসুর তৃতীয় পুত্র। মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররূপে ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী নেতাজীর ঐতিহাসিক দেশত্যাগের সময়

ইতিপূর্বে ভারতে সর্বশেষ কারাজীবনে আমরণ অনশনের পূর্বে তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসু মারফৎ সুভাষচন্দ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতা মিঞা আকবর শাহের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ করেন এবং তাঁর মারফৎ মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়। প্রেসিডেন্সী জেল থেকে মুক্তির পর এ্যাম্বুলেন্সে যখন এলগিন রোডে তাঁকে আনা হয়, তখন তাঁকে দেখবার জন্য বিভিন্ন ধরনের মানুষ আসতে থাকেন। সুভাষচন্দ্র শুয়ে শুয়ে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি দিনের পর দিন নিখুঁতভাবে রেডিওতে বার্লিন-রোম-লণ্ডন-মস্কোর রেডিও সেন্টার থেকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন।

এদিকে ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরের সঙ্গে গৃহত্যাগ পরিকল্পনার ছক ক্রমে পাকা হতে থাকে—ছদ্মবেশে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত যাওয়া, সীমান্ত প্রদেশ থেকে সঙ্কেত এলেই যাত্রা শুরু হবে সে অভিযানের। কিন্তু এলগিন রোডের বাড়ী থেকে অন্তর্ধানের পদ্ধতি ও গোপনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে স্থির হয়—সবচাইতে নিরাপদ প্ল্যান—বাড়ীর মধ্যেই উনি গাড়িতে উঠবেন। কোন রকম সন্দেহের উদ্রেক না হয় সে জন্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আলোচনায় এবং চিঠিপত্রে সুভাষচন্দ্র পুনঃপুনঃ বলতে লাগলেন যে, ওঁকে শীঘ্রই আবার জেলে ফিরে যেতে হবে। আত্মীয় সহকর্মী সকলের কাছে বারে বারে বলতে লাগলেন, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজরা তাঁকে ছাড়বে না। তাই ওঁর ব্যক্তিগত কাজকর্ম যেমন—তাঁর অনুপস্থিতিতে মহাজাতি সদনের কাজকর্মের পরিকল্পনা কি হবে ঠিক করা ও সব কাজ গুছোনো দরকার। তরুণ শিশিরকুমারের গাড়ী চালিয়ে বর্ধমান পর্যন্ত গিয়ে আবার সোজা কলকাতা ফিরে আসার সহ্যশক্তি ; ধানবাদ পর্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে গাড়ী চালিয়ে সেখানকার পথঘাট এবং বারারীতে বড় ভাই ডক্টর অশোকনাথ বসুর বাংলো বাড়ীর কাছের গাছপালা, ঝোপঝাড় ও গোমো স্টেশনের দূরত্ব—এসব বিষয়ে অনুসন্ধান শেষে পথে লেভেল ক্রসিং, পেট্রোল পাম্প, চৌকী এবং বিশেষত ড্রাইভার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহ্যশক্তি, সাহস ও বুদ্ধি-বিবেচনার রিপোর্ট নিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন দুঃসাহসী প্ল্যানার।

> কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ী থেকে গাড়ী চালিয়ে ধানবাদ স্টেশনের কাছে গোমো স্টেশনে পৌঁছে দেন এবং ১৯৪৪ সালে বন্দী হয়ে লাহোর জেলে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। নেতাজীকে ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ বোস বাড়ীতে সকলে 'রাঙাকাকা'বাবু বলে ডাকেন)।

মহানিক্রমণের মহাপ্রস্তুতি এগিয়ে চলে, এগিয়ে আসে ক্রমে ক্রমে সেই মহালগ্ন—নিশুতি রাতের অন্ধকার ভেদ করে নিঃশঙ্ক শুভযাত্রা মুহূর্ত। ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১ সালের গভীর অমানিশার দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত। তারও আগে অপেক্ষা, প্রতীক্ষা—সে যেন যুগ-যুগান্তরের অপেক্ষমাণ কাল—উদ্যোগপর্বের শেষ অধ্যায়ে উপনীত হতে এখনো যে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর সমীক্ষা! তাঁর ঘরের মধ্যে এক সুদর্শন পাঠান—উনিই মিঞা আকবর শাহ, সীমান্ত প্রদেশের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা। কাজ সেরে ফিরে যাবেন। কিন্তু অতিথির জন্য একটু কেনাকাটায় সাহায্য করতে হবে বৈ কি! ও প্রান্তে রাশিয়ার পথের জন্য আকবর শাহ আর এ প্রান্তে ভারতের পথে বাংলা থেকে বিহার পর্যন্ত গাইড শিশিরকুমার। কিন্তু ধর্মতলা স্ট্রীট—বর্তমানে যা লেনিন সরণি—সেখানকার বিখ্যাত পোশাক প্রতিষ্ঠান ওয়াছেল মোল্লার কাছ থেকে একটা টুপি ও পাজামা অবশ্যই ঠিক মাপের কিনতে হবে এবং তা আকবর শাহকেই কিনতে হবে—তাহলে গোয়েন্দা পুলিশের সন্দেহ আসে না। কেননা, 'দ্য এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া' লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এর ট্রাভেলিং ইন্সপেক্টার মহম্মদ জিয়াউদ্দিন এগুলো পরে যে কোনো জায়গায় জীবনবীমা বিষয়ে ইন্সপেকশনের কাজে যেতে পারেন। আর তাছাড়া, ঐ নামে 'আইডেনটিটি' কার্ডও ছাপিয়ে আনা একান্ত দরকারী —তা সেটা রাধাবাজারের এক অভিজাত দোকান থেকেই অর্ডারমাফিক নেওয়া ভালো।

মেজদাদা প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসুর দুখানা গাড়ী। খুব বড় যেটা 'স্টুডিবেকার-প্রেসিডেন্ট'। আর ছোটটাইতো আমাদের পছন্দ, জার্মান মডেল—'ওয়ানডারার'। ডাক্তারী পড়া ভাল ছাত্র শিশিরকুমার স্বাধীনভাবেই যখন তখন এই 'ওয়ানডারার' নিয়ে ওয়ানডারিংএ যান—এতো বাড়ীর সকলেই জানে। গেটের দরওয়ান, আত্মীয়-স্বজন, ভাইপো-ভাইঝি, পাশের বাড়ীর লোকজন অনেকেই দেখে—অতএব এই গাড়ীতে বেরিয়ে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। একদিন মহম্মদ জিয়াউদ্দিন পেশোয়ারী মুসলমান ভদ্রলোকের ছদ্মপরিচ্ছদে নিজেকে ভাল করে দেখলেন, নিশ্চিন্ত হলেন ভারত মায়ের দামাল ছেলে সুভাষ, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়ক কংগ্রেসের বহিষ্কৃত প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র মাতৃভূমির জন্য মাতৃভূমি ত্যাগে উন্নত শির! ভবিষ্যতের মহানায়ক নেতাজী সুভাষ, গৃহত্যাগে প্রস্তুত ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী!

ঘোষণা করা হলো—উনি জানিয়ে দিলেন, “উনি কিছুদিনের জন্য লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাচ্ছেন। এই স্বেচ্ছাকৃত অবসর ব্রতের সময় উনি কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না বা কথাও বলবেন না। ওঁর ঘরের মধ্যে দিয়ে দুটি পর্দা দু-দিক থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, যাতে ঘরের উত্তরদিকটা সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে যায়। রাঙাকাকাবাবু ঘরের সেই দিকটায় থাকবেন এবং তাঁর ব্রত উদযাপন করবেন। যে ঠাকুর ওঁর মার রান্না করে তার ওপর ভার থাকবে ওঁর খাবারটা সময়মত পর্দার তলা দিয়ে ঠেলে দেবে। আহার্য হবে নিরামিষ—তরকারী, দুধ, ছানা, মিষ্টি আর ফল। উনি চলে যাওয়ার পর ইলাকে এই ভাঁওতাটা চালিয়ে যেতে হবে। খাবারগুলো খেয়ে নিতে হবে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব কাজ করতে হবে।

“অন্তর্ধানের দিন দশ-বারো আগে আমার বাবা (শরৎচন্দ্র বসু) কলকাতায় ফিরলেন। রাঙাকাকাবাবু আমাকে বললেন, বাবাকে গিয়ে বলতে যে, যত শীঘ্র সম্ভব উনি বাবার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি গিয়ে মাকে খবরটা পৌঁছে দিলাম। পরদিন সন্ধ্যায় দুই ভাই মিলিত হলেন···আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম যে, ইদানীং রাঙাকাকাবাবু আমার সঙ্গে দীর্ঘ নৈশ আলোচনার সেসনগুলো ছোট করে দিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন।···বাবা আমার সঙ্গে একেবারে যাত্রার দিনে ছাড়া এ নিয়ে কোন সোজাসুজি কথা বললেন না··· রাঙাকাকাবাবু আমাকে ডেকে বললেন, তোমার বাবা আমাদের পরিকল্পনার কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। একটা পরিবর্তন হলোঃ তিনি চান এই যে, রাঙাকাকাবাবু চলে যাওয়ার পর উনি লোকচক্ষুর আড়ালে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন বলে ভাঁওতা দিতে হবে[৯] এবং শেষপর্যন্ত পুলিশকে বলতে হবে। এ ব্যাপারে এলগিন রোডের বাড়ীর কোন একটি ছেলেকে ভার দেওয়া হোক। আমিতো এলগিন রোডে থাকি না,; (১নং উডবার্ন পার্কে শরৎচন্দ্র বসুর নিজস্ব বাড়ী শরৎচন্দ্র বসু ভবন) সুতরাং আমার দ্বারা এ কাজ সম্ভব ছিল

---

[৯] গৃহ ত্যাগের পর প্রায় দশদিন যাবৎ সুভাষচন্দ্রের জন্য প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী ইলা-অরবিন্দ (সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসুর কন্যা ও পুত্র) খেয়ে নিতেন এবং ঘরের মধ্যে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত আলো জ্বালানো থাকতো। রাত একটা দেড়টার সময় অরবিন্দ রাঙাকাকাবাবুর অভ্যাস মতই বেসিনে কণ্ঠস্বর নকল করে গলা পরিষ্কার করতেন, যাতে গোয়েন্দা পুলিশ প্রহরীর এবং অন্যদের সন্দেহ না হয় যে, সুভাষচন্দ্র ঘরের মধ্যে নেই। অরবিন্দ বসুর দীর্ঘ কারাবাস ও নির্যাতন হয় ক্যাম্বেলপুরে। [শ্রীঅরবিন্দ বসুর সহিত লেখকের সাক্ষাৎকার ২৯.১০.৮৫]

না—পরে পুলিশের যে অবশ্যম্ভাবী জুলুম হবে ইলার মত অল্প বয়সী মেয়ে তার মুখোমুখি হোক এটা বাবা একেবারেই চান না। রাঙাকাকাবাবু বাবার কথা মেনে নিয়েছেন মনে হলো …। আমি আমাদের জ্যাঠতুতো দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম করলাম।"[১০] নেতাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সতীশচন্দ্র বসুর পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু নেতাজীর পলায়নে প্রত্যক্ষ সাহায্য, পুলিশ বিভাগকে বিভ্রান্ত করা ও গোপনীয়তার জন্য পাঞ্জাব সীমান্তে ক্যাম্বেলপুরে দীর্ঘ কারাবাসে পুলিশের অমানুষিক দৈহিক অত্যাচার সহ্য করেন ও তাঁর কোমর ও শিরদাঁড়ার অস্থি ভেঙে যায়। শিশির বসুকে প্রথমে লালকেল্লার সেলে এবং পরে সেখান থেকে লাহোর ফোর্টের কারাবাসে থাকতে হয়।

উত্তরণের সে মহানিষ্ক্রমণের মহালগ্ন আগত। আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"নিবিড় অরণ্য মধ্যে অন্ধকারে মহাপুরুষের প্রশ্নের উত্তরে সত্যানন্দ বলিলেন তিনি দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারেন। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, 'প্রাণ তুচ্ছ, সকলেই দিতে পারে।' সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কি আছে—আর কি দিব?' উত্তর হইল 'ভক্তি'।" নেতাজী এই 'ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।'[১১] তাঁর এই 'ভক্তির' পরিচয় তাঁর জীবনভোর ছড়ানো এবং কি সুন্দর সুসমঞ্জস, তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। তাঁর কাজ, কথা, ভাব, অভিব্যক্তি এবং এক কথায় জীবনবোধের সর্বাবস্থাতেই মনুষ্য জীবনের সেই অতি বিরল 'ভক্তি' বস্তুটি সুপরিস্ফুট। গৃহত্যাগের শেষ মুহূর্তের সঙ্গী ভ্রাতুষ্পুত্রের লেখায় জানা যায়ঃ "রাঙাকাকাবাবুর নির্দেশমত এক সন্ধ্যায় ইলাকে আমার গাড়ীতে করে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গেলাম। আমি কালী মন্দিরের দরজায় অপেক্ষা করলাম, ইলা একটি ছোট তাম্রপাত্র নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল। পূজার ফুল ও চরণামৃত হাতে করে সে বাড়ী ফিরে এল।" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পূজিতা দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের স্পর্শ ও সেখানকার পরম পবিত্র মৃত্তিকা ঋষি অরবিন্দের নিকট থাকত। শ্রীরামকৃষ্ণ ও দক্ষিণেশ্বর—সে দেবস্থানের ফুল-চরণামৃত স্পর্শে হয়তো বা মুহূর্তের শিহরণ! ভক্তিস্নাত হয়ে উঠলো মহাশক্তির অনুভব সমগ্র সত্তায়! সুভাষচন্দ্র প্রস্তুত হলেন।

১৬ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার, ১৯৪১, সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করতে হবে। শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং পরীক্ষিত তাঁর যাত্রা পথের সঙ্গী স্নেহের ভাইপো শিশির-

---

১০। মহানিষ্ক্রমণ, পৃষ্ঠা ৫২

১১। নেতাজী সুভাষচন্দ্র—জয়শ্রী, মাঘ, ১৩৬২

কুমারকে একসময় বললেন—"আমি অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। অনেকদিন—হয়তো কুড়ি বছর আমি দেশে ফিরতে পারবো না, তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।" পঞ্চাশ বছর কালের প্রতীক্ষা, আজো দেখা হলো না—চকিতের জন্য ভারতের সঙ্গে, তাঁর পুণ্যভূমির সঙ্গে স্পর্শ ঘটেছিল যখন তিনি ভারতে ব্রিটিশ-আমেরিকান সমর শক্তিকে আক্রমণ করেছিলেন। সহস্র সহস্র মাইল দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু সে অভিযান তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থলপথে অথবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে নয়—তা ছিল আরো ভয়ঙ্কর, আরো দুর্দম এক পরাক্রমশালী মহাসমরাভিযান। স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করে সেই ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনীসহ তার মহানায়ক ও রাষ্ট্রপ্রধান রূপেই এসেছিলেন—এক সময়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের বহিষ্কৃত তরুণ, সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রমে-মঠে সন্ন্যাসী হওয়ার চেষ্টায় অক্লান্ত ঘুরে ঘুরে বেড়ানো এক বাঙালী কিশোর সুভাষচন্দ্র বোস—হিজ একসিলেন্সী, সুপ্রীম কম্যাণ্ডার অব দ্য আই. এন. এ.—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। ইংরেজ রাজশক্তি ও সমরশক্তির সঙ্গে কখনো সম্মুখ যুদ্ধে, কখনো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমান অংশীদার রূপে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—যার পরোক্ষ ফলস্বরূপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং ভারতবর্ষ মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই বিশাল অপূর্ব ধনধান্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত জন্মভূমি ভারত উপমহাদেশ নয়, খণ্ডিত ভারত। সে ইতিহাসে আমরা উপস্থিত হবো পরবর্তী অধ্যায়ে, তার পূর্বে দেশ ত্যাগের প্রথম পদক্ষেপের কাল এগিয়ে আসে।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পুনরায় জেলে যাওয়ার প্রস্তুতি চলেছে—বহু ব্যক্তি সেজন্য এলগিন রোডের বাড়ীতে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে চলেছেন। এঁদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি অবশ্যই আছেন। এঁদের অন্যতম হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার। তাঁর কিছু কথা এখানে খুবই প্রযোজ্য। কটকে একই স্কুলে সুভাষচন্দ্রের উপরের ক্লাসের ছাত্র ছিলেন ডঃ মজুমদার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে কলকাতায় এসে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। "সুভাষ একবার আমাকে বলিল যে, দেশের কাজের জন্য তাহার অনেক অর্থের প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া আমি মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করিলে ভাল হয়। ঢাকার অধ্যাপক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঘোষ ও আমি যে

এইরূপ গোপনে বিপ্লবীদিগকে সাহায্য করিতাম তাহা সে জানিত। সম্ভবত জ্ঞান ঘোষকেও এই কথা বলিয়াছিল…” (১৯২১)। “…নির্দিষ্ট সময়ে আমি এলগিন রোডের বাড়ীতে গেলাম (১৯৪১ জানুয়ারী)। বাড়ীর দরজায় ২/৩ জন পুলিশ বা মিলিটারী লোক ছিল, কিন্তু তাহারা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। ভিতরে যাইতে কোনরূপ আপত্তি করিল না। আমি দোতলায় উঠিলাম—সবই প্রায় অন্ধকার, লোকজন কেহ নাই। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে একটি যুবক বাহির হইয়া আসিল। আমার নাম শুনিয়াই বলিল—‘আসুন আমার সঙ্গে’। পরিচয় দিল সে সুভাষের ভাইপো। আমি তাহার পিছন পিছন একটি কি দুইটি শূন্য কক্ষ পার হইয়া আর একটি কক্ষের রুদ্ধ দ্বারের কাছে পৌঁছিলাম। সে বলিল, ‘আমার আর যাইবার অনুমতি নাই। আমি চলিয়া যাইতেছি। আপনি তাহার পর এই দরজা খুলিয়া ভিতরে যাইবেন।’ ভিতরে গিয়া দেখিলাম, ঘরের এক কোণে একটি খাটের উপর সুভাষ শুইয়া আছে। তাহার মুখময় দাড়ি গজাইয়াছে, মনে করিলাম অসুখ বলিয়াই বোধহয় দাড়ি কামায় না। খাটের নিকটে একখানা চেয়ার ছিল, তাহাতে বসিয়া সুভাষের শারীরিক অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আমাকে কেন ডাকিয়াছ’। সুভাষ বলিল—‘কিছু টাকার দরকার।’ আমি বলিলাম, ‘তুমি তো পীড়িত, শয্যাশায়ী—এ অবস্থায় টাকা দিয়া কি করিবে?’ সুভাষ একটু হাসিয়া জবাব দিল—‘এ প্রশ্ন তো কোনদিন করেন নাই, টাকা চাহিলেই দিয়াছেন—আর সেই ভাল, কারণ আপনারা বিপদে পড়েন এটা আমরা চাই না।’ আমি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলাম—‘সে কথা ঠিক, টাকা কিসের জন্য চাও কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে টাকা চাওয়া মানে কোন কাজে লিপ্ত হওয়া—তোমার এই গুরুতর অসুখ, তোমার জীবনের আশঙ্কা আছে বলিয়াই তোমাকে জেল হইতে বাড়ীতে পাঠাইয়াছে। এই অবস্থায় তোমার বিশ্রাম দরকার—এই জন্যই প্রশ্ন করিয়াছিলাম।’ সে বলিল, ‘না আমার অসুখ খুব গুরুতর নয়।’ তারপর কি ভাবে কাহার মারফৎ টাকা পাঠাইতে হইবে ইহা স্থির করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। আসার সময় বলিল, ‘ছোট মামীকে (আমার স্ত্রীকে) আমার প্রণাম জানাইবেন।’ পরদিন কিংবা তার পরদিন আমি টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার দাড়ি রাখা, আসিবার সময় মামীকে প্রণাম জানানো ইত্যাদি ব্যাপারে কি রকম একটা সন্দেহ জাগিল। …তার ১০/১২ দিন পরেই খবরের কাগজে পড়িলাম সুভাষ বাড়ী হইতে অন্তর্ধান

করিয়াছে। তখন বুঝিলাম সে দূর যাত্রায় গিয়াছে। তবে জীবনে যে আর কখনও দেখা হইবে না, ইহা মনে করি নাই।"[১২]

'ওয়ানডারার' গাড়ীটা ১ নং উডবার্ন পার্কের বাড়ী থেকে রাত সাড়ে আটটায় বেরিয়ে এল, লক্ষ্য এলগিন রোড। কিন্তু সন্দিগ্ধ শঙ্কিত মন—তাই এলগিন রোডের দিকে না গিয়ে উল্টোদিকে গাড়ী ঘুরিয়ে নিল ড্রাইভার শিশিরকুমার। লোয়ার সার্কুলার রোডের পেট্রোল পাম্পে তেল নেওয়া, চাকার প্রেসার-এর কাজ সারা এবং তারপর চৌরঙ্গী রোড ধরে পশ্চিমদিক ঘুরে এলগিন রোডের বাড়ী। তখন যে ব্রত উদযাপনের সংকল্প, তারজন্য সুভাষচন্দ্রকে সেই রকম বেশবাস পরিধান করতে হবে বৈ কি। সিল্কের ধুতি ও চাদর পরা হয়ে গেল। ব্রত শুরুর আগে মা-জননী ও পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে এবার আনুষ্ঠানিকভাবে শেষবারের মত আহার গ্রহণ। শুধু ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ নন, অরবিন্দ বোসও ভাঁওতা চালিয়ে যাবার কাজে নিযুক্ত। ব্রতধারী সুভাষ কিছুটা বিষণ্ণ গম্ভীর—হয়তো চিরকালের জন্য মায়ের সামনে বসে, স্নেহাস্পদ ভাইপো-ভাইঝিদের সঙ্গে এক সঙ্গে খাওয়া ও মাতৃদর্শন শেষ হয়ে যেতে চলেছে। বিদায় শুধু নয়, চির বিদায়ই হয়তো বা—একথা নিজে ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে সমর্থ হলেন না। এই স্বেচ্ছাকৃত ব্রত নির্বাসনের সময় কিভাবে তাঁকে আহার্য পর্দার তলা দিয়ে ঠেলে দিতে হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। নিজের হাতে কিছু 'রেডিমেড' স্লিপ তৈরী করে রেখে গিয়েছিলেন—যে সব লোকজন দেখা করতে আসবে —তারা কি-কাজে আসবে আন্দাজ করে সেগুলো বিলি করতে হবে। এ-ছাড়া জেলে জেলে যাঁরা সহবন্দী তাঁদের উদ্দেশ্যে কয়েকখানা চিঠিও (অন্তর্ধানের পরের দিনের তারিখ দিয়ে তৈরী করা) গৃহত্যাগের পরের তারিখে ডাকঘরে দেওয়ার ব্যবস্থা। গোয়েন্দা বিভাগকে ও অন্য সকলকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই নিখুঁত ব্যবস্থা।

---

[১২] রমেশচন্দ্র মজুমদার—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—শ্রীবীরেশ মজুমদার সম্পাদিত অধুনা লুপ্ত "যুগধ্বনি" (প্রথম খণ্ড/দ্বাদশ সংখ্যা): স্মরণে-মননে সুভাষ, পৃষ্ঠা ১১০
[এই লেখক ঐতিহাসিক ডঃ মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় নেতাজীর যুদ্ধ পরিকল্পনা বিষয়ে প্রায় একইরূপ বর্ণনা শুনেছেন। ডঃ মজুমদার বলেন, সুভাষচন্দ্র ছাত্র-যুবকদের সমর-বিদ্যা-শিক্ষা এবং শৃঙ্খলা বিষয়ে উৎসাহ দিতেন কিন্তু তাঁর সমর পরিকল্পনার কথা কিছু জানা যেতো না।]

ঘড়িতে তখন রাত দেড়টা, ইংরেজী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১৭ ই জানুয়ারী ১৯৪১। উপযুক্ত প্রহর সন্দেহ নেই। দুই জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাই কিন্তু গল্প-গুজব কিছুতেই শেষ করতে রাজী নন, সুভাষ-শিশিরের কাজকর্ম স্পষ্টই কেমন যেন অস্বাভাবিক তাদের চোখে, নিজেদের বাড়ী যাবার তাদের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। এদিকে অমূল্য সময় বয়ে যায়—চঞ্চল হয়ে ওঠে রাতের যাত্রীদের মানসলোক। "শেষ পর্যন্ত দ্বিজেনকে ডেকে রাঙাকাকাবাবু বললেন, 'আমার এই সন্দেহগ্রস্ত দাদাটিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুতে এবং যেমন করে পারে আমরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আটকে রাখতে'।" আর ঘরের সেই পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে মহম্মদ জিয়াউদ্দিনের পোশাকে প্রস্তুত হলেন সুভাষচন্দ্র। বাদামী রঙের গলাবন্ধ, লম্বা কোটের সঙ্গে ঢোলা পায়জামা আর মাথায় কালো ফেজ। ছদ্মবেশের শেষ ধাপে পরিবর্তন করা হলো নতুন কেনা কাবুলী চপ্পল জোড়া, তার জায়গায় হাঁটাচলার সুবিধার জন্য ইউরোপে ব্যবহৃত পুরোনো ফিতে বাঁধা মজবুত জুতো পরে নিলেন। কিন্তু রাস্তার ক্লিয়ারেন্সের ইঙ্গিত পাওয়া আর সন্দিগ্ধ নিজের লোকদের আটক রাখার কারণে দীর্ঘ সময় পার হয়ে গিয়েছে। শেষে সংকেত ভেসে এল। ইলার কাছ থেকে পাশের ঘরে সস্নেহে বিদায় নিলেন সুভাষচন্দ্র—ঈশ্বরের কাছে তার জন্য মঙ্গল আশীর্বাদ কামনা করে। আর আরো এক ঘণ্টা তাঁর নিভৃত ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে—যাতে করে সি. আই. ডি. ও ঘরে-বাইরে সকলের মনে হয় তিনি তাঁর ঘরেই আছেন।

নিঃশব্দে পা ফেলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনজন। অরবিন্দ বোস সামনে, মাঝখানে 'মহম্মদ জিয়াউদ্দিন', পেছনে শিশির বোস। জ্যোৎস্নায় ভরা রাত, দেওয়ালে যেন ছায়া না পড়ে! 'ওয়ানডারার' গাড়ীটার পাশে ঘন অন্ধকার। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতায় গাড়ীতে ঢুকে গেলেন, দরজা বন্ধ না করে ধরে রইলেন অভিযাত্রী, পাছে ড্রাইভারের দিকে দরজা বন্ধের শব্দের সঙ্গে আর একটা শব্দ যুক্ত হয়ে সূক্ষ্মতম সন্দেহের অবকাশ ও আনাচে-কানাচে গোয়েন্দা পুলিশের চোখ-কান সজাগ না করে তুলতে পারে—অর্থাৎ ড্রাইভার ছাড়া ওই 'ওয়ানডারারের' মধ্যে দ্বিতীয় কেউ ঢোকেনি, নেই! চটির জোর শব্দ তুলে এর পর গাড়ীর মধ্যে শিশিরকুমারের প্রবেশ এবং সশব্দে দরজা বন্ধ করা। আর প্রচণ্ড গর্জন তুলে গাড়ী বেরিয়ে গেল। প্রথমে দক্ষিণমুখো ছুটে চলে ঐতিহাসিক সে গাড়ীটি—লক্ষ্য যদিও উত্তরে। এলগিন রোডের বাড়ী ছাড়াও উডবার্ন পার্ক রোডের মোড়ে সি. আই. ডি. লোকেদের

তখন আর একটি হেডকোয়ার্টারস—সব দিকেই এখান থেকে লক্ষ্য রাখার কত সুবিধা। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য ভিজিটারদের যাতায়াত এবং তাঁর দিনে-রাতের 'মুভমেন্ট'—সবকিছুই নজর রাখার সুবিধা; বসু পরিবারের দুই বাড়ীই এর নাগালের মধ্যে। কিন্তু লালবাজার-রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সমস্ত পুলিশী মাস্টার প্ল্যান ব্যর্থ হয়ে গেল। এলেনবি রোড—জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোড—ল্যান্সডাউন রোডে এসে পড়লো গাড়ী। এতক্ষণে সুভাষচন্দ্র তাঁর দরজা বন্ধ করলেন। এরপর লোয়ার সাকুর্লার রোড-শিয়ালদহ-হ্যারিসন রোড বরাবর ছুটে চলেছে 'ওয়ানডারার'। শীতের অন্ধকার ঘিরে তখন কলকাতা মহানগরী নিদ্রাচ্ছন্ন। দুঃখের হোমানলে পাঁজর জ্বালিয়ে নিদ্রাহীন দুই চোখ কোন দুস্তর পারাবারের পথে স্থির অচঞ্চল।

হাওড়া ব্রীজ পার হয়ে, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে, বর্তমানের চেয়েও খারাপ সেই ভাঙাচোরা পথ ধরে এগিয়ে চলা—সেও উত্তম। কেননা, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে বালী ব্রিজ পার হতে গেলে গাড়ী থামিয়ে 'টোল ট্যাক্স' দিতে হবে—ছদ্মবেশীকে যদি কোনমতে সন্দেহ হয়! পুলিশের পক্ষে সামান্যতম সন্দেহই যথেষ্ট। তাই ও-পথ বাতিল। মাঝে মাঝে ড্রাইভারের মুখের সামনে ফ্লাস্ক থেকে কফির গ্লাস তুলে ধরে 'জিয়াউদ্দিন'; ড্রাইভারের দু-হাতের শিরা যে ফুলে ফুলে উঠছে—ভোর হবার ভয়—আরো জোরে—আরো জোরে—হে রাণার, হে দুর্জয়। "ডি ভ্যালেরার এসকেপের গল্প জানো তো?" আয়ারল্যাণ্ডের সেই বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী ডি ভ্যালেরা, তাঁর ব্রিটিশ জেল থেকে পালিয়ে যাওয়া। "বললাম, জানি। সেই কেকের ওপর চাবির ছাপ দিয়ে জেলের ভেতর পাচার করে দেওয়া—তারপর সেই ছাপ থেকে চাবি তৈরী করে নেওয়ার কাহিনী তো?' আমি আবার শেষের কদিনে কতকগুলো বিখ্যাত এসকেপের কাহিনী পড়ে নিয়েছিলাম।"[১৩]

রাত চারটায় বর্ধমান, আসানসোলের কাছাকাছি রাত ভোর হলো। এখানের গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে ধানবাদের দিকে মোটর গাড়ীর পথ গিয়েছে বেঁকে। ধানবাদ ছেড়ে বারারী, ভ্রাতুষ্পুত্র ডঃ অশোকনাথ বসুর বাড়ী।[১৪]

১৩। মহানিক্রমণ—দেশ, ৫৮

১৪। ডক্টর অশোকনাথ বসু, শরৎচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। খনি ইঞ্জিনীয়ারিং-এ জার্মানী থেকে পি. এইচ. ডি.-র পর ধানবাদ খনি অঞ্চলে বারারীতে চাকুরী। তাঁর বাংলোতে সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সনের ১৮ই জানুয়ারী

পাশেরটাই এক ইংরেজ অফিসারের বাড়ী। চারশ গজ দূরে—মহম্মদ জিয়াউদ্দিনকে গাছের তলায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ী গিয়ে ঢুকে গেল যথাস্থানে। বাইরের ঘরে সারাদিন অতিথিরূপে জীবনবীমা কোম্পানীর ইনসপেক্টার জিয়াউদ্দিন, বসু সাহেবের সঙ্গে ব্যবসায়িক কথা বলতে এসেছেন। অনেক দূর থেকে এসেছেন—কাছাকাছি থাকার জায়গা নেই এবং ফেরবার ট্রেনও রাতের আগে নেই। অতএব অপেক্ষা করতেই হলো। কত বেদনা, কি আশ্চর্য অনুভূতি! ডঃ অশোকনাথ বসুর স্ত্রী জানতে পারলেন না—তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় খুল্লতাত ভারতের মহান বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র তাঁদের গৃহের বহির্ভাগে একজন সাধারণ অতিথিরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত করলেন। ঐ বাইরের ঘরেই খাওয়া-দাওয়া। ঠাকুর-চাকর লোকজন কারুরই সন্দেহ নেই। বিদায়ের মুহূর্তে গাড়ীর মধ্যে রাঙাকাকাবাবু, দুচোখের সে শ্রাবণের ধারাকেও চেপে রাখতে হয়েছিল, একটা শব্দও উচ্চারণ নয়। এমনি কত দুঃসহ ব্যথা-বেদনার পাহাড়। আসানসোল নয়, উনি গোমো স্টেশন থেকে ট্রেন ধরবেন। দিল্লী-কালকা মেল মধ্যরাত্রির পর গোমো স্টেশনে এল। বারারী থেকে ত্রিশ মাইল দূর। স্টেশন চত্বরে যখন গাড়ী পৌঁছাল ট্রেন আসার সময় প্রায় হয়েছে। শিশিরকুমার বসু লিখেছেন—" 'আমি চললাম, তোমরা ফিরে যাও'—বিদায় মুহূর্তে এই ছিল তাঁর শেষ কথা। আমি কেমন যেন নির্বাক ও নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলাম, প্রণাম করার কথাও মনে এল না। রাতের গোমো স্টেশনের নির্জন ওভারব্রিজ দিয়ে রাঙাকাকাবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃপ্ত অথচ ধীর ভঙ্গীতে হেঁটে চলে যাচ্ছেন, আগে আগে চলেছে কুলি—তার মাথায় মালপত্র, চিরদিনের মত এই ছবিটি আমার মনে মুদ্রিত হয়ে রইলো। ওপারের সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাঙাকাকাবাবু প্ল্যাটফরমের দিকে

জীবনবীমা কোম্পানীর ইনসপেক্টার মহম্মদ জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে অবস্থান করেন এবং জনবহুল আসানসোল স্টেশনে বহুজনের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য অশোকনাথের পরামর্শে গোমো স্টেশনে রাত্রিতে ট্রেনে ওঠেন। ডঃ অশোকনাথ বসুর স্ত্রী শ্রীমতী মীরা বসুর নিকট লেখক জানতে পারেন, কণ্ঠস্বর শুনে ছদ্মবেশী সুভাষচন্দ্রকে চিনতে পারলেও শ্রীমতী বসুর বাড়ীর পরিচারক-পরিচারিকা-ড্রাইভার-মালী বা অন্যান্য কর্মচারীর কোনরকম সন্দেহ যাতে উদ্রেক না করে সে জন্য মুসলমান অতিথির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ছিল।

ডঃ অশোকনাথ বসু ও শ্রীমতী বসুর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার: ৮.১.৮৬।

অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।" আর কিছুক্ষণের মধ্যে পেশোয়ারের পথে দ্রুতগামী রেল ধীর গতিতে গোমো স্টেশন ছেড়ে পশ্চিমের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—লাল আলোর ফুটকীও হারিয়ে গেল।

১৩ই মাঘ, ১৩৪৭ সাল, অর্থাৎ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪১ তারিখে ভারতের সমস্ত সংবাদপত্রের শিরোনামে সুভাষচন্দ্রের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়লো। আনন্দবাজার পত্রিকা লিখলেন—"শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু—অপ্রত্যাশিতভাবে গৃহত্যাগ ঃ—গত রবিবার অপরাহ্ন হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার বাসভবনের কক্ষে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনবর্গের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি দিবারাত্র এই কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন।

"সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গত কয়েকদিন যাবৎ তিনি সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন করেন এবং সকলের সহিত এমনকি আত্মীয়-স্বজনের সহিতও দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া ধর্মচর্চায় সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া উদ্বেগের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল হয় নাই এবং সংবাদ ছাপিতে দেওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নাই বলিয়া জানা গেল।"

এই দশ দিনই প্রয়োজন ছিল। পলায়নের প্রস্তুতি এতই নিখুঁত ছিল যে, তাঁর অন্তর্ধান বিষয় ২৬শে জানুয়ারী রাত্রিতে মাত্র ভারতবাসী, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনতে লাগলো আর ২৭শে জানুয়ারীর প্রত্যুষেই কোটী কোটী মানুষ চমকে উঠলেন। কোথায় গেলেন মহাবিপ্লবী? রবীন্দ্রনাথ বারে বারে টেলিগ্রাম পাঠালেন সুভাষচন্দ্রের জন্য প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে। গান্ধীজীও ঘন ঘন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও এলগিন রোডের বোস বাড়ীতে সংবাদ জানতে চাইলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কিংকর্তব্যবিমূঢ়—কোথায় সুভাষচন্দ্র বোস—কোন শিবিরে? খোঁজ, খোঁজ, পথে পথে পাহারা বসাও। বিশ্বমহাসমর দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সমস্ত মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কর, সুভাষচন্দ্রের গোপন নিশানার খোঁজ পাওয়া না গেলে আর উপায় নেই—সর্বনাশ ঘটে যাবে।

এদিকে পুলিশকে, পারিবারিক বন্ধুদের খবর পাঠাচ্ছেন মেজদাদা শরৎচন্দ্র বোস—সুভাষকে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকেই এসে পড়ছেন

উদ্বিগ্ন হয়ে, কেউ কেউ তাঁর প্রেসিডেন্ট এবং ওয়ানডারার গাড়ী নিয়েই খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন—কেউ কেউ তার রাঙাকাকাবাবুর সন্ধান করতে শিশিরকুমারকে নিয়েই কালীঘাটের মন্দির, মঠ, গঙ্গার ধার, শ্মশান চত্বর, বহুস্থান ঘুরে ঘুরে হয়রান। সুভাষ-জননী প্রভাবতী দেবীর সামনে কে হাজির হবে! তাঁকে কিছুই যে বলার নেই কারুর—এটাই মেজোছেলের অর্থাৎ অন্যতম মুখ্য ষড়যন্ত্রকারী শরৎচন্দ্রের নিকট হলো কঠিন পরীক্ষা। তারপর এক কালীভক্ত সাধু বাবাতো চ্যালেঞ্জিং সুরে বলে বসলেন 'আমি আগে বলিনি কি যে, সুভাষবাবুকে সংসারে বেঁধে রাখতে পারবে না। দেখলে তো, তাই হল।' সত্যই তাই, কোন শৃঙ্খলই এই ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসীকে বেঁধে রাখতে পারেনি—প্রবুদ্ধ, মুক্ত আত্মশক্তির আধার সুভাষচন্দ্র, তাই বাইরের বন্ধন যতোই প্রবল হয়, অন্তরের নিত্য-মুক্ত রূপটি ততোই আনন্দ শক্তিতে নৃত্য করে ওঠে।

ব্রিটিশ-বাংলার পুলিশ বিভাগই সর্বাপেক্ষা বেশী বিপর্যস্ত হলো। কলকাতার ডেপুটী কমিশনার অব পুলিশ জানভ্রিন বাছাই করা ৬২ জন পুলিশ গোয়েন্দা নিয়ে সুভাষচন্দ্রের প্রহরার দায়িত্বে। কি লজ্জা, কি লজ্জা! কোনরকমে সামাল দিতে তারা এলগিন রোড পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারছে না—দেরী হয়ে যাচ্ছে, আরো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু সম্মুখে। ওদিকে আদালতে রাজদ্রোহের মামলায়ও সুভাষচন্দ্রকে ধরে নিয়ে দাঁড় করাতে হবে যে। ঐ তারিখেরও প্রায় একসপ্তাহ পূর্বে আদালতে হাজির হওয়ার আরো একটা দিন ধার্য ছিল, অসুস্থতার জন্য রেহাই দেওয়া হয়। সত্যই কি অসুস্থ? সুভাষচন্দ্রের ছোট ভাই ডঃ সুনীলকুমার বসু অসুস্থতার সার্টিফিকেট দিলেন না। ডঃ মণি দে আর কী করে দেন! রাঙাকাকু কার্তিককে (রণজিৎ বসু) বললেন, "ডঃ মণি দে'র বাড়ী যাও, আমার মেডিকেল সার্টিফিকেট তোমাকে নিয়ে আসতে হবে, যদি দরকার হয় বলো যে, এরপরে আর দিতে হবে না।" ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরেই যাঁর স্থান, মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সেই ডঃ মণি দে'র বাড়ী পি, ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউতে ছুটলেন রণজিৎকুমার বসু। ডঃ দে বললেন, "ওঁর তো কিছু হয়নি, কি করে দেব? যদি মেডিকেল বোর্ড বসায়?" "আপনার এগেনস্টে কেউ মেডিকেল বোর্ড বসাবে না এবং আপনি যদি মনে করেন, এই সার্টিফিকেট লিখে দিন—I found much improvement in him and he may be fully recovered very soon." তাই-ই হয়েছিল, অন্যথায় ১৬-১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত

মহানিষ্ক্রমণের জন্য প্রস্তুতির আগেই পুনরায় দীর্ঘ কারাবাস অবধারিত ছিল। পরবর্তী সময়ে ডঃ মণি দে'কে যথেষ্ট সরকারী নিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু সিংহের পিঞ্জর যে খোলা। গৃহত্যাগের 'অলীক' কাহিনী শুনে বিশ্বাস না করার বিশ্বাস নিয়ে ঘুরতে ফিরতে লাগলো বাঘা বাঘা গোয়েন্দা অফিসারের দল। কিন্তু সব ব্যর্থ হলো, কেউ কেউ চাকরী থেকে বিতাড়িত হলেন সেজন্য, সে মুহূর্তে।[১৫] আর সেদিন সন্ধ্যায় অল ইণ্ডিয়া রেডিও হঠাৎ ঘোষণা করে বসলো যে, সুভাষচন্দ্র বসু যিনি গতকাল 'নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, তিনি ঝরিয়ার কাছে গ্রেপ্তার হয়েছেন। শঙ্কিত হয়ে ওঠে সহস্র মন—কিন্তু পরেই—'এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া' থেকে খবরটি ভিত্তিহীন বলে প্রচার করা হলো। ৩১শে মার্চ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সব অবসান—এক সুদর্শন তরুণ নাম ভগৎরাম স্লিপ দিয়ে ঘরে ঢুকলেন, বললেন যে, তিনি পেশোয়ার থেকে কাবুল পর্যন্ত বোসবাবুর সাথী ছিলেন এবং কাবুল থেকে মস্কোর পথে তাঁকে রওনা করিয়ে দিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন। বাংলার বাইরে 'কীর্তি কিষান পার্টি' ও 'শরহাদ ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর প্রতিনিধি এই ভগৎরামও পূর্ব-উল্লেখিত, কলকাতায় যোগাযোগকারী আকবর শা।

দিল্লীকে পাশ কাটাবার জন্য বুন্দেলায় হঠাৎ ট্রেন চেঞ্জ করে পাঞ্জাব মেল ধরলেন ছদ্মবেশী সুভাষচন্দ্র, দেখা গেল এক মৌলভী নামছেন নৌশেরা স্টেশনে। সঙ্গে সঙ্গে আবেদ খাঁ নামে এক গাড়ী চালক এসে হাজির মৌলভী মহম্মদ জিয়াউদ্দিনের সামনে। একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখালো সে। এই তো তাহলে আকবর শার প্রেরিত দূত। গাড়ী ছুটে চলে পেশোয়ারের উদ্দেশ্যে, এখানে পুলিশও ভয় পায় এ গাড়ীর চালক আবেদ খাঁকে। সন্ধ্যার গোধূলি বেলায় সরাইখানায় আশ্রয় মিললো, কিন্তু যাত্রীকে হুঁশিয়ার থাকতে হয়—কাছেই যে থানা। তাই কম্বলে মুখ ঢেকে শুয়ে রইলেন সুভাষচন্দ্র। প্রত্যূষে আবেদ খাঁ ও সুভাষচন্দ্রের আবার যাত্রা শুরু—

---

[১৫] 'Janvrin, Deputy Commissioner of Calcutta's Special Branch was in charge of interned Subhas Bose from the Government side. He engaged 62 sleuths to keep a round-the-clock vigil on the Elgin Road house. Some of them lost their jobs immediately. Not only Special Branch, the Intelligence Branch, the Criminal Investigation Department of the Bengal Police and the Central Intelligence were rocked by the mysterious disappearance'—Netaji Subhas in Self exile : S. N. Bhattacharyay.

সবকদর, মেমান্দ পেরিয়ে ঐ যে সম্মুখে আফগান সীমান্ত—তার ও-প্রান্তেই সেই ঈপ্সিত গন্তব্য স্থল রাশিয়ার ভূমি। কিন্তু লক্ষ্য কাবুল। কারণ, কাবুল না গিয়ে ভারত ছাড়িয়ে কোথাও যাওয়া যায় না—অজানা ভবিষ্যৎ দূর-দিগন্ত থেকে হাতছানি দিতে থাকে। বড় অনিশ্চিত, বড় ভয়ঙ্কর সে পথ!

কাবুলের পথে আবার ছদ্মবেশ—ছদ্মনাম দুই-এরই পরিবর্তন। ভগৎরামের নাম বদলে যায় সে এখন রহমৎ খাঁ, আর সুভাষচন্দ্র তাঁর বোবা-কালা ভাই শাখি সাহেবের দরগায় রোগ নিরাময়ের জন্য রোগী কাবুলীওয়ালা—সহযাত্রী। কাবুলের পথে বিরাট জামরুদ দুর্গের আগেই গাড়ী বাঁক নিল। খাইবার গিরিপথে ঢোকার মুখেই এই জামরুদ দুর্গ। দেশী ট্রাকে চড়ে অতি রুক্ষ পাহাড়ী পথে বেশীদূর যাওয়া চলে না; তাই বিদেশীদের কাছে নিষিদ্ধ আফগান উপজাতির এক গ্রামে হাড় কাঁপানো শীতের রাত্রি শেষে পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছে দুই তীর্থযাত্রী। সঙ্গে দুই বন্দুকধারী ভাড়াটে পাঠান—পথে দুশমন, খুন-জখম-লুঠ-হত্যা—কতরকম ভয় ওৎ পেতে। আদ্দা শরীফ তীর্থে দ্বিতীয় রাত্রির অবসান হলো। সেখান থেকে লালপুরা। অতিসঙ্কটময় বিপদসঙ্কুল পর্বতের ওপর রুক্ষ পদযাত্রায় শীতার্ত তৃতীয় দিন ও রাত্রির অবসান হলো। চতুর্থ দিনে আবার কাবুল নদী পেরিয়েই প্রধান রাস্তায় আফগানিস্তানের অনেক গভীরে প্রবেশ। তা না হলে ঐ খাইবার পাসে সশস্ত্র রাজ প্রহরীদের পাশপোর্ট প্রদর্শন না করলে হয় না। তাই এই দুর্গম পথ পরিক্রমা। শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে যন্ত্রণাদায়ক পদযাত্রায় সুভাষচন্দ্র প্রায় নিঃশেষিত। সশস্ত্র দেহরক্ষীদের আর এগিয়ে যাওয়ার অধিকার নেই। অবশেষে ছাগল, মেষ বাহক এক উন্মুক্ত লরীতে সেই তুষারাচ্ছন্ন চড়াই-উৎরাইসঙ্কুল পার্বত্য পথে সারারাত্রি ও পরের সমস্ত দিন দুর্গম যাত্রার শেষে কাবুল। বরফে প্রায় জমে যাওয়া সেই দুঃসহ অবস্থায় তাঁরা লাহোর গেট পৌঁছুলেন—লরী ড্রাইভারদের সরাইতে আশ্রয় পেলেন বহু মেহনতের পর।

১৯৩০-এ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন 'নওজওয়ান ভারত সভা'র প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী উত্তমচাঁদ মালহোত্রা। এখন তাঁর কাবুলে বসবাস। ক্ষীণ আশার আলো দেখা যায়। কিন্তু অপেক্ষা করতে হয় কয়েকটা দিন তাঁর সন্ধানে। আর সরাইখানার কাছাকাছি ঐ যে সাদা পোশাকের একটা লোক প্রায়ই উল্টো দিকে দোকানে বসে থাকে আর সদাজাগ্রত চোখজোড়া এ দিকেই। সন্দেহের কথা সুভাষচন্দ্রকে জানালেন ভগৎরাম, আর দেখা গেল কালবিলম্ব না করে সেই সাদা পোশাক পরা লোকটি হাজির—আপনারা কে? কোথা

থেকে আসছেন? বিনয়ে ভেঙ্গে পড়লেন রহমৎ—বোবা-কালা ভাইকে দেখিয়ে, পথ ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে বরফ পড়ে, তাই অপেক্ষা করতে হচ্ছে। উঁহুঁ, থানায় যেতে হবে। প্রমাদ গণলেন সুভাষচন্দ্র। একটা সামান্য পুলিশের মোকাবিলা করা যায় না। জলপানির কিছু টাকা গোয়েন্দাটির হাতের মধ্যে চালান হয়ে গেল, তখন বোবা-কালা রোগীর জন্য সুরটা অনেক সহানুভূতির নরম খাতে নেমে এলো; কিন্তু লোভাতুর পুলিশটি দিনের পর দিন ঘুষের দাবী বাড়িয়েই চললো—বিশ্বাসঘাতকতা করলো। বের হয়ে পড়লেন রহমৎ ওরফে ভগৎরাম। কাবুলের রেডিও দোকানে উত্তমচাঁদকে খুঁজে বের করতেই হবে। ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১। কি ব্যাপার? নিভৃতে 'সুভাষ বাবুর' নাম শুনেই শিউরে উঠলেন, গর্ব ও আশঙ্কা দুই-ই যুগপৎ তাঁর চোখে মুখে খেলে যায়। কিন্তু তিনি হিন্দু আর এঁরা যে মুসলমানের বেশে—অন্যের সন্দেহ জাগবে। তবে তাঁর বন্ধু এক 'হাজি সাহেব' আছেন, যাঁর স্ত্রী একজন জার্মান মহিলা—এঁরা ব্রিটিশ বিরোধী. ভারতের স্বাধীনতা লাভ এঁদের অন্তরের কামনা। কিন্তু একজন পলাতককে ঠাঁই দেওয়ার ইচ্ছা তাঁদের নেই। সুতরাং সুভাষচন্দ্র উত্তমচাঁদের গৃহে গোপন এক কোঠায় আশ্রয় নিলেন। সস্ত্রীক উত্তমচাঁদ কি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে, কি দুঃসাহসের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের বিপ্লবীকে ছ-সপ্তাহ ধরে সেদিন নিরাপদে আগলে রেখেছিলেন এবং সেজন্য অন্তর্ধানের পর সবকিছু দিনের আলোয় যখন প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, তখন কাবুলের এই দেশপ্রেমিক উত্তমচাঁদ পরিবারকে যে মূল্য দিতে হলো তার বর্ণনা এখানে অসম্ভব। এইটুকু শুধু বলা যায়, দেশের মুক্তি-যুদ্ধে তা ছিল এক মহান বলিদান।

"……They sought access to the Russian Embassy. This was not easy. In Kabul they had no friends, nor was Bhagat Rams Pusto of much use, for most people spoke Persian……embassies were under guard: they could find no way to the Russian envoy…… The squalid looking and his own dumb disguise, the meagre filthy clothing, the icy weather, began to have their effect on Bose. There could be no going back, only frustration awaited him in India, but somehow, at any cost, he must leave this unfriendly country. On the fifth day, 'in sheer desperation', he sent Bhagat Ram to the Italian Legation. Here there were welcoming smiles, congratulations, and the promise of a passport…… The journey from Kabul to

Rome or Berlin could only be by way of Moscow. Even now Bose had no good word for the Axis. He still hoped in the last resort to reach Soviet rulers······ 'I am not altogether happy', he said 'about going to Berlin or Rome. But there is no choice'.[১৬]

কাবুলে ইটালীয় দূতাবাসে ওয়ারলেস অপারেটারের একটা পোস্ট খালি ছিল। রাষ্ট্র দূতাবাসের কূটনৈতিক অফিসারের স্বাধীনতা আছে সেই খালি জায়গায় লোক নিয়োগ করার। —'ওরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা (সিনিয়র)' এই নামে সুভাষচন্দ্রকে কাবুলে নিযুক্ত ইটালীয় রাষ্ট্রদূত আলবার্টো পিয়েত্রো ক্যারনী, (Alberto Quaroni) নিয়োগপত্র দিয়ে ভিসার ব্যবস্থা করলেন; কিন্তু ইটালীর রাজধানী রোমে পৌঁছতে হবে সোবিয়েত রাজধানী মস্কো ঘুরে, দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তৈরী হলো রোম-বার্লিন-মস্কোর মিলিত জটিল ব্যবস্থাপনা। এখন আর মহম্মদ জিয়াউদ্দিন নন, সুভাষচন্দ্র বোস নন, তিনি 'ওরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা'। সেই ত্রিশক্তির পরিকল্পনা দ্বিতীয় মহাসমরের মাঝখানে দু-দুটো মহাদেশ, মিত্রশক্তি অক্ষশক্তির উভয় অংশীদারদের গোপন ব্যবস্থায় কি অদ্ভুত রূপ নিয়েছিল ও কার্যকর হয়েছিল, তার কিছুটা নিম্নলিখিত মহাযুদ্ধ সময়ের গোপন একটি দলিল থেকে উপলব্ধি করা যায়ঃ

জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনূদিত

U. St. S. Pol. Nr. 176 Berlin, the 4th March, 1941.

I have today informed the Italian Charge de Affairs on the basis of the telegram No. 470 from Moscow that the Soviet Government is ready to give the Indian Bose a transit visa for journey from Afganistan to Germany, and have added that Bose could afterwards establish contact with Italy from here.

Sd. Woermann

(Text of secret note of German State Secretary Woermann confirming arrangements between the three powers, Germany, Italy and Soviet Russia for Bose's journey across Russia to Germany)

Telegram (Secret Ch. V)

১৬। Hugh Toye, pp. 64-65.

Kabul, the 17th March, 41 18.30 hrs.
Received here 17th March, 41 19.10 hrs.

No. 103 of the 17th March, 41 Reference Telegram
No. 14.69X) X) Pol VII 1121 g[1]

(Bose's journey)

The Plan of journey through Iran dropped after the Soviet Embassy issued transit visa and B. will probably leave here on the 18th March. B. is travelling under the cover name of Orlando Mazzotta with Italian Passport No. 647932 dated the 10th March, 1941. Shall wire as soon as the news of crossing of the Afgan-Russian border is received here.

Pilger

(Text of secret message of German Ambassador in Kabul, Pilger, to the German Foreign Office conveying details of final arrangements of Bose's journey from Kabul to Berlin via Moscow.)[১৭]

এক অবিশ্বাস্য আত্মবিশ্বাসী মন ও দুর্দমনীয় পুরুষকার ভিন্ন ভারত সীমান্ত, ইরান, সমরখন্দ, সুলেমান পর্বতশ্রেণীর সে প্রকৃতির নগ্ন ক্ষুধার্ত পার্বত্য বিভীষিকা জয় করা প্রায় অসম্ভব ছিল সেদিন একজন বাঙালীর পক্ষে। পামীর-হিন্দুকুশের ওপর দিয়ে হিমবাহী তুষার ঝঞ্ঝার মধ্যে নেতাজী একটানা পাঁচ রাত ধরে সে পথ পাড়ি দিয়েছিলেন—বিমানে যে পথ দশমিনিটে অতিক্রম করা যায়।

আফগান সীমান্তের প্রান্ত থেকে রাশিয়ায় বোখারার পথে ও মস্কো পর্যন্ত ওরল্যাণ্ডো ম্যাজোটাবেশী সুভাষচন্দ্র। সঙ্গে ইউরোপ থেকে প্রেরিত জার্মান ইঞ্জিনীয়ার ডঃ ওয়েলার তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গী, একজন ইটালীয়ান ও অন্যতম সঙ্গী রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির ভেরা আসরাকোফ। কাবুলের বরফ পড়া শীতে সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সুদূরের আহ্বান, সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়ার উদাত্ত প্রেরণা তাঁকে অন্তরে-বাইরে উদ্বুদ্ধ করে নিয়ে চলেছে। মেঘমালায় আবৃত কোহ-ই-বাবা গিরিপথ তিনি অতিক্রম করলেন। এ যেন সপ্তম শতকের পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর মত ধর্ম অনুপ্রেরণায়। আমু দরিয়ায় ফেরী নৌকা থেকে তারমেজে অবতরণ করে তাঁর জার্মান সঙ্গীকে বললেন সুভাষচন্দ্র, "বহু অসমসাহসিক পর্যটক ও দুর্মদ

১৭। Netaji—A Pictorial Biography : Page 127

অভিযাত্রী তাদের বিজয় অভিযানের সময় এই আমু দরিয়া পার হয়ে বিশ্ব-ইতিহাসের গতি প্রভাবান্বিত করেছে।" ভেরা আসরাকোফ বলেন, (১৯৬৩-৬৪) "এখনও আমার মনে পড়ে তাঁর জার্মান সঙ্গী আমার কাছে তাঁকে রেখে কিছুক্ষণের জন্য অন্য জায়গায় গেলে সুভাষবাবু ফ্যাসীবাদীদের নিন্দাই করেছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মস্কোয় পৌঁছিয়ে তাঁরা সোবিয়েত নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেতে পারবেন কিনা। কিন্তু স্ট্যালিনের যুগে সুভাষবাবুর মত একজন নেতার সঙ্গে নিজে হতে নিয়ে দেখা করানোর মত হিম্মত রাশিয়ায় কারও ছিল না। ফলে, তাসখন্দ থেকে রেলপথে মস্কোয় পৌঁছিয়ে সেইদিনেই তাঁকে বার্লিনের বিমান ধরতে হলো।"

"অদৃষ্টের পরিহাস। আমার ধারণা যে, সুভাষ যদি স্ট্যালিনের সাক্ষাৎ পেয়ে আলোচনার সুযোগ পেতেন তাহলে ভারত থেকে ব্রিটিশদের তাড়াবার জন্য জার্মান অথবা জাপানীদের চেয়ে আরো আগে সোভিয়েত সামরিক সাহায্য পেতেন। যাইহোক মস্কো রেল স্টেশনে আমার যে-সব কমিণ্টার্ন বন্ধু সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাঁদেরও ধারণা তাই যে, তিনি খুব খুশী মনে বার্লিনের বিমানে চড়েননি। তাঁর পক্ষে অবশ্য দ্বিতীয় পন্থা ছিল না।"[১৮]

জীবনের অনুভব, সে ছিল সুভাষচন্দ্রের কাছে এক ভিন্ন বস্তু। সাধারণ কিংবা অনেক মহাপুরুষ বা দেশপ্রেমিকের কাছে তার প্রকাশভঙ্গীর ধারার সঙ্গে তুলনা করে পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়—তা যেন দেশোদ্ধারের মহান ব্রতেরও ঊর্ধ্বে—আরো কিছু, যার ব্যাখ্যা সহজে করা যায় না, শুধু দূরের থেকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয় মাত্র।

১৮। ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ : নেতাজী রহস্য : পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭

পঞ্চম অধ্যায়

রণক্ষেত্রে

সুভাষচন্দ্রের চোখে জল! প্রচণ্ড ভারাক্রান্ত মুখমণ্ডল। অথচ ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তির সঙ্গে তাঁর সংগ্রামের আয়োজনে তিনি প্রায় প্রস্তুতির পথে। তখন ১৯৪২-এর এপ্রিল মাস। "What is it?...While proceeding to Tokyo from Bangkok."...১

এন. জি. গানপুলে বিস্ময়ে হতবাক—"কি ব্যাপার?" তাঁর দিকে রয়টারের রিপোর্টটা এগিয়ে দিলেন সুভাষচন্দ্র। ছাপা হয়েছে—"ব্যাঙ্কক থেকে টোকিও যাবার পথে বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র মারা গেছেন।" তাঁর মা যখন এই সংবাদ পাবেন তখন কি হবে এবং একটা সংবাদ পাঠিয়েও বলা যাচ্ছে না তিনি জীবিত এবং ভালই আছেন—তাই। সুভাষচন্দ্র ইউরোপে অথবা এশিয়ায় রয়েছেন, এ খবরটি জেনে নেবার জন্যই ইংরেজের এ-দুরভিসন্ধি। তারও আগে ঘটে গিয়েছে কত বিস্ময়কর ঘটনার ইতিহাস। কলকাতা-কাবুল-মস্কো-রোম-এর মহাদুর্যোগ-অভিযান শেষে মুসোলিনির অনুরোধে তিনি রোম নগরে আরামের জীবন-যাপনের মধ্যে থাকতে রাজী হননি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সে প্রচণ্ড প্রবাহে রোমের আন্তর্জাতিক দূতাবাসগুলো গুপ্তচরদের বিরাট ঘাঁটিতে পরিণত। সেখানে 'ওরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা'বেশী সুভাষচন্দ্রের নিরাপত্তা যথেষ্ট নয়। বার্লিনই ইচ্ছা পূরণের যোগ্যতম স্থান। কিন্তু কি পর্বত প্রমাণ বাধা তাঁর সম্মুখে সেদিন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বার্লিনে পৌঁছবার আগেই হিটলারের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে, ১৯৪১-এর জুন মাসে তাঁর রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা। এদিকে উত্তর আফ্রিকার

১। N. G. Ganpuley : Netaji in Germany, Page 2
[দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীতে যে সব ভারতীয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং জার্মানীর পতনের পর বন্দী হয়ে ১৯৪৭ সালে ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন তাঁদেরই একজন নেতৃস্থানীয় এন. জি. গানপুলে।]

লিবিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ইটালীয় সৈন্য বাহিনীকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব, অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের সুবিস্তৃত ফ্রন্টে ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে জার্মান সৈন্যবাহিনীর প্রবল যুদ্ধ। সমস্ত বিবেচনায় ভারতবর্ষ হিটলারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ভারতে অবস্থিত জার্মান কনসালের মারফৎ বামপন্থী বিপ্লবী নেতা ; কলকাতা মহানগরীর প্রাক্তন মেয়র সুভাষচন্দ্র বোসের পরিচয় জার্মান কর্তৃপক্ষের জানা আছে ঠিকই। ভিয়েনায় অবস্থান সময়ে ১৯৩৫-এ জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি—সে তো হঠাৎ এবং তাঁর স্বল্প সামরিক প্রস্তুতির একটা বেসরকারী মাপজোখ মাত্র—জার্মানীকে, তার জনসাধারণকে নিজের বিচারে বিচার করা। কিন্তু এখন এই যুদ্ধমত্ত বার্লিনে তিনি অতি সম্মানিত সরকারী অতিথি। আর এই ইটালীয়ানবেশী সুভাষচন্দ্রের আছেই বা কি? না কোন সৈন্যবাহিনী, না ভারতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার সার্টিফিকেট। জার্মানীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিব্বেন ট্রপ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেননি সুভাষচন্দ্রকে ভারতের সঙ্গে গোপন রেডিও যোগাযোগে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার করার ব্যবস্থা করে দেবার অসুবিধা না থাকলেও থাকতে পারে ; এমন কি আফ্রিকা-ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধবাদী ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একটা সৈন্যবাহিনী গড়ার ব্যবস্থা করে দেওয়াও সম্ভব হতে পারে ; কিন্তু অক্ষশক্তির পক্ষে জার্মানীর ভারতীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করা এ কি করে সম্ভব! কিন্তু তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব, তাঁর ভাবভঙ্গী, কথাবার্তায় এমন গাম্ভীর্য, এমন তাঁর অদ্ভুত যুক্তি-জাল---সুভাষচন্দ্র বিদেশ দপ্তরের কাছে একটা বিরাট 'প্রবলেম'—তাঁকে এড়ানো দুঃসাধ্য। ব্যাপারটা স্বয়ং কর্ণধার এ্যাডলফ হিটলারের কাছে পাঠানো ছাড়া পথ ছিল না সেদিন। আর তাই-ই চেয়েছিলেন সেনর ওরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা। 'হিজ একসিলেন্সী ম্যাজোটা' সুভাষচন্দ্র বোস (এ নামেই তাঁকে ডাকা হয় রোম ও বার্লিন বিদেশ দপ্তরে)। বার্লিনে যুদ্ধকালীন জাপানী রাষ্ট্রদূত, জেনারেল ওশিমার মতে—তাঁর জীবনে তিনি বহু এশিয়, ইউরোপীয় এবং মার্কিনী-কূটনীতিক দেখেছেন, কিন্তু সুভাষ বোসের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কারুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি।

২২শে মে, ১৯৪২ সাল। তারিখটা ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। জার্মানীর ফুয়েরার, ইউরোপের মিত্রশক্তি জোটের আতঙ্ক—হের হিটলারের সঙ্গে ঘটলো ভারতের মহান বিপ্লবী জনগণমন অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বোসের সাক্ষাৎকার। একজনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী—তাঁর জার্মান জাতি বিশ্বের

শ্রেষ্ঠ এবং খাঁটি আর্যজাতি। গ্রেটব্রিটেন ছাড়া আর সমগ্র ইউরোপ তাঁর বুটের তলায় গিয়েছে—রাশিয়ার বিশাল সীমানা এবং মধ্য-এশিয়ার প্রান্তর বরাবর প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চলছে। আর অন্যজন ভারতীয় বিপ্লববাদের মহত্তম নায়ক আত্মবিশ্বাসে অচল মহাবীর্যবান, ভারতীয় জাতীয় মহাসভার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি—সুভাষচন্দ্র। তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ-ভারতীয় দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনী, দুরধিগম্য তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে চরম দুঃখযন্ত্রণার আঘাত বুকে ধারণ করে উপস্থিত—ভারতের শত্রুর যে শত্রু, সেই দেশ ও জাতির সাহায্য সংগ্রহে। প্রাচীন বেদ-উপনিষদের মহান ভারত পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে গেলে পুনরায় বিশ্বসভ্যতাকে অবশ্যই তার অবদানে সমৃদ্ধ করে তুলবে। বার্লিনে পৌঁছানোর দীর্ঘ এক বৎসর পর অবশেষে হিটলার তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের ঊর্ধ্বতন অফিসার এ্যাডাম ভন ট্রট জু শোলজ (Adam Von Trott Zu Solz)-এর উপস্থিতিতে এই সাক্ষাৎকারের অনুষ্ঠান ঘটে। (হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ভন ট্রটের ১৯৪৪-এর জুলাই মাসে ফাঁসী হয়)। এই সাক্ষাৎকারের পর পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক অধিকর্তা—Eanst Woermann হিটলারের মনোভাবকে যে নীতির কাঠামোয় গঠন করেন তা থেকে জানা যায়, সুভাষচন্দ্রকে তিনি 'ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন' বা আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে সাহায্য করার ব্যবস্থা করলেও জার্মানীর ভারত অভিযানের বিষয় নেতাজীর নিকট গোপন রাখবার নির্দেশদান করেন। "German expedition to India... it would not have to be discussed with Bose." রাশিয়া ও জাপান যুদ্ধে যোগদান করার পর এবং বিশেষ করে আফ্রিকাতে জার্মান সেনাপতি রোমেলের পরাজয় ও স্ট্যালিনগ্রাডে রুশবাহিনীর ঐতিহাসিক জয়ের পর হিটলার নেতাজীর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।[২]

এ প্রতিবেদন খুবই যথার্থ। হিটলার, বিশ্বত্রাস হিটলার, যাঁর নর্ডিক জাতি অহংকার, অর্থাৎ জার্মান জাতই পৃথিবীর একমাত্র খাঁটি আর্য—এই ম্যানিয়া তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'মাইন কাম্ফ'-এ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে, ভারতীয় বেদ-উপনিষদ এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির

---

[২] S. N. Bhattacharyay : Netaji Subhas : Page 44

ইতিহাসের প্রসঙ্গ উপস্থাপনার ফলে সুভাষচন্দ্রই একমাত্র ব্যক্তি যিনি হিটলারকে তাঁর এই অহমিকাপ্রসূত বক্তব্য প্রত্যাহার করিয়েছিলেন।

কিন্তু বর্তমান ভারত? তার প্রতি ফুয়েরারের সহানুভূতিশীল হওয়ার কোন কারণ নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্রিটেনের বুটের তলায় পচে মরছে যে দেশ, এত বিরাট যার জনসংখ্যা, এত বিশাল যার আয়তন, আর যার এত সম্পদ ও প্রাচুর্য, সে কি করে ব্রিটেনের মত ক্ষুদ্র এক দেশের দাসত্ব করে? সে দেশ ও জাতির হীনমন্যতা হিটলারের শক্তিমত্ত মনের কাছে কোন্ প্রশংসা পেতে পারে না। বরং স্বাভাবিকভাবেই সহস্র সহস্র মাইল দূর-দূরান্ত পেরিয়ে ঐ পাঁচ কোটী ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জবাসীর পক্ষে চল্লিশ কোটী ভারতবাসীকে কঠোর শাসনাধীনে রাখার যোগ্যতা হিটলারকে. তাঁর প্রতিবেশী শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের প্রতি প্রশংসনীয় করে রেখেছিল। কিন্তু ইংরেজের লিখিত বিবরণ ছাড়া ভারত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা তাঁর না থাকলেও ইতিহাস জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় এটা স্পস্টই তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল—ইংরেজের এই প্রভুত্ব ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তথাপি ইংরেজ ছিল হিটলারের শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশী এবং জার্মান-রক্ত ছিল ইংল্যাণ্ডের রাজাদের দেহে কত শতাব্দী ধরে। অন্যথায় ২৯শে মে থেকে ১৪ই জুন-এর মধ্যে তাঁর 'অপারেশান ডানকার্ক'-এর ফলে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সমস্ত সমরসম্ভারসহ জার্মান বাহিনীর হাতে বন্দী তিন লক্ষের একজন ব্রিটিশ সৈন্যও ডানকার্ক পতনের পর জীবিত অবস্থায় ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে পারতো কিনা সন্দেহ। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি ইংরেজ সৈন্য তার দেশের সমস্ত যুদ্ধজাহাজ, ব্যবসায়ী জাহাজ, লঞ্চ, নৌকাসহ নিরাপদে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে মরিপড়ি করে স্বদেশের মাটিতে অবতরণ করেছিল, অক্ষশক্তির মহান ফুয়েরার তাঁর বিজয়ী উন্মত্ত জার্মান বাহিনীকে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রিটনদের ওপর গুলি চালাতে দেননি। জার্মান কম্যাণ্ডাররা বিস্ময়ে প্রথমে হতভম্ব ও পরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধবিশারদ ও ঐতিহাসিকগণের কাছে আজও এ এক মানসিক চ্যালেঞ্জ স্বরূপ, এক মহাজিজ্ঞাসা।

রাশিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রচণ্ড ঝড় ও অব্যাহত জার্মানীর বিজয় অভিযান এবং স্বয়ং হের হিটলারের অবিশ্বাস্য 'রেস ম্যানিয়া' বা শ্বেতাঙ্গ রক্তপ্রীতি! এই অবস্থায় একান্ত অনাহূত, অপ্রত্যাশিত, নিঃসঙ্গ ভারতীয় বিপ্লবী নেতা সুভাষ তাঁদের মুখোমুখি অনেকগুলো দাবী নিয়ে উপস্থিত। মুসোলিনীর সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে ব্রিটিশ-ভারত গভর্নমেন্টের

কাউন্টার গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এবং 'হিজ একসিলেন্সী ম্যাজোটাকে' আত্মপ্রকাশের পরামর্শে জার্মানীর অসম্মতির বিষয় গোয়েবলস ১১ই মে তারিখেই রেকর্ডভুক্ত করেছিলেন ঃ

'We don't like this idea very much,··· they only exist in the realm of theory.[৩]

সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবের সমর্থনে মুসোলিনীর মনোভাবের মধ্যে জার্মান গভর্নমেণ্ট রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাববোধ করলেন। কিন্তু এ বিষয়ে জাপানের প্রচণ্ড আগ্রহের কথা তাঁরা বললেন। কারণ, বাস্তব আকারে অর্থাৎ নেতাজীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন প্রকার স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্টের অস্তিত্বের প্রকাশ না হলে শুধুমাত্র তা তত্ত্ব ও শূন্যতার মধ্যে টিকে থাকতে পারে না আর ভারতের বিপ্লবী জনসাধারণের প্রস্তুতির কথায় হিটলারের উত্তরও সে অবস্থায় হয়তো একান্ত যুক্তিসঙ্গতই ছিল। কারণ, তাঁর মতে যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত কয়েক হাজার সৈন্যের বন্দুক-কামানের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র বিপ্লবীকে নিস্তব্ধ করা যায়, একেবারে দোরগোড়ায় কোন বহিঃ-আক্রমণ ছাড়া ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পরিবর্তন অসম্ভব এবং জার্মানীর পক্ষে তা তখন সম্ভব নয়, কিন্তু জাপান সে অবস্থার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।

ব্যক্তিত্ব, পুরুষকার, আত্মবিশ্বাস এবং সর্বোপরি ঈশ্বরীয় সর্বশক্তিমানতায় বিশ্বাসী মানুষের চৈতন্য এমনই অসম্ভবলোকে তাকে পৌঁছে দেয়—সে যা চায়, তাই সে পায় অদ্ভুত ব্যঞ্জনায়। সে চলে অবিশ্রাম, তার দেহ মনের প্রতি অনুভূতিকে এক অদ্ভুতকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করে। বহিঃপ্রকাশে সে থাকে অশান্ত-অস্থির, নিদ্রাহীন, নিরলস, আর ঠিক সেই মুহূর্তগুলোতেই তার সুপ্ত-সমাহিত যোগশক্তি তারই অজ্ঞাতে রচনা করে যায় তার অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল।

চিরকালের অনমনীয় সুভাষচন্দ্র বিদেশে ইউরোপের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধমঞ্চের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে তাঁর সে দৃঢ় চরিত্রের ভাবটি বজায় রেখেছিলেন—ত্রিশক্তির ঘোষণা ছাড়া তিনি রেডিওতে তাঁর আত্মপ্রকাশ করতে রাজী নন। তাঁর প্রথম প্ল্যান ছিল একটি 'প্যারাস্যুট' বা ছত্রী বাহিনীর

৩। Goebbel's Diary : Page 157
(গোয়েবলস হিটলারের প্রচার বিভাগীয় মন্ত্রী ছিলেন)

সাহায্যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে দেওয়া। তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সমস্ত শক্তি বন্ধনের সীমানা ছিন্ন করে তখন বহুদূরে। কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত অন্য গভর্নমেণ্টের যন্ত্ররূপে তিনি নিজেকে কোনভাবেই লিপ্ত করতে প্রস্তুত নন—ভারতের মুক্তিই একমাত্র কামনা-বাসনা, সকল দুঃখ-যন্ত্রণার একমাত্র লক্ষ্য। তাই নিজের 'মাস্টার মাইণ্ড' বা সেই 'এ্যাটমিক' মস্তিষ্কের নির্দেশ অনুযায়ী মাতৃমুক্তি সাধনার সিদ্ধিপথে অগ্রসর হলেন। একটা মহৎ আদর্শের জন্যই তো এ জীবন। তাকে পেতেই হবে।

পরিকল্পনায় সামান্য ভুলের খেসারৎ দিতে হয় কখনো কখনো অতি ভয়ঙ্করভাবে। তাই জার্মান গভর্নমেণ্টের কাছে কয়েক মাস ধরে তাঁর ভাবনা-চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সময় পেয়ে গেলেন। পূর্ব হতে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়েই ভারতবর্ষ ও তার ভবিষ্যৎ স্বাধীন রাষ্ট্রকে মর্যাদার ভিত্তিতে উপস্থিত করলো তাঁর 'ড্রাফট'—সেণ্ট্রাল ইউরোপে ভারতীয় প্রবাসীদের পক্ষে 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার' বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ প্রতিষ্ঠা। এর ত্রিবিধ উদ্দেশ্য ঃ (১) রেডিও প্রোগ্রাম (২) লিজিয়ন (সৈন্য-বাহিনী গঠন ও পরিচালনা) (৩) প্ল্যানিং কমিটি। আশ্চর্য, হিটলার সুভাষচন্দ্রের সমস্ত দাবীই মেনে নিলেন। তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধানের অর্থাৎ একটি গভর্নমেণ্টের 'হেড অফ স্টেট'-এর মর্যাদা দিলেন, এবং সমস্ত আইনানুগ সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা। কিন্তু 'ভারতের স্বাধীনতা' ঘোষণা করলেন না। কেননা, সেরকম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ-ভারতকে আক্রমণ করা ও তা মুক্ত করার দায়িত্ব নিতে হয় জার্মানীকে এবং সেই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর 'লিজিয়ন' বা সৈন্যবাহিনী ভারতে প্রবেশ করতে পারবেন উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে—তারও সামরিক এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দায়িত্ব।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে দিল্লী অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। সেজন্য কাবুলে মুক্তি বাহিনীর প্রচার এবং গড়া হলো ভারতে বিপ্লবীগণের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের কেন্দ্র। কাবুলকে ভাবী আক্রমণাত্মক 'স্প্রিং বোর্ড' করে আফ্রিদী এলাকায় সামরিক সমীক্ষা ঘাঁটিসমূহ স্থাপন করা হলো—আর সেখান থেকে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে যোগাযোগ সংস্থাও তৈরী হতে লাগলো। যুদ্ধ কৌশলের দিক থেকে নেতাজী স্থির করেছিলেন ককেশাস বা বলকান, সিরিয়া-ইরাক ও লিবিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের পথ ধরে ভারতীয় মুক্তি ফৌজ ৫০ হাজারের মত

সৈন্যবাহিনী একযোগে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করবে। তাঁর মতে, ভারতের মাটিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বম্বে থেকে কলকাতা, মাদ্রাজ থেকে দিল্লী ভারতীয় জনতারূপ বিশাল বারুদখানা বিদীর্ণ হবে; ভারত অধিকারের জন্য পর্যাপ্ত সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন হবে না।[৪] দুর্বার যে গণ-উত্থান হবে তাকে রোধ করবার সাধ্য কোন শক্তিরই থাকবে না। ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন বা আই.এন.এ. সিরিয়ার যুদ্ধে জার্মান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল রোমেলের সৈন্যবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর ভারতীয় জওয়ানদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে সুয়েজ বা পারস্য

৪। নেতাজীর ভারত ত্যাগের অব্যবহিত পরেই 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর'-এর অন্যতম প্রধান সংগঠক সত্যরঞ্জন বক্সীর নির্দেশে শ্রীশান্তি গাঙ্গুলী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৯৪১ সনের এপ্রিল, মে মাস যাবৎ পেশোয়ার, লাহোর, কাবুল প্রভৃতি অঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে বিপ্লবের প্রস্তুতি করতে থাকেন। শার্দ্দুল সিং কবিশের, মাস্টার তারা সিং প্রভৃতি আফ্রিদী নেতাদের সঙ্গে মমন্দ অঞ্চলে গোপনে বিদ্রোহ আয়োজন চলতে থাকে। মিঞা আকবর শাহের পরামর্শে শ্রীগাঙ্গুলী কাবুল দরওয়াজায় আবাদ খাঁ ও ভগৎরামের সঙ্গে মিলিত হন। জার্মান গুপ্তচর রাসমুসেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে কাবুলে সাক্ষাৎকার সম্ভবত ভগৎরাম তলওয়ারের জানা ছিল। এই সাক্ষাৎকার ইংরেজ ও রুশ-দিগের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে যায়। নেতাজীর ভবিষ্যতে ভারত অভিযান পথে প্রস্তুতির সে লগ্নে উপজাতিদের মধ্যে কুদাখেল দল যে বিপুল পরিমাণ সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাঁদের সর্দার মীর আজম খাঁ যে শত শত রাইফেল বন্দুক নিয়ে দুর্ধর্ষ পাঠানবাহিনীসহ হিন্দুস্থান থেকে ফিরিঙ্গী বিতাড়নে প্রচণ্ড উদ্যোগ প্রদর্শন করেছিলেন, তা চাঞ্চল্যকর। কিন্তু জার্মানী যখন রাশিয়া আক্রমণ করে বসলো তখন জার্মানীব বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির যুদ্ধকে 'পিপলস ওয়ার' বা গণযুদ্ধ ঘোষণা করায় এই পার্বত্য যোদ্ধার দল বিপ্লব আন্দোলনকে বিপরীত দিকে পরিচালিত করে। শ্রীশান্তি গাঙ্গুলী প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভারতে ১৯৪২ সালে একের পর এক ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দসহ বহু বিপ্লবীর সঙ্গে বন্দী হন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভারতীয় 'ডাবল এজেন্ট' রূপে অর্থাৎ ইংরাজ-রুশ ও জার্মান, বিরুদ্ধবাদী রাষ্ট্রকে একই সময়ে গোপনে সহযোগিতা করেছেন কিনা—এরকম মতবাদ এখনো গবেষণার বিষয়। কারণ, কীর্তি কিষাণ পার্টির নেতা ভগৎরাম সে সময় কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হলেও তিনি একজন দেশপ্রেমিক ও নেতাজীর অনুগামী।—শ্রীশান্তি গাঙ্গুলীর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার : ১১.১.৮৬

উপসাগরের পথ ধরে ভারত অভিযানের পথ উন্মুক্ত করবে। নেতাজী এও স্থির করেছিলেন, কোন কারণেই আই.এন.এ. ইঙ্গ-মার্কিনী ছাড়া অন্য কোন দেশের আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয় অংশীদার হবে না। কিন্তু এ পরিকল্পনা জার্মান অধিনায়ক রোমেলের ভ্রান্ত মর্যাদাবোধকে আঘাত করলো। তিনি সামরিক অভিযানে রাজনীতির গন্ধ পেয়ে হের হিটলারের কাছে তাঁর প্রবল আপত্তি তুললেন আর জার্মান গভর্নমেন্ট তাঁদের সৈন্যাধ্যক্ষের মতামতই গ্রহণ করলেন। অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতে দেরী হয়নি সেদিন। ব্রিটিশ কূটনীতি তাদের প্রচারযন্ত্রে মরু যুদ্ধের আতঙ্ক ফিল্ড মার্শাল রোমেলের আই এন.এ. অভিযান-বিরোধী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো আর অত্যল্পকালের মধ্যে লিবিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের গতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। বিখ্যাত রণনায়ক রোমেলের আশ্চর্যজনক আগের জয়গুলো ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ পরাজয়ে পর্যবসিত হলো। আর এই অবস্থায় নেতাজীর প্রথম পরিকল্পনা প্রতিহত হলো, কিন্তু ভিন্ন পথে, বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে তার গতিমুখ পরিবর্তিত হয়ে চললো।[৫]

যাই হোক, জার্মানীর পক্ষে তার ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে এবং সেদিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কূটনীতির দিক থেকে নেতাজীর পরামর্শ—পরিকল্পনা গ্রহণ করা জার্মানীর পক্ষে সম্ভবত সম্ভব ছিল না। অতি গোপন যোগাযোগে ১৯৪০ সনের শেষ দিকে সে রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে আবদ্ধ। সেই অনুযায়ী ব্রিটেনের পতনের পর ভারতবর্ষ তো রাশিয়ারই এক্তিয়ারের মধ্যে যাবে, তারই ভাগে পড়বে।[৬] আর তাছাড়া ১৯৪১ সনের ২২শে জুন তারিখের আগে হিটলারের যে গোপন মনের প্রবল ইচ্ছাটি—অর্থাৎ রাশিয়া আক্রমণ তাতো শুরু হচ্ছে না—খামোকাই এখন তাহলে ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করে রাশিয়াকে সন্দিগ্ধ করে তোলা কেন ?

বার্লিনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার, রেডিও ওয়ার্ক, লিজিয়নের ট্রেনিং-এর জন্য সুভাষচন্দ্রকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ দিল জার্মানী। কিন্তু কোন দান গ্রহণ নয়। সুভাষচন্দ্র তা 'জাতীয় ঋণ' হিসাবেই গ্রহণ করলেন নিজের দায়িত্বে—ভারত

৫। বিপ্লবী জ্যোতীশ জোয়াদ্দার রচনা সংগ্রহ : নেতাজীর অমর কীর্তি : পৃষ্ঠা ১৩০-১৩১

৬। Sir Winston Churchill, The Second World War, Vol. II Page-520

স্বাধীন হলেই শুধু তা পরিশোধ্য, (উল্লেখ করেছি তাঁকে একজন ‘হেড অব এস্টেট’-এর ক্ষমতা ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে)। তাঁর ব্যক্তিগত ‘এ্যালাউন্স’ তখন প্রতিমাসে ৮০০ পাউণ্ড, সেণ্টারের মাসিক গ্রাণ্ট ১২০০ পাউণ্ড (১৯৪১), যা ১৯৪৪-এ ৩২০০ পাউণ্ডে পৌঁছেছিল। ‘It was a personal debt of honour to Bose and the Indian Nation was not made responsible for its re-imbursement.’[৭]

একের পর এক ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় ছাত্র ও অন্যান্যদের জার্মানীর পররাষ্ট্র দপ্তরে ডাক দেওয়া হলো। জার্মান অফিসাররা ইণ্টারভিউ নিয়ে প্রাথমিক নির্বাচনের পর সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের পরীক্ষা করলেন। কারণ, ভয়ঙ্কর গুরুদায়িত্ব, গোপনীয়তা ও কষ্টভোগের পথে এদের কাজে নামতে হবে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এঁদের অধিকাংশই ইঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারী এবং সাংবাদিকতার তরুণ শিক্ষার্থী, কিন্তু প্রচণ্ড আগ্রহে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে তখনই যোগদান করলেন। সাতজন এলেন ফ্রান্স থেকে। ১৯৪১-এর নভেম্বরের মধ্যে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারে তিরিশজন যোগদান করলেন। আর তার মধ্যে ভিয়েনার ফ্রাউলিন সেঙ্কেলইনি যিনি ১৯৩৪-এ সুভাষচন্দ্রের বিখ্যাত ‘ভারতের মুক্তি সংগ্রাম’ বই লেখায় সাহায্য করেছিলেন ও তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন, তিনিও। এ.সি.এন. নাম্বিয়ার তার মধ্য ইউরোপে দু-দশক-কালের সাংবাদিকতার চাকুরী ছেড়ে নেতাজীর সঙ্গে যোগ দিলেন ১৯৪২-এর জানুয়ারীতে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতাবাস অধ্যুষিত তিয়েগার্টেন অঞ্চলের এক সুসজ্জিত বাড়ীতে এই স্বাধীনতা সংঘের অফিস এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অক্টোবর মাসে উদ্বোধন করা হলো।

১৯৪১-এর ২রা নভেম্বর বার্লিনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রথম অধিবেশনে তার উদ্দেশ্য, রীতি-নীতি, আইন-কানুন গঠন করা হলো এবং সংঘের সদস্যবৃন্দ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের নিকট আনুগত্য, গোপনীয়তা, সততা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়নিষ্ঠ কর্তব্য কর্মের শপথ নিলেন। যে কাজের একমাত্র লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা। ভবিষ্যৎ কর্মধারা ও তার পরিচালনা, ভারতীয় ও বিশ্বরাজনীতি ও জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক—বহু বিষয়ে বহু প্রস্তাব নথীভুক্ত করা হলো, কিন্তু তার মধ্যে চারটি প্রস্তাব ছিল যুগান্তকারী এবং ভারতের জাতীয় জীবনে চিরকালের মহা-সম্পদস্বরূপ।

---

[৭] Netaji in Germany—Page 39.

প্রথমে প্রস্তাব গৃহীত হলো—আমাদের (১) যুদ্ধধ্বনি হবে 'জয়হিন্দ'—ভারতের জয় হোক (২) জাতীয় নেতার টাইটল—'নেতাজী' (৩) জাতীয় সঙ্গীত—'জনগণমন,' (৪) জাতীয় ভাষা—'হিন্দুস্থানী'। একে অপরের অভিনন্দন ও জাতীয় আদর্শকে মূর্ত করে তোলার বাণী ও ধ্বনির নির্দেশক এই 'জয়হিন্দ'—অত্যন্ত ভাবময় ও অর্থবহ। ভবিষ্যতের সৈনিক ও মুক্তি সংগ্রামী কর্মীদের কাছেই শুধু নয় এই প্রেরণাদায়ক 'জয়হিন্দ' ধ্বনি সমগ্র ভারতবর্ষকে আগুনের শিখার মত উত্তাল উদ্দাম করে তুলেছিল। সেই সৃষ্টির মুহূর্তে এর গভীরতাও বিশাল বিরাট পরিণতি তার মহান স্রষ্টাকে এতখানি প্রভাবিত করেছিল কিনা সন্দেহ। কারণ এই জয়হিন্দ (Let India be victorious/ Victory to the Nation) ধ্বনি এশিয়া, ইউরোপের নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র ভারতীয় জীবন-স্রোতের সঙ্গে এমনই নিবিড়ভাবে মিলেমিশে একাকার যে, স্বাধীন ভারতের গ্রাম-শহরের সাধারণ নাগরিক, মন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং জননায়কগণ অথবা সৈন্যবাহিনীর সদস্যগণ যুগ থেকে যুগে তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের মুখে, জনসভা দুর্গপ্রাকার কিংবা বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সর্বোচ্চ রাজপ্রাসাদে গর্বভরে এই ধ্বনি উচ্চারণ করে চলেছেন। এ এক মহাবিস্ময়কর আবিষ্কার—প্রতিভা। বৈচিত্র্যময় এই ভারতবর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, রীতি-নীতি আর পোষাক, খাদ্য, ভাষার ভিন্নতার মধ্যে ঐক্যবোধের আর এ-অপেক্ষা সম্ভবত কোন শব্দ অভিধানে লিখিত হয়নি যার উচ্চারিত অনুচ্চারিত উপলব্ধি এর অপেক্ষা অধিক।

এই বইয়ের সে ভার বহন করার উপায় নেই—এই 'জয়হিন্দ' ধ্বনি, তার সঙ্গে জাতীয় নেতা 'নেতাজী' আখ্যার মূল্যও জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' এবং জাতীয় ভাষারূপে 'হিন্দুস্থানী' নিরূপণ কত বড় তাৎপর্যময় এবং এর ফলাফল কত সুদূরপ্রসারী তা ব্যাখ্যা করার। আবির্ভাবের সময়কালের পর প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে আজো পর্যন্ত—তাই শুধু নয়, বিংশ শতাব্দীর সুদীর্ঘ এই একশত বৎসরের ইতিহাসে এর চেয়ে এমন কোন সুন্দরতর ও অধিক শক্তিসম্পদশালী ও বিজ্ঞানসম্মত এবং মনস্তত্ত্বভিত্তিক সর্বভারতীয় ব্যবস্থার পরিকল্পনা কোন সংসদ বা ব্যক্তিই কি আজো পর্যন্ত নিরূপণ করতে সমর্থ হয়েছেন? শুধু স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ বিশ বৎসরের কংগ্রেসী সহকর্মী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উক্তির আমি পুনরুক্তি করেই ক্ষান্ত হই—"ভারতের স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক নেতাজী সুভাষচন্দ্র—তিনি শুধু যে বিপুলভাবে ভারতের সেবা করিয়াছেন তাহাই নহে,

পরন্তু আমাদের নিকট ভারতের স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছেন। নেতাজী শুধু বাংলার নন, তিনি সমগ্র ভারতের অতি আদরের মানুষ। আমাদের জাতীয় ধ্বনি 'জয়হিন্দ'-ই শুধু নেতাজীর অবদান নহে, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতও প্রকৃতপক্ষে নেতাজীর অবদান, কেননা আমাদের গ্রহণের বহু পূর্বেই নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" [১৯৫৪]

মাত্র ৩৫ মিনিটের জন্য নেতাজীর সযত্নে প্রস্তুত করা গোপন বার্তা রেডিও চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা হলো—হিন্দুস্থানী, বাংলা ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় পালাক্রমে। প্রথম দিনে তাঁর রেডিও ব্রডকাস্ট নেতাজীর নিজের ও ভারতের পক্ষে এক ঘটনাবহুল, এক রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক মুহূর্ত। তাঁর স্বাভাবিক মেজাজে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল কিন্তু সেদিনের তাঁর ভাব ও ভঙ্গীতে অস্বাভাবিক অনুপ্রেরণা ও কিছুটা উত্তেজনা। গত কয়েকদিন 'আজাদ হিন্দ রেডিও'র যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এবং ফ্রি ইণ্ডিয়া সেন্টারের ষ্টাফ ম্যানেজমেন্টের পর পর ট্রায়াল করিয়ে তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছেন। শুভক্ষণটিতে সংঘটিত হলো কত যুগের, কত কালের প্রতীক্ষার অবসান। ১৯৪১-এর নভেম্বরে আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে ইথার প্রবাহে মহাকাশ ভেদ করে ভেসে এলো—৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ ভারতবাসী যে কথাটি শুনবার জন্য দশ মাস কাল কত উৎকণ্ঠাময় দিন, কত বিনিদ্র রাত্রি, কত আশায়, কত শঙ্কায় অতিবাহিত করেছে—সে সুগম্ভীর সুমধুর বার্তা তরঙ্গ—আমি সুভাষ বলছি! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত থর থর করে কাঁপতে থাকে—কাঁপতে থাকে আশা পূরণের আশায় আশ্বাস ভরা ভারতবাসীর বুক—ইতিহাসে তরঙ্গ ওঠে।

জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের কার্যসূচীর সেই শুরু; 'নেতাজী'তে মহোত্তরণ ও কর্মোন্মাদনা—"ভারতবর্ষ থেকে বহু সহস্র মাইল দূরে বিদেশ বিভূঁইতে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের প্রধানের পদমর্যাদায়—সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা—সে যে কি অবিশ্বাস্য আত্মশক্তি ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের পরিচায়ক তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মাতৃভূমি ত্যাগের পর দীর্ঘ অজ্ঞাতবাস শেষে তাঁর প্রিয় ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের করুণায় তাঁর জীবিত ও সম্পূর্ণ সুস্থ থাকার কথা ঘোষণা, অদৃশ্য বিশাল ভারতীয় জনতার লক্ষ লক্ষ অর্ধভুক্ত অর্ধনগ্ন অধিবাসীকে যেন চোখের সামনে দেখে করুণার্ত তাঁর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসা…।"[৮]

৮। Netaji in Germany, pp. 51, 52.

'ইহার ভিতরে যে ঝড় বহিতেছে—দুই চক্ষে রুদ্ধ বর্ষণ অশ্রুমেঘ। অতঃপর সেই সন্ন্যাসীর কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—'আমি সারা ভারত ভ্রমণ করিয়াছি—আমার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জনগণের কি ভীষণ দারিদ্র্য কি শোচনীয় দুর্দশা দুই চক্ষে দেখিলাম! আমার কান্না থামিতেছে না। এখন বুঝিয়াছি, ধর্ম প্রচার করিবার সময় এ নহে। এই দারিদ্র্য ও দুর্গতি আগে নিবারণ করিতে হইবে, ইহার একটা উপায় চিন্তা করিয়া আমি আমেরিকায় যাইতে মনস্থ করিয়াছি।' স্বামী বিবেকানন্দের সেই মূর্তিমান বিগ্রহ যেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে বার্লিনের আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্রে আবির্ভূত।

মনশ্চক্ষে অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন লক্ষ লক্ষ দেশবাসী আর তাদের দেওয়া রাজস্বের অর্ধেকটাই বিদেশী ব্রিটিশ শাসকেরা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধে ব্যয় করে চলেছে—আর সেই দেশবাসীর খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য নয়, তাদের দমনের জন্য তাদেরই দেওয়া অর্থে পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে উৎপীড়ন অত্যাচারের করুণ স্বরূপ 'আমি কেন আমার জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলাম এবং সর্বপ্রকারে বিপদসঙ্কুল এই দুর্গম পথে পদার্পণ করিলাম সেই কথা খোলাখুলিভাবে আপনাদের কাছে বলি, এই আমার ইচ্ছা। ··· সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতের ভিতরে থাকিয়া আমরা যত রকম চেষ্টাই করি না কেন, ব্রিটিশকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। যদি ভারতে থাকিয়া চেষ্টা করিলেই আমাদের দেশের লোকের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তবে আমি অনাবশ্যক বিপদের ঝুঁকি লইবার নির্বুদ্ধিতা দেখাইতাম না। সুতরাং সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভারতে যে সংগ্রাম চলিতেছে বাহির হইতে তাহার শক্তি বৃদ্ধি করাই আমার দেশত্যাগের উদ্দেশ্য ছিল।'[৯]

তবে তাই হোক, ইতিহাসের ইঙ্গিত, আজাদ হিন্দের অঙ্কুর ঐ 'ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন' প্রস্তুত। জার্মানীর মাটিতেই গড়ে উঠলো আজাদ হিন্দ ফৌজ—ইউরোপ ও আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া সৈন্যবাহিনীর মধ্য থেকে। হিটলার ও রিব্বেনট্রফ খুশি—আজাদ হিন্দের সংগঠন ও রেডিও বিভাগের কাজের উন্নতি দেখে ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা প্রচারের সুযোগ হল। ক্রমে ক্রমে আরও দুটি রেডিও ট্রানসমীশন সেণ্টার—'আজাদ মুসলিম রেডিও' এবং 'কংগ্রেস রেডিও' কেন্দ্র নেতাজীকে মঞ্জুর করা

৯। নেহরুকে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্রাংশ—জুলাই ৯, ১৯৪৩

হলো। ইংরেজী, হিন্দী, পার্সী, পুস্তু, তামিল ও তেলেগু এবং পালা করে গুজরাটী, মারাঠী ভাষায় প্রতিদিন আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের উদ্দেশ্য, ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও বিশ্বরাজনীতি, যুদ্ধাবস্থা—ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের প্রতি কতভাবেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর কর্মপন্থা বর্ণনা করে চলেছেন। নিজে মিলিটারী ট্রেনিং সেন্টারগুলিতে জার্মান ইন্সট্রাকটারের কাছে নিয়মিত ট্রেনিং নিচ্ছেন, যুদ্ধবন্দীদের ব্যারাকে ব্যারাকে গিয়ে আলোচনা ও লিজিয়নে যোগদানের জন্য বক্তৃতা। ওদিকে মন-প্রাণ কিন্তু প্রাচ্যের যুদ্ধ পরিমণ্ডলের দিকে—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্র-আকাশ চত্বরে।

আজাদ হিন্দ রেডিওর কর্তৃত্ব দিয়েছেন এক কেমিষ্ট্রীর তরুণ ছাত্রকে। আর তার সহযোগিতায় সাংবাদিকতার ছাত্র যারা—ইংরেজ পরিচালিত অল ইণ্ডিয়া রেডিও ও বি.বি.সির প্রচার, ক্রিপস-জিন্না-গান্ধী, সব বিষয় নিয়েই নোটসহ নেতাজীর নিকট উপস্থিত হয়। হ্যাপস কোয়েলিং এই রেডিওর সায়েন্টিফিক এ্যাসিসট্যান্টের কাজ করতেন। দিল্লীর ফিল্ম প্রোডাকসনের একজন এসেছেন হলিউডের চাকরী ছেড়ে—তিনি হিন্দীর দায়িত্ব নিলেন। এক আফগান যুবক অর্থনীতি বিভাগ থেকে পার্সীতে ভাষ্যকার। প্যারিসের রেস্টুর‍্যান্ট ব্যবসা ত্যাগ করে এসেছেন যিনি তিনি দক্ষিণী, তামিল ভাষায় তাঁর প্রচার দায়িত্ব। হায়দ্রাবাদের যুদ্ধবন্দী ষ্টোর-কীপারকে নেতাজী ভার দিলেন তেলেগু ভাষার। এইভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিদ্যুৎ স্পর্শে যেমন যুদ্ধবন্দী ভারতীয় মিলিটারী যুবক তেমনি ইউরোপে উচ্চশিক্ষার্থী কিংবা ব্যবসায়ী তরুণগণ যেন আছড়ে পড়তে লাগলেন নেতাজীর কাছে। আর নেতাজীর সে কি শান্তি, শক্তি ও কাজ-প্রবণতা। মাঝে মাঝে তিনি ব্যক্তিগত নোট রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেন তাঁর রেডিও সেন্টারে—আমার সমগ্র জীবন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ-অবিরাম এক আপোষহীন সংগ্রাম এবং তাই আমার পরিচয়ের শ্রেষ্ঠ জামিন-পত্র।'

প্যারিসেও তাঁর ফ্রি-ইণ্ডিয়া সেন্টারের আর একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা তিনি ইতিমধ্যে করেছেন। তাঁর ইণ্ডিয়ান লিজিয়নে সৈন্য সংখ্যা ৩০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শক্তির অহংকার বৃহত্তম ভাসমান দুর্গ—সিঙ্গাপুরের পতন হলো মাত্র ৭ দিনের যুদ্ধে। ব্রিটেন ও আমেরিকার আতঙ্ক সৃষ্টি হলো। জাপানী বাহিনী তখন মালয় অভিযান শেষ করে ব্রহ্মসীমান্তে প্রবেশের প্রস্তুতিতে তৎপর। ইটালী থেকে

জার্মানীতে আগত হাজার হাজার ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান আর্মিব যুদ্ধবন্দীদের ১৯৪২-এর জুনে স্বাগত ভাষণে নেতাজী বললেন—'The English are like dead snake, men are afraid of even after its death. ···Now it rests with you to shoulder this noble task and bring it to perfection, or spend your life in imprisonment···'

ইংরেজ মৃত সাপের মত—মানুষ এই মৃত সাপকেও ভয় করে। নিঃসন্দেহে ইংরাজ যুদ্ধ হারিয়েছে, সমস্যা আমরা আমাদের দেশের দায়িত্ব কিভাবে গ্রহণ করি তার। তারা এখন পলায়মান, অতএব স্বাধীনতা ওদের কাছে চাওয়া বা ওদের পক্ষ থেকে উপহার দেওয়ার কোন কথা এখানে থাকতে পারে না। কারণ, এ ধরনের স্বাধীনতা বেশীদিন টেকে না। আমরা তরুণ, আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ একটা আছে। আমরা বাহুবলে তা ছিনিয়ে নেবো। স্বাধীনতা কখনো দেওয়া হয় না, তা কেড়ে নিতে হয়।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, যে সব দেশ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তারা ভারতকে সাহায্য করতে চায়। কারণ তারা জানে স্বাধীন ভারতবর্ষের বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নে অনেক কিছু দেবার আছে, সেজন্য তারা আন্তরিকভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এখন যুদ্ধবন্দীদের এই মহৎ উদ্যোগকে পূর্ণতা দিতে হবে অথবা কারাগারে তারা জীবন যাপন করবে—তাই ঠিক করতে হবে।

যুদ্ধবন্দীদের সম্মুখে সুভাষচন্দ্রকে প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীগিরিজা মুখার্জী তাঁর 'দিস ইউরোপ' বইতে বর্ণনা দিয়েছেন যে, উন্নতশির সুভাষচন্দ্র সোজা হয়ে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে কয়েকঘণ্টা ধরে কথা-বার্তা বলছেন আর যুদ্ধফেরৎ সৈন্যরা মন্ত্রমুগ্ধ—কি আশ্চর্য আগ্রহে তা শুনছেন। যখন তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন তখন তারা প্রচণ্ড প্রাণশক্তিতে জেগে ওঠা নতুন এক সত্তায় পরিণত। যারা জড়ো হয়েছিল, তাদের বেশীর ভাগই এসেছিল শুধু একটা অজানা ঔৎসুক্য নিয়ে, ব্যাপারটা কি তাই শুনতে। কিন্তু নেতাজীর দীর্ঘ বক্তৃতার পর তারা ডজনে ডজনে এগিয়ে এসে অনুরোধ করতে থাকলো—ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন বা আজাদ হিন্দ ফৌজে তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করে নিতে। নেতাজীর অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ভারতের স্বাধীনতার জন্য এমন উজ্জীবিত উৎসর্গীকৃত তা তাঁর ভাববহ্নিতে এমনই জ্বলন্ত হয়ে প্রকাশিত হতো যে, সেই মোহ তাদের নিজস্ব সত্তাকে নিঃশেষ করে দিয়ে নেতাজীময় করে তুলেছিল। যে কোন সৈনিকের কাছে এই ছিল কাম্য, সত্যকার নেতার নেতৃত্বে নিজেকে তুলে দেওয়ার অদম্য ও অবধারিত স্পৃহা।

ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের জন্য জার্মান সৈন্য বাহিনীর একজন বড় ট্রেনিং অফিসার ডঃ আডালবার্ট শেফ্রিজ-এর বক্তব্য আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য তাঁর জার্মান ভাষায় মূল লেখার ইংরেজী অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো ঃ

“A living national will was the distinguishing character of this Legion. The troops made every effort to maintain discipline in all respects, and the cooperation and relations with the German troops caused no serious difficulties. Even in difficult situations the Legion suffered privation and proves their courage and readiness for battle. With diligence the Legionnaires underwent drilling in different arms ; they were eagre to learn much in a short time. It must be emphasised that Bose's principle that preferment and advancement within the Legion should only depend on ability and proof of aptitude, independent of birth or former grade was recognised and esteemed by the Legionnaires. It can be said that the experiment to form Hindus, Sikhs, Moslems, Pànjabis, Mahratas and Bengalees and members of other religious communities into a close military unit and to form an efficient fighting force was crowned with success ....

To many a man Subhas Bose—seemed to be a reserved and contemplative personality. But when he stood in the front of the Legion and expressed his ideas of a Free India in detail, then the fire of a fighter and a revolutionary could be felt ... He was the great idol of the Legion, and it was the ardent desire of each Legionary, up to the day of the German capitulation, to try to emulate him in the execution of his ideas. A meeting with Subhas Bose was a special event for the German training staff. We spent many evening with him, discussing the future of India. He lives in the minds of the training staff members

as an idealistic and figting personality never sparing himself in the service of his people and his country."[১০]

১৯৪২-এর আগস্টে 'লিজিয়ন' স্যাক্সনীর (জার্মানী) কোইনসরুএক মিলিটারী সেণ্টারে সরে যায় এবং এইখানেই নেতাজীর নেতৃত্বে অক্টোবরে ফার্স্ট ব্যাটালিয়ান গঠিত হয়। ইহা তাঁর কার্যসূচীর প্রথম পরিণতি। ১৯৪৩-এর জানুয়ারীতে সেকেণ্ড ব্যাটালিয়ান এবং ফেব্রুয়ারীতেই থার্ড ব্যাটালিয়ান; এইভাবে নেতাজীর প্রভাবে ১৫০০০ যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ৪০০০ সৈন্য ইণ্ডিয়ান লিজিয়নে স্বেচ্ছায় যোগদান করেন এবং জার্মানী, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালীর যুদ্ধক্ষেত্রে সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও চমৎকার শৃঙ্খলা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। ওদের পোশাক ছিল জার্মান সৈন্যদের মতই, তার ওপর লম্ফমান বাঘ আঁকা ও 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এই কথাগুলো লেখা। জার্মানীতে বসবাসকারী চল্লিশজনের মধ্যে দশজন ভারতীয় যুবক ও পাঁচজন যুদ্ধবন্দী এই পনেরজন 'ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন' বা 'আজাদ হিন্দ ফৌজে' প্রথম যোগদান করেন। এইভাবে ১৯৪১-এর ২৫শে ডিসেম্বরের শীতার্ত দিনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের অফিসে বার্লিনের সকল ভারতীয় প্রবাসীদের এক সভায় প্রথম ব্যাচকে (দল) তাঁর হেডকোয়ার্টার ফ্র্যাঙ্কেনবার্গের পথে নেতাজী বিদায় জ্ঞাপন করেছিলেন। তাঁর আপোষহীন সংগ্রামী জীবনের স্বপ্ন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী জন্মলাভ করেছিল—ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৮ হাজার মাইল দূরে। পনের জন বীর ভারতীয় তরুণকে যুদ্ধের দীক্ষামন্ত্র দান করেছিলেন নেতাজী 'জয়হিন্দ' সম্ভাষণে আর সেই জীবন বলিদানের বৃহত্তম আদর্শে উদ্বুদ্ধ ক্ষুদ্রতম বাহিনীর নামকরণ করেছিলেন সেই মুহূর্তে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'—ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনী। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা তুলে দিলেন তাঁর বাহিনীকে—সেখানে পরিবর্তন শুধু চরকার জায়গায় লম্ফমান ব্যাঘ্র—ব্যাঘ্র কেতন।

---

[১০] Preface to the book—'Netaji in Germany' by N. G. Gunpuley written by Dr Adalbert Seifriz-Stutgart Germany—14th August, 1959. ডঃ এ্যাডালবার্ট শেফ্রিজ ১৯৫৯-এ জার্মান লেবার অফিসের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং তিনি স্টাটগার্টে ইণ্ডো-জার্মান সোসাইটী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষে দু'বার এসেছিলেন।

"তোমাদের নাম স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে লিখিত হবে। এই পবিত্র যুদ্ধের প্রত্যেক শহীদের স্মৃতিস্তম্ভ থাকবে।" নেতাজী আরও বললেন তাদের—"যখন আমরা একসঙ্গে ভারত অভিযান করবো আমি সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেবো।" দূর প্রাচ্যের দিগন্ত ঘিরে যুদ্ধের ঘন কালো মেঘের ভেতর থেকে তখন ব্রিটিশ সমর অহঙ্কার একের পর এক বজ্রাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে চলেছে; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক-একটা দেশ স্বাধীনতা লাভ করছে। তাদের একতাবদ্ধ হতে হবে। ভারত তথা সমগ্র এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধের জন্য চাই সমগ্র পূর্ব পৃথিবীর জনগণের মানসিকতা, প্রচণ্ড আবেগ ও সর্বাত্মক সহযোগিতা। সর্বত্র সামরিক বেসামরিক ব্যক্তিদের মুখে মুখে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম বিদ্যুৎ বহ্নির মত ছড়িয়ে পড়ছে।

বিশ্ব সমরের পূর্ব রণাঙ্গনে চোখ ফেরানো যাক। দেখা যাবে সূর্যোদয়ের দেশ জাপান থেকে আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত ন্যূনপক্ষে দশ হাজার মাইল-ব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন শ্বেতাঙ্গ শক্তির সে এক লজ্জাকর পরিণতির দৃশ্যরূপ। গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল একরকম 'প্রাণ বাঁচাও' আবেদনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে জানালেন, ভারত মহাসাগরে জাপানী নৌবহরের অগ্রগতি রোধ করা তো দূরের কথা, সামান্যতম বাধাদান করতে হলেও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় একটা আমেরিকান নৌ-মহড়া খুবই প্রয়োজন—যাতে করে জাপ অক্টোপাশকে একটু শিথিল করা যায়। তা না হলে শুধু ভারত মহাসাগর নয়, পারস্য উপসাগর পর্যন্ত জাপ নৌ-শক্তির একচ্ছত্র অধিকারভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। জবাবে রুজভেল্ট সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর অসামর্থ্য জানিয়ে উপদেশ দিলেন, তাঁর ভারী বোমারু বিমান কিছু দিয়ে তিনি সম্ভাব্য জাপানী নৌ-আক্রমণকে কিছুটা ঠেকাতে সম্ভব হলেও ব্রিটিশ নৌ-বহরের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে চার্চিল যেন কোনক্রমেই জাপ নৌ-শক্তির মুখোমুখি না হন বরং যুদ্ধ এড়িয়ে আত্মগোপন করার পথই বেছে নেন। ভারত মহাসাগরীয় নৌ-যুদ্ধ এলাকায় নবনিযুক্ত সর্বাধিনায়ক এ্যাডমীরাল সোমারভিল (Admiral Sommerville) এই নীতি সমর্থন করলেন কিন্তু ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড ওয়াভেল নারাজ এবং তাঁর এই বিরোধিতার জন্যই প্রধানত তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসারণ করা হলো। সিঙ্গাপুরের পতন ও রেঙ্গুনের ব্রিটিশ বিপর্যয়ের ব্যর্থতা-ত তাঁর ভাগ্যে আগে থেকেই ঘটেছিল; দিল্লীর বড়লাটের পদে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হলো। ইত্যবসরে জাপানের বিখ্যাত কলম্বো-ত্রিঙ্কমালী নৌ-বিমান হানা এবং যুগপৎ বঙ্গোপসাগরের

উপকূলে নৌ-আক্রমণের আঘাতে ক্ষীয়মাণ ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর অসহনীয় ক্ষতি সাধিত হয়ে গিয়েছে। আর জাপানী এ্যাডমীরাল ওজাওয়ার নৌ-বহর উৎকামণ্ড-ভিজাগাপত্তমের মধ্যবর্তী উপকূল অঞ্চলে ১৯৪২-এর এপ্রিলে ১৯ খানি পণ্যবাহী ব্রিটিশ জাহাজ ধ্বংস করে দেয়। কলকাতা বন্দর থেকে সমস্ত জাহাজ চলাচলের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে এক ভয়াবহ অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। ভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর বাকী অংশ কলম্বোর প্রায় ৬-শত মাইল পশ্চিমে আড্ডু আটোল দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় নেয় এবং আফ্রিকার উপকূলে কালিন্দীনি পোতাশ্রয়ে আত্মরক্ষা করে। ভারতে ব্রিটিশ শক্তি এমনই অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, কলকাতা পরিত্যাগ করে যাওয়ার গোপন সার্কুলার এবং মাদ্রাজ ত্যাগ করার প্রকাশ্য ঘোষণা তাঁরা জারি করেন ; আর সে সময়ের ভারত-ব্রহ্ম যুদ্ধফ্রন্টের ইঙ্গ-মার্কিন 'হেড কোয়ার্টার্স' ছিল কুমিল্লায় ; সেখান থেকে তা রাঁচিতে স্থানান্তরিত করার কাজও শুরু হয়ে যায়।

এই দিশেহারা অবস্থায় এবং মার্কিন সরকারের চাপে পড়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ভারতবর্ষের জন্য যুদ্ধের শেষে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' বা স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব দিয়ে ব্রিটেনের তথাকথিত সমাজবাদী নেতা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠিয়ে দেন। কারণ, চার্চিলের ভাষায় 'ভারত সংরক্ষা বিপন্ন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মারাত্মক চ্যালেঞ্জ বর্তমান'। তিনি আরো স্পষ্ট করে বললেন, 'সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি চরমপন্থীদল বিদ্রোহাত্মক কাজে লিপ্ত এবং অক্ষশক্তির বিজয় লাভে আস্থাবান। কিন্তু আজ উত্তরোত্তর একটা শক্তিশালী জনমত যা আগে গান্ধী নেতৃত্বে বিশ্বাসী ছিল এবং এ-যুদ্ধে নিক্রিয় থাকাই সমীচীন মনে করত, জাপানী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তা ভোল বদল করে ফেলছে ··· এবং ভাবছে যে বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে ব্রিটিশ সংস্পর্শ ছিন্ন করে ফেলতে পারলে আয়ারের (EIRE) মতই ভারতবর্ষও তার স্বাধীন স্থান দখল করে নিতে পারবে···।'[১১]

আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকাবাসীর সমর্থন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, বিশাল ভারতের জনমত, বিপ্লবাত্মক জাগরণ এবং প্রথম পর্যায়ে ইঙ্গ-মার্কিন পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকাবাসীর পক্ষে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যুদ্ধ চলাকালীনই ভারতবাসীর স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষপাতী ছিলেন। স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার পূর্বাহ্নে

১১। জোয়ারদার রচনা সংগ্রহ—পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯।

রুজভেল্ট চার্চিলকে বার্তাযোগে জানালেন, স্বায়ত্তশাসন বা ঐ জাতীয় শাসন-ব্যবস্থা যদি যুদ্ধের শেষে ভারতকে দেওয়াই সাব্যস্ত হয়, তাহলে যুদ্ধ চলাকালীন তা দিতেই বা আপত্তি কোথায়? বরং দ্রুত জাতীয়-গভর্নমেন্ট গঠন করলে যুদ্ধোদ্যমে ভারতের অত্যাবশ্যক স্বেচ্ছা-সহযোগিতা আশা করা যায়। অন্যথায় আমেরিকার জনসাধারণ অতিমাত্রায় বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে পড়বার প্রবল আশঙ্কা।

চার্চিল এ মন্তব্যে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করলেন, 'পরের পয়সায় আদর্শবাদ'—(Second World War, Vol. 4) অর্থাৎ ভারতে ইংল্যাণ্ড তার সাম্রাজ্য সম্পদ হারালে আমেরিকার তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না—তাই আমেরিকার পক্ষে নীতিবাগীশ হতে আর অসুবিধা কি? তাঁরই ধৃষ্ট মনোভাবের জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময়ে ভারতে জাতীয়-গভর্নমেন্ট গঠনে বা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় গ্রেট ব্রিটেন রাজী হয়নি। আমেরিকাও এই নিয়ে আর অগ্রসর হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাবো, নেতাজী সুভাষচন্দ্র চার্চিলের এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমর্থকরূপে আমেরিকার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং তা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন নয় যে, ভারতবর্ষকে যুদ্ধে লিপ্ত করে অর্থাৎ যুদ্ধোদ্যমে ভারতবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা আদায় করাই ছিল স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের উদ্দেশ্য। কিন্তু বিশ্ব-রাজনীতি ও যুদ্ধ সমাবেশের একেবারে মর্মমূলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রজ্ঞা এমনই হিমালয়ের স্বরূপ নিয়ে ভারতের পক্ষে দাঁড়াল যে, তাঁকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা ইঙ্গ-মার্কিন কূটনীতি এবং যুদ্ধ বিশারদদের আর তখন ছিল না। বার্লিন থেকে অবিরাম 'আজাদ হিন্দ রেডিও' এবং পরে আরো তিনটি রেডিও কেন্দ্র থেকে সুভাষচন্দ্র ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী কূটচক্রান্ত সমগ্র পৃথিবীর সামনে প্রকাশ করে দিতে লাগলেন। মহাত্মা গান্ধীসহ ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, বিপ্লবী জনসাধারণ—সকলের কাছে বিশ্বযুদ্ধ ও রাজনীতির পরিস্থিতি বারে বারে তুলে ধরতে লাগলেন; অক্ষশক্তির সক্রিয় সাহায্যের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার ভারসাম্য ভারতের অনুকূলে অভ্রান্তভাবে নোয়াতে সমর্থ হলেন। দ্বিতীয় মহাসমরের দুই বিরুদ্ধ শিবিরই তাঁর নীতিতে সমানভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে উঠলো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শক্তি আতঙ্কিত, কারণ তার ক্রিপস মিশন প্রত্যাখ্যাত হওয়া ও সুভাষচন্দ্রের অক্ষশক্তির সমর সাহায্যসহ ভারতে প্রবেশ এবং ভারত হাতছাড়া

হওয়ার সম্ভাবনা। আর জার্মানী ও জাপান উৎসাহিত কারণ, ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশে তাদের উত্থানের আশা-আকাঙ্ক্ষা। ১৯৪২-এর ১০ই এপ্রিল 'ক্রিপস প্রস্তাব' বাতিল হয় এবং ৯ই আগস্ট 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ঘোষিত হয়। বেতার ভাষণে বারে বারে নেতাজী বার্লিন থেকে আগস্ট বিপ্লবীদের উৎসাহ, সংগ্রামের লক্ষ্য, আদর্শ, লড়াই কৌশল এবং সরঞ্জাম সম্বন্ধে নানান নির্দেশ দিতে থাকেন।

নেতাজী বার্লিন থেকে ব্যাঙ্কক-এ শক্তিশালী তাঁর মতবাদ পাঠালেন —"ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন একটিই এবং এখন সময় হয়েছে সমগ্র বিশ্বে যত জাতীয়তাবাদী ভারতীয় আছেন সকলকে একটি সর্বতোমুখী সংগঠনের মধ্যে একীভূত করা।" তাছাড়া তিনি জার্মানীতে জাপানী রাজদূত মেজর জেনারেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ জানালেন, টোকিওতে জাপানী গভর্নমেন্ট যেন দূরপ্রাচ্যে, বার্লিনে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের অনুরূপ আজাদ হিন্দ সৈন্যদল গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করেন।

ভারতে শতাব্দীর স্বাধীনতা সংগ্রামে, সৈন্যদল গঠন করে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়ার কার্যসূচী কোন নেতাই গ্রহণ করার কথা ভাবেননি। নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ এ বিষয়ে ভাবলেও তা কার্যে পরিণত করার উদ্যোগ কারুর মধ্যে জন্মায়নি মাত্র। ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের আয়োজন করেছিলেন সন্ত্রাসবাদী মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু। কিন্তু তা সুপরিকল্পনার অভাবে বিফল হয়। একমাত্র বীর সাভারকরই তাঁর সুস্পষ্ট ধারণার কথা ১৯৪৩ সালে প্রকাশ করেছিলেন —"আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্র ব্যতীত কখনো ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে না", এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে তাঁর সে মনোভাবও প্রকাশ হয়েছিল, এই পর্যন্তই বলা যায়। শুধু আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করে একক সে সময় আয়োজন—সৈন্যবাহিনী গঠন, যুদ্ধ পরিচালনা, সাময়িক ভারত গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা—একমাত্র নেতাজীর পক্ষে সে-অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। তাঁর দূরদৃষ্টি ও সংগঠনী প্রতিভার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন চেতনার উদ্বোধন হয়।

দূরপ্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভাব হতে আরো আট মাসকাল পাশ্চাত্যের রণক্ষেত্রে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। কারণ, এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে আর মূল ভারত ভূখণ্ডে কতই না ঘটনা প্রবাহ তখন। আর তার সঙ্গে নেতাজী ভারত সীমানার বহু যোজন দূরে থেকেও মহত্তম আত্মিক

যোগে-যুক্ত ; সে জাগ্রত জগতের সঙ্গে কত অঙ্গাঙ্গিভাবেই না বদ্ধ। সেখানকার অবস্থা কিছুটা পর্যালোচনার প্রয়োজন।

ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে জাপানে পলায়নের পর তিরিশ বৎসরকাল সেখানে জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করে বসবাস করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়—জাপ সৈন্যবাহিনীর—'ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফের প্রধান অধ্যক্ষ ফীল্ড মার্শাল সুগিয়ামার সঙ্গে দেখা করে রাসবিহারী প্রস্তাব করেন যে, বর্তমান মহাযুদ্ধ ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতবর্ষ উদ্ধার করবার একটা সুবর্ণ সুযোগ। জাপানের সাহায্য পেলে ভারতীয়েরা পূর্ব-এশিয়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পূর্বপ্রান্ত থেকে ব্রিটিশ-ভারতীয় গভর্নমেণ্টকে আক্রমণ করতে পারে এবং সেজন্য যেন জাপান অধিকৃত দেশগুলিতে জাপ সরকার ভারতীয়দের শত্রু-প্রজার দৃষ্টিতে না বিচার করে। কিন্তু যেহেতু ইংল্যাণ্ড এ সময় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, ব্রিটিশ-ভারতীয়দের শত্রু প্রজাবৎ মনে না করে উপায় কি! কিন্তু জাপানের ডেপুটী যুদ্ধমন্ত্রী রাসবিহারীর প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় তাঁর অধিনায়কত্বে 'ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ' (ইণ্ডিয়ান ইনডিপেণ্ডেন্স লীগ) প্রতিষ্ঠিত হলো। পরে এই সংঘের শাখা পূর্ব-এশিয়ায় সর্বত্র, যথা—ফিলিপাইনস, থাইল্যাণ্ড, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিস, ফরাসী ইন্দোচীন, সাংহাই, ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি দেশে গড়ে ওঠে। এর সমস্ত শাখাই, রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বাধীনে জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের কর্তৃত্ব মেনে চলতো।

এই সময় ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান আর্মির চতুর্দশ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ফার্স্ট ব্যাটালিয়ানের অফিসার ক্যাপ্টেন মোহন সিং ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে ক্যাপ্টেন আকরাম খাঁ এবং আহত ইংরেজ কম্যাণ্ডিং অফিসার লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল এল. ভি. ফিজপ্যাট্রিক সহ মালয়ের ঘন জঙ্গলে অর্লস্টারের একটি মসজিদে আশ্রয় নেন। সেইখানে শিখ বিপ্লবী প্রীতম সিং-এর দেখা হয়। বিপ্লবী প্রীতম সিং ব্যাঙ্ককের ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের নির্দেশে জাপানী সৈন্যদলের সঙ্গে এগিয়ে চলেছিলেন। তাছাড়া জাপানী মিলিটারী গোয়েন্দা অফিসার মেজর ফুজিয়ারা ধৃত ক্যাপ্টেনকে স্বাধীনতা সংঘে যোগ দেবার পরামর্শ দেন এবং বন্দী অন্য একজন ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস-এর ক্যাপ্টেন পট্টনায়ককেও সেই পরামর্শ দেন। আহত সৈন্য ও অসামরিক ভারতীয়দের ফেলে ইংরেজ শাসকরা পলাতক ও পলায়মান। এ অবস্থায় জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা শ্রেয় ; তাতে অনেক ভারতীয়ের প্রাণরক্ষা হবে ও

নিরাপদে থাকতে পারবে—এই যুক্তিতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদলের কতিপয় সৈন্য ও কয়েকজন অফিসার নিয়ে ক্যাপ্টেন মোহন সিং একটি ছোট দল গড়ে তুললেন—তার নাম 'ফুজিয়ারা কিকন'। এই স্বেচ্ছাসেবকেরা জাপানী সৈন্যদলের সাথে এগিয়ে গিয়ে ইংরেজ পরিত্যক্ত ভারতীয় সেনা সংগ্রহে সাহায্য করতো। তাছাড়া অসামরিক ভারতীয়দের খাদ্য সরবরাহ, আহত-রুগ্নদের সেবা প্রভৃতি কাজে তারা সাহায্য করতো।[১২]

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এই যুদ্ধ নেতাজীর জীবনে পূর্ণতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম সুযোগ উপস্থাপিত করলো। সুভাষচন্দ্র পরিকল্পনা স্থির করে ফেললেন—পূর্ব-এশিয়ায় গিয়ে মালয়, সিঙ্গাপুর, বার্মা ও পূর্ব-এশিয়ার অন্যান্য সমস্ত দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের একত্রিত করে একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠন করার। যদি জাপান-বার্মা ও পূর্ব-এশিয়ার গভর্নমেন্ট-সমূহের এবং জনগণের সক্রিয় ও উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যায় তবে ব্রহ্ম সীমান্তে পৌঁছে ব্রিটিশ সমর শক্তিকে তীব্র আক্রমণে পর্যুদস্ত করা এবং বাংলা ও আসামের মাটি স্পর্শ করতে পারলে সারা ভারত জুড়ে যে মহাআলোড়ন দেখা দেবে তা হবে অতুলনীয়।

"আমি সুভাষচন্দ্র বোস বলছি—যে এখনও জীবিত এবং আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে আপনাদের বলছি। ভারত ত্যাগের পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ প্রচার বিভাগ, আমি কোথায় জানবার জন্য অসংগতিপূর্ণ প্রচার করে যাচ্ছে। ভারত ইতিহাসের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ভারতবর্ষকে তাদের যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য এটা তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা এবং তাই তারা তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার যুদ্ধে আমাকে মৃত দেখাতে চায়। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতে পাঠিয়ে তাদের একদিকের চেষ্টা আপোষকামীদের সমঝোতায় নিয়ে আসা আর সেই সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার জন্য নির্ভীক যোদ্ধাদের কারাগারে নিক্ষেপ। ইংলণ্ডের 'ডেলী টেলিগ্রাফ' সংবাদপত্রের তাই মন্তব্য—ক্রীপস মিশনের মৌলিক নতুন কোন অর্থ নেই—স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি ছাড়া; আর 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার মতে—যুদ্ধোত্তর ভারতকে কয়েকটি ডোমিনিয়ন ও দেশীয় রাজ্যে বিভক্ত করা।"[১৩]

---

[১২] মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান—আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী : পৃষ্ঠা ৪৩-৪৫

[১৩] Broadcast from Azad Hind Radio, Germany, March 25, 1942. Selected Speeches of Subhas Chandra Bose—Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

"জাপানের প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক ঘোষণার উত্তরে আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে আমি সুভাষচন্দ্র বোস বলছি—সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন পতনের পর ভারতীয় সমস্যা বিষয়ে হিজ একসিলেন্সী জাপ প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক ঘোষণায় দেশে ও বিদেশে অবস্থিত স্বাধীনতাকামী সকল ভারতবাসীর পক্ষে তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'ভারতবর্ষ ভারতীয়দের জন্য'—তাঁর এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টাসুলভ ঘোষণা ভারত ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতবাসী স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে—চিরদিনের জন্য তার মাটি থেকে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি ঘটাবে -যে-শাসন দস্যুতা ও অন্যায় নীতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং যা অবিচার ও অত্যাচারের মধ্য দিয়ে বর্ধিত। ভারতের পক্ষে এটা সম্মানজনক বিষয় ও সুযোগ যে, জাপানের নেতৃত্বে বৃহৎ এশিয়া গঠনের মহৎ উদ্যোগে সে জাপানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সহযোগী হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।"[১৪]

ব্যাঙ্ককে ১৯৪২-এর ১৫ই জুন পূর্ব-এশিয়ার সমস্ত দেশের প্রতিনিধি এবং জাপানের হাতে বন্দী ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সৈন্যবাহিনীর মধ্য থেকে গঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর ৩০ জন প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন রাসবিহারী বসু। প্রচণ্ড আনন্দোল্লাসের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে অবিলম্বে পূর্ব-এশিয়ায় চলে এসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব নিতে হবে। এরপরই চলতে থাকে জার্মান ও জাপ সরকারের মধ্যে গোপন পরিকল্পনা—নেতাজীর সমুদ্র পথে ডুবোজাহাজে করে ইউরোপ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পথে দুস্তর সমুদ্র পারাপার। বার্লিনে তাঁর জাপানী বন্ধু জাপ মিলিটারী এ্যাটাচে কর্ণেল ইয়ামামোতো (পরে মেজর জেনারেল) তুরস্ক ও রাশিয়ার পথ ধরে নেতাজীর এশিয়া যুদ্ধখণ্ডে আসার ব্যবস্থা করতে টোকিয়ো চলে যান।

মার্কিন সুরক্ষিত পার্ল হারবার নৌ-ঘাঁটির পতন, বিশাল নৌবহর 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' ও 'রিপালস'-এর ধ্বংসের পর ব্রিটিশ সামরিক শক্তির পূর্বগোলার্ধের গর্ব দুর্ভেদ্য সিঙ্গাপুরের পতন হলো। তার একমাস যেতে না যেতে রেঙ্গুন জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। শোনা যেতে লাগলো ভারতের পূর্ব ফটকেই বিজয়ী জাপানের যুদ্ধধ্বনি। তখন ভারতীয় রাজনীতি-মঞ্চেও অতি

---

[১৪] Broadcast from Azad Hind Radio, Germany, April 6, 1942.

দ্রুত পট পরিবর্তনের কাল শুরু হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস-বহিষ্কৃত সুভাষচন্দ্র, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী তাঁর বিভিন্ন বিবৃতির মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অমর অবদানের প্রশংসা করে চলেছেন। তাঁর অপূর্ব সাহস ও বুদ্ধি কৌশলে অন্তর্ধান, তাঁর গতিবিধি, আজাদ হিন্দ রেডিও মারফৎ তাঁর দেশসেবার স্বচ্ছ নীতি ঘোষণা—গান্ধীজীর হৃদয় স্পর্শ করেছে। তাঁর মুখে এখন দেশপ্রেমিকদের সেরা দেশপ্রেমিক সুভাষ।

অহিংসবাদী নেতা গান্ধীজীর এ অদ্ভুত মানসিকতা, এমন শক্তিশালী ব্রিটিশ বিরোধী সুস্পষ্ট কথা ইতিপূর্বে কখনো কেউ শোনেনি—এ যেন বহুকথিত বহু ঘোষিত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নেতাজী সুভাষের বাণীর প্রতিধ্বনি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে এক বিরাট বাস্তবানুগ বক্তব্য রাখলেন মহাত্মা গান্ধী যা আজো পর্যন্ত নেতাজী ভিন্ন অন্য কারুর মুখে শোনা যায়নি।

'ওরা ভারত ছেড়ে চলে যাক, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ তাদের নিজেদের স্বার্থেই ভারত সরকার গড়ার জন্য একত্রিত হবে।'[১৫] গান্ধীজীর ধীর অথচ এমন অনমনীয় দৃঢ়তার পেছনে নেতাজীর আত্মশক্তির প্রভাব পড়েছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের লেখায় পাওয়া যায়।*

১৯৪২ সালের ২৯শে এপ্রিল তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে মহাত্মাজী লিখলেন—"ভারতবর্ষ হইতে সুশৃঙ্খলভাবে এবং যথাসময়ে ব্রিটিশ-শক্তির অপসারণের মধ্যেই রহিয়াছে গ্রেটব্রিটেনের ও ভারতের সামগ্রিক মঙ্গল।" ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে সবরকমের বন্ধুত্বের অবসান ঘটেছে—এই তাঁর প্রথম ঘোষণা এবং তাঁর এই মন্তব্য প্রমাণ করলো তিনি ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

১৫। Michael Edwards : The Last Years of British India : Page 72

* 'I saw that Subhas Chandra's escape to Germany had made a great impression on Gandhiji. He had not formerly approved many of Bose's activities. But now I found a change in his outlook. Many of his remarks convinced me that he admired the courage and resourcefulness of Subhas Bose had displayed in making his escape from India. His admiration for Subhas Bose had coloured his view about the whole war situation ?

—Moulana Abul Kalam Azad (India Wins Freedom)

পরস্পর কত কাছাকাছি এসেছেন। শুধু তাই নয়, গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তীব্র বিরোধিতার জন্য তার কিছু অংশ—অর্থাৎ 'জাপান' কিংবা 'ভারত রক্ষার ব্যাপারে ব্রিটেনের অসামর্থ্য'—কথাগুলি বাদ দিয়ে গান্ধীজী ১লা মে যে খসড়া-প্রস্তাব কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে পাঠিয়েছিলেন তা গৃহীত হোল। গান্ধীজীর মূল প্রস্তাব ছিল এইরকম—“ভারতকে রক্ষা করিতে ব্রিটেন অসামর্থ্য ··· ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারতীয় জাতির প্রতিনিধিত্ব করে না। উহা পৃথক একটি বাহিনী যাকে তাঁদের নিজেদের বাহিনী বলে তাঁরা কোনও ক্রমেই গ্রহণ করতে পারেন না ··· ভারতের সঙ্গে জাপানের কোন বিবাদ নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তার লড়াই। ভারত যদি স্বাধীন হয় তাহলে সম্ভবত তার প্রথম পদক্ষেপ হবে জাপানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা। কংগ্রেসের মতে, ব্রিটিশ যদি ভারত থেকে চলে যায় তাহলে জাপান কিংবা আর কোনও আক্রমণকারী ভারত আক্রমণ করলে নিজেকে রক্ষা করতে সে সমর্থ হবে।”[১৬]

গোঁড়ামীর গন্ধহীন বিপ্লবাত্মক, এই বাস্তববাদী গান্ধী-প্রস্তাব ভারতবাসীর বুকে বিপ্লবের শক্তি তীব্রতর করে তুললো আর এর পূর্ণপরিণতি ঘটতে দেরী হলো না। গান্ধীজীর নেতৃত্বে আসমুদ্র হিমাচল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—ইংরেজ ভারত ছাড়'—করবো অথবা মরবো—তূর্যধ্বনি তুললো আর গান্ধীজীসহ সকল নেতাকে কারারুদ্ধ করা হলো। সম্ভবত এখানেই মহাত্মাজীর মাহাত্ম্য, সত্যের সঙ্গে তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী যে এক্সপেরিমেন্ট—সে নৈতিকতার এখানেই একটি মূল্যবান সাফল্য যে, সুভাষচন্দ্রের মতামতকে তাঁর সপ্রশংস স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রকাশ। ইংলণ্ড থেকে আগত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস খোলাখুলি বললেন যে, তিনি আশা করতে পারেননি, মহাত্মা গান্ধীর মত ব্যক্তি যিনি অহিংসবাদী নেতা, তিনি সুভাষচন্দ্র অক্ষশক্তির যোগাযোগে ব্রিটিশ সরকারকে সম্মুখ যুদ্ধে আক্রমণ করতে কৃতসংকল্প জেনেও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, এ কি করে সম্ভব? এর কারণ, মহাত্মাজী এখন আর সুভাষবিরোধী নন। মহাযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতবাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনিও একথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, জাপান যদি

---

[১৬] শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র-রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০২

ভারত আক্রমণ করে তবে ব্রিটিশ শক্তির শত্রু হিসেবেই তা করবে, ভারতের শত্রু হিসেবে নয়।

ভারতে আসন্ন জাপানী অভিযানে এবং সেই সঙ্গে নেতাজীর আবির্ভাবের সম্ভাবনায়, ক্রিপস প্রস্তাবের দূরভিসন্ধিতে (কারণ ক্রিপস প্রস্তাবে স্বাধীনতা নয়, স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, এমন কি ভারত ভাগের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল) কারুরই আস্থা ছিল না। এমন কি স্বয়ং গান্ধীজী বিদ্রূপ করতে বাদ দিলেন না —'যে ব্যাঙ্ক স্পষ্টত ফেল মারছে আগে ভাগে পরের তারিখ দিয়ে তার চেক কেটে দেওয়ার সামিল'[১৭]—এই ক্রিপস প্রস্তাব। (ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাঁর ওয়ার ক্যাবিনেটের সোস্যালিস্ট সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন এক ঘোষণা করে যে, ভারতের নেতৃবৃন্দ যেন আক্রমণকারী জাপানের হাত থেকে তাদের দেশ ব্রিটিশ-ভারতকে রক্ষা করে, যুদ্ধ জয়ের পর ইংলণ্ড স্বায়ত্তশাসন দান করবে।) 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই পতনের মুখোমুখি, তার পক্ষে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্ন কোথায় ? তার চেয়ে অনেক ভাল ভারতবাসী তার শক্তি ও সুনাম বাঁচিয়ে রাখুক বিজয়ী জাপানের সঙ্গে তার বোঝাপড়ার জন্য। এই হচ্ছে কালোপযোগী এবং অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী।'

নেতাজী ভারতবর্ষে চলমান ঘটনার সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতি বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। ১৯৪২-এর ৩১শে আগস্ট, জার্মানী থেকে তাঁর দেশবাসীর প্রতি 'ভারত ছাড় আন্দোলন' সম্বন্ধে যেভাবে অনুপ্রাণিত করেন, ব্রিটিশ গোয়েন্দা ও প্রচার বিভাগের সর্ববিধ চেষ্টা ও অপকৌশল সত্ত্বেও কিছু ভারতবাসী তাঁর বেতার ভাষণ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও গোপনে প্রতি নিয়তই শুনে দেহ-মনে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন, ধন-সম্পত্তি বিসর্জন ও আত্মত্যাগে বলীয়ান হয়ে ওঠেন। তখন জাতীয় কংগ্রেসের সমস্ত নেতাই বন্দী—কিন্তু দেশ-মহাদেশ-সমুদ্র-পর্বত-মরুভূমির ওপার হতে নেতাজীর আহ্বান ধ্বনি তাঁর শারীরি উপস্থিতির চেয়েও বিপ্লব-বিদ্রোহের আগুন আসমুদ্র হিমাচলে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ঝড়ের গতিবেগ দান করে, দাবানলের সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু বিভিন্ন অপকৌশলের জালে, দেশী-বিদেশী শিকারীর কূটনৈতিক-কারাগারে বন্দী তখন দেশবাসী।

---

[১৭] Michael Edwards—The Last Years of British India—Page 79

'বন্ধুগণ, প্রায় দু-সপ্তাহ আগে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্যের পর ভারতে আন্দোলন অপ্রতিহত গতিতে দাবানলের মত শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভারতবর্ষ, তাকে রাখতে ব্রিটিশ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ লড়বে। তাই আমাদের এই শেষ সংগ্রামে অনেক দুঃখ বহন, হত্যা, অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হবে—এই হচ্ছে স্বাধীনতার মূল্য—সেই মূল্য আমাদের দিতেই হবে। আমাদের নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে—তার জন্য হতাশার কারণ নেই বরং তাঁদের এই কারাযন্ত্রণা সমগ্র জাতিকে প্রেরণা জোগাবে। তাছাড়া যাঁরা আজ মুক্ত নেই, তাঁরা আন্দোলনের যে প্ল্যান আপনাদের দিয়ে রেখেছেন তাকে কার্যকর করতে হবে। ... আমি শ্রীজিন্না, শ্রীসাভারকর এবং সেই সব নেতা, যাঁরা এখনো ইংরেজের সঙ্গে আপোষের সম্ভাবনার কথা ভাবছেন, তাঁদের এই উপলব্ধি করাতে চাই—আগামীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলতে কিছু থাকবে না। ... দুই-ভাবে এই অহিংস গেরিলা যুদ্ধ হতে পারে। প্রথমত ভারতে ইংরেজের যুদ্ধ-সামগ্রী উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস করা এবং দ্বিতীয়ত ওদের শাসন ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় যে, এই 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের আহ্বান ধ্বনি ভারতে ও বহির্বিশ্বে আমাদের সৈন্যদের অন্তর স্পর্শ করেছে—নিঃসন্দেহে তাদের সেজন্য সমর আদালতে ব্রিটিশের স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার কাছে প্রাণ দিতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে কিছু সৈন্য মিশরের যুদ্ধে অক্ষশক্তির কাছে সশস্ত্রে আত্মসমর্পণ করেছেন ; এল আলামেইন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নির্ভরযোগ্য নয় বলে সমস্ত ভারতীয় ইউনিটকে ব্রিটিশ যুদ্ধ বিভাগ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। আপনারা মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হবেন না যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন তার শেষ ধাপে পৌঁছেছে।'[১৮]

যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর দুরবস্থা, গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি, সৈন্যদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া এবং ৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে দেশবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে নেতাজী তাঁর অপূর্ব ভাষা ও যুক্তি প্রদর্শনে দেশবাসীকে প্রচণ্ডভাবে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন।*

১৮। Broadcast from Azad Hind Radio, Germany, August 31, 1942. Selected Speeches—pp. 147–153

* এই লেখক ওই সময় মেদিনীপুরে গ্রামের হাইস্কুলে নিম্নশ্রেণীর ছাত্র, বিয়াল্লিশের আন্দোলনে স্কুল বয়কটে পাঁচ ছয় মাইল পরিধির মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে ভলান্টিয়ার হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কাঁথি

প্যারিস থেকে ১৯৪৩-এর জানুয়ারীতে প্রত্যাবর্তনের পর নেতাজী বুঝলেন, তাঁর সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পথে যাত্রা আসন্ন। কিন্তু এলগিন রোড বা কাবুল অতিক্রমণের চেয়ে সমুদ্র পথে বার্লিন থেকে টোকিও তিন তিনটি মহাসাগর, তিন তিনটি মহাদেশ পাড়ি দেওয়া এক প্রায়-দুর্লঙ্ঘ অভিযান, একান্ত গোপনীয়, একান্ত বিপদসঙ্কুল, অথচ দুর্নিবার। জীবিত অবস্থায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা শতকরা পাঁচ ভাগ– জার্মান কর্তৃপক্ষ এরকম হিসেব করেছিলেন। ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে বার্লিন নগরীতে ইচ্ছাকৃতভাবে এক বিরাট ও জাঁকজমকপূর্ণ পার্টি বা ভোজ সভার আয়োজন করলেন তিনি। দেশ-বিদেশের মহামান্য ছয়শ'জন অতিথি হিজ এক্সিলেন্সী নেতাজী বোসের স্বাস্থ্য পান করলেন আর দুদিনের পর আজাদ হিন্দ দিবসে—অর্থাৎ 'লিজিয়ন ডে' অনুষ্ঠানে ভাষণ দিলেন তিনি। তাঁর বার্লিন ত্যাগ সংবাদ যাতে শত্রুপক্ষ না জানতে পারে সে কাহিনী একান্ত গোপন রাখতে তিনি অগ্রিম তারিখ দিয়ে দুটো বক্তৃতা টেপ রেকর্ড করিয়ে রাখলেন যাতে তিনি চলে যাওয়ার পরেও প্রচার করা হয়।[১৯]

একটি ২৮শে ফেব্রুয়ারী, অন্যটি ৪ঠা মার্চ ১৯৪৩ প্রচার হয়েছিল। (৮ই ফেব্রুয়ারী নেতাজী কিয়েল বন্দরে সাবমেরিনে যাত্রা করেন) তিনি বলে চললেন, রাশিয়ার যুদ্ধ সীমান্তে তাঁর দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিদর্শনে যাওয়ার কথা। কি অদ্ভুত বুদ্ধি-চিন্তা-প্রণোদিত কৌশলের চমৎকারিত্ব। দায়িত্বের

মহকুমার রামনগর থানা ঘেরাও, সেখানে মেদিনীপুরের বিপ্লবী নেতা বলাইলাল দাস মহাপাত্রের নেতৃত্বে তাঁর আপন গ্রাম বেলবোনীতে সশস্ত্র পুলিশ-মিলিটারীর সঙ্গে ৪২-এর ২৭শে সেপ্টেম্বরে লাঠি হাতে গ্রামবাসীদের লড়াই দেখেছেন, যে সংঘর্ষে উল্লেখিত নেতার ভাই ভীমচরণ দাস-মহাপাত্রসহ দশজন গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন, পুলিশ পক্ষে সম্ভবত একজন। গুলিবিদ্ধ শ্রীক্ষিরোদপ্রসাদ গিরি নামক জনৈক গ্রামবাসীকে লেখকের বাড়ীতেই এনে গোপনে রাখা হয়েছিল, (একটি করে চোখ, কান, চোয়াল হারিয়ে এখনো জীবিত) আর এ গ্রামের সমস্ত বাড়ীই মিলিটারী-পুলিশদের পেট্রোলে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন লেখক। তাছাড়া দেশপ্রাণ শাসমল স্মৃতিমন্দিরটিও ভস্মীভূত ও ধূলিসাৎ করা হয়। তখন কাঁথি-দীঘার একমাত্র যাতায়াতের পথ আন্দোলনকারীগণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন পিছাবনীর নিকট মৈশাগোঠ সড়ক, তমলুক থেকে সে সময় ব্রিটিশ শাসন লোপ করে দেওয়া হয়েছিল এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় দুবছর।

১৯। Springing Tiger—Hugh Toye—Page 83.

কি গুরুভার। হুঁশিয়ার। ব্রিটিশ চ্যানেল, উত্তর সাগর, আটলান্টিক মহাসাগর পার হতে হবে—আরো দূরে, বহুদূরে। অতলান্ত ভারত মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগরের সীমানায় ওই আগ্নেয় পর্বতশোভিত এশিয়ার শ্রেষ্ঠ জাগ্রত জাতির সাম্রাজ্য সীমানায় পৌঁছুতে হবে তাঁকে। সূর্যোদয়ের দেশে—খুব—খুব হুঁশিয়ার। আজাদ হিন্দের রেডিও বার্তা সব সময় শুরু হতো ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট বাহাদুর শাহের বিখ্যাত শ্যুয়ের দিয়ে ঃ

"গাজিওঁমে বু রহেগী যবতলক ইমান কি
তব্‌তো লণ্ডন তক চলেগী তেগ হিন্দুস্থানঁ কি ॥"*

আর রেডিও প্রোগামের সমাপ্তিও হতো তাঁরই শ্যুয়ের দিয়ে ঃ

"মজা আয়েগা যব্ হামারা রাজ দেখেঙ্গী
কে আপনি হি জমিন হোঙ্গী আপনা আসমান হোগা
শহীদোঁকী চিতায়োঁপর লাগেঙ্গে হারা বরস্ মেলে
ওয়াতনপর মরনেওয়ালোঁকা য়্যাহি নামোয়িসান হোঙ্গা।"

এই ঘটনা কখনো সম্ভব ছিল না—নেতাজী সুভাষচন্দ্র যদি ভারতে থাকতেন —এমন কি জেলের বাইরেও মুক্ত থাকতেন, মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই 'হিন্দুস্থানের তরবারী লণ্ডনের বক্ষ ভেদ না করা পর্যন্ত এগিয়েই যাবে'—এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কোন অন্ধতম কারাগারে নিক্ষেপ করা হতো তাঁকে, হয়তো বা ভয়ঙ্কর রাজদ্রোহমূলক এই বক্তৃতার জন্য ফাঁসীর ব্যবস্থাও হতে পারতো। কিন্তু জার্মানীর রাজধানীর বুকে দাঁড়িয়ে তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরী করে বিশ্বব্যাপী ভারতীয় স্বাধীনতাকামীদের উদ্দেশ্যে তাঁর কম্বুনাদে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের আহ্বান। আজ আবার তাঁর সুদূর প্রাচ্যের রণক্ষেত্রে শেষ পর্বটি উদযাপনের জন্য যাত্রা। কারণ তিনি অন্তরে বাইরে মুক্ত সত্তা এক অনন্য ভাববহ্নি। দুঃসময়ের সঙ্গীদের প্রতি, দেশী-বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি অন্তরে বাইরে তাঁর কতই না কৃতজ্ঞতা। লম্ফমান ব্যাঘ্র অঙ্কিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড়ে চলেছে, তার তলায় দাঁড়িয়ে সুমহান রণ-নায়ক রাষ্ট্রনায়ক, হিজ এক্সিলেন্সী নেতাজী স্যালুট গ্রহণ করলেন—শেষবারের মত ইউরোপের ভারতীয় ও জার্মান সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে। সগর্বে

---

* রেঙ্গুনে বন্দী এবং নির্বাসিত ভারতের শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের দৃপ্ত কবিতা। এর অর্থ আত্মসম্মানের সৌরভ যতদিন যোদ্ধাদের হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন আশা ভারতের দাপট একদিন না একদিন পৌঁছাবে লণ্ডনে।

তিনি আজ উচ্চকিত—আরো গুরুভার নিতে চলেছেন। 'জয়হিন্দ, কমরেডস, আজাদী সেনা যখন দিল্লী অভিযান করবে, আমিই থাকবো তোমাদের সামনে।'

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন-চরিত্রের শেষ পৃষ্ঠাটি পর্যন্ত মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়—গীতার নিষ্কাম কর্মের স্বরূপ যা অর্জুনের মধ্য দিয়ে সুপ্রকাশ হয়েছিল; বঙ্কিমচন্দ্রের সেই জীবানন্দ, যিনি জন্মভূমি রক্ষায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মানুষের অন্তর্লোকে চিরজীবী; যে মহৎ আত্মপ্রকাশের জন্য বিবেকানন্দ একদিন মেঘগম্ভীর স্বরে আহ্বান জানিয়েছিলেন…এসবই একীভূত হয়ে ভারত ইতিহাসে নেতাজীরূপে প্রকাশ হয়েছে। সুগভীর দেশপ্রেম, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-মহাসমুদ্র পার হয়ে বিদেশে দেশের জন্য কঠোর মুক্তির সাধনা, মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা—এ মহা সাধনার সিদ্ধি, ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে সঁপে দেওয়ার সে অমর কাহিনী একদিন অবশ্যই মুক্তি-যুদ্ধের মহাকাব্যের অংশীভূত হবে।

তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ের মুখে, যখন তিনি সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান, সেই পরিচ্ছেদের একটি অতি অপরূপ পৃষ্ঠা লিখতে বসেছি। সে ঘটনা যে-কোন রহস্য-উপন্যাসের মতই লোমহর্ষক। ইতিহাসে অনেক ব্যক্তিত্বই মানুষকে চমৎকৃত করেছে। কিন্তু শুধু আত্মবিশ্বাস আর পবিত্র নিষ্ঠা সম্বল করে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, একটা উপমহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে, স্বদেশের অনেক সেরা মানুষের শত্রুতা মাথায় নিয়েও একেবারে মৃত্যুর গুহায় সজ্ঞানে দৃপ্তভঙ্গীতে হেঁটে যেতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিশ্ব-ইতিহাসে সম্ভবত অনন্য এবং অসাধারণ।

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ সাল। বার্লিনের লেহর্টার ব্যানহফ রেলস্টেশন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর স্থান তখন বার্লিন নগরী। বলদর্পী হিটলার, ইতিহাসের বিস্ময়-বিভীষিকা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রায় সকল রাষ্ট্র-নায়কের দুঃস্বপ্ন হের হিটলার তখন সম্ভবত পঞ্চাশ ফিট মাটির নীচে কংক্রীট বাড়ীর তলায় তাঁর বাঙ্কারে বসে এই পৃথিবী উপগ্রহটার ভাগ্য নির্ণয় করতে অতি ব্যস্ত। বার্লিন থেকে কিয়েল বন্দরমুখী একটি ট্রেন যাত্রায় উদ্যত।

এমনি সময় উপস্থিত হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস—হিজ এক্সিলেন্সী সুপ্রিম কম্যাণ্ডার অব আজাদ হিন্দ ফৌজ। সঙ্গে একমাত্র ভারতীয় আবিদ হাসান সাফরানী—জার্মানীতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, এক হায়দ্রাবাদী মুসলমান যুবক। 'ফ্রি ইণ্ডিয়া-সেন্টার'—এর দুজন অফিসার, জার্মান পররাষ্ট্র

দপ্তরের দুজন ঊর্ধ্বতন অফিসার বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে এসেছেন দুজন পলাতক ভারতীয়কে। হায়রে, এক দেশের রাষ্ট্রনায়কের একি সম্বর্ধনা!

ভারতের শত্রুর শত্রুই তার মিত্র—এই নীতি, বাস্তববাদী সুভাষচন্দ্রের মনে উৎসাহ দান করেছিল সেদিন। বিশ্বের প্রায় সমস্ত পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে এই সাক্ষ্যই বহন করে। এমন কি অতি রক্ষণশীল ইংরেজ জাতও সেদিন জার্মান রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে কম্যুনিস্ট রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার সাহায্য নিয়েই যুদ্ধ লড়েছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজ আটলাণ্টিক, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্যাক্সনীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইঙ্গ-আমেরিকার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ তিন বছর প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করে চলেছেন। কিন্তু তাদের পেছনে রেখে আজ প্রায় নিঃসঙ্গ কোথায় চলেছেন তাদের অধিনায়ক। বক্ষে কোন মহৎ জিজ্ঞাসা—কোন আশার আলো তাঁকে আজ পথ-নির্দেশ করে চলেছে—কে বলতে পারে? কিন্তু সে সংবাদ যে অতি গোপন। রেল স্টেশন, বিমান ঘাঁটি, বন্দর-পোতাশ্রয়—সর্বত্র আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা দপ্তর অতি তৎপর। কিন্তু দূরপ্রাচ্যের আহ্বান, মাতৃভূমির মুক্তি আহ্বানে সব ভয়, সব সংশয় আজ দূরীভূত। বলিদান চাই। জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ ধন তা সঁপে না দেওয়া পর্যন্ত মহাযজ্ঞ যে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আকাশ, বাতাস, সমুদ্রের উপর দিয়ে আসে ইশারা—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐ যে সিঙ্গাপুরের অজেয় ব্রিটিশ হেড কোয়ার্টার্স আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ। অর্ধ লক্ষাধিক আহত মুমূর্ষু ভারতীয় সৈন্য ও সেনাপতিদের মৃত্যুমুখে ত্যাগ করে ব্রিটিশ বাহিনী আজ পলায়মান। কিন্তু সেনাপতি কই। কে করবে এদের সংগঠন, এদের পরিচালনা। সব্যসাচী সুভাষচন্দ্র ছাড়া এ গুরুভার বহন করার সাধ্য কি অপরের। বীরের রক্তে, নেতার নেতৃত্বে সে আহ্বান দোলা দিয়ে যায়। এই ত সুযোগ। রুশ যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মান শক্তির বিপর্যয় শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি দ্রুত পরিবর্তনের মুখে, এই ত পরম আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত।

কিন্তু এ যে এক অসম্ভব অবিশ্বাস্য পরিকল্পনা। উত্তর মহাসাগর, আটলাণ্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর—সর্বত্র ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স-আমেরিকার দূরপাল্লার বোমারু বিমান, মাইন, সাবমেরিন, যুদ্ধজাহাজ। প্রতিটি গতিপথ বন্ধ করে শত শত গোয়েন্দা বাহিনী, শক্তিশালী র‍্যাডার আর বেতারযন্ত্র সমস্ত গোপন জায়গায় সজাগ। ভারতীয় কংগ্রেসের শত্রু, কম্যুনিস্টদের শত্রু, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বৃহত্তম শত্রু—বিপ্লবী বিদ্রোহী সুভাষ, আজাদ হিন্দ ফৌজের

সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দূরপ্রাচ্যে পাড়ি—এও কি সম্ভব? না—'অসম্ভব' কিংবা 'ভয়াবহ' কথার সঙ্গে তাঁর যে কোন পরিচয় নেই। জার্মানীর যুদ্ধ বিভাগ, জাপান সরকার আর সুভাষচন্দ্রের মধ্যে প্রস্তুত হলো সে দুষ্কর পরিকল্পনা। জার্মানীর পররাষ্ট্র দপ্তরের শেষ পর্যন্ত সম্মতিসূচক সঙ্কেত পেলেন দুঃসাহসী সেনাপতি।

কিয়েল বন্দরের দিকে রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে দ্রুতগামী ট্রেনটি জার্মানীর উত্তর সীমানায়, ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারীর অষ্টম দিন সেদিন। এমনি করেই ভারতের এক রেলগাড়ী গোমো স্টেশন থেকে দ্রুত ছুটেছিল দু-বছর আগে এক পেশোয়ারী মুসলমানবেশী যাত্রীকে বহন করে ১৯৪১-এর ১৮ই জানুয়ারীর স্মরণীয় দিনে—এ সেই একই পুরুষ, একই যাত্রী, একই তার ভাব ও ভাবনা। ৯ই ফেব্রুয়ারী রেলওয়ে স্টেশনে—ঐ যাত্রী অতিদ্রুত এগিয়ে চলেছে কিয়েল বন্দরের জেটীর দিকে। তার পরের পথ জলের তলা দিয়ে। কৃষ্ণ-কালো একটি সাবমেরিন—টাইপ ৯ নাম্বার ইউ-১৯০ (Type IX U-190)।

বন্দরের কাল হলো শেষ, জার্মান ডুবোজাহাজ, সঙ্গে আরও সাত-আটটি সাবমেরিনের কনভয়, সামনে মাইন সুইপার পাহারা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল তখন জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। না ব্রিটিশ-চ্যানেল দিয়ে নয়, পথ হলো নরওয়ে-সুইডেনের মাঝ বরাবর—নর্থ-সী পার হতে কত সতর্কতা, কত শঙ্কা। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ সম্পূর্ণ পরিক্রমা করে স্কটল্যাণ্ডের উত্তরে ও আইসল্যাণ্ডের মাঝখানে উত্তর সাগরের গভীর জলের তলায় ডুব দেওয়া। দুর্দম বেগে ছুটে চলেছে এক বিশাল আকৃতির ডুবোজাহাজ—বিপজ্জনক সে ছুটে চলা মহা-শত্রুর নাকের ডগার ওপর দিয়ে, চারিদিকে মাইনের বেড়াজাল ভেদ করে—তাদেরই যুদ্ধ-জাহাজের দৃষ্টি এড়িয়ে, র‍্যাডার যন্ত্রকে ফাঁকি দিয়ে আটলান্টিকে এসে পৌঁছানর অর্থ যে কোন সময়ে টর্পেডোর আঘাতে অথবা ভাসমান যে কোন মাইনের বিস্ফোরণে কিংবা ডেপথ চার্জে জলের তলায় জীবন্ত সমাধি, সকল স্বপ্নের সমাধি রচনা।

দিনের বেলা ডুবে ডুবে রাত্রি বেলা ভেসে উঠতো ইউ-বোটটি। কারণ ব্যাটারী চার্জ করতে হতো। ক্যাপ্টেন ওয়ার্নার মাসেনবুর্গের প্রতি জার্মান নৌ-যুদ্ধ-বিভাগের কঠিন নির্দেশ—তার দায়িত্বে যে-যাত্রী সে আজ বহন করে চলেছে, তিনি এক বৃহৎ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, জার্মানীর পাঁচগুণ বেশী যার জনসংখ্যা। তাঁর নিরাপত্তা সর্বপ্রথম, এমন কি সম্পূর্ণ নাগালের মধ্যেও শত্রু

জাহাজ আক্রমণ না করে এড়িয়ে চলার হুকুম। আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি শেষে এগার সপ্তাহ পরিক্রমণের পর দক্ষিণ আফ্রিকার ঐ অদূরে জলের তলায় অপেক্ষমাণ আর একটি ডুবোজাহাজ 'আই-২৯' জাপানী সাবমেরিন। উত্তমাশা অন্তরীপের দক্ষিণে চারশত মাইল দূরে এখানে আমাদের মহা-অভিযানের এক অধ্যায় শেষ হতে চলেছে। সে এক অসম সাহসিকতাপূর্ণ অভিযান, দুই নৌ-অধ্যক্ষের মধ্যে সে কি নিখুঁত পরিকল্পনা—সেকেণ্ড, মিনিট মিলিয়ে কিয়েল থেকে মাদাগাস্কার। মাদাগাস্কার থেকে সিঙ্গাপুর সাবমেরিন পরিকল্পনা, সে এক বিচিত্র, অতি বিস্ময়কর ঘটনা।

ইঞ্জিনের সামান্য গোলযোগ, কিংবা সময়ের বিন্দুমাত্র ভুলত্রুটি অথবা নির্দিষ্ট গতিবেগ আর নির্দিষ্ট স্থানে দুই-এর সাক্ষাৎ হওয়ার এতটুকু ভুলভ্রান্তির জন্য কতখানি মূল্য সেদিন দিতে হতো, তা জ্ঞানের অতীত। ডুবোজাহাজের মধ্যে ছিল একটি 'প্রেসাস কারগো' এক মহামূল্য বোঝাই-মাল, একটা সমগ্র জাতির মহত্তম সম্পদ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। জার্মানীর সেই সঙ্গীন ও অতি মহার্ঘ যুদ্ধ বিজয়-বিপর্যয়ের সময়েও তাদের মোট ৬০ খানা U-Boat-এর মধ্যে একখানি, (আটলাণ্টিক পর্যন্ত ৬ খানি) শুধু নেতাজীর জন্যই একটা সাবমেরিন সেদিন নিযুক্ত করা--সে, ভারতবর্ষ তথা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি কতবড় সম্মান, কতখানি গুরুত্ব আরোপ, তা সহজেই অনুমেয়।

দূর-প্রাচ্যের রাজনীতির সে পরিবর্তনের মুখে বিপ্লবী রাসবিহারীর সঙ্গে যোগাযোগের পর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথের দিকে চেয়ে ইউরোপে অপেক্ষা করা নেতাজীর পক্ষে সম্ভব নয়। আবিদ হাসানকে দিয়ে সঙ্গে তিনি একটি ছোট টাইপ রাইটার নিয়েছিলেন। যতদূর জানা যায়, ডুবোজাহাজের কেবিনের মধ্যে তিনি ভবিষ্যতের 'ঝাঁসী রেজিমেণ্ট' (আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী সৈন্যবাহিনী)-এর পরিকল্পনা বাঙ্কের ওপর শুয়ে থাকা অথবা সরু গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার মত অতি অল্প পরিসর মাত্র স্থানের মধ্যে, তীব্র ডিজেলের গন্ধভরা পরিবেশে হাসানকে ডিকটেশন দিয়ে দিয়ে খসড়া করছিলেন। তাঁর এই কাজের মধ্যে হঠাৎ একদিন তাঁর ডুবোজাহাজটি ভুল করে ভেসে ওঠে জলের উপরে—আর সামনেই সাক্ষাৎ যম অর্থাৎ শত্রুর যুদ্ধ জাহাজের পেছনেই। সেটা সম্ভবত ছিল মার্কিন যুদ্ধজাহাজ—বিশালাকৃতি। যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার কঠোর নির্দেশ থাকলেও জার্মান ক্যাপ্টেনের মাইক্রোফোনে আদেশ মত ডুব দিতে দিতে অন্তত একটা মিনিটের প্রয়োজন—এই

অবস্থায় সমুদ্রের মৃত্যু বিভীষিকা—সেই শত্রু জাহাজটি আপন প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দুঃসাহসিকতায় ভর করে ঘুরিয়ে জার্মান ইউ বোটকে ডুবিয়ে দেবার জন্য ভয়ঙ্কর গতিবেগে ধেয়ে এলো। এদিকে বিপদের ঘণ্টাধ্বনি জার্মান ডুবোজাহাজের সর্বত্র প্রচণ্ড আর্তনাদে বেজে চলেছে আর কম্যাণ্ডারের পাগলের মত ডুব দেওয়ার নির্দেশ। আবিদ হাসান আতঙ্কিত মৃত্যুভয়ে, নেতাজীর জন্য আশঙ্কায় প্রায় প্রস্তরীভূত,—নেতাজী কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁকে, তাঁর ডিকটেশন দেওয়া সত্ত্বেও টাইপ হচ্ছে না কেন? এক পলকের জন্য সেদিন নেতাজী সমেত সকল আরোহীর প্রাণরক্ষা হলো, শুধু ইউ বোটটির পিঠের কিছু অংশে আঁচড় লেগেছিল। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে প্রবল অস্ত্র-আওয়াজ ও সোরগোলের মধ্যে নেতাজীর এরকম দৃঢ়চিত্ততা ও স্থিতপ্রজ্ঞা, এ শুধু অলৌকিক শক্তিমত্তারই পরিচয়—যার খুব কম নজির আমরা দেখতে পাই। ডুবোজাহাজ বা ঐ জার্মান ইউ বোটের কম্যাণ্ডারসহ সকল নৌসেনা ও অফিসারগণ সেদিন মুক্তকণ্ঠে নেতাজীর ঐ স্বরূপে শুধু স্তব্ধ নয়, তাঁরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধার জাতি একথা খোলাখুলি উচ্চারণ করে নেতাজীর নির্ভীকতা ও মৃত্যুভয়হীন ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন।

জাপানী সাবমেরিনে কম্যাণ্ডার জুইসি ইজু যথাসময়েই মাদাগাস্কারে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে অপেক্ষমাণ, রাত্রির অন্ধকারে। সেদিন ২৯ শে এপ্রিল, ১৯৪৩ সাল। জার্মানীর উপকূল থেকে উত্তর সাগর, আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে, আফ্রিকার দক্ষিণ সীমানা ঘুরে তখন ৮০ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। উত্তাল তরঙ্গমালার ওপর জার্মান-জাপানী দুই ইউ বোটের অন্ধকারের মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কায় সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা অবধারিত ছিল সেদিন। তথাপি সংঘর্ষের অঘটন এড়াতে দুই অসম সাহসিক জার্মান নৌ-সেনার সন্তরণ দিয়ে জাপানী সাবমেরিনে পৌঁছানো এবং দড়ির সাহায্যে রবারের ডিঙি চড়ে শেষ পর্যন্ত জার্মান ডুবোজাহাজ থেকে জাপ-সাবমেরিনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ও আবিদ হাসানের সম্পূর্ণ নিরাপদে অক্ষত অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া—সে এক বিচিত্র বিস্ময়ভরা ঘটনা।

মাদাগাস্কারে সশরীরে তুলে নেওয়া হলো নেতাজীকে রবারের তৈরী ডিঙিতে। অনতিদূরে অপেক্ষমাণ জাপানী ডুবোজাহাজের দরজামুখে এসে দাঁড়াল ডিঙিটি। তারপর ইউরোপ, আফ্রিকা থেকে জীবনের শেষ বিদায়। অক্ষশক্তির অন্যতম অংশীদার, এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সমর বিজ্ঞানী

রাষ্ট্র জাপ-সরকারের প্রেরিত ডুবোজাহাজের অধিনায়ক স্যালুট দিয়ে দাঁড়ালেন নেতাজীর সামনে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সুপ্রিম কম্যাণ্ডার তাঁর সুন্দর গম্ভীর মুখে গ্রহণ করলেন সে সম্ভাষণ, হাত বাড়িয়ে দিলেন। সমুদ্রের দূর-দিগন্তে, নিঃসীম নীলিমায় ক্ষণিকের জন্য তাঁর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গ্রহণ করলেন তাঁর নির্দিষ্ট আসন জাপানী ডুবোজাহাজের ভেতর।

ভারত মহাসাগরের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে, জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নির্ভীক বীর নেতাজীকে বুকে করে সহস্র সহস্র মাইল দূরে মাতৃভূমির মূল ভূখণ্ড ভারতবর্ষ বাঁয়ে রেখে জাপানী ডুবোজাহাজ। ১৯৪৩-এর মে মাসে এসে পৌঁছুলেন সিঙ্গাপুর। বার্লিনে জাপানের এক সময়ের মিলিটারী এ্যাটাচী কর্নেল ইয়ামোতো জাপান সরকারের প্রতিভূরূপে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। সতর্কতার প্রয়োজনে সুমাত্রার উত্তর খণ্ডে সাবাং-এ নেতাজী অবতরণ করলেন ; সেখান থেকে বিমানে টোকিও—১৮ সপ্তাহের যুগান্তকারী যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটলো ২০শে জুন।

সাড়ে তিন মাসের সে বিস্ময়কর ঐতিহাসিক সাবমেরিন অভিযান বিশ্বের যুদ্ধ ইতিহাসে কোন রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে ঘটার আর নজির নেই। আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট গঠন, তার সৈন্যবাহিনী পরিচালনা, স্বাধীনতায় ও সমান মর্যাদায় দুর্ধর্ষ জাপানী গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলাদেশের জন্য লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যসম্ভার প্রেরণের ব্যবস্থা, সর্বোপরি তাঁর ভারতবর্ষের মাটি চুম্বন করে ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সিঙ্গাপুর থেকে ব্রহ্ম, আসাম সীমান্ত বরাবর অসম সাহসী যুদ্ধ, বিশ্বের দু-দুটো শক্তিশালী দেশ ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা, সে কোন কাব্য-কাহিনী নয়—রক্তের অক্ষরে চির উজ্জ্বল সে ইতিহাস।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আরজি হুকুমৎ-ই-আজাদ হিন্দ

'ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম—I have brought you this present, Subhas Chandra Bose—who needs no introduction to you, to India or to the world. He symbolizes all that is best, noblest, the most daring and most dynamic in the youth of India. আজ আমি আপনাদের সম্মুখে এক অপূর্ব উপহার উপস্থিত করিব। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর সন্তান, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যিনি কায়মনোবাক্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অধীনস্থ লোভনীয় পদ 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' স্বেচ্ছায় পরিত্যাগপূর্বক পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত যোগদান করিয়া স্বদেশ সেবার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ইংরেজ কারাগারে জীবনের অধিকাংশকাল যাপন করিয়া বিজয়ের অমৃতমুকুট পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, সেই সুভাষচন্দ্র আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত হইয়াছেন ··· এই সর্বত্যাগী মহাপ্রাণের নেতৃত্ব লাভ আপনাদের বহু সৌভাগ্য এবং ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া মনে করিবেন। আমি এখন সর্বভার হইতে মুক্ত হইলাম, আমার জীবন ও মরণের একমাত্র চিন্তা ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আপনারা কেবল সমস্বরে বলুন 'জয় নেতাজীর জয়'। 'বন্দেমাতরম্।'—রাসবিহারী বোস [৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩]

৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরে 'ক্যাথায় বিল্ডিং'-এর এক বিরাট সভায় ভারতীয়দের মাঝে বিপ্লবী রাসবিহারী বোস এক চিরস্মরণীয় বক্তৃতায়—আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সমস্ত ভার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উপর অর্পণ করলেন। এই বাঙ্গালী বিপ্লবী বীর (রাসবিহারী) ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর দিল্লীতে বোমা নিক্ষেপ করে পালিয়ে জাপানে গিয়ে ওখানকার ধর্মগুরু মিঃ তোয়েমার আশ্রয়ে বাস করতে থাকেন। প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল তাঁর জাপানে কাটে। বিগত দ্বিতীয় মহাসমর যখন পূর্ব-এশিয়ায়

প্রসারিত হল তখন তাঁর জীবনের চির-ঈপ্সিত সুযোগ এল। এই সুযোগের জন্যই তিনি বহুকাল ধরে অপেক্ষা করছিলেন। ১৯২১ সালের 'কামা-গাতা-মারু' অভিযান তাঁরই চেষ্টার ফল। 'কামা-গাতা-মারু' নামে একখানা জাপানী জাহাজ যোগাড় করে তাতে অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ ভর্তি করে তিনি গোপনে ভারতবর্ষে পাঠাতে চেষ্টা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রিটিশেরা খবর পেয়ে যায়, ফলে 'কামা-গাতা-মারু' এবং তার আরোহী ভারতীয় বিপ্লবীদল ও অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ ব্রিটিশের হস্তগত হয়। নেতাজী বলতেন যে, তাঁদের ছেলেবেলায় তাঁরা রাসবিহারী বোসকে দেশের একজন বীর সেবক বলে পূজা করতেন—তরুণের দল তাঁর কথা স্মরণ করে দেশ সেবার প্রেরণা পেত।

আগের অধ্যায়ে, সমগ্র পূর্ব-এশিয়ার দেশসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৪২-এর ১৫ই জুনের ব্যাঙ্কক অধিবেশনে রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ'এর কর্মপরিষদ গঠন করার কথা বলা হয়েছে; ঐ অধিবেশনে ১৭টি প্রস্তাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল, (ট) ভারতীয় যুদ্ধবন্দী এবং অসামরিক ভারতীয়দের ভেতর থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে একটা ফৌজ গড়ে তোলার কথা, (ঠ) ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে এই নবগঠিত ফৌজের সর্বাধিনায়ক করা, (ড) জাপানী গভর্নমেন্টের মারফৎ জার্মান গভর্নমেন্টের কাছে সুপারিশ পাঠানো যে, নেতাজীকে সেখান থেকে পূর্ব-এশিয়ায় পাঠানোর বন্দোবস্ত করা।[১] এই অনুযায়ী 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ' দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলেন, তা বিশাল আকার ধারণ করে। জেনারেল মোহন সিং-এর প্রতিশ্রুতি ও প্রচারকার্য খুবই সফল হয়েছিল—তাঁর প্রচারে বিশ্বাস করে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিল; কিন্তু মোহন সিং-এর

---

[১] "When Netaji Subhas formed Indian Legion in Germany, in South-East Asia General Mohan Singh founded the Indian National Army on 17. 2. 1942 at Singapore. General Mohan Singh and Capt. Mohmmad Akram had jointly written letter to the Japanese Government to bring immediately Netaji Subhas Chandra Bose from Germany to take the leadership of the INA. But the Japanese Government and Rash Bihari Bose could not bring Netaji from Germany in time to Singapore to lead the INA···" —National Seminar on Netaji and INA Moirang: Sheel Bhadra Yajee, 22.10.85.

গোপনে প্রেরিত কতিপয় অফিসারের বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগদান, রাসবিহারী বোসের নির্দেশ অমান্য এবং ফলে জাপান গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততার জন্য মোহন সিংকে বন্দী করা হয়।[২] সবাই বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল, সেখানে শুধু একটি লোক কর্তৃত্ব করতেন, সুতরাং অধিকতর সাধারণতান্ত্রিক ভিত্তিতে দ্বিতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনকল্পে 'ডিরেক্টরেট অব মিলিটারী ব্যুরো' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ার সিদ্ধান্ত হল। ...জাপানী গভর্নমেণ্ট সরকারীভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজকে মিত্রবাহিনী বলে স্বীকার করে নিলেন এবং আরও জানালেন—এ বাহিনীকে জাপানী বাহিনীর সমান মর্যাদা দেওয়া হবে।

জেনারেল মোহন সিংকে বন্দী করার সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে মিঃ রাসবিহারী বোস আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবির পরিচালনা এবং সৈন্যদলের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য কয়েকজন অফিসার নিয়ে এক কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটিতে রইলেন—লেঃ কর্নেল এ. ডি. লোগানাধন, লেঃ কর্নেল জে. কে. ভোঁসলা (ডাইরেক্টরেট অব মিলিটারী ব্যুরোর অধ্যক্ষ), লেঃ কর্নেল এম. জেড. কিয়ানী (কম্যাণ্ডার) এবং লেঃ কর্নেল এহশান কাদির। আজাদ হিন্দ ফৌজের পুনর্গঠনের পূর্ব পর্যন্ত এই কমিটিই কাজ চালাতে থাকেন।

জাপানী সামরিক বিভাগের একটা বিশেষত্ব—সব যুদ্ধ ঘাঁটিতেই তাদের কম্যাণ্ডিং অফিসাররা যতই নিম্নপদস্থ হোক না কেন, তাঁদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া থাকে এবং তাঁদের প্রত্যেকেই মনে করেন জাপানের যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করার ব্যাপারে তাঁর নিজের একটা বড় কিছু করবার কর্তব্য এবং ক্ষমতা রয়েছে। এই মনোভাবের ফলেই ইয়কুরো কিকনের (জাপানী মিলন সংঘ) লিয়াজোঁ অফিসারেরা (যোগাযোগকারী অফিসার) ভারতীয়দের দিয়ে যথাসম্ভব নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছিলেন; ভারতীয়রা তা বুঝতে পেরে জাপানীদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারছিলেন না—মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলতেন। কিন্তু রাসবিহারী তাঁদের এ মানসিকতার কথা খুব ভালভাবেই জানতেন; তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল--রাজধানী টোকিওতে গিয়ে জাপানী হাইকম্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করে আজাদ হিন্দ-এর অসুবিধা তিনি

---

[২] মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান—আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী: পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭ (জেনারেল মোহন সিং বাটাভিয়ার নির্বাসনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অন্তরীণ ছিলেন।)

দূর করতে পারবেন। এরই ফলস্বরূপ 'ইয়াকুরো কিকন'-এর অধিকর্তা জেনারেল ইয়াকুরো জাপ গভর্নমেণ্টকে অবহিত করলেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্ব ছাড়া সত্যকার আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করা সম্ভব নয়—নেতাজীকে বার্লিন থেকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করতে তিনিই তাঁর গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করেন। স্থল ও বিমান পথ সম্পূর্ণ বন্ধ, একমাত্র উপায়—সাবমেরিনযোগে নিয়ে আসা। শাহনওয়াজ খান তাঁর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী'—ইতিহাসে লিখেছেন "…গভর্নমেণ্ট তাঁকে (জেনারেল ইয়াকুরোকে) বলেন—এই বিপদসঙ্কুল পথে সুদূর বার্লিন থেকে সিঙ্গাপুরে আসা নেতাজীর পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। আসতে গেলে জীবিতাবস্থায় এখানে পৌঁছানোর সম্ভাবনা শতকরা মাত্র পাঁচ। জাপ গভর্নমেণ্ট জেনারেল ইয়াকুরোকে এ অনুরোধ করতে নিষেধ করে দেন—কারণ এরূপ কাজ করতে গেলে নেতাজীর মৃত্যু অনিবার্য।"

তিনি (জেনারেল ইয়াকুরো) তাঁর চিঠিতে লিখলেন—"জানি, তাঁর এখানে নিরাপদে পৌঁছানোর পথে অনেক বাধা, কিন্তু এখানকার ভারতীয়েরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে—তাঁর নেতৃত্ব ব্যতিরেকে তাঁরা ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে লড়তে পারবে না। তিনি যদি নিরাপদে এখানে এসে না পৌঁছতে পারেন তাহলে বুঝবো—বিধাতার ইচ্ছা নয় যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। আর যদি এই ভীষণ বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়েও তিনি নিরাপদে এসে পৌঁছান তাহলে বুঝা যাবে ভগবানের ইচ্ছা, তাঁর চেষ্টাতেই ভারত স্বাধীন হোক।"

অবশেষে তিনি জাপ পার্লামেণ্টকে বলেন—নেতাজীকে সব কথাই জানানো হোক। …এরপর বার্লিনের রাজদূত … এরূপ ক্ষেত্রে তিনি তাঁকে এমন দুঃসাহসিক কাজ করতে নিষেধই করেন। কারণ তাঁর জীবন অতি মূল্যবান। নেতাজী সব শুনে সমস্ত বিপদ মাথায় করেই যাত্রা করা সাব্যস্ত করলেন। তিনি বলেন—এরূপ করতে গিয়ে যদি তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে তিনি ভারতের মুক্তির জন্য প্রাণ দিলেন এই তৃপ্তি নিয়ে সেই মৃত্যুবরণ করবেন।

এর পরের ইতিহাস আগেই বিবৃত হয়েছে। মিস্টার আবিদ আলি হাসানকে সঙ্গে নিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ক্যাপ্টেন ওয়ার্নার মাসেনবুর্গ পরিচালিত জার্মান ডুবোজাহাজ ইউ বোটে মাদাগাস্কার, তারপর থেকে কম্যাণ্ডার জুইসি ইজু পরিচালিত 'আই—২৯' অন্য একটি জাপানী সাবমেরিনে

করে ৯৩ দিন সমুদ্র পথে কিভাবে জাপানে পৌঁছেছিলেন। সুভাষচন্দ্র ২০শে জুন ১৯৪৩ তারিখে জাপানের রাজধানী টোকিওতে পৌঁছান এবং সেই দিনই তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন ও পরের দিন বেতার ভাষণ দেন। বহু সহস্র মাইল মহাসমুদ্র অভিযানের পর ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে এশিয়া মহাদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডলে বিজয়ীর বেশে নেতাজীর আবির্ভাব এক বিরাট বিস্ময়। কলকাতা থেকে পেশোয়ার, সেখান থেকে কাবুল—কাবুল থেকে বোখারা—তারপর মস্কো-রোম-বার্লিন—এ যেন মানুষ ও প্রকৃতির দুর্দমনীয় বিরোধী শক্তির সঙ্গে নেতাজীর, তথা জাতীয় সংগ্রামে এক অবিশ্বাস্য বীরের জীবন-কাব্য—সমগ্র পৃথিবীকে চমৎকৃত, ভারতের স্বাধীনতার শত্রুরা আতঙ্কিত। জার্মানী তখন তার দুঃসাহসী রাশিয়া আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে পশ্চাদগামী, আর তখনই পূর্ব গোলার্ধের জল-স্থল-অন্তরীক্ষে ব্রিটেন ও আমেরিকা, জাপানের আক্রমণের সে বজ্রতেজ সহ্য না করতে পেরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়মান—সেই সময়ে নেতাজী কিয়েল বন্দর থেকে উত্তর সাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর পার হয়ে সুমাত্রার সাবাং পৌঁছান। জীবনের প্রতি সমস্ত মায়া-মোহ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে সুদীর্ঘ জলপথ ও বিমানপথে মুহূর্তে মুহূর্তে মৃত্যুর বিভীষিকা অতিক্রম করে নেতাজী জাপানের রাজধানী টোকিওতে উপস্থিত।

"আমাদের নিজেদের রক্ত দিয়েই আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। বহু কষ্টে আত্মত্যাগে অর্জিত স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আমরা নিজ শক্তিবলে রক্ষা করতে পারবো। যে শত্রু আমাদের অস্ত্রাঘাত করেছে—অস্ত্রাঘাতই তার উত্তর। অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনকে আজ সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত করতে হবে। যখনই বেশী সংখ্যায় মানুষ এই অগ্নিদীক্ষা গ্রহণ করবে তখনই ভারতের মুক্তিলাভের যোগ্যতা আমরা অর্জন করবো।"[৩]

আর পরের দিন অর্থাৎ ২১শে জুন তাঁর জাপানে প্রথম বেতার বক্তৃতা যা বিশ্বের যুদ্ধলিপ্ত শত্রু-মিত্র উভয় দেশসমূহের গভর্নমেণ্ট এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ শিবিরে স্পন্দিত হয়ে উঠলো।

৩। N. G. Ganpuley—Netaji in Germany: Appendix—II Page—180 (An Extract from the "Testament of Subhas Bose"—Press.Statement.)

"ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—এখন এর নিকট পরিস্থিতি ব্রিটিশেরা ভারতবর্ষে এসে পর্যন্ত একদিনের জন্যও কোন ব্রিটিশ সেনানায়ক মনে করতে পারেন নি যে, কোন শত্রু এর পূর্ব সীমান্ত দিয়ে এখানে প্রবেশ করতে পারে। ···ব্রিটিশের রণ-চাতুর্যের অভাব তাকে জগতের চক্ষে হেয় করেছে। জেনারেল ওয়াভেল এখন ভারতবর্ষের পূর্বসীমান্ত রক্ষার দ্রুত আয়োজনে মনোনিবেশ করেছেন। ভারতবাসী এখন ভাবছে—'বিশ বছর ধরে ওরা যে সিঙ্গাপুর গড়ে তুলেছিল তা'ত সাতদিনেই শেষ হয়ে গেল, এখন ওরা পূর্বসীমান্ত সুরক্ষিত করবার কাজে লেগেছে—ওখান থেকে সরে পড়তে হবে ওদের কদিনে কে জানে।' ···খুব আড়ম্বর করে ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার করতে গিয়ে ব্রিটিশ যেভাবে বিতাড়িত হয়েছে এটা আমাদের বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়। সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে, ব্রহ্মদেশও হারিয়েছে তারা,—ব্রিটিশের সামরিক ইতিহাস এই লজ্জার কাহিনীতে চিরকলঙ্কিত হয়ে থাকবে, কিন্তু এ সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি।

"সুতরাং দেশবাসীগণ, বন্ধুগণ—আসুন আমরা ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্র আমাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য দিয়ে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করি, আর যতদিন না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয়ে সেই ধ্বংসস্তূপের উপর স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন আমরা অদম্য উৎসাহ আর অবিচলিত নিষ্ঠা নিয়ে এই যুদ্ধ চালাতে থাকি।"

১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই নেতাজী ভারতীয় অসামরিক এবং আজাদ হিন্দ দলের সকল লোককে এক জনসভায় আহ্বান করেন। এই সভায় তিনি এক মর্মস্পর্শী ভাষণে বলেন যে, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে একথা জগৎবাসীকে, এমন কি আমাদের শত্রুকেও মুক্তকণ্ঠে জানাবার দিন এসেছে। ভারতবর্ষের বাইরের ভারতীয়েরা বিশেষ করে পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়েরা এমন একটা শক্তিশালী ফৌজ গড়তে শুরু করেছেন যা ভারতের ব্রিটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করার স্পর্ধা রাখে। এই আক্রমণ যখন তারা করবে তখন যে বিপ্লব শুরু হবে তা শুধু ভারতের অসামরিক জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না—ব্রিটিশ বেতনভোগী ভারতীয় সৈন্যদলের মাঝেও এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়বে। ভিতর ও বাইরে থেকে এমনি করে আক্রান্ত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান হবে, ভারতীয়েরা পাবে মুক্তি। যুদ্ধ বিশারদ ও রাষ্ট্রনীতিবিদ দুই এর স্বরূপেই নেতাজীর তাত্ত্বিক ও মানসিক প্রভাব হলো সত্যই অদ্ভুত। এর প্রতিক্রিয়া ও প্রচণ্ড প্রভাব 'ভারত ছাড়'

আন্দোলনকারী ভারতবাসীর মধ্যে যেমন ছড়িয়ে পড়ে গোপন বেতার সংকেতে তেমনি ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এবং এশিয়ার দেশ ও দ্বীপ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অসামরিক ভারতীয়দেরও উদ্বেলিত করতে থাকে। কিন্তু অহিংস কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও ব্রিটিশ প্রচার বিভাগের চেষ্টায় ভারতের অভ্যন্তরে তার বিস্ফোরণ ঘটেনি। আরও একটি প্রবল কারণ ছিল। জার্মানী ব্রিটেন অভিযান না করে সোসালিস্ট-কম্যুনিস্ট দেশ রাশিয়া আক্রমণ করে বসলো। ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ও রাষ্ট্রনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। সারা পৃথিবীতে বামপন্থী মানুষ এবং দলগুলি রাশিয়ার পক্ষে নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও সোচ্চার হয়ে উঠলো। ভারতবর্ষেও তাই। এমনকি নেতাজীকে 'কুইসলিং' দেশদ্রোহী বলে, আই.এন.এ. যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে 'জনযুদ্ধ' বিরোধী আখ্যা দিয়ে জোর প্রচার আরম্ভ হল।

"তিনি বিশ্বযুদ্ধে প্রজ্বলিত প্রলয়কুণ্ড থেকে তাঁর দেশোদ্ধারের পবিত্র উদ্দেশ্য উদযাপনের জন্য একটি জ্বলন্ত সমিধ তুলে নিলেন। পৃথিবীব্যাপী হিংসানল থেকে তিনি বহ্নিকণা সঞ্চয় করে অগ্নির সর্বশুচিত্ব প্রমাণ করার গুরুদায়িত্ব নিজের উপর ন্যস্ত করলেন। এত বড় একটা সাহসিক পরিকল্পনা সে-সময় কোন ভারতীয় রাজনীতিকের মনে উদয় হয়নি। ··· সত্য সত্যই সুভাষচন্দ্র দেশের এই দারুণ অসহায় মুহূর্তে যে অপূর্ব মর্যাদাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে অনন্য। তিন তিনটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে সমমর্যাদায় আলোচনা করেন। ··· তিনি দেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বমূলক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক থেকেও কেবল প্রকৃতিদত্ত অধিকারেই নিজের উপর এই গুরুদায়িত্ব তুলে নেন। তাঁর রাজকীয় প্রতিভাই তাঁকে এই দুরূহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে।··· এই প্রথম স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় মুক্তিফৌজ দ্বারা ভারত আক্রমণের প্রতি পদক্ষেপে বীরত্বের চরম প্রকাশ, আত্মোৎসর্গের মহত্তম নজির সৃষ্ট হয়েছে ··· ।"[৪]

তাঁর সেই আবেগধর্মী-সত্যের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বিশাল জনসমুদ্রের দিকে ঋজু হয়ে কম্বু আহ্বান আজ অর্ধশতাব্দীর প্রান্তে এসেও যে কোন ভারতবাসীকে রোমাঞ্চিত করে তোলে—"বন্ধুগণ, আজ আমি বলি, আজ

৪। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—যুগপুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র

থেকে ত্রিশ লক্ষ পূর্ব-এশিয়াবাসী. ভারতীয়ের বুলি হোক—'সর্বগ্রাসী যুদ্ধের জন্য সর্বস্ব পণ' (Total Mobilisation for a Total War)। এই মহান উদ্দেশ্যে আমি অন্তত তিন লক্ষ সৈন্য এবং তিন কোটি মুদ্রা (ডলার) পাবার আশা পোষণ করি। আমি এখান থেকে একটি ভারতীয় নারী বাহিনীও গড়ে তুলতে চাই, এ বাহিনীর বীরাঙ্গনারা মৃত্যু ভয় কাকে বলে জানবেন না। ১৮৫৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রামে ঝাঁসীর রানী যেমন করে অস্ত্র ধরেছিলেন, ঠিক তেমনি করে অস্ত্র ধরবেন এঁরা। ··· ।"[৫]

১৯৪৩ সালের ২৫শে আগস্ট নেতাজী সুভাষচন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন এবং এর পূর্ণ নামকরণ করলেন "আজাদ হিন্দ ফৌজ"। এই দিনের বিশেষ ঘোষণায় বললেন—"ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বার্থে আমি আজ থেকে এই ফৌজের নেতৃত্বভার প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করছি। আজ আমার জীবনে পরম আনন্দ ও গৌরবের দিন। কারণ, ভারতের মুক্তির জন্য তার সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হওয়ার চেয়ে আর বেশী সম্মানজনক কি হতে পারে! কিন্তু যে গুরুভার আমি গ্রহণ করলাম তার বিশালত্ব সম্পর্কে আমি সজাগ। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি কর্তব্য যত কঠোরই হউক, তিনি যেন তা পূর্ণ করতে আমাকে ক্ষমতা দান করেন। আমি নিজেকে আমার ৩৮ কোটি বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী দেশবাসীর সেবক বলে মনে করি। ··· কাজ আমাদের সহজ নয়, এ সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী ও ভীষণ কিন্তু আমাদের ন্যায়-সঙ্গত উদ্দেশ্য ও দুর্জয় আদর্শের প্রতি আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে। সারা বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই ৩৮ কোটি মানুষের স্বাধীনতায় অধিকার আছে এবং তারা আজ সে অধিকার লাভের জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত।"[৬]

১৯৪৩ সালের ২রা অক্টোবর পূর্ব-এশিয়ার সর্বত্র গান্ধীজীর ৭৫তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে 'ফেরের পার্কে' ভারতীয়দের এক বিরাট জনসভায় নেতাজী বলেন—"কুড়ি বৎসরেরও বেশী মহাত্মা গান্ধী ভারতবাসীদের নিয়ে দেশের মুক্তির জন্য সাধনা করেছেন। ··· ১৯২০ সালে

৫। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান—পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২

৬। Major General A. C. Chatterji (First General Secretary of the Indian Independence League & First Finance Minister, Provisional Govt. of India)
—India's Struggle for freedom—pp. 91, 92

মহাত্মা যদি এ পথের সন্ধান না দিতেন—তাহলে ভারতবর্ষের দুর্দশার সীমা থাকতো না—একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই বলছি ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি যা করেছেন তার তুলনা মেলে না। ···১৯২০ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে ভারতীয়েরা দুটি জিনিস শিখেছে। স্বাধীনতার জন্য এ দুটিরই বড় প্রয়োজন। এর একটি হচ্ছে—জাতীয় আত্মমর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয়বোধ, যার ফলে প্রত্যেক ভারতীয়ের হৃদয়ে আজ বিপ্লবের অগ্নিশিখা দীপ্যমান। দ্বিতীয়টি—সঙ্ঘবদ্ধতা, ভারতের সুদূর নিভৃত পল্লী অঞ্চলে পর্যন্ত এই স্বাধীনতাকামী সংঘ তার শাখা-প্রশাখা মেলে ধরেছে ··· আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—১৯২০ সালে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে মহাত্মাগান্ধী যখন তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন তখন তিনি বলেছিলেন যে, ভারতের হাতে যদি আজ তলোয়ার থাকতো, তবে সেই তলোয়ার হাতেই সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হত। ··· কালচক্র এগিয়ে গেছে, এখন ভারতীয়দের অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামবার দিন এসে গেছে। আজ বড় আনন্দ ও গৌরবের কথা—আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠেছে এবং দিন দিন তার সৈন্য সংখ্যা বাড়ছে।"

নেতাজীর সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি 'আরজি হুকুমৎ-ই-আজাদ হিন্দ' প্রতিষ্ঠা। বাংলা ভাষায় যার সরল অনুবাদঃ সাময়িক স্বাধীন ভারত সরকার (প্রভিজনাল গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া)। আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলায় এ-শুধু একটা বিরাট চাল নয়, এর বাস্তব ভাবরূপের প্রতিক্রিয়া অতি সুদূর প্রসারী। ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের পরিচালনায় সমগ্র এশিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করা যায়, এমন কি তার তত্ত্বাবধানে এক বিরাট সৈন্য-বাহিনী গঠন ও সাম্রাজ্য-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ আয়োজনও যথাযথ হতে পারে কিন্তু শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার থাকা চাই এবং অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের তাকে মেনে নেওয়া চাই। তাছাড়া ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে এবং বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের মনের মধ্যে ভারতের স্বাধীন গভর্নমেন্টের মর্যাদার যে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব, শক্তি ও মর্যাদাবোধ জাগ্রত করবে সেজন্য চাই স্বাধীন ভারত গভর্নমেন্ট। নেতাজীর সাধনা, অতি বিচক্ষণ পরিচালনা ও পরিকল্পনা এবং তাঁর অকপটতা তাঁকে মহীয়ান করে তুললো।

দেহমনের বৈদ্যুতিক গতিশীলতা আর অনমনীয় ব্যক্তিত্বের জীবন্ত বিগ্রহ নেতাজী সুভাষচন্দ্র পূর্ব-এশিয়ায় পৌঁছানোর পর মুহূর্ত থেকেই ভারতীয়

স্বাধীনতা সংঘ, আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠন, জাপান, বার্মা, মালয় ও এশিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে সংযোগ, বিশেষত অসামরিক ভারতীয় এবং বন্দী ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে জাতীয়তা উন্মেষের বিরাট কর্মযজ্ঞে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিলেন। কতিপয় সুযোগ্য সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর ভবিষ্যৎ এবং কঠিনতম উদ্যোগের জন্য কতকগুলি বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব অর্পণ করলেন। এঁদের মধ্যে সাধারণ পরিচালনা ও অর্থদপ্তর —লেঃ কর্নেল এ.সি. চ্যাটার্জী; প্রচার বিভাগ—এস.এ. আয়ার; শিক্ষা বিভাগ —জে. থিভি; সমাজ কল্যাণ, গৃহ ও পরিবহণ—ডি. এম. খান; নারী বিভাগ —ডাক্তার লেঃ কর্নেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন; সরবরাহ দপ্তর—হরদয়াল সিং; নিয়োগ—মেজর বি. এম. পট্টনায়ক; প্রশিক্ষণ—লেঃ কর্নেল এহ্‌শান কাদির; গোয়েন্দা দপ্তর—সত্যমোহন সহায় ও পুনর্গঠনের দায়িত্ব—এ. এস. সরকার আর শ্রীলঙ্কা ডিপার্টমেণ্ট-এর ভার অর্পিত হলো—কোটনাওয়ালা নামে একজন দক্ষিণ ভারতীয়ের ওপর। আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করলেন। মিলিটারী ব্যুরোর বিলুপ্তি ঘটিয়ে মেজর জেনারেল জে. কে. ভোঁসলেকে তার প্রধান অর্থাৎ চীফ-অব-স্টাফ-এর পদে নিয়োগ করলেন এবং অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্য থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজে সৈন্য নিয়োগ, ফৌজের পকেট এ্যালাউন্স ও রেশনের পরিবর্তন ঘটালেন। আর তখন তাঁর সৈন্য বাহিনীতে সম্পূর্ণ তিনটি ডিভিশন—যার প্রত্যেকটিতে দশ হাজার করে সৈন্য। তা ছাড়া আরো বিশ হাজার ভলান্টিয়ার সৈন্যের যুদ্ধ-প্রশিক্ষণ দ্রুত আরম্ভ করে দিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিজে কোন মিলিটারী 'র‍্যাঙ্ক' (যথা জেনারেল বা ফিল্ড মার্শাল, এ্যাডমীরাল বা এয়ার চীফ মার্শাল প্রভৃতি) গ্রহণ করলেন না—যার ফলে সমগ্র সৈন্যবাহিনীর চোখে তিনি আরো প্রিয় ও অধিক শ্রদ্ধেয়রূপে পরিগণিত হলেন।

তাঁর মিলিটারী দপ্তরে যে সমস্ত বিভাগ পরিচালনার ব্যবস্থা নিলেন তার মধ্যে (১) জি. শাখা—মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান—দায়িত্ব যুদ্ধ পরিকল্পনা, যুদ্ধ, সৈন্য-প্রশিক্ষণ এবং মিলিটারী গোয়েন্দা; (২) এ. শাখা—কর্নেল এন. এম. ভগৎ—সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নির্দেশনামা ও দপ্তর পরিচালনা; (৩) কিউ. শাখা—কর্নেল কে. পি. থিমায়া—বাহিনীর বাসস্থান, গোলাবারুদ, পোশাক, রসদ ও ট্রান্সপোর্ট; (৪) মেডিকেল ব্রাঞ্চ—মেজর জেনারেল এ. ডি. লোগানাথন—ডাইরেক্টার, মেডিকেল সার্ভিস, সৈন্য বাহিনীর দৈহিক ও মানসিক কল্যাণের দায়িত্ব এবং (৫) মিলিটারীর শিক্ষা ও

সংস্কৃতি শাখায় লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহাঙ্গীর কম্যাণ্ডার পদে নিযুক্ত। নেতাজী জাপানী মিলিটারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন—আজাদ হিন্দ ফৌজকে যুদ্ধাস্ত্র-সরবরাহ ও পার্বত্য যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং ভারত-বর্মা সীমান্তে অনতিবিলম্বে যুদ্ধ অভিযানের বিষয় নিয়ে।

চার মাসের মধ্যেই আজাদ হিন্দ ফৌজের শৃঙ্খলা, মানসিকতা এবং জাপানী ফৌজ ও তাদের ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রতি মনোভাব সমস্তই তাঁর গভীর দৃষ্টি ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। এ বিষয়ে রাসবিহারী বোসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রেরণা জাপ প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর সক্রিয় ও শক্তিশালী সহযোগিতা আসতে আরম্ভ করলো। ১ নম্বর ডিভিশনের কম্যাণ্ডার মেজর জেনারেল এম. জেড কিয়ানী প্রস্তুত হলেন, তাঁর অধীনে তিন গেরিলা রেজিমেণ্ট। নেতাজী নামকরণ করলেন (১) গান্ধী রেজিমেণ্ট ঃ কম্যাণ্ডার—আই. কিয়ানী ; (২) আজাদ রেজিমেণ্ট ঃ কম্যাণ্ডার—কর্নেল গুলজারা সিং ; (৩) নেহরু রেজিমেণ্ট ঃ কম্যাণ্ডার—মেজর জেনারেল আজিজ আমেদ খান। হিন্দ ফিল্ড ফোর্স ; বাহাদুর গ্রুপ ; ইনটেলিজেন্স গ্রুপ ; রি-ইনফোর্সমেণ্ট গ্রুপ প্রভৃতি যেমন ছিল, তিনি তাই রেখে দিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের পদ বা র‍্যাঙ্ক ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সৈন্যবাহিনীর মতই রাখা হলো। এক বিশেষ আর্মি ব্যাজের ব্যবস্থা হলো। মাথার টুপি বা শিখদের শিরস্ত্রাণে, জাপানী লাল সূর্যোদয়ের চিহ্ন তুলে দিয়ে অখণ্ড ভারতের ছোট্ট মানচিত্রের ঠিক সীমানায়, দুই দিকের মাথায় আই.এন.এ. লেখা এবং আউট লাইনের ঠিক তলায় ধাতুর ওপর ইত্তেফাক, এৎমোদ্, কুরবানী—খোদাই করে দেওয়া হলো। যুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধিতে জীবন ধারণের মান বেড়ে যাওয়ায় তাঁর সৈন্যদের পকেট এ্যালাউন্সের স্কেলও সময়ে সময়ে বাড়তে লাগলো। বাহিনী ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠলো, সে জন্য বেশী সংখ্যায় অফিসার তৈরীর প্রয়োজন হলো। তিনি নিসুনে (রেঙ্গুন) "অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল" প্রতিষ্ঠা করলেন—লেফটেন্যান্ট কর্নেল হবিবুর রহমান এই মিলিটারী স্কুলের প্রথম কম্যাণ্ডিং অফিসার বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। এখানকার মিলিটারী গ্রাজুয়েটগণ ইন্দো-বার্মা সীমান্তের প্রথম যুদ্ধে তাঁদের দক্ষতা, ত্যাগ ও সহনশীলতার সঙ্গে নৈতিক মানের সুযোগ্য সাক্ষ্য রেখেছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সিঙ্গাপুর ও কুয়ালালামপুরে এবং ননকমিশণ্ড অফিসারদের জন্য সিঙ্গাপুরে 'আজাদ

স্কুল' গড়া হলো আর পেনাং এবং রেঙ্গুনে 'স্বরাজ ইয়ংমেনস ট্রেনিং সেন্টার' তৈরী হলো—ভারতে ঢুকে ব্রিটিশ পক্ষের উপর গুপ্তচর বৃত্তির জন্য শিক্ষালাভ করতে। বাবা ওসমান, এন. রাঘবন ও মেজর গোপালস্বামী প্রভৃতি এর পরিচালনার জন্য দক্ষ অফিসারের পদলাভ করলেন। এস. সি. নাম্বিয়ার, যিনি বার্লিনে 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টার' ও 'ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন' গঠনে নেতাজীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যকারী ছিলেন এবং এশিয়ার পথে পাড়ি দেবার সময় নেতাজী যাঁকে ইউরোপে স্বাধীনতা সংঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব অর্পণ করে এসেছিলেন, তাঁকে ১লা অক্টোবর গঠিত আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের একজন মিনিস্টার অব স্টেট ইন জার্মানী নিযুক্ত করলেন।[৭]

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বারে বারে তাঁর বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতায় বলেছেন—'Spirit and sword are both necessary in battle, but spirit dominates the sword.' যুদ্ধে জীবন চেতনা ও তরবারী দুই-এরই প্রয়োজন, কিন্তু চেতনা তরবারীর ওপর প্রভুত্ব করে। এই চেতনা জাগ্রত করাই কঠিন এবং সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বের বাস্তব প্রকাশভঙ্গী। নেতাজীর আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট ও তার সৈন্যবাহিনী সংগঠনের কর্মযজ্ঞে আমরা এ-দুই-এর এক চমৎকার সমন্বয় দেখতে পাই। অস্ত্র ধারণ ও তার সার্থক প্রয়োগ কেন্দ্রীয়-কর্তৃত্বের সফলতার ওপরই নির্ভরশীল। তার এই কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বের শক্তিই—তার অনুগামীদের হৃদয় স্পর্শ করে দেহে শিহরণ তোলে। যে রক্তক্ষয় ও প্রাণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালিত হবে সে মহাসংগ্রামের নায়কত্ব ও কর্তৃত্ব শক্তির কিছুটা সাক্ষাৎ পরিচয় অবশ্যই হওয়া চাই, এবং তা শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষেরই দৃষ্টি গোচরও হতে হবে। কেননা অর্থ, অস্ত্র, সরঞ্জাম, স্বীকৃতি, সহযোগিতা এসবের প্রয়োজনীয়তা পদক্ষেপের মুহূর্তে মুহূর্তে অনুভূত হবে। তাই আজ ১৯৪৩-এর ২১শে অক্টোবর সময় ১০টা ৩০ মিনিটে সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত ক্যাথায় সিনেমা বিল্ডিংস চত্বরে সমাবেশ—রাজ-অভিষেক! কানায় কানায় উপচে পড়া বাইরের পথ, মাঠ, পরিপূর্ণ। এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়, আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং বিদেশী রাষ্ট্র প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের সম্মুখে সে দৃশ্য ও ঘটনা এবং সে অধিবেশনের প্রসিডিংস বা গৃহীত প্রস্তাবাবলী শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে নয়—চিরকালের জন্য স্মরণীয় প্রতিবেদন হয়ে রইলো।

৭। Major General A. C. Chatterji—India's Struggle for Freedom. pp. 94–106.

নেতাজী মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে জন-সমুদ্র তাঁর জয়ধ্বনিতে উত্তাল হয়ে উঠলো—তিনি বক্তৃতা মঞ্চে দেড়ঘণ্টাব্যাপী এক প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন। শ্রোতারা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁর বক্তৃতা শুনতে থাকে, আর সেই উজ্জ্বল সুন্দর, উদ্ভাসিত, বহুশ্রুত নেতাজীকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে থাকে। মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি ও প্রচণ্ড উল্লাসের মধ্যে শুনে চলে। নেতাজীর দৃপ্ত ঘোষণা অসামরিক বিপুল সংখ্যক ভারতীয়েরই পূর্ণ সমর্থন শুধু নয়, ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট সংখ্যক সদস্যের পরিপূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতায় সাময়িক ভারত গভর্নমেণ্ট বা আরজি হুকুমৎ-ই-আজাদ হিন্দ গঠন করা হয়েছে তার ক্ষীণতম সন্দেহ নেই, যেই মুহূর্তে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মধ্যে প্রবেশ করে তার মাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবে সেই অবস্থাই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবলুপ্তি ঘটাবে। সুদৃশ্য ব্যানার, জাতীয় পতাকা, ফুল মালায় সুশোভিত মঞ্চের ওপর পূর্ণ সামরিক পোশাকে নেতাজী ও পাশে তাঁর গভর্নমেণ্টের চারজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী (প্রথমে তিনি চারজন মন্ত্রীকে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়েছিলেন), আটজন মিলিটারী প্রতিনিধি ও প্রধান উপদেষ্টা রাসবিহারী বোস সহ ন-জন অসামরিক উপদেষ্টা এবং জাপ সরকারের প্রতিনিধি কর্নেল ইয়ামামোতো। নেতাজীকে প্রাচ্য দেশসমূহের রাজদূত, কূটনৈতিক নেতাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন আর সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার বাহিনীর তৎপরতা, মঞ্চের সামনের দিকে মাইক্রোফোনের সারি—এক সুপ্রতিষ্ঠিত, সুসংহত গভর্নমেণ্টের সার্থক প্রকাশ। তাঁর অনবদ্য ঘোষণার পর আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের পক্ষে তিনি জাপান সরকারকে তাঁর শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং বাংলার দুর্ভিক্ষ (পঞ্চাশের মন্বন্তর) পীড়িত মানুষের সাহায্যে ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান গভর্নমেণ্টকে এক লক্ষ টন চাল সাহায্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি (শর্ত ছিল, মিলিটারীর জন্য খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করা চলবে না, বিদেশে পাঠানো হবে না, আর আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের জাহাজগুলিকে খাদ্য-শস্য কলকাতায় নামিয়ে দেবার পর যেন নিরাপদে ফিরে আসবার সুযোগ দেওয়া হয়—পুনঃ পুনঃ তাঁর সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়) পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী দর্শককে সম্মোহিত করলো। আরজি হুকুমৎ-ই-আজাদ হিন্দ—অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্ট যে একটা 'রিয়্যালিটি'—বাস্তব জিনিস—একটা 'পাপেট' বা জাপানের হাতের পুতুল মাত্র নয়—তাতে আর সন্দেহের অবকাশ রইলো না।

নেতাজী যখন ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করছিলেন, তখন সমস্ত দিক জুড়ে বিরাট জয়ধ্বনি উঠতে থাকে, সভামণ্ডপ থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে। ভাবাতিশয্যে নেতাজীর কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হলো না, তারপর তিনি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে শপথের প্রতিটি কথা অতি স্পষ্ট করে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে লাগলেন। সেই বিরাট জনসমুদ্রের ভেতর দাঁড়িয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—'আমি সুভাষচন্দ্র বোস ভগবানের নামে এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, ভারতবর্ষ এবং আটত্রিশ কোটী ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য আমি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করবো।'[৮] এইটুকু বলার পর তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ তাঁর কোন বাক্যস্ফুরণ হলো না। শ্রোতাগণ অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে দেখা গেল তাঁর চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। তা দেখে কেউ কেউ মনে করলেন হয়তো ভবিষ্যতের চিন্তায় অভিভূত হয়েছেন, কিংবা অতীত কোন ঘটনার স্মৃতিতে তাঁর ঐরূপ ভাব হয়েছে ; আর জনতার মধ্যে বহুমানুষও অশ্রুধারা সংবরণ করতে পারলেন না। কয়েক মিনিট পরে রুমালে চোখ মুছে পুনরায় ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র পড়লেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীগণ পরপর তা পাঠ করলেন।[৯] আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ খান এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—"এইটুকু বলবার পর তিনি একটু থামলেন—আমাদের মনে হচ্ছিল হৃদয়াবেগ রোধ করতে না পেরে এইবার তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়বেন। আমরা সকলেই শপথের প্রত্যেকটি বাক্য মনে মনে আবৃত্তি করেছিলাম। প্রস্তর মূর্তিবৎ নেতাজীর দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে আমরা সবাই ঝুঁকে পড়েছিলাম। সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী যেন নেতাজীর মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে। চারদিকে বিপুল নিস্তব্ধতা। নিশ্চল দেহে নিরুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে আমরা নীরবে অপেক্ষা করছিলাম—নেতাজী নিজেকে সামলে আবার কি বলেন। একটু পরেই গির্জের অরগ্যানের আওয়াজের মত গম্ভীর কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন :

'আমি চিরকাল ভারতের সেবক থেকে আমার আটত্রিশ কোটী ভাই-বোনেদের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করবো। এই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। স্বাধীনতালাভের পরেও—এই স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে

---

[৮] Kusum Nair—The Story of INA—Page 14

[৯] স্বামী ভাস্বরানন্দ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ে সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ)—'নেতাজীকে যেমন দেখিয়াছি'।

আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু কাজ করবার জন্য প্রস্তুত থাকবে।' এইবার আমাদের স্তব্ধভাব কেটে গেল—আমরা প্রকৃতিস্থ হলাম। এরপর সাময়িক গভর্নমেণ্টের সভ্যগণ একে একে এসে এই শপথ গ্রহণ করতে লাগলেন—ভগবানের নামে আমি এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, ভারতবর্ষ এবং আমার ৩৮ কোটী দেশবাসীর স্বাধীনতা অর্জনে আমি অটল বিশ্বস্ততার সাথে সুভাষচন্দ্র বসুর আদেশ পালন করবো এবং ভারতের মুক্তির জন্য আমার জীবন ও যথাসর্বস্ব দিতে প্রস্তুত থাকবো।"[১০]

এরপর নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণা পাঠ করলেন যা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এই ঘোষণায় ছিল—১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর ভারতবাসীর একশ বছর ধরে স্বাধীনতা উদ্ধারের কঠোর সংগ্রামের কাহিনী—যার মধ্যে বাংলার সিরাজউদ্দৌলা, মোহনলাল—দাক্ষিণাত্যের হায়দর আলি, টিপু সুলতান, ভেলুথাম্পি—মহারাষ্ট্রের আপ্পা সাহেব, ভোঁসলা, পেশোয়া বাজীরাও—অযোধ্যার বেগম—পাঞ্জাবের সর্দার শ্যাম সিং আগরওয়ালা, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই—ডুমরাওঁয়ের মহারাজা কুমার সিং এবং নানা সাহেবের নাম আর—১৮৫৭ সালে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে ভারতবাসীর আর একবার সমবেত সংগ্রামের কথা, ভারতীয়দের নিরস্ত্র করা; ১৮৮৫-তে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, সন্ত্রাসবাদ, সশস্ত্র বিপ্লব প্রভৃতির সাহায্যে হৃত স্বাধীনতা উদ্ধারের চেষ্টা ও ব্যর্থতা—এবং ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীজীর নতুন অস্ত্র—অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ প্রয়োগ। এই পর্যায়ে ভারতবাসীর শুধু রাজনৈতিক চেতনালাভ হলো না, ঐক্যভাবের প্রতিষ্ঠা হলো; ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত ভারতের আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করে তাঁদের শাসন নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন। ব্রিটিশের প্রতারণা, শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে ভারতের মহা জাগরণ—দূষিত শাসনের অবসান ঘটাতে প্রয়োজন শুধু একটি মাত্র অনল শিখা। এই শিখা জ্বালাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ আর আগত মুক্তির দিনে—ভারতবাসীর কর্তব্য হচ্ছে একটা সাময়িক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে তারই পতাকাতলে চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা করা। ভারতের নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ, জনগণ নিরস্ত্র, সুতরাং মূল ভূখণ্ডে এরূপ গভর্নমেণ্ট সম্ভব নয় এবং তার নির্দেশে সশস্ত্র যুদ্ধ করাও সম্ভব নয়। সুতরাং এ-মহাযজ্ঞের ভার পূর্ব-এশিয়ার

১০। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান—পৃষ্ঠা ১৫৯।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের—আর মাতৃভূমির ভেতর ও বাইরে থেকে চূড়ান্ত এ মুক্তি সংগ্রাম—আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধকে সাহায্য করা। দায়িত্ব জনসাধারণের। এ ছাড়াও আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের ঐ ঘোষণায় বলা হলো (যা কোন সার্বভৌম রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারে না), এ সাময়িক গভর্নমেন্ট প্রত্যেক ভারতীয়দের আনুগত্য লাভের অধিকার রাখে এবং তা দাবী করে। ভগবানের নামে আমাদের যেসব পূর্বপুরুষ ভারতীয় জনগণকে একতাবদ্ধ করার চেষ্টা করে গেছেন তাঁদের নামে, অতীত যুগে আপন প্রাণের বলিদানে যাঁরা শৌর্য ও আত্মত্যাগের স্পৃহার উন্মেষ করেছেন তাঁদের পূত পবিত্র নামে, প্রতি ভারতীয়কে আজাদ হিন্দের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান এবং ব্রিটিশ বিতাড়নের পর দেশ স্বাধীন না করা পর্যন্ত বিরামহীন কঠোর সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি হুকুমৎ-ই-আজাদ হিন্দ-এর পক্ষে ঘোষণা করলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

—অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষরিত—

সুভাষচন্দ্র বসু (রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক, প্রধানমন্ত্রী এবং যুদ্ধ ও বহির্বিষয়ের মন্ত্রী)

ক্যাপ্টেন শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথন (মহিলা সংগঠনী বিভাগ)

এস. এ. আয়ার (প্রচার ও তথ্য পরিবেশন বিভাগ)

লেঃ কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জ্জী (অর্থ বিভাগ)

লেঃ কর্নেল আজিজ আহমেদ, লেঃ কর্নেল এন. এস. ভগৎ, লেঃ কর্নেল এম. জেড. কিয়ানী, লেঃ কর্নেল এ. ডি. লোকনাথন, লেঃ কর্নেল এহশান কাদির, লেঃ কর্নেল শাহনওয়াজ খান (সশস্ত্র সৈন্য বাহিনীর প্রতিনিধিবৃন্দ)

এ. এম. সহায়, সচিব (মন্ত্রীর পদের সমতুল্য)

রাসবিহারী বসু (সর্বোচ্চ উপদেষ্টা)

করিম গনি, দেবনাথ দাস, ডি. এম. খান, এ. ইয়েলাপ্পা, জে. থিবী, সর্দার ইসার সিং (বিভিন্ন উপদেষ্টা)

এ. এন. সরকার (আইন উপদেষ্টা)

সিঙ্গাপুর, ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

নেতাজী ১৯৪১-এর মার্চ থেকে ১৯৪৩-এর জানুয়ারী (৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁর এশিয়ার পথে যাত্রা) এই দুবছর বার্লিনে থাকাকালে তিনি মিলিটারী ট্রেনিং-এর সমস্ত শিক্ষাই নিখুঁতভাবে গ্রহণ করতেন। দেহকে সম্পূর্ণ সমর্থ রাখার জন্য নিয়মিত ড্রিল এবং ভারী যুদ্ধাস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম নিয়ে দীর্ঘ

রুটমার্চ করতেন। মিলিটারী বিষয়ে যতখানি সম্ভব ওয়াকিবহাল হতেন, জার্মানী ভাষা শিক্ষা ও যুদ্ধ বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করতেন আর ফ্রি-ইণ্ডিয়া সেণ্টার, ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন, জার্মানীর শিল্প-সমরাস্ত্র, কল-কারখানা পরিদর্শন, হিটলার, মুসোলিনী ও জাপানের তোজোর সঙ্গে রাজনৈতিক-কূটনৈতিক যোগাযোগ এবং তিন তিনটি রেডিও সেণ্টার পরিচালনা ও বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতি—এ সবই এই দু-বছরের মধ্যে করেছিলেন। তার আগেই, আমি বিবৃত করেছি মান্দালয় জেলে তাঁর ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া টিবি-জনিত গুরুতর অসুস্থতা, ভিয়েনায় দীর্ঘকাল ধরে হাসপাতালে গলব্লাডারের অপারেশন—তারপর কলকাতা থেকে দুস্তর ভারত ত্যাগের সেই অভিযানের প্রচণ্ড দৈহিক ক্লান্তি আর সাবমেরিনে তিরানব্বই দিনের সমুদ্র পাড়ির কথা।

এই দুঃসাহসী, দুর্জয় কর্মযোগীর সীমাহীন কর্মধারা। একজন মানুষ কতখানি প্রতিভাধর হলে তবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যবাহিনীর আধুনিক যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ হন, তা কল্পনা করতেও হতবাক হতে হয়। শুধু যুদ্ধ নয়, পূর্ণ মর্যাদায় সার্বভৌম ক্ষমতা ও আধিপত্যে একটা গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা, সে গভর্নমেণ্ট পরিচালনা এবং তার জন্য অর্থ সংগ্রহ, ব্যাঙ্ক, মুদ্রা ও আইন তৈরী এবং শত্রু পক্ষ থেকে উদ্ধার করা হাজার হাজার মাইল অঞ্চলের জন্য অসামরিক শাসন ব্যবস্থা, শান্তি-শৃঙ্খলা, যুদ্ধক্ষেত্রে হাসপাতাল, নারী সৈন্যবাহিনী—জাপ সেনাপতিদের সঙ্গে আজাদ হিন্দের কর্তৃত্ব সঙ্কট—একের পর এক যেন ইন্দ্রজাল বা কাব্য-কাহিনী। তাঁর সম্মুখে বিশাল সৈন্যবাহিনী ও অসামরিক প্রায় ত্রিশ লক্ষ এশিয়াবাসী ভারতীয়, বহুদূরে উদ্বেলিত আটত্রিশ কোটি নিরস্ত্র ভারতবাসী আর কারান্তরালে সমস্ত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী এবং বুকের মধ্যে সেই-অনুরণিত জাগ্রত ভারত আত্মার প্রমূর্ত বিশ্বরূপ—বিবেকানন্দ।

তাঁর যুদ্ধ আহ্বান, দেশমাতৃকার জন্য সর্বস্ব বলিদান, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহাজীবনে উত্তরণের সে উদাত্ত কম্বুকণ্ঠ—চিরকালের জন্য সাহিত্য, ইতিহাস ও দেশপ্রেমের মহাকাব্যে পরিণত হয়ে থাকবে।[১১] “দূরে বহু দূরে ঐ নদী

১১। “…There, there in the distance—beyond that river, beyond those jungles, beyond those hills, lies the promised land—the soil from which we sprang—the land to which we shall now return. Hark! India is calling—India's Metropolis Delhi is calling—three hundred and eighty-eight millions of our countrymen are calling. Blood is calling to blood. Get up, we have no time to loss. Take up your arms. There in front

ছাড়াইয়া ঐ জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড ছাড়াইয়া আমাদের দেশ। ঐ দেশে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি, ঐ দেশে আমরা আবার ফিরিয়া যাইতেছি। শোন! ভারত আমাদিগকে ডাকিতেছে, ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকিতেছে, আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ দেশবাসী আমাদের আহ্বান করিতেছে—আত্মীয়েরা আত্মীয়দের ডাকিতেছে। ওঠ, নষ্ট করিবার মত সময় আমাদের নাই। অস্ত্র হাতে লও। দেখ, তোমার সম্মুখে পথ রহিয়াছে, যে পথ আমাদের পথ-প্রদর্শকগণ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইব। শত্রুসেনার মধ্য দিয়া আমাদের পথ করিয়া লইব। ভগবান চাহেন, আমরা শহীদের ন্যায় মৃত্যুবরণ করিব। যে পথ ধরিয়া আমাদের সৈন্যবাহিনী দিল্লীতে পৌঁছিবে, শেষ শয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী।"

আই, এন, এ (ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি) বা আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ বিভাগীয় মন্ত্রী মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ লিখেছেন—"…ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব রূপে যাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, আমার মত একজন সামান্য ব্যক্তি তাঁর প্রকৃত লিপিচিত্র অঙ্কন করবে একি সম্ভব? আমার ত মনে হয় এ শুধু দুঃসাধ্য নয়—এ অসম্ভব। …জাপানীদের সঙ্গে একসাথে মিলে মিশে কাজ করলেও যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের পৃথক স্থান ছিল, সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করত। …যুদ্ধের সময় অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে অনেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—'এই ফৌজ যখন জাপানী সৈন্যদলের সঙ্গে একযোগে লড়াই করছে তখন এরা জাপানীদের হাতে ক্রীড়া-পুত্তলি না হয়ে যায় না। নেতাজী এর উত্তরে বলেছিলেন, ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যদল তো ফ্রান্সে জেনারেল আইশেনহাওয়ারের নেতৃত্বে ঠিক একইভাবেই লড়াই করছে। ব্রিটিশেরা যখন নিজেরাই আমেরিকানদের নির্দেশ মেনে যুদ্ধ করছে, তখন তারা আবার আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যাবলীর সমালোচনা করতে আসে কেন?'

of you, is the road that our pioneers have built. We shall march along that road. We shall carve our way through the enemy's ranks or if God wills, we shall die a martyr's death. And in our last sleep we shall kiss the road that will bring our army to death. The road to Delhi is the road to Freedom. "Chalo Delhi".

"……মিঃ রাসবিহারী বোস, কর্নেল ইয়ামামাতো এবং জাপানীজ লিয়াজোঁ ডিপার্টমেণ্টের মিঃ সেণ্ডাও টোকিও থেকে নেতাজীর সঙ্গে একই বিমানে এসেছিলেন। বিমান থেকে নেমে নেতাজী সোজা আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন। আমার শরীর শিউরে উঠলো—জীবনে তাঁকে এই প্রথম দেখলাম আমি। কত কিছুই না তাঁর কাছে প্রত্যাশা করে বসে আছি।…… শ্রদ্ধা-প্রীতির এক বিপুল উচ্ছ্বাসে সকলে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এক বিপুল জনসমুদ্র—ভারতীয়, চীনা, মালয়বাসী, জাপানী সবাই ঠেলাঠেলি করে ধাক্কা খেয়ে এই বিপ্লবী বীরকে একটিবার দেখবার জন্য সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। গৌরবব্যঞ্জক মূর্তিতে খাড়া হয়ে মাথা তুলে মধুর স্মিতমুখে নেতাজী দাঁড়িয়ে আছেন। যে দেখছে, সেই মুগ্ধ হচ্ছে। আমরা তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম—হ্যাঁ, এইবার আমরা আমাদের ঠিক নেতা পেয়েছি, ইনিই আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিতে পারবেন।

"পরদিন ১৯৪৩ সালের ৩রা জুলাই আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবৃন্দ এবং হংকং, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, বোর্নিও প্রভৃতি দেশ থেকে আগত ভারত-স্বাধীনতা সংঘের সভ্যদের নিয়ে একটা সভা করলেন। এই সভায় আলোচনাকালে নেতাজীর আধুনিক যুদ্ধনীতি ও অস্ত্র-শস্ত্র সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জ্ঞান আমার মত সামরিক কর্মচারীদেরও মুগ্ধ করেছিল।"[১২]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপ-সৈন্যাধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল কাউণ্ট তেরাউচি আদৌ রাজী নন আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। কারণ এই ফৌজ গড়ে উঠেছে মালয় ও সিঙ্গাপুরে পরাজিত হীন মনোবল ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্য থেকে। দুর্ধর্ষ জাপানী সমর অভিযানের সময় তারা কঠোর বাস্তবের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হবে, দল ত্যাগ করে ইংরেজ বাহিনীতে চলে যাবে। সেখানে ভাল খাদ্য ও টাকা পয়সার আকর্ষণ আছে। অতএব ভারতকে স্বাধীন করতে জাপ-সৈন্যরাই যা করার করবে, নেতাজী বোস অনুগ্রহ করে শুধু ভারতীয় জনমত ও শুভেচ্ছার ব্যবস্থা করে দিলেই যথেষ্ট। আই. এন. এ.-কে সিঙ্গাপুরে রেখে দেওয়াই ভাল, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচার ও শত্রু এলাকায় কাজের জন্য তাঁর ফৌজের গুপ্তচর ও অন্যান্য কিছু কাজে লাগাবেন—এ হলো জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষের মতামত। নেতাজীর পক্ষে এ এক বৈদ্যুতিক 'শক'। না—না, তা হতেই পারে না। "জাপানীদের

---

[১২] শাহনওয়াজ খান—পৃষ্ঠা ১৪২–১৪৪

সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ, সে হবে দাসত্বের চেয়েও ঘৃণ্য।" ভারতবাসীকেই রক্তদান করতে হবে চূড়ান্তভাবে, আগামী মণিপুরের যুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় সৈন্যবাহিনীই পুরোভাগে থাকবে, ভারতের পবিত্র ভূমিতে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম রক্ত দেবে ভারতীয়েরা, অন্যথায় এ হবে তার জাতীয় মর্যাদার হানিকারক। অবশেষে জাপ কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ ফিল্ড মার্শাল নেতাজীর যুক্তি স্বীকার করে নিলেন। প্রথমে বাছাই করা একটা ভাল ব্রিগেড যুদ্ধে পাঠানো হোক, এরা জাপানীদের মত কষ্ট সহ্য করে ভাল ফল দেখালে তবে আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যান্য সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে। তাই সে মহারণের জন্য চলেছে প্রস্তুতি।[১৩]

নেতাজী ২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর ২৫শে অক্টোবর অসামরিক ভারতবাসী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সামনে সিঙ্গাপুরে এক বিরাট সভায় ঘোষণা করলেন—"রাত্রি ১২-০৫ মিনিটের সময় মন্ত্রী পরিষদের দ্বিতীয় বৈঠকে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে ঃ আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে।"

প্রায় পনের মিনিটকাল পঞ্চাশ হাজারের ওপর লোকের চলমান পর্বতমালা এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদীর্ণ হতে থাকে। উন্মত্ত জনতার শৃঙ্খলা রাখা কঠিন হয়ে উঠলো, মঞ্চের কাছে যাবার জন্য নিজেদের হারিয়ে ফেলতে পারলেই যেন ভাল হয়। নেতাজী আবেদন জানালেন স্তব্ধ হবার, শুধু হাত তুলে সমর্থন জানাবার। এত হাত শূন্যের দিকে উঠলো সে এক অকল্পনীয় মহারণ্য—আর আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকগণ তাঁদের রাইফেল কাঁধে তুলে নিলেন তাঁদের পরিপূর্ণ ফৌজী সমর্থনের প্রতীক হিসেবে।

নেতাজী অমানুষিক পরিশ্রম করে অসামরিক লোকদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন। তাঁরাও স্বেচ্ছায়-সানন্দে প্রচুর অর্থ দিলেন। রেঙ্গুনে তাঁর আজাদ হিন্দ ব্যাংকে (National Bank of Azad Hind Limited) মোট ২০ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। নেতাজী জাপানীদের কাছ থেকে সামরিক উপকরণ ছাড়া অন্য কোন প্রকার সাহায্য নিতে কিছুতেই রাজী হননি। শুধু কি তাই, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে এমন দেশপ্রীতি জাগিয়ে তুলেছিলেন নেতাজী, যার ফলে তাদের কাছ

১৩। স্প্রিংগিং টাইগার—হিউটয়—পৃষ্ঠা ৯৩

থেকে গভর্নমেণ্ট ও যুদ্ধ চালাবার জন্য সাহায্য আসতে লাগলো অবিশ্বাস্য রীতিতে। কোন কোন পরিবারের সবাই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিলেন —বাবা এসেছেন আজাদ হিন্দ ফৌজে, মা—ঝাঁসীর রানী বাহিনীতে, ছোট ছোট ছেলেরা বালসেনা দলে—"করো সব নিছোয়ার, বনো সব ফকির"—এই ছিল তাঁদের কাছে নেতাজীর দেওয়া বাণী। স্বাধীনতার একটা অনিশ্চিত সম্ভাবনার জন্য এমন যথাসর্বস্ব উজাড় করে দেওয়ার কথা সম্ভবত জগতে আর কোন জাতির ইতিহাসে আছে কিনা সন্দেহ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে নেতাজী যা চান তাই দিতে প্রস্তুত—দিয়েছেন।

স্বাধীনতার যুদ্ধে এমনিভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে নেতাজীর হাতে মিস্টার হাবিব বেতাই ও মিস্টার খান্না নামে দুই ব্যক্তি বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি তুলে দিয়েছিলেন। শুধু নেতাজীর নিকট আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের পক্ষে 'সেবক-ই-হিন্দ' বা হিন্দুস্থানের সেবক এই খেতাবের জন্য শ্রীহাবিব বেতাই একাই প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের ধনরত্ন, বিষয়-সম্পত্তি ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের হাতে অর্পণ করেন। ১৯৪৪-এর 'নেতাজী সপ্তাহ' অনুষ্ঠানে ৯ই জুলাই হাবিবের অপূর্ব আত্মত্যাগের মহিমা ঘোষণা করে সেবক-ই-হিন্দ গৌরবজনক পদক দিয়ে নেতাজী তাঁকে ভূষিত করেন।

নেতাজী তাঁর সৈন্যদলের উদ্দেশে বারে বারে বলে চলেছেন যে, ভারতীয়দের কারো উপর নির্ভর করা চলবে না—কাউকে বিশ্বাস করা চলবে না, এমনকি তাদের মিত্রপক্ষ জাপানকেও না। তাদের একমাত্র ভরসা তাদের নিজেদের বাহুবল আর ভারতবর্ষে একবার যদি তাঁরা প্রবেশ করতে পারেন তবে এই বল তাদের শতগুণ বেড়ে যাবে। আজাদ হিন্দ ফৌজ ও গভর্নমেণ্টের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস—নেতাজীর এই কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এই যে, ভারতবর্ষে গিয়ে যদি দেখা যায় জাপানীরা ভারতবর্ষের উপর কোনরকম প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে, তখন তাদের ওপরই ভারতীয়দের বন্দুক চালাতে হবে—ব্রিটিশের মত ঠিক একইভাবে এদের সঙ্গেও লড়তে হবে।

সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়ে এরপর নেতাজী সৈন্যদের কঠোর মানসিক ও সামরিক শিক্ষাদান শুরু করলেন। জঙ্গলে কি করে লড়তে হয়, তার দিকেই বেশি নজর দেওয়া হলো। সৈন্যদলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্পষ্ট ও সোজা কথায় তিনি বললেন, এই যুদ্ধে অনেক কষ্ট তাদের সহ্য করতে হবে, সৈন্যদের সাজিয়ে দেবার মত বন্দুক, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন প্রভৃতি যুদ্ধ সাজ-সরঞ্জাম তাঁর কম—তাদের আরামে রাখবার মত টাকা-পয়সাও নেই। গান্ধী, আজাদ,

নেহরু ব্রিগেড থেকে বাছাই করে তৈরী হলো নতুন এক সৈন্যদল—১নং গেরিলা রেজিমেণ্ট। এই দলই প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন। লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল শাহনওয়াজ খান (পরে মেজর জেনারেল) এই রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার নিযুক্ত হলেন,—কর্নেল ঠাকুর সিং সহকারী কম্যাণ্ডার এবং কর্নেল মহবুব আহম্মদ—'রেজিমেণ্টাল এ্যাডজুট্যাণ্ট'। নেতাজীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা তার নাম রাখলেন—'সুভাষ ব্রিগেড'। সামরিক শিক্ষা শেষ করে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও রণসজ্জার ঘাটতি কিছুটা পূরণ করে ১নং রেজিমেণ্ট—সুভাষ ব্রিগেড ১৯৪৩ সালের ৯ই নভেম্বর তাইপিং থেকে ট্রেন যোগে রেঙ্গুনের পথে যাত্রা করলো। নেতাজী বললেন—"দিল্লী অভিযানে আমি তোমাদের দিতে পারি—শুধু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কষ্টসাধ্য অগ্রগমন, অবশেষে হয়তো মৃত্যু ··· তোমরা দেশের জন্য রক্ত দাও, তবেই দিতে পারবো আমি দেশের স্বাধীনতা।" সৈন্যরা এককণ্ঠে উত্তর দিল—"নেতাজী, আমরা রক্ত দিলে যদি দেশ স্বাধীন হয় তবে সে রক্ত আমরা দেব, এত রক্ত দেব যে তাতে মণিপুরের সমতলভূমি প্লাবিত হয়ে যাবে।" তাই ঘটেছিল। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল-মে মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েক হাজার সৈন্য ঐ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন—হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সর্বশ্রেণীর মানুষ জাত-ধর্ম সাম্প্রদায়িক সমস্ত বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে নেতাজীর মহান নেতৃত্বে স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজেদের দেহের সমস্ত শোণিতে তাঁদের ভারতে মণিপুরের রণক্ষেত্র রক্তধৌত করে দিয়েছিলেন। আর ঐ একইভাবে সুভাষ, গান্ধী, আজাদ ও নেহরু ব্রিগেডের সৈন্যগণ, গুপ্তচর বিভাগ ও বাহাদুর গ্রুপের সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত আক্রমণে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে দুর্জয় ব্রিটিশ-আমেরিকান শক্তি জোটের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, রক্ত ঝরেছিল আরও প্রায় ৩০,০০০ আজাদী সৈনিকের—আরাকান-ব্রহ্ম-মালয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে।

সাময়িক ভারত গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দিন ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩-এর রাত্রিতে আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর নয়টি রাষ্ট্র ভারতের সাময়িক স্বাধীন গভর্নমেণ্টকে অনুমোদন দান করেন। জার্মানীই সর্বপ্রথম দেশ এই স্বীকৃতি দেয়। জার্মান রাইখের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেরভেন রিব্বেনট্রফ—নেতাজী প্রতিষ্ঠিত 'প্রভিশনাল গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া'কে সরকারীভাবে স্বীকৃতি পাঠান। তারপর ক্রোশিয়া, চীন, (নানকিং গভর্নমেণ্ট), মাঞ্চুকুয়ো, ফিলিপাইনস, ব্রহ্মদেশ। ইটালী গভর্নমেণ্টের পক্ষে—সেনর মুসোলিনি, ইম্পিরিয়াল জাপানীজ গভর্নমেণ্টের

পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোমোরু সিগিমেৎসু তাঁদের সরকারের স্বীকৃতি ছাড়াও অত্যন্ত আন্তরিক ব্যক্তিগত অভিনন্দনও প্রেরণ করেন নেতাজীর কাছে। সিয়াম গভর্নমেন্টই নবম রাষ্ট্র, যাঁরা আমাদের স্বাধীন ভারত সরকারকে স্বীকৃতি দান করেন ; আর, আইরিস ফ্রি স্টেট-এর প্রেসিডেন্ট ইমনডি ভ্যালেরা তাঁর ব্যক্তিগত এক গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ অভিনন্দন স্বাধীন ভারত গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার সময় নেতাজীর নিকট প্রেরণ করেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনটি ডিভিশন খোলা হয়—আসাম ফ্রন্ট, রেঙ্গুন ফ্রন্ট ও মালয় ফ্রন্ট। এবং আরো দুটো ডিভিশন সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করার জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পূর্ণ যুদ্ধ বর্ণনা অথবা তার লাভালাভ অর্থাৎ জয় ও পরাজয়ের পরিমাণ বর্ণনা আমার এ বই-এর উদ্দেশ্য নয় এবং নেতাজীর সমগ্র জীবনকর্ম সম্বন্ধে একখানা বইতে তা সম্ভবও নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাড়ে পাঁচ বছর কাল স্থায়ীত্বের মধ্যে এশিয়া খণ্ডে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যে প্রায় আড়াই বছর কাল আই. এন. এ. বা আজাদ হিন্দ ফৌজ তাঁদের অত্যন্ত সীমিত সমরসম্ভার নিয়ে মালয়-আরাকান-ব্রহ্ম-আসামের পাহাড়-জঙ্গলে, নদী-পর্বতের প্রান্তরে পৃথিবীর অন্যতম দুটি শ্রেষ্ঠ ও আধুনিক সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে—শুধু নেতৃত্ব ও দেশপ্রেমের আগুনে নিজেদের জ্বালিয়ে নিয়ে যে ভীষণ, মরণজয়ী যুদ্ধ করেছিলেন তার সামান্য কিছু বিবরণ এখানে দিতে হবে, আর একই সঙ্গে পাশাপাশি থাকবে সেই সাময়িক স্বাধীন ভারত গভর্নমেন্টের পরিচালনার কিছু কিছু কথা। কারণ প্রধানমন্ত্রী ও সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ছিলেন একই মানুষ—নেতাজী সুভাষচন্দ্র। আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের হেড কোয়ার্টারস বা প্রধান কার্যালয় প্রথমে সিঙ্গাপুর, তারপর ১৯৪৪-এর জানুয়ারীতে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হয়। স্বাধীনতা সংঘ বা ইণ্ডিয়ান ইনডিপেণ্ডেন্স লীগের মালয়ে ৭০টি শাখা যার সদস্য সংখ্যা ২ লক্ষ, ব্রহ্মদেশে ১০০টি শাখা অফিস এবং থাইল্যাণ্ডে ২৪টি শাখা অফিস গড়ে তোলা হয় এবং আন্দামান, সুমাত্রা, জাভা, সেলিবিস, বোর্নিও, ফিলিপাইনস, চীন, মাঞ্চুকুয়ো এবং জাপানেও এর শাখা-প্রশাখা প্রসারিত হয়। বৃহত্তম ত্রাণকেন্দ্র কুয়ালালামপুরে প্রতিদিন এক হাজারেরও বেশী অসামরিক মানুষ সাহায্য লাভ করতেন।

এই গভর্নমেন্টের ৪টি রেডিও স্টেশন ছিল এবং দুটো সংবাদপত্র নিয়ে প্রচার বিভাগ গঠিত হয়েছিল। দৈনিক পেপারের নাম 'পূর্ণ স্বরাজ' এবং সাপ্তাহিক 'আজাদ হিন্দ'। সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনে ট্রেনিং দিয়ে যে 'আজাদ হিন্দ দল'

বাহিনী গঠন করা হয়েছিল, তাঁরা অধিকৃত বা মুক্ত অঞ্চলে অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার গ্রহণ করে নেতাজী নামকরণ করেন 'স্বরাজ ও শহীদ দ্বীপ'। আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪৪-এর প্রথমেই ব্রিটিশ-ভারতকে আক্রমণ করে এবং ১৫০০ বর্গমাইল অঞ্চল মুক্ত করে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করে। ৯৪ নং পার্ক রোড, রেঙ্গুনে ১৯৪৪-এর এপ্রিলে আজাদ হিন্দ ব্যাংক কাজ শুরু করে। এখানে ব্রহ্ম ও মালয় থেকে আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের পক্ষে সংগৃহীত ২০ কোটি টাকা জমা পড়ে। তাছাড়া এ ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার ব্যাংকের মর্যাদা থাকায় জনসাধারণের ব্যক্তিগত এ্যাকাউণ্টে ৪০ লক্ষ টাকা জমা পড়ে। ১৯৪৫-এর ১৯শে মে ব্যাংক যখন বন্ধ করে দেওয়া হয়, ৩০ লক্ষ টাকা তখন ব্যালান্স ছিল। নেতাজী যেখানেই যেতেন তাঁর অনুগামী জনসাধারণ নিজেদের উজাড় করে দান করতেন। একজন পাঞ্জাবী যুবক নেতাজীর গলার একটি মালা নিলামে কিনেছিলেন ১০ লক্ষ টাকায়; বার্মার 'জিয়াওয়াদী এস্টেট' পুরোটাই আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টকে রেজিস্ট্রী করে দিয়েছিলেন এর মালিক। আজাদ হিন্দের সরকারী এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল ৪০,০০০—এঁদের ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধবন্দী ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্য থেকে রিক্রুট করা হয়েছিল। কিন্তু যোগদানেচ্ছু ভলাণ্টিয়ারের সংখ্যা এত বিপুল ছিল যে তাঁদের যুদ্ধাস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ দেবার মত সামর্থ্য আজাদ হিন্দ সরকারের ছিল না। তা সত্ত্বেও সৈন্যবাহিনীর প্রতি মাসে যে মাহিনা দেওয়া হত—ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান আর্মির চেয়ে খুব কম নয়।

আজাদ হিন্দ ক্যাবিনেট সৈন্যদের জন্য যে পকেট মানি (নগদ) নির্দিষ্ট করেন তা এইরূপ ঃ

পদ	*মালয়ের জন্য* (ডলারে)	*বার্মার জন্য* (ডলারে)
সিপাই	২৬	৩০
ল্যান্সনায়ক	২৮	৩২
নায়েক	৩২	৩৭
হাবিলদার	৪০	৫০
সাব-অফিসার	৬০	৭০
সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট	৭০	৮০

পদ	*মালয়ের জন্য* (ডলারে)	*বার্মার জন্য* (ডলারে)
লেফটেন্যাণ্ট	৮০	১০০
ক্যাপ্টেন	১০০	১২০
মেজর	১২০	১৫০
লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল	১৭০	২২৫
কর্নেল	২৮০	৩৩০
মেজর জেনারেল	৩৮০	৪২০

এখানে উল্লেখের প্রয়োজন যে, আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী পরিষদ সুস্পষ্টভাবে এও স্থির করেছিলেন যে, পেনসান ও সম্মানদানের ক্ষেত্রে, যুদ্ধে যাঁরা বীর ও শহীদ বিবেচিত হবেন শুধু তাঁরাই নন, আজাদ হিন্দে যোগদানকারী সৈনিকদের পরিবারবর্গকে এই সমস্ত সুযোগ ও আর্থিক সুবিধা অত্যন্ত সম্মানজনকভাবেই প্রদান করা হবে, ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান আর্মিতে নিযুক্ত জওয়ানদের অপেক্ষা যার স্ট্যাণ্ডার্ড যথেষ্ট উঁচুতে থাকবে।

সিঙ্গাপুর এবং রেঙ্গুনের অফিসারস ট্রেনিং স্কুল থেকে প্রায় ১৫০০ অফিসার মিলিটারী গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন, জওয়ানদের জন্য আরো চারটে মিলিটারী ট্রেনিং স্কুলের মারফৎ আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট ৭০০০ সৈন্যকে একই সময়ে ট্রেনিং দিতে পারতেন। 'আই. এন. এ. এ্যাক্ট' বা আজাদ হিন্দ ফৌজ আইন সাধারণ ইণ্ডিয়ান আর্মি এ্যাক্ট-এর নিয়ম অনুসরণ করে গঠন করা হয়েছিল। এই ফৌজের একটি বাহিনীর নাম ছিল 'বাহাদুর গ্রুপ' এবং এর কম্যাণ্ডার ছিলেন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল বুরহানুদ্দীন। আজাদ হিন্দ ফৌজের এই বিভাগের কাজ ছিল গুপ্তচর বৃত্তি। 'স্যাবোটাজ' অর্থাৎ ব্রিটিশ বাহিনীর ভেতর মিশে গিয়ে অন্তর্ঘাত এবং যেখানে যুদ্ধ চলছে সেখানে ব্রিটিশ লাইন অতিক্রম করে তাদের মধ্যে আজাদ হিন্দের উদ্দেশ্য প্রচার করে তাদের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দলে নিয়ে আসা। তাছাড়া 'ইনটেলিজেন্স গ্রুপ'—অর্থাৎ মিলিটারী গোয়েন্দা বিভাগ—যুদ্ধ অঞ্চলের ভেতরেই এই দলের গোপন ডিউটি। আর ছিল 'রিইনফোর্সমেণ্ট গ্রুপ'। যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া। লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের কোর্টমার্শালের সময় কর্নেল বুরহানুদ্দীনের যখন মুক্তি হয় তখন সেই কোর্টমার্শালের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল কে. এম. কারিয়াপ্পা বুরহানুদ্দীনের সঙ্গে 'হ্যাণ্ডশেক' করেছিলেন। সে ঘটনায় তখনকার এ্যাডজুট্যাণ্ট জেনারেল

অব ইণ্ডিয়া জেনারেল কারিয়াপ্পাকে কৈফিয়ৎ দাবী করেছিলেন—এক চিঠিতে। চিঠিখানি টাইপ করা নয়, হাতে লেখা—সে চিঠি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার। তাই এখানে হুবহু উল্লেখ করা হলো।[১৪]

Personal and Confidential
New Delhi Feb. 15, 1946

My dear Cariappa,

I saw in the 'Statesman' today that at the end of the Burhan-ud-din Trial yesterday you shook hands with the accused. This, as far as I know, is an unprecedented thing for a President of a Court Martial to do and naturally your action has attracted attention in the press and will undoubtedly be the subject for comment both in and out of the Services.

These INA Trials, as you know, are for the reported and widely discussed every where in India.

I should be very interested to learn what your motives were in taking the action you did.

Would you kindly let me know, I think your action is liable to be misconstrued by officers, Indian and British and that you may do or have done yourself no good.

You must be glad that this long and difficult Trial is over, and I am sorry, you have been kept away from Banu so long.

I certainly never anticipated the case going on for anything like the time it did, when you were selected as President.

Yours Sincerely
I. B. Deedr

আজাদ হিন্দ ফৌজের আর একটি চমকপ্রদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। এই বাহিনীর 'রাণী অব ঝাঁসী রেজিমেন্ট'-এর কম্যাণ্ডার ছিলেন (ডঃ) লেফটেন্যান্ট কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন। নেতাজী সিঙ্গাপুরে পৌঁছানর পর এই নারী-বাহিনী খোলা হয়। নেতাজী বলেন—"ভগিনীগণ, আমাদের যে স্বাধীনতার যুদ্ধ, সে যুদ্ধে আপনারাও অংশ গ্রহণ করবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিক ভাইদের কে দেখবে—অনেক ডিউটির মধ্যে

১৪। General Cariappa Collection—Group VII—Letters relating to Indian National Army (Trial) National Archives of India, New Delhi.

এ আপনাদের অন্যতম কাজ। এছাড়া সৈন্য, রসদ, অর্থ সংগ্রহও আপনাদের কাজ হবে—কখনো কখনো বন্দুকও হাতে তুলে নিতে হবে আপনাদের। ১৮৫৭-এর প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁসীর বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর যুদ্ধ করতে করতে আত্মদানের কথা স্মরণ করুন। সংখ্যায় কত বন্দুকের গুলি আপনারা ছুঁড়বেন তা বড় কথা নয়, যে নৈতিক শক্তি আপনাদের এই বীরত্বময় কাজের দ্বারা বিচ্ছুরিত হবে সেই মহাশক্তিই এই যুদ্ধে সবচেয়ে মূল্যবান। সীমান্তে সাধারণ ভারতীয় নাগরিক ও ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জওয়ানরা উভয়েই যখন আপনাদের বন্দুক কাঁধে যুদ্ধ সাজে রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে দেখতে পাবেন, তাঁরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে আপনাদের বন্দুক নিজেদের কাঁধে তুলে নেবেন—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

বক্তৃতার শেষে নেতাজী ঝাঁসীর-রাণী-বাহিনী ও রেডক্রস দলের জন্য মেয়ে চাইলেন। বহু মহিলা তখনই এগিয়ে এসে নিজেদের নাম দিলেন। এরপরে সিঙ্গাপুরে তাঁদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হল। সিঙ্গাপুরে ৮০০ স্বেচ্ছাসেবিকা এই নারীবাহিনীতে যোগ দেন, এঁদের মধ্যে অল্পবয়স্কা তরুণী থেকে বর্ষীয়সী মহিলা পর্যন্ত ছিলেন—অধিকাংশই উচ্চ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সব সম্প্রদায়ের এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের মেয়েই এতে ছিলেন। মেয়েদের এই শিক্ষাকেন্দ্রে কোনরূপ ভোগবিলাসের নামগন্ধ ছিল না। সামরিক শিক্ষা গ্রহণের সময় তাঁদের অনেক কঠিন কষ্টসাধ্য কাজ করতে হোত। যথা—মেসিনগান, টমীগান চালানো, হাতবোমা ছোঁড়া, রাইফেল, সঙ্গীন প্রভৃতি চালানো শেখা। শ্রমসাধ্য শারীরিক ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ ইত্যাদিও তাঁদের করতে হোত। এছাড়া ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে তাঁদের কাছে বক্তৃতা দেওয়া হোত। ক্যাম্পে অতি সাধারণ খাদ্য খেয়ে তাঁদের জীবন ধারণ করতে হোত। ভাত, মাছ, তরকারী এই ছিল তাঁদের খাদ্য। রাত্রে ঘুমাবার জন্য সুকোমল শয্যা তাঁদের ছিল না। কাঠের মেঝের উপর মাত্র একটা করে কম্বল পাতা—এই তাঁদের বিছানা।

শিক্ষাশিবিরের নিয়ম-কানুন ছিল অতীব কঠোর। বাইরের লোক কেউ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পেত না, আত্মীয়-স্বজনেরা সপ্তাহে মাত্র একদিন দেখা করবার অনুমতি পেতেন।

সামরিক শিক্ষা গ্রহণে তাঁদের সকাল থেকে সন্ধ্যা কেটে যেত। ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন নামে একটি উদ্যোগশীলা, তরুণী, অসম-সাহসিক মেয়েকে

নেতাজী এঁদের কম্যাণ্ডার নিযুক্ত করেন। ···সঙ্গীন যুদ্ধে তাঁরা সবচেয়ে বেশী পারদর্শিনী হন এবং তাঁদের সবারই ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে সঙ্গীন চালনা করবার জন্য সর্বদাই ব্যগ্রতা ছিল। ১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদল যখন ইম্ফল আক্রমণ করবার জন্য ব্রহ্মদেশে যাত্রা করে তখন ঝাঁসীর-রানী-বাহিনীর মেয়েরা নিজেদের দেহের রক্ত দিয়ে নেতাজীর কাছে এক আবেদনে লেখেন—পুরুষ সৈনিকদের মত তাঁরাও দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে প্রাণ দিতে সমভাবে ব্যগ্র। নেতাজী যেন যত শীঘ্র তাঁদের এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ দেন। নেতাজী তাঁদের এই আবেদন মঞ্জুর করেন। এরপর ঝাঁসীর-রানী-বাহিনী সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুন যায়, সেখানে নতুন স্বেচ্ছাসেবিকাদের সামরিক শিক্ষা দেবার জন্য ১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে আর একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়। এরপর স্বেচ্ছাসেবিকাদের সংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজার। আরও কয়েক হাজার মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীতে যোগদানে ইচ্ছুক হয়ে নিজেদের নাম লিখিয়েছিলেন—কিন্তু শিক্ষাদান প্রভৃতির ব্যবস্থার অসুবিধা থাকায় তাঁদের দলে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ইম্ফল আক্রমণ শুরু করলে ঝাঁসীর-রানী-বাহিনীর দলগুলিকে মেমিও (Maymyo) নিয়ে যাওয়া হয়। এঁরা প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণীর কাজ ছিল যুদ্ধ, অপরটির শুশ্রূষা। কিন্তু প্রত্যেক মেয়েকেই যুদ্ধ ও হাসপাতালের শুশ্রূষার কাজ—দুই-ই শেখান হোত।[১৫]

আজাদ হিন্দ ফৌজের 'রানী অব ঝাঁসী রেজিমেণ্ট' শুধু আহতদের মায়ের-বোনের সেবায় নয়, ওয়ার ফ্রণ্টে সাক্ষাৎ যুদ্ধ করেছিলেন, প্রাণও দিয়েছিলেন অনেকে, বিশেষ করে ১৯৪৪-এর ডিসেম্বরে। বীরত্ব, ত্যাগ ও কষ্ট সহিষ্ণুতার চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বেলা দত্ত নামে একজন বাঙ্গালী সৈনিক হাসপাতালের প্রায় ৭০ জন আহত সৈনিকের দায়িত্বে একাই কাজ চালিয়েছিলেন—ওয়ার ফ্রণ্ট থেকে আর্মি হেড কোয়ার্টারে একথা রিপোর্টের পর নেতাজী কর্তৃক এই সৈনিককে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছিল। অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের পূর্ব থেকেই জাপান যখন সমস্ত রকম সাহায্য—বিমান, মোটর এমনকি রসদ পর্যন্ত সরবরাহ বন্ধ করে দিতে থাকে, আজাদ হিন্দ

---

[১৫] শাহনওয়াজ—আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী : পৃষ্ঠা ৫২৫-৫২৭

ফৌজকে অপসারণ করতে হয় ; সুদীর্ঘ ২০০ মাইল পর্বত ও জঙ্গলের পথ তাঁরা বন্দুক ও গুলিবারুদ, রসদ, পোশাক ইত্যাদির ভারী বোঝা বহন করে পায়ে হেঁটে গিয়েছেন (যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন ধারণা যাঁদের নেই, তাঁদের এ কথা বুঝতে অসুবিধা হবে—সে ভারী বোঝা, বিশেষ করে বন্দুক ও কিছু গুলিবারুদ আর সামান্য খাদ্য-পোশাক শুধু নিজেকেই বইতে হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে কেউই সাহায্য করে না—অন্যথায় মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয় নিষ্ঠুরভাবে)। আজাদ হিন্দ নারী সৈন্যদের কাজের দ্বারা এই প্রমাণিত হয়েছে, প্রয়োজন উপস্থিত হলে—আমাদের মেয়েরা কত সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু হতে পারেন। আজাদ হিন্দের আত্মসমর্পণের আগেই নেতাজী প্রত্যেক নারী সৈনিককে তাঁদের আত্মীয়-আশ্রয়ের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন, এবং নিরাপদে তাঁরা পৌঁছেছেন—মোটামুটি নিশ্চিত জেনে তিনি তাঁর ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্টের শেষ নির্দেশনামা ঘোষণা করেন।

তাইপিং থেকে রেঙ্গুন যেতে পাঁচ সপ্তাহের পথ—সৈন্যদলকে প্রায় ৪০০ মাইল পায়ে হেঁটে পৌঁছতে হয়। যানবাহন, খাদ্যদ্রব্য, গোলাবারুদ, যুদ্ধ সরঞ্জাম ও আহত সৈন্য বহনের জন্য পাঁচখানা লরী ছিল। কিন্তু মেরামতের কারখানা ছিল না। ছিন পাহাড় ও কালাদন উপত্যকার যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর শীতে তুলোর কম্বল ও এক একটা পশমী জামা ছাড়া কিছু ছিল না। আর ভীষণ ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর্যাপ্ত মশারীও সরবরাহ সম্ভব হয়নি। নেতাজী 'শকরপরা বিস্কুট' নামে একরকম বিস্কুট তৈরী করিয়েছিলেন—রেঙ্গুনে আসবার পর, এই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের 'জরুরী খাদ্য'। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী নেতাজী একখানা বিমানে করে রেঙ্গুনে এলেন, যুদ্ধ যাত্রার সব কিছু আয়োজনের তদবির নিজে করতে লাগলেন। জাপানী সাহায্যের ক্ষেত্রে নেতাজীকে তাঁরা আশ্বাস দিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হলে তারা সবকিছু পাবে কিন্তু তা তারা পায়নি।

ব্রহ্মদেশ যুদ্ধাঞ্চলের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল কাওয়াবি এবং নেতাজী দুইজনে মিলে আক্রমণের একটি যুদ্ধ কৌশল ঠিক করলেন। জাপানী বাহিনীর সঙ্গে আজাদ হিন্দের ছোট ছোট দলের প্রস্তাব নেতাজী বাতিল করলেন। ঠিক হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজ একটি চিহ্নিত স্বতন্ত্র স্থান থেকে যুদ্ধ করবে আর ভারতবর্ষের স্বাধীন হয়ে যাওয়া স্থানগুলি আজাদ হিন্দের হাতে ছেড়ে দিতে হবে—যার গভর্নর হবেন মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জী, আর শত্রুপক্ষের গোলাবারুদ গাড়ী যা কিছু সম্পদ পাওয়া যাবে তা তুলে দেওয়া

হবে সাময়িক আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের হাতে। এছাড়া জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সমান মর্যাদা, আজাদ হিন্দ ও জাপ সামরিক আইনের সম্পর্ক এবং ভারতের মাটিতে প্রথম ভারতীয় সৈন্যের প্রবেশ এবং পরস্পরের অন্যান্য অনেক প্রকারের সম্পর্ক সহযোগিতা সম্বন্ধে বোঝাপড়ার পর নেতাজী তাঁর হেডকোয়ার্টার্সে ফিরে আসেন।

জাপ বাহিনীর জেনারেল মুতাগুচির অধিনায়কত্বে বর্মায় ৪ ডিভিশন জাপ বাহিনীর সঙ্গে ইম্ফল অধিকারের জন্য লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল সাতো ও মেজর জেনারেল ইয়ামামোতো-র পরিচালনায় ৩১ নং, ১৫ নং ও ৩৩ নং—পুরো ৩ ডিভিশন সৈন্য এবং মেজর জেনারেল কিয়ানী, কর্নেল ধীলন ও মেজর জেনারেল শাহনওয়াজের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের ১ নং ও ৩ নং গেরিলা রেজিমেন্ট। আর অন্যপক্ষে, চীনের ইউনান যুদ্ধফ্রন্ট থেকে বর্মার মধ্য দিয়ে আমেরিকান সেনাপতি জেনারেল স্টিলওয়েলের নেতৃত্বে চীনা-আমেরিকান ১৪ ডিভিশন সৈন্যবাহিনীর বর্মায় প্রতি আক্রমণ ও মাউন্টব্যাটেনের সৈন্যবাহিনী 'ফোরথকোর'-এর রক্ষায় স্টিলওয়েলের সহযোগিতা। ১৯৪৪-এর ৭ই মার্চ জাপানী 'হোয়াইট টাইগার'—ইংরেজের 'ব্ল্যাক ক্যাট'কে ঘেরাও করে ফেলে।[১৬] জাপ অধিকৃত বর্মা পুনরধিকারে বিলম্বের জন্য আমেরিকা ইংরেজ সেনাপতি মাউন্টব্যাটেনের কঠোর সমালোচনা করলে শুরু হয়ে যায় মিত্রপক্ষের—অর্থাৎ মাউন্টব্যাটেনের পরিচালনায়—'থার্সডে অপারেশন'। জাপ-আজাদী ও ব্রিটিশ-আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর রক্তক্ষয়ী অসহনীয় মারণযুদ্ধ। অনমনীয়, বিশ্বের সেরা কষ্টসহিষ্ণু জাপানী সৈন্যের দুঃসাহসিক যুদ্ধ, আজাদ হিন্দের দেশাত্মবোধে আত্মদানের ইতিহাস, আর মাউন্টব্যাটেনের গোর্খা রেজিমেন্টগুলির যুদ্ধকৌশল কাহিনী।[১৭] টোকিও থেকে ঘোষণা করা হলো 'Nippon's net is closing' (ইম্ফল তথা সমগ্র মণিপুরে যে ১,৫৫,০০০ ব্রিটিশ সৈন্য ও আরো অসামরিক ১০,০০০ সহযোগী, তারা জাপ-আজাদী ফৌজ দ্বারা অবরুদ্ধ, তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার ব্যবস্থা প্রায় শেষ)।

১৬। জাপ আক্রমণ পরিকল্পনার সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় 'হোয়াইট টাইগার', আর ইংরেজ-আমেরিকান আক্রমণের কোড—'ব্ল্যাক ক্যাট'। মাউন্টব্যাটেনের মণিপুর যুদ্ধের সাংকেতিক নাম ছিল 'থার্সডে অপারেশন'।

১৭। Manipur and World War II—Vol-II—Sanasam Gourhari Singh—pp. 134-138.

কিন্তু ৮০ দিনের অবরোধে বিপদাপন্ন ইঙ্গ-মার্কিন সমর বিভাগকে ইউরোপ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ব্রিটিশ-আমেরিকান বিমান বহরের প্রায় আশিখানা বিমান ও বহু সৈন্য সরিয়ে এনে মিত্রপক্ষের সেদিনের আত্মরক্ষা সম্ভব হয়। সে যুদ্ধে জাপানী সৈন্যের অসমসাহসী যুদ্ধ সত্ত্বেও বিরাট পরাজয় হয়। রসদ সমর-সম্ভার বহনের জন্য একখানিও বিমান না পাওয়া এবং প্রচণ্ড বর্ষার জন্য আজাদ হিন্দ বাহিনীকে শুধু কোহিমা ও ইম্ফল রণক্ষেত্র থেকে বর্মায় পশ্চাদপসরণ করতে হয়। এই যুদ্ধে জাপান হারিয়েছিল ৪০,০০০ বীর যোদ্ধা, আজাদ হিন্দ ফৌজ ২৬,০০০, আর যে ইংরেজ, আমেরিকান ও ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্য মৃত্যুবরণ করে তার সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০,০০০।[১৮]

১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনী বা আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রথমবারের মত যুদ্ধ আক্রমণ শুরু করে। সুভাষ ব্রিগেডের কম্যাণ্ডার শাহনওয়াজ যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আমার ব্রিগেড বাছাই করা অফিসার ও জওয়ানদের নিয়ে তৈরী। যুদ্ধক্ষেত্রে কষ্ট এবং মৃত্যু ওঁৎ পেতে আছে। আমাদের এ যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধে ভীরু যাঁরা তাঁদের স্থান নেই। আমরা চাই দুঃসাহসীদের। যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে তখন, আমাদের বর্তমান সাহায্যকারী জাপান যদি আমাদের ওপর প্রভুত্ব করতে আসে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। এমন কি এখন যদি ওরা একটা চড় লাগায় আপনারা তিন চড় দিতে পিছপা হবেন না। কারণ আমাদের আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট জাপানী গভর্নমেণ্টের প্যারালাল, তার অধীনস্থ নয়। ভারতকে স্বাধীন করার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

নেতাজী ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর অফিসারগণ এবং তাঁর গভর্নমেণ্ট এমনই প্রবল আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ ও সাহসপ্রবণ যে, একই ধরনের মানসিকতা সকলের মধ্যে লক্ষিত হয়। জাপানী-মানসিকতা, অহমিকা, এমনকি প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো 'ইণ্ডিয়া ফর ইণ্ডিয়ান্স,' 'এশিয়া ফর এশিয়ান্স,'—একথা

১৮। 'Due to the lack of aeroplanes and heavy rains, the I.N.A had to withdraw to Burma from the battle fronts of Kohima and Imphal. About sixty thousand British, American and British-Indian Army men killed and 26 thousand I.N.A. and forty thousand Japanese Army became martyrs to liberate India.'—I.N.A and Its Netaji's Role in the Freedom Struggle of India—Sheel Bhadra Yajee.

ঘোষণা করলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চারদশক পর বহু ফাইল, কাগজ-পত্র এবং গবেষণায় জানা যায়—পাশ্চাত্যে ব্রিটিশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মত এশিয়ায় জাপ-সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব গড়ে উঠেছিল—বিশেষত পার্লহারবার পতনের পর। দশমাসের মধ্যে সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জাপানী সূর্যের প্রকোপে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ব্রিটেন ও আমেরিকা ধরেই নিয়েছিল জাপান ব্রহ্মদেশ দখল করে ভারতের দিকে এগুবে। সেজন্য তারা ঠিক করলো বাংলা এবং আসাম থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে ওড়িষ্যার দক্ষিণে ও বিহারের রাঁচি-রামগড়ের কাছে ঘাঁটি করবে। ১০/১২ ডিভিশনের (এক ডিভিশনে সাধারণত ১০ হাজার সৈন্য থাকে) বিশাল বাহিনী জাপানকে ঠেকাবার জন্য 'সেকেণ্ড লাইন অব ডিফেন্স' তৈরী করে যুদ্ধ চালাবে। ভবিষ্যতের এই আতঙ্কের হাত থেকে রক্ষায় সৈন্যবাহিনীর জন্য বাংলার সমস্ত খাদ্য-সামগ্রী বাজার থেকে মিলিটারীর জন্য গুদামজাত করা হয় আর তার সেই অবধারিত ফলস্বরূপ পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলার বুক থেকে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়।

নেতাজী সম্ভবত জাপানী-চালাকি ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর সঙ্গে জাপান যে চুক্তি করেছিল, তা প্রথম থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে বহু জাপানী কম্যাণ্ডার পদে পদে নানা কৌশলে লঙ্ঘন করেছে। জাপানের ধারণা এবং হয়তো কিছুটা সত্য যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে, ব্রিটিশ বাহিনী সিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে পালিয়ে আসার সময় তাদের গুপ্তচর রেখে এসেছিল যারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রশক্তির সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ 'এম আই টু'র প্রধান মস্তিষ্ক জেনারেল উইনগেট দ্বারা পরিচালিত হতো। সাউথ-ইস্ট এশিয়া কম্যাণ্ড-এর পলিটিক্যাল ওয়ারফেয়ার ডিভিশনের গোপন রিপোর্টে জানা যায়, ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির মতের বিরুদ্ধে নেতাজীর প্রবল আপত্তির জন্য ভারতে বোমা বর্ষণ বন্ধ হয়। এই ওয়ারফেয়ার ডিভিশনের গোপন ফাইলের গোড়ায় মন্তব্য আছে ঃ[১৯]

"অপূর্ব সংগঠনী ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি মিস্টার বোস একজন বিপজ্জনক

---

[১৯] । চন্দ্রবোস ফাইল ঃ (ছয় খণ্ডের এই ফাইলটি মিত্রশক্তির মিলিটারী গোয়েন্দা বিভাগ 'চন্দ্রবোস ফাইল' নামে চিহ্নিত করেছিল। শিবপ্রসাদ চৌধুরী তরুণ বয়সে মিত্রশক্তির এক গোয়েন্দা বিভাগে ফরাসী ভাষা অনুবাদকের কাজ করেন এবং সাউথ-ইস্ট এশিয়া কম্যাণ্ড-এর পলিটিক্যাল ওয়ার-ফেয়ার ডিভিশনে যুক্ত হন ও এই ফাইলের তথ্যসমূহ গোপনে সংগ্রহ করেন)

রাজনীতিজ্ঞ সমগ্র কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁর সমকক্ষ কাউকে পাওয়া যাবে না। গরম মাথা, চরম উদ্ধত, কোন আপোষই ইনি মানেন না।" এই ফাইলের আর এক জায়গায় মন্তব্য এই রকম: "নেতাজীর একমাত্র লক্ষ্য ভারতের মাটিতে পদার্পণ করা এবং ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহী সেনাদের সঙ্গে যোগ-সাধন। ফিল্ড মার্শাল তেরাউচিসহ জাপানী কম্যাণ্ডারদের ইচ্ছা তাঁরাই ভারতে ঢোকার সময় সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে থাকুন এবং এই অভিযানে বোসের নিজস্ব প্লান তিনি তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে প্রথমে যাবেন, এটা তাঁরা নিশ্চয়ই সমর্থন করেন না।"

১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১নং ব্যাটালিয়ান প্রোমের দিকে এবং ২ ও ৩ নং ব্যাটালিয়ান মান্দালয়ের দিকে যাত্রা করে। ১নং গেরিলা বাহিনী যুদ্ধে যাবার আগেই আজাদ হিন্দ ফৌজের বাহাদুর গ্রুপের অনেকে সেখানে চলে গিয়েছিল, এরা গুপ্তচর বিভাগের সৈন্য। আরাকান সেক্টারে নেতৃত্ব দেন শহীদ কর্নেল এল. এস. মিশ্র, সর্দার-ই-জং[২০] এবং মেজর মোহর দাস, বিষানপুর সেক্টরে কর্নেল এস. এ. মালিক সর্দার-ই-জং ও কোহিমা সেক্টরের দায়িত্বে শহীদ মেজর মঘর সিং ও শহীদ মেজর অজমীর সিং। কর্নেল এল. এস. মিশ্রের ব্যক্তিগত বিশেষ কর্মতৎপরতায় আরাকান সেক্টরে মাউডঙ-বুথিয়াডঙে ব্রিটিশ বাহিনীর ৭ম ডিভিশন চারিদিক থেকে আক্রান্ত হয়। মায়ু-উপত্যকায় অবরুদ্ধ এই সৈন্যবাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আজাদ হিন্দের যুদ্ধে এই জয় তাদের যুদ্ধ ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হরি সিং নামে একজন আজাদ হিন্দ সৈনিক একাই সাতজন ইংরেজ সৈন্যকে নিঃশেষ করার জন্য শের-ই-হিন্দ পদক লাভ করেন। বিষানপুর সেক্টরে কর্নেল এস. এ. মালিকের

২০। বীরত্বের জন্য আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের 'গ্যালান্ট্রী এ্যাওয়ার্ড' বা বীরত্বের পুরস্কারগুলি ছিল যথাক্রমে (১) শহীদ-ই-ভারত, (২) শের-ই-হিন্দ, (৩) সর্দার-ই জং, (৪) বীর-ই-হিন্দ, (৫) তাংখা-ই-বাহাদুরী, (৬) তাংখা-ই-শত্রুনাশ।

আরাকান যুদ্ধে মহান কৃতিত্বের জন্য নেতাজী ১৯৪৪-এর ৫ই জুলাই কর্নেল এল. এস. মিশ্রকে নিজ হাতে 'সর্দার-ই-জং' পদকে এবং স্বদেশ-ভক্তি, সাহস ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য প্রীতম সিং-কে 'বীর-ই-হিন্দ' পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

বর্তমান ভারত গভর্নমেন্টের প্রচলিত গ্যালান্ট্রী এ্যাওয়ার্ড: (১) পরম বীরচক্র, (২) মহাবীর চক্র, (৩) বীর চক্র, (৪) অশোক চক্র, (৫) কীর্তি-চক্র এবং (৬) শৌর্য চক্র।

যুদ্ধতৎপরতা এতই প্রবল ছিল যে, তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে ইম্ফলের মাত্র দু-মাইল দূরত্বে পৌঁছে গেছিলেন, তিনি মণিপুর রাজ্যের স্বাধীনকৃত অংশের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। কোহিমা সেক্টরের যুদ্ধে শহীদ ক্যাপ্টেন গুরুবচন সিং, শহীদ সোহনলাল, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হোসেন এবং লেফটেন্যাণ্ট আসিফের কৃতিত্ব প্রশংসা অর্জন করেছিল। ঠিক একই সময়ে ডুবোজাহাজে করে ভারতে নেতাজী প্রেরিত গুপ্তচর বিভাগের মাস্টার চোপরার কাছ থেকে ভারত থেকে সংবাদ আদান-প্রদানের সাফল্যে নেতাজীকে উৎফুল্ল করে তোলে। (পরিশিষ্ট ঃ নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস দ্রষ্টব্য)।

আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধকৌশল ও নিপুণতায় প্যালেল ও তামু ব্রিটিশ যুদ্ধ-কেন্দ্রের পতন হয়। টিড্ডিম অধিকৃত হয় ১৮ই মার্চ। ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনী ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের পবিত্র মাটিতে জাতীয় পতাকা সগর্বে উত্তোলন করেন।[২১] ভারতভূমিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম প্রবেশের সে অপূর্ব দৃশ্য বর্ণনা দিতে গিয়ে এই ফৌজের মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান লিখেছেন—"সৈন্যেরা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে উন্মাদের মত মাতৃভূমির পবিত্র মৃত্তিকা চুম্বন করতে লাগলো। এরই উদ্ধার সাধনে তারা জীবন পণে যুদ্ধে নেমেছে। এরপর মহাসমারোহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। এই উপলক্ষে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়েছিল তা এই ঃ

'সব সুখ চায়েন কী বরখা বরষে, ভারত ভাগ হ্যায় জাগা ?
পঞ্জাব, সিন্ধ্, গুজরাট্, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বংগা
চঞ্চল সাগর বিন্ধ্ হিমালা, নীলা যমুনা গংগা
তেরে নিত্ গুণ গাঁয়েঁ, তুঝ্ সে জীওন পাঁয়েঁ
সব তন্ পাঁয়েঁ আশা
সূরজ বন্ কর জগ পর চমকেঁ, ভারত নাম সুভাগা
জয় হো, জয় হো, জয় হো ; জয়, জয়, জয়, জয় হো,
ভারত নাম সুভাগা।'

২১। ভারতে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের কাছে মৈরাং কাংলা নামক স্থানে ১৯৪৪ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে আই. এন. এ. কম্যাণ্ডার (বাহাদুর গ্রুপ) কর্নেল এস. এ. মালিক আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষে ভারতের তিন রঙা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

ইতিহাসের পথ বড় বিচিত্র এবং রহস্যময়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাতীয় সৈন্যবাহিনী বা আই. এন. এ-র কম্যাণ্ড গ্রহণ করে ভারতের বাইরে সাময়িক ভারতীয়-স্বাধীন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৩-এর অক্টোবরে, আর ঐ বছর ঐ মাসেই গ্রেটব্রিটেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব-এশিয়-যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এক সেনাপতি—ওয়াভেলকে নিয়ে এসে ভারতে ভাইসরয়ের পদাভিষিক্ত করেন। লর্ড ওয়াভেল যখন স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রতিশ্রুতিটিকেই পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং মুখোস খুলে ফেলে গান্ধীজীসহ বহু সহস্র নিরস্ত্র ভারতবাসীকে কারারুদ্ধ করেছেন তখন সাময়িক স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-প্রধান ও সুপ্রীম কম্যাণ্ডার নেতাজীর পরিচালনায় আজাদ হিন্দ ফৌজ পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে—ব্রিটিশ ভারত সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। ১৯৪৫-এর জুন মাসে যখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব ব্রিটিশ বড়লাট দিল্লীতে ঘোষণা করছেন তখন নেতাজী প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী ভারত গভর্নমেণ্ট দেড় হাজার বর্গমাইল স্বাধীন করে দিল্লীর পথে এগিয়ে চলেছেন। দু'শ বছরের ব্রিটিশ শক্তির পরাধীনতা থেকে মুক্ত পুণ্য ভারতের মাটিতে তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা উড্ডীন করে ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনী জাতীয় সঙ্গীত গাইছেন। রক্ত-অশ্রু-আনন্দানুভূতির সে বিরল মিলন দৃশ্যের প্রত্যক্ষ অংশীদারগণের সহস্র সহস্র সৈনিক-সেনাপতি আজো ভারতের প্রান্তে প্রান্তে, তাঁদের সেদিনের আজাদ হিন্দ ফৌজের সযত্নরক্ষিত পোশাকটার দিকে চেয়ে একবার জ্বলে ওঠে তাঁদের দু-চোখের মণি। কেউ কেউ আজো শুনতে পায় নেতাজীর কণ্ঠস্বর।[২২] ১৯৪৬-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারীতে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর ভারতীয় নৌ-সেনা বিদ্রোহ হয়। আর পরের দিনই গ্রেটব্রিটেন ঘোষণা করে ভারতের শাসনভার ভারতবাসীর হাতেই ন্যস্ত করা হবে। তাই মনে হয় ইতিহাস কি বিচিত্র! নেতাজীর এক একটি পদক্ষেপের সঙ্গে গ্রেটব্রিটেনের ভারত সাম্রাজ্য-সিংহাসনের এক একটি স্তম্ভ ধসে পড়ার কি আশ্চর্য যোগসূত্র।[২৩]

নেতাজী বললেন—"আমাদের বিজয়ী সৈন্যবাহিনী নিপ্পন (জাপান) বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে এখন যুদ্ধ করে

---

[২২] ১৯৬৬-তে আজাদ হিন্দ ফৌজে নেতাজীর সিকিউরিটি স্টাফভুক্ত জনৈক লেফটেন্যাণ্ট সনবন সিং গিলের সঙ্গে লেখকের কলকাতায় সাক্ষাৎকার।

[২৩] নৌ-বিদ্রোহ ঃ এই বইয়ের সপ্তম অধ্যায়।

চলেছেন, ভয়াবহ আর একটি যুদ্ধ আমাদের সামনে। আমাদের একটিই আকাঙ্ক্ষা আমাদের মৃত্যু, যাতে করে ভারত বাঁচে, যাতে করে শহীদের রক্তে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়।”[২৪]

সাঙ্গুভ্যালীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের মোডক অধিকারের পর ব্রিটিশ বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ। জাপ কম্যাণ্ডার তাঁর সৈন্যদল সরিয়ে নিলেন, কিন্তু আই. এন. এ-র এই ফ্রন্টের অফিসাররা কম্যাণ্ডার রাতুরিকে স্পষ্টভাবে বললেন, ‘আমরা হুকুম পেয়েছি দিল্লী যেতে—দিল্লী আমাদের সম্মুখে, আমরা ফিরে যাব না। ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমিতে আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা উড়িয়েছি। শত্রুদের যেখানে পেয়েছি সেইখানেই পরাজিত করেছি—সেই শত্রুদের সম্মুখ থেকে জাতীয় পতাকা তুলে নিয়ে আমরা কি করে পশ্চাদপসরণ করবো?’ আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের কিছুটা অংশ উদ্ধার করেছে—কিছুতেই তা না-ছাড়ার প্রতিজ্ঞায় অটল। বিস্ময় মুগ্ধ জাপ-কম্যাণ্ডার তাঁর এক প্লেটুন সৈন্য ক্যাপ্টেন সুরজমলের নেতৃত্বে রেখে গেলেন। জাপানী যুদ্ধের ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম, যে, জাপানী সৈন্যদল বিদেশী অফিসারের অধীনে যুদ্ধ করলো।

একশত বৎসরের ইতিহাসে এই প্রথম ভারতীয় সৈন্যগণ ভারতীয় অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্বাধীন ভারতের পতাকা হাতে যুদ্ধ করলো। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের সবচেয়ে বেশী ও জরুরী প্রয়োজন যে রসদ, সমরসম্ভার, মেডিকেল— অর্থাৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, তার অবস্থা করুণ। আর সামনে তাদের শক্তিশালী ব্রিটিশ-মার্কিন মজবুত যুদ্ধ ঘাঁটী এবং তাদের বিমান, ট্যাঙ্ক ও কামান। কিন্তু শত্রুবাহিনী এত দুর্জয়শক্তি নিয়েও আমাদের বিজয়ী আজাদ হিন্দ ফৌজকে তাদের বিজিত-স্বাধীনীকৃত স্থান থেকে নড়াতে পারলো না—আজাদ হিন্দ সেনারা তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমানার শেষ ঘাঁটিতে। তারা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে গেল ইম্ফলের প্রান্তরে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুদ্ধ-ফ্রন্টের অধিনায়ক মাউণ্টব্যাটেন ও আমেরিকান বাহিনীর জেনারেল স্টিলওয়েলের মধ্যে এই যুদ্ধ নিয়ে তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। ইম্ফল ও আরাকান ফ্রণ্ট থেকে ফিফথ ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান ডিভিশনকে বিমানে করে সরিয়ে আনতে হবে, অন্যথায় সর্বনাশ ঠেকান অসম্ভব এবং তা করতে হবে আকাশ পথে, কারণ স্থলপথ, নদীপথ এবং

---

[২৪] I. N. A. ON INDIAN SOIL—Selected Speeches : p—214
Publication Division, Government of India

রেলপথ জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বারা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। দিল্লী উড়ে গেলেন মাউন্টব্যাটেন, সেখান থেকে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে সংকেত পাঠালেন—অন্তত চীন ফ্রন্ট থেকে ৩০-খানি ডাকোটা বিমান তাঁকে দেওয়া হোক। ইম্ফলে ব্রিটিশ বাহিনীর এমনই জরুরী প্রয়োজন যে, আমেরিকার অনুমতির অপেক্ষায় থাকা তাঁর পক্ষে সেদিন সম্ভব হল না। এ্যাংলো-আমেরিকান প্রধান সেনাপতিগণ মাউন্টব্যাটেনের দাবীর গুরুত্ব বুঝলেও চিয়াং কাইসেকের চীনা বাহিনীকে দুর্বল করে দিতে রাজী নন তাঁরা। কিন্তু ১৯৪৪-এর এপ্রিলে অবরুদ্ধ ইম্ফল-দিমাপুর রোড বরাবর উত্তর-পূর্বভারতের একমাত্র ব্রিটিশ শক্তির প্রতিরক্ষা কেন্দ্র পর্বত বনজঙ্গল ঘেরা সুরম্য উপত্যকা-দুর্গ ইম্ফলে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী—'চতুর্থ কোর', এমন অবস্থার সম্মুখীন যে, আত্মসমর্পণ অথবা অনাহারে মৃত্যুবরণ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ তাদের সম্মুখে নেই। ইতিমধ্যে জাপানী ও আজাদ হিন্দ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত জেনারেল উইনগেটসহ ১৭০০ ইংরেজ সৈন্যকে ইম্ফল যুদ্ধক্ষেত্রে সমাধিস্থ করা হয়েছে (পরে উইনগেটের কফিন আমেরিকায় বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হয়)। এই অবস্থায় যুদ্ধবিশারদ মাউন্টব্যাটেনের সাহস ও দূরদর্শিতায় ওয়াশিংটনে তার করা হয়—অবিলম্বে ১০০খানি বিমানের জন্য।

বিপর্যয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইংরেজ-মার্কিন মিত্র পক্ষ সমর্থ হয়। ইটালির যুদ্ধাঞ্চল থেকে ৭৯ খানা বোমারু বিমান এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে এসে পৌঁছায়। এমন উত্তুঙ্গ, বিপদ শঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল ভেদকরে, যেখানে একমাসে রসদ ও জিনিস-পত্র পৌঁছাতে লাগে, সেখানে মাত্র ৯০ মিনিটে বিমান বহরে তা পৌঁছে যেতে লাগলো। বিমান যুদ্ধের আগের সমস্ত ইতিহাস ম্লান করে দিয়ে এয়ার ভাইস মার্শাল স্ট্যানলি ভিনসেণ্ট-এর পরিচালনায় ঘোড়া, খচ্চর, ট্যাঙ্ক, মেসিনগান, কামানের অংশ, বন্দুক, গোলাবারুদ, রসদ ও সৈন্য আরাকান থেকে এবং সম্পূর্ণ ৫ম ইণ্ডিয়ান ডিভিশন উড়োজাহাজে করে নামান হলো ইম্ফল উপত্যকায়। রয়্যাল এয়ার ফোর্সের ১৯৪ স্কোয়াড্রন এবং ২০ নম্বর মার্কিন কম্যাণ্ডো কখনো বা কুমিল্লা—কখনো আরাকান, কখনো সানসক, কালাদান থেকে ইম্ফলে—আবার ইম্ফল থেকে আহত, মৃত সৈন্য ফেরৎ নিয়ে যাওয়া—সবই বিমানে। কিন্তু যখন সেই ৭৯ খানা বিমানকে ইউরোপে নর্ম্যাণ্ডী যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে দেবার সময় এসে গেল, তখন

ব্রিটিশ-ভারতীয় ও চীনা যুদ্ধ ফ্রন্টে দুর্ভাবনার মেঘ ঘনিয়ে এলো। একদিকে চিয়াং কাইসেকের ইউনান যুদ্ধক্ষেত্র অন্যদিকে মাউণ্টব্যাটনের—মণিপুর। বিমান বহর যদি ফেরত দিতে হয় তাহলে অবশ্যই জাপ বাহিনীর হাতে বন্দীত্ব এবং আই. এন. এ-র দিল্লী অভিযানকে দু-হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানানোই হবে একমাত্র ফলাফল। ইউরোপে বিমানগুলি ফিরে যাবার মাত্র ৪ দিন আগে দশ সহস্র মাইল দূর থেকে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে, মাউণ্টব্যাটেন এমনিভাবেই বোঝাতে পারলেন যে, কোন বিমান বহরকে প্রাচ্য যুদ্ধাঞ্চল থেকে পাশ্চাত্যের রণক্ষেত্রে ফিরে যেতে হলো না, অন্যথায় সম্পূর্ণ অন্য ইতিহাস লিখিত হতো। জাপ জেনারেল মোতাগুচী ও আজাদ হিন্দ জেনারেলদের দৃষ্টি সীমানার মধ্যেই রয়্যাল এয়ার ফোর্স ও আমেরিকান এয়ার ফোর্সের বিমান বহর ওঠা-নামা করতে লাগলো।

আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের অন্যতম উপদেষ্টা জন. এ. থিভি ১৯৪৫ সালে লিখেছেন—'ব্রিটিশ যুদ্ধ বিভাগ স্বীকার করেছিলেন, ভারতের পূর্ব-প্রান্তে তাঁদের শেষ প্রতিরক্ষা ইম্ফলের পতন আসন্ন বুঝতে পেরে এবং সমস্ত পথ অবরুদ্ধ দেখে তাঁদের সৈন্যদের জন্য রসদ, যুদ্ধ সম্ভার বিমানযোগে দ্রুত সরবরাহ করেছিলেন। আই. এন. এ. তাঁর সমরসম্ভার, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার অতি সঙ্গীন অবস্থা সত্ত্বেও ক্রমাগত অবরুদ্ধ ব্রিটিশ বাহিনীকে আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগলেন—শত্রুপক্ষ শুধু মাত্র আত্মরক্ষা করে চললেন। কিন্তু মৌসুমী বর্ষা-ঝড় সফল হলো আমাদের সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করাতে—যা ব্রিটিশ যুদ্ধাস্ত্র পারেনি। আমাদের সৈন্যবাহিনী ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত ধরে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়।'[২৫]

নেতাজী তাঁর ১৪ই আগস্টের বিশেষ নির্দেশনামায় ঘোষণা করলেন যে, 'ব্যূহরচনা কৌশল' দিক থেকে অভিযানের এই সাময়িক পশ্চাদপসরণ, আমরা প্রতিটি যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেছি। আমাদের ইউনিটগুলি তাদের উচ্চতর শিক্ষা ও শৃঙ্খলাবোধের দ্বারা শত্রু সৈন্যের চেয়ে উচ্চমান প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে আর প্রতিটি পরাজয়ের সঙ্গে ওদের মনোবলের অবনতি হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহস ও বীরত্ব যথার্থই সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল এবং আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই যুদ্ধে, লালারুয়াতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট অমর সিং-এর নেতৃত্বে ছোট একটি সৈন্যের ঘাঁটি ছিল। সকাল ৮টায় ১৫০ জন

---

[২৫] The Struggle in East Asia—John A. Thivy : page—84

ব্রিটিশ সৈন্য কামান নিয়ে এই ঘাঁটি আক্রমণে এলেন। আজাদ হিন্দের ছিল শুধু মেসিনগান ও রাইফেল। নীরবে থেকে খুব কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনী আক্রান্ত হলো, পিছু হটে গেল বিকাল ৫টায়। পুনরায় আক্রমণ হলো, এবং অনেক প্রবল তার বেগ। এবার ইংরেজ বাহিনী ছয়খানি জঙ্গী বিমানের সাহায্যে (মাথার ওপর রেখে) আক্রমণ চালালো—তারপর আজাদী সৈন্যের পরিখার ওপর মেসিনগানের গুলি এবং ২০ মিলিমিটার গুলি যা ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ির ওপর ছোঁড়া হয়, এরপর কামান। শত্রুপক্ষের ধারণা—ঘাঁটিটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তাই এগিয়ে এল। কিন্তু একটিও গুলি না ছুঁড়ে ওঁৎ পেতে বসেছিলেন দুঃসাহসী আজাদ হিন্দের সৈন্যগণ। তারপর সেই দুর্জয় আক্রমণ—এবারও আত্মরক্ষার্থে পলায়ন। কিন্তু অমর সিং পালিয়ে যেতে দিতে রাজী নন। রাত্রির অন্ধকার শুরু হতেই মাত্র ৫0 জন সৈন্য নিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চললেন ইংরেজ শিবিরের দিকে—তারপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া। শত্রু শিবির সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ লাভ। এরপর বহুদিন এ-অঞ্চলে ব্রিটিশ বাহিনী আক্রমণ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল।

এরপর কোহিমা যুদ্ধক্ষেত্রের কিছু বর্ণনা খুবই প্রয়োজন। জাপানীজ-মাঞ্চুরিয়ান ডিভিশনের মারাত্মক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্পেশ্যাল সার্ভিস গ্রুপ (বাহাদুর গ্রুপ) এবং আজাদ হিন্দ দল ১৯৪৪-এর মার্চে ক্যাপ্টেন মগর সিং, ক্যাপ্টেন অমর সিং এবং দলপতি সিনহার পরিচালনায় যাত্রা করে। আই. এন. এ-র মিলিত বাহিনী উখরুল ও কোহিমা দখল করে নেয়। কিন্তু প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ ও তাঁর বাহিনী আর অপেক্ষা করতে রাজী নন। কিন্তু বারে বারে ম্যালেরিয়ায় দৈহিক শক্তি ক্ষয়েও তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কোহিমায়—ব্রিটিশ বাহিনীকে আক্রমণে অনেক জঙ্গল, পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে, সময় বয়ে যাচ্ছে। এই সুযোগে জাপ বাহিনী অনেকদূর অগ্রসর হয়ে কোহিমা দখল করে নিয়েছে এবং মণিপুরের উপর আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে রয়েছে শক্তিশালী আজাদ হিন্দের বাহাদুর গ্রুপ ও গোয়েন্দা বাহিনী। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে শাহনওয়াজের প্রথম রেজিমেন্ট হাকা-ফালম থেকে কোহিমায় পৌছালো। ব্রিটিশের শক্তিশালী মেকানাইজড-ফোর্স জাপ বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে তখন। তার মধ্যেই আমাদের সৈন্যদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, তথাপি সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ

করলো তারা। কিন্তু সবচেয়ে বেশী অভাব খাদ্যের আর তখন শুরু হয়েছে আসামের জঙ্গলে বর্ষার ভয়ঙ্কর প্রকোপ। অবস্থা আরো গুরুতর আকার ধারণ করলো—যখন আজাদী সৈন্যদের শুধু নাগা অঞ্চলের গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা চালের উপর নির্ভর করতে হলো। সেদ্ধ ঘাস আর চালের মণ্ডই হলো একমাত্র 'রেশান'। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের জন্য কোন 'প্রোটীন' খাদ্য একটুও নেই, যা ছিল অপরিহার্য। এ অবস্থায় এক সপ্তাহ চলে না। এর ওপর ইংরেজ পক্ষের ভাল খাদ্য ও চাকুরীর লোভনীয় ও শক্তিশালী প্রচার।[২৬] এবং পার্বত্য অসামরিক লোকেদের ক্ষেপিয়ে তোলা। একমাত্র সম্বল তখন 'জয়হিন্দ' ধ্বনি ও দুর্দমনীয় মানসিক শক্তি।

প্রবল মৌসুমী বর্ষা আর ক্রমবর্ধমান বিমান আক্রমণ, উভয় আক্রমণের মুখে আজাদ হিন্দ ফৌজকে জুন মাসের শেষ দিকে টামুতে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। এই পশ্চাদপসরণ এক অতি জটিল ও ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্য দিয়ে ঘটতে থাকে। শত শত জাপানী ও আজাদ হিন্দ সৈন্য রাস্তার পাশেই মৃত্যুবরণ করেন—রোগের আক্রমণে আর ঔষধ, খাদ্যদ্রব্যের অভাবে। আশা করা গিয়েছিল—বিপর্যস্ত এই বাহিনী ১নং ডিভিসনের মূল অংশের সঙ্গে যোগদান করবেন কিন্তু নেতাজীর কাছ থেকে নির্দেশ এলো চিনদুইনের পূর্ব তীরে সম্পূর্ণ ১নং ডিভিসনকে সরে যাওয়ার। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনীকে আহলো পর্যন্ত মার্চ করে, ইয়ে নদী পার হয়ে চিনদুইন নদী বরাবর কালেওয়া পর্যন্ত পৌঁছুতে হলো নৌকার সাহায্যে। জাপানী সরবরাহ ব্যবস্থা তখন ভেঙে পড়েছিল, কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়—বার্মা, সিয়াম, বোর্নিও প্রভৃতি রাষ্ট্রে জাপ মিলিটারী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আবার আমেরিকার নৌবহর ও বিমান বাহিনীর তীব্রতর প্রতি আক্রমণ।[২৭]

২৬। "We have broadcast several times···they thought (people of India) it was all Japanese propaganda. On the other hand the British counter propaganda was excellent and completely hood winked our people, with the result that there was no supply of food received from our own country.··· They carefully kept away from the public the broadcasts of Provisional Government of Free India. They deliberately suppressed information about the formation of the Azad Hind Fouj under Netaji Subhas Chandra Bose"—Major General A. C. Chatterjee p. 306-307.

২৭। Major General A. C. Chatterjee—pp. 181-182

১৯৪৪-এর ২১শে আগস্ট নেতাজী তাঁর নির্দেশনামায় পুনরায় প্রস্তুতি পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিতের ঘোষণা করেন। বর্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনী তাদের দুর্ধর্ষ চতুর্দশ বাহিনীকে আসামের যুদ্ধক্ষেত্রে এনে ফেলেছে। তাদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি লক্ষ্য করে নেতাজী তাঁর দ্বিতীয় ইনফ্যান্ট্রি-রেজিমেণ্টের উদ্দেশ্য করে বলেন—"ব্রিটিশ শত্রুপক্ষ ভারত-প্রতিরক্ষার জন্য এই অঞ্চলকেই তাদের প্রথম যুদ্ধক্ষেত্র করে তুলেছে—এইটে তাদের পক্ষে স্ট্যালিনগ্রাড। কোন গোলাপী আশার ছবি তুলে ধরতে আমি চাই না। যুদ্ধের মাঝখানে মৃত্যুই অপেক্ষা করে আছে এই মনে করতে হবে ; কারণ শত্রু তার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছে—আমাদেরও যা আছে তা একত্রিত করতে হবে। তাছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের অদ্যাবধি 'চলো দিল্লী' শ্লোগানের সঙ্গে আজ থেকে আর একটি যুক্ত হবে—'রক্ত, রক্ত, আরো রক্ত'।"[২৮] এর অর্থ, ৪০ কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য আমরা দেহের শোণিত দান করবো—সেই সঙ্গে সেই একই উদ্দেশ্যে শত্রুর শোণিত পাত করবো। এই 'সেকেণ্ড ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেণ্ট'-এর কম্যাণ্ডার ছিলেন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল পি. কে. সাইগল। ১৯৪৫ ফেব্রুয়ারী-এর তৃতীয় সপ্তাহে তিনি পোপায় মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ-এর সেকেণ্ড ডিভিসনের সঙ্গে মিলিত হলেন ; আর তৃতীয় ইউনিট—নেহরু রেজিমেণ্ট তখন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল জি. এস. ধীলনের নেতৃত্বে মান্দালয়ের কাছে নিযুক্ত। কিন্তু শুধু স্বাজাত্যবোধ ও স্বাধীনতার উদগ্র কামনা দিয়ে কামান-বিমানের মুখোমুখি হওয়া যায় না। ইতিমধ্যে 'বার্মা ন্যাশনাল আর্মি' দল ত্যাগ করে ব্রিটিশের পক্ষে চলে গিয়েছে, জাপ বাহিনী মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আজাদ হিন্দের লেফটেন্যাণ্ট হরিরাম দল ত্যাগ করেছেন, তথাপি নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যুদ্ধ করে চলেছেন আই. এন. এ.-র বহু সহস্র বীর।

ইংরেজ পক্ষের সামরিক গোয়েন্দাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে ঢুকে পড়া এবং খাদ্যাভাব ও জাপানী অসহযোগিতা প্রভৃতির জন্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের 'মোরেল' বা নৈতিক-মানসিক অবস্থা যাতে ঠিক থাকে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র সশরীরে মাউন্ট পোপার যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে দৃঢ়সংকল্প হলেন। জাপানের হাত থেকে ব্রহ্মদেশ শত্রুর কবলে পুনরায় চলে যাবে একথা তিনি নিশ্চিত বুঝে নিয়েছিলেন। তাঁর দিল্লী অভিযান যদি রুদ্ধ হয়েই যায় তাতেই বা কি! তিনি কি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে প্রতিশ্রুতি দেননি, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁদের নেতৃত্ব দান করবেন? ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই প্রাণ দান

[২৮] Kusum Nair : INA—pp. 18-19

করতে তিনি আগ্রহী, মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য এর চেয়ে বড় ত্যাগ আর কি হতে পারে? চাঁদের আলো ভরা শেষ রাত্রিতে তিনি উপস্থিত আই. এন. এ. অফিসারদের সঙ্গে তর্ক করে চলেছেন যুদ্ধে তাঁর নিজের যাওয়ার যুক্তিতে। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। নেতাজীকে বললেন, "আপনি আপনার ব্যক্তিগত সাহস প্রদর্শন করতে জীবনের ঝুঁকি নেবার প্রস্তাব করছেন এবং এটা স্বার্থপরতা, আর তা করার কোন অধিকার আপনার নেই। আপনার জীবন আপনার ব্যক্তিগত বিষয়বস্তু নয়, আপনার জীবন ভারতের মূল্যবান সম্পদ—আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখার জন্য আমরা দায়ী।" নেতাজী তথাপি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ধীরে বললেন, "আপনাদের দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই, ইংল্যাণ্ড এমন বোমা তৈরী করেনি—যাতে আমার মৃত্যু ঘটাতে পারে।"[২৯] এই আলোচনার ছেদ হচ্ছে না—অফিসাররা রিপোর্ট করলেন—অন্ধকার একেবারে দূর না হলে পাহাড়ী পথে গাড়ী চালানো সম্ভব নয়। নেতাজী তাঁর মেজাজ হারিয়ে ফেললেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫-এর রাত্রিভোর হয়ে গেল, ২৬-এর শুরুতেই বোমারু বিমান থেকে মেইকটিলায় বম্বিং হলো—তার আগের দিনও প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ ঐ জায়গায় হয়ে গিয়েছে। বিমান চলে গেলে জাপানী লিয়াজোঁ অফিসার জানালেন, একটি ব্রিটিশ আর্মার্ড বাহিনী ১৬ মাইল দূরে দেখা গিয়েছে। রেঙ্গুন রোড-এর ওপর মাউণ্ট পোপা যাওয়ার পথ বন্ধ। ব্রিটিশের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণদান এক কথা কিন্তু পোপা পর্বতের মধ্যে জাপানীদের সঙ্গে মেইকটিলায় তাদের বেড়াজালে আটকে মৃত্যুবরণ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। এ অবস্থায় নেতাজী ঐ স্থান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সে-সময় যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গী শাহনওয়াজ লিখেছেন—"গাড়ীর মধ্যে আমি অস্ত্র-শস্ত্র গোলাবারুদ ভর্তি করে নিলাম, যখন আমরা গাড়ী ছেড়ে দিলাম, তখন সকাল ৯টা। নেতাজী গুলি ভর্তি একটি টমিগান কোলের ওপর রেখে বসে আছেন, তাঁর নিজস্ব ডাক্তার কর্নেল রাজুর হাতে দুটো গ্রেনেড, ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত। জাপানী অফিসারটির হাতে আর একটি টমিগান, আর আমার গুলি বোঝাই ব্রেনগান। আমরা সকলে মুহূর্তেই গুলি-চালানোর জন্য প্রস্তুত হয়েই চলেছি। গাড়ীর ফুট বোর্ডে জাপানী অফিসার দাঁড়িয়ে, চারদিকে তাঁর দৃষ্টি, শত্রু বিমান দেখা মাত্রই গুলি।"

---

[২৯] Springing Tiger—p. 154.

যে-কোন মুহূর্তে কামান, মেসিনগানের গুলি বা বোমারু বিমানের আক্রমণের মধ্যে—অর্থাৎ সাক্ষাৎ মৃত্যুর মাঝখানে, নিজের হেড কোয়ার্টার ছেড়ে একটি দেশ ও গভর্নমেণ্টের প্রধান এবং প্রধানতম সৈন্যাধ্যক্ষকে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার কথা নয় বা সে রকম কাহিনী বর্তমান যুগে আধুনিক এবং সর্বাত্মক যুদ্ধের ইতিহাসে শোনা যায় না। সম্ভবত নেতাজী ব্যতিক্রম। সেদিন কোন রকম দুর্ঘটনা ছাড়াই রাত্রি না আসা পর্যন্ত ইনডাও পর্যন্ত তাঁরা ২০ মাইল চলে গেলেন—পোপার পার্বত্য গ্রামাঞ্চলে বিমান আক্রমণের বহুবার সাইরেন বাজলো রাত্রে। আকাশে ঘন ঘন জঙ্গী বিমান ঘুরে বেড়ালো আর বোঝা গেল—ইংরেজ গুপ্তচররা ছেয়ে ফেলেছে। সম্ভবত কোন গোপন সূত্রে নেতাজীর সেখানে উপস্থিতির কথা জানতে পেরেছিল সেদিন। তাই আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট ও তাঁর সুপ্রীম কম্যাণ্ডারকে পাওয়ার জন্য ঐ মাউন্ট পোপার পার্বত্য গ্রামের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে এমন রাজকীয় আয়োজন নিয়েছিল সেদিন ব্রিটিশ।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের ব্যক্তিগত বীরত্ব, ত্যাগ ও দুঃসাহসিকতার অনেক কাহিনী নথিভুক্ত আছে। তার মধ্যে একটি মাত্র বর্ণনা করছি। কর্নেল ধীলন—'চার্জ অব দ্য ইম্মর্টালস'-এর যে রিপোর্ট নেতাজীর নিকট উপস্থিত করেছিলেন—তা অবিস্মরণীয়। তা থেকে জানা যায়ঃ "১৪২৩ ফিট উঁচু এক পাহাড়ের পেছন থেকে ব্রিটিশ বাহিনী কামানের সারী নিয়ে মূল আজাদ হিন্দ ফৌজের দিকে এগিয়ে আসছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আজাদ হিন্দের মাত্র ৯৮ জনের এক 'কম্পানী' সৈন্য নিয়ে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট গিয়ান সিং চলেছেন—মেসিনগান বা লাইট মেসিনগানও সঙ্গে নেই ঐ আর্টিলারীকে ঠেকাতে। পুরাতন মডেলের রাইফেল ছাড়া আছে মাত্র দুটো এ/টি. কে. মাইন। যে-কোন উপায়ে শত্রুর অগ্রগতি রোধ করাই ছিল আজাদী ইউনিটের ওপর নির্দেশ। দুদিন কিছু হলো না। হঠাৎ ১৯৪৫-এর ১৬ই মার্চ ভোর থেকেই বোমারু বিমান থেকে বোমা বর্ষণ ও মেসিনগানের গুলি বেলা ১১টা পর্যন্ত। কাজ সেরে বিমান অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিলার ওপার থেকে কামানের গোলা বর্ষণ শুরু হলো। আর তার কভারে ১৩টা ট্যাঙ্ক, ১১টা আর্মার্ডকার ও ১০টা ট্রাক। অনেক গোলা-বারুদ ছোঁড় হলো কিন্তু নির্ভীক যোদ্ধারা তাঁদের ট্রেঞ্চে অপেক্ষা করে রইলেন শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। লৌহ দানবেরা এগিয়ে এলো—সঙ্গে সঙ্গে দুটো মাইন ছুঁড়লেন আজাদী সৈনিকগণ। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তা ফাটলো না—

তবে ট্যাঙ্ক-আর্মার্ডকারগুলো থেমে গেল আর ঐগুলোকে পিলবক্স করে গড়ে তুললো। এদিকে এ ঘাঁটি থেকে ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে টেলি যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই। এ অবস্থায় নিশ্চিৎ মৃত্যু বুঝতে পেরে লেফটেন্যান্ট গিয়ান সিং আদেশ দিলেন—'চার্জ', আক্রমণ কর। এ সময় গিয়ান সিং রাইফেল নিয়ে চীৎকার করে উঠলেন—'নেতাজী-কি-জয়', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'চলো দিল্লী'। তাঁর কম্পানীর সকলেই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে শত্রুর গোলাবারুদের প্রচণ্ড শব্দের এইভাবে প্রত্যুত্তর দিতে দিতে ট্রাকগুলোকে চার্জ করলেন। পুরো দু-ঘণ্টা হাতাহাতি মরণযুদ্ধ চলেছিল। তাদের সংখ্যার অনেক বেশী শত্রুকে নিধন করে প্রাণ বিসর্জন দিলেন ৪০ জন বীর আজাদ হিন্দ সৈনিক। বিপর্যস্ত শত্রুপক্ষ পশ্চাদ-পসরণ করলো। গিয়ান সিং তাঁর থার্ড প্লেটুন কম্যাণ্ডার সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট রাম সিং-কে যখন চার্জ করার নির্দেশ দিতে গেলেন সেই মুহূর্তে শত্রুপক্ষের একটি বুলেট তাঁর মাথা ভেদ করে গেল—তিনি আদেশ দিতে আর উঠলেন না। গিয়ান সিং তাঁর অধীনস্থ সৈনিকদের বলতেন যে, তিনি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দান করবেন, সে শপথ রক্ষা করেছিলেন।" (অনুবাদ)—লেফটেন্যান্ট কর্নেল জি. এস, ধীলন ১৯৪৫ সালের ৯ই এপ্রিল তাঁর লিখিত রিপোর্ট নেতাজীর নিকট ৮০১ নং ইউনিট-এর কম্যাণ্ডারের স্বাক্ষরে উপস্থাপিত করেছিলেন।[৩০]*

'হিন্দুস্থান টাইমস'-এর স্পেশ্যাল সংবাদদাতা যুদ্ধ বিষয়ে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন—"All reports go to show that the morale of the I.N.A. men has been very high during the period of their detention.··· It was impossible for General Bhonsle to persuade them to surrender to the British forces when they came."

"আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকের নৈতিকতা অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের ছিল, বন্দী শিবিরে তারা কর্তৃপক্ষকে প্রচণ্ড সমস্যায় ফেলতো—তারা তাদের কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্নেল গুপ্ত ভিন্ন কারুর আদেশ মানতো না। তারা

---

[৩০] Kusum Nair : The Story of INA—Page 21

* To quote from another letter of Major Dhillon to Netaji on the same subject : "Their bravery is unparalleled in the history of war. Attacking of tanks and A.F.V.S may seem impossible but these heroes preferred to die fighting than to handup and show their backs."

আত্মসমর্পণের জন্য নেতাজীর নির্দেশেরও বাধাদান করতো। ৯ই আগস্ট জাপানের সারেণ্ডারের সংবাদে তারা চিৎকার করে শ্লোগান দিতে থাকেন—'জাপান আত্মসমর্পণ করেছে আমরা নই'।"[৩১]

জানা যায়, সিংহলের ক্যাণ্ডিতে সাউথ-ইস্ট এশিয়ার যুদ্ধ-বিভাগে একটি রাজনৈতিক দফতর খোলা হয়েছিল—যা সরাসরি লণ্ডন থেকে পরিচালিত হতো। এই দপ্তরের গোয়েন্দা বিভাগে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি ভারতীয় অফিসারের পরিচিতিসহ ফাইল রাখা ছিল। বিশেষত 'গান্ধী ব্রিগেড' ও 'সুভাষ ব্রিগেড'-এর অফিসাররা ইংরেজেরও মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এই দুই ব্রিগেড অকুতোভয়ে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত।……খবর এলো, ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে হাকা-ফালমের ৬ হাজার ফিট ওপরে আজাদ হিন্দ ফৌজ রীতিমত লড়াই চালাচ্ছে। তারপর খবর এলো তিদ্‌দিম, তামু, ক্যালাভ্যোনি ও ইম্ফলেও তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চলছে।… ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ কম্যাণ্ডের আক্রমণ কিন্তু এসময় তীব্রতর করা হলো। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে কয়েক ডিভিশন সৈন্য তারা সরিয়ে এনে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে নিয়োগ করলো। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে তারা কোহিমা, দিমাপুর, মইরান এবং কালেওয়া সেক্টরে পর্যুদস্ত হলো। সে সময়কার প্রখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক স্টুয়ার্ড গেল্ডার সেই সেক্টার থেকে রিপোর্ট পাঠালেন…"Bottles of scotch and beer-cans lay littered along with hundreds of bodies of Scottish Highlanders and US negros." স্টুয়ার্ড গেল্ডার ছিলেন অসমসাহসী সাংবাদিক। জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় তিনি লণ্ডন টাইমস-এর প্রতিনিধি ছিলেন।[৩২]

আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাজীর নির্দেশে অস্ত্র সম্বরণ করে এবং তাঁরই সুস্পষ্ট পরামর্শ অনুযায়ী ব্রিটিশ বাহিনী সিঙ্গাপুরীদের সঙ্গে তাঁকেও বন্দী করুক, এই সুদৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গভর্নমেন্টের মন্ত্রীমণ্ডলী ও সেনাপতিদের সঙ্গে নিজেও আত্মসমর্পণের জন্য যে সুদৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন—সারা রাত্রি ধরে অধিবেশনের পর অবশেষে ভবিষ্যতে পুনরায় সমরায়োজন-সংগ্রামের জন্য নেতাজীর বন্দী হওয়ার বিরুদ্ধে সকলের পুন পুন বাধাদান করার ফলে তিনি অন্যত্র চলে যান। তাহলে কি আজাদ

৩১। Kusum Nair—pp. 23-24

৩২। 'চন্দ্রবোস ফাইল' (নেতাজী ফাইল): শিবপ্রসাদ চৌধুরী, 'পরিবর্তন', ২৬ জানুয়ারী—পৃঃ ১৯

হিন্দ ফৌজের এত রক্তদান নেতাজীর স্বপ্ন সবই নিষ্ফল হয়েছে? ভারত ইতিহাসে আজাদ হিন্দের অবদান কি এবং নেতাজীর নির্দেশে তাদের যুদ্ধবন্দী হয়ে দিল্লীতে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে উপস্থিত হওয়া ও লালকেল্লায় বিচারই যে ব্রিটিশের ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রত্যক্ষ কারণ সে-কথা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য একখানি বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন। এখানে শুধু নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিচালনা অর্থাৎ তাঁর রণনীতি যে ভুল ছিল না বা পরাজয় তাঁর হয়নি, এ বিষয়ের ওপর কিছু আলোকপাত হওয়া দরকার।

জাপ সামরিক বিভাগ তার প্রতিশ্রুত সরবরাহ, বিশেষত বিমান এবং পরিবহণ ব্যবস্থা শেষের দিকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েও এবং কোন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ভুল সংবাদসহ আই. এন. এ. কম্যাণ্ডারদের এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে বাধাদান সত্ত্বেও জাপানী কম্যাণ্ডার মেজর ফুজিয়ারার মতামত—“সৈন্যবাহিনীর নেতা হিসেবে বোস আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনের আত্মিক শক্তির ভিত্তিমূল। তথাপি দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, যুদ্ধের কার্যকর-এর ক্ষেত্রে তাঁর মান নিম্নমানের। উদাহরণ স্বরূপ, আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ-ক্ষমতার গভীরতা সম্পর্কে পরিচিতি কম থাকা সত্ত্বেও তিনি সর্বদাই দাবী করতেন আই. এন. এ. কে স্বতন্ত্র ও চূড়ান্ত ‘রোল’ দেওয়া হোক।”

ইম্ফল অভিযানে তাঁদের পরাজয়ের পর জাপ-হাইকম্যাণ্ড বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—ইম্ফলে লেকের মাছ সহজেই জালে তাঁরা টেনে তুলবেন আশা করেছিলেন অথচ দেখা গেল মাছ নয়, বিরাট কুমীর তাঁদের সে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। যুদ্ধবিদ্যার মিলিটারী অফিসার কখনো নেতাজী ছিলেন না, ১৯৪১-৪২-এ জার্মানীতে তাঁর ৪৪ বছর বয়সে অতি সামান্য মিলিটারী-ড্রিল ও ফিল্ড ট্রেনিং গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পুরুষ পরম্পরায় যুদ্ধ বিশারদের জাতি, যাঁরা চীনা-রুশ শক্তিকে পর্যুদস্ত করার অভিজ্ঞতা পুষ্ট, যাঁরা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্য শক্তিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সাময়িকভাবে হলেও উৎখাত করেছিল, তাঁদের এ ‘অপারেশন্যাল ব্লাণ্ডার’ বা কার্যকর যুদ্ধ ব্যবস্থার প্রচণ্ড পরাভব ইম্ফলের যুদ্ধক্ষেত্রে হলো কেন? সে উত্তর খুবই সহজ—বিমান-রসদ, বর্ষা-ঝড় এবং আত্মতুষ্টি। তবে জয় অথবা পরাজয় যে কোন একটিই যুদ্ধের অবধারিত অংশ বিশেষ মাত্র। থারমোপাইলি, ওয়াটার্লু, পানিপথ, খানুয়া অথবা স্ট্যালিনগ্রাড অথবা পলাশী—এক একটি ঘটনামাত্র! না, জাপ কম্যাণ্ডার ফুজিয়ারার মতবাদ আদৌ নির্ভুল নয়। নেতাজী যুদ্ধ বিশারদ ছিলেন না একথা সত্য. কিন্তু তিনি মহা প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন।

এই জাতীয় পুরুষকার যে ক্ষেত্রেই আবির্ভূত হউন তাঁদের কর্মধারা সম্পূর্ণ ভুল হয় না।

বৃটিশ ভারতের আই. সি. এস. শ্রীদেবেশ দাস তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন—“রণনীতি শুধু যুদ্ধ কুশলতা নয়। কূটনীতির সুব্যবস্থাও তার অন্তর্গত। তাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মহাভারত, রোম্যান প্লুটারক ও বৃটিশ কূটনীতিকদের অনুসরণে শত্রুর শত্রুদের সঙ্গে সৌহার্দ্য করলেন। কৌটিল্যের নীতি অনুসারে ‘কণ্টকৌনব কণ্টকম’ ছিল নিঃসহায় ভারতীয়দের এক মাত্র পথ। প্রথমেই তিনি স্বাধীন ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্থাপন করলেন ··· নেতাজীর সমর কৌশলও ছিল অসাধারণ। সেই সমর কৌশলের ফলে অতর্কিতে তাঁর বাহিনী আটটি প্রবাহে এগিয়ে এসে ইম্ফলের মাত্র তিন মাইলের মধ্যে পৌঁছে যায়। আই. এন. এ-র তিনটি ডিভিসনের মধ্যে দুটির কোন যানবাহন ছিল না। তবু নেতাজীর ভরসা ছিল যে ইম্ফল হাতে এসে পড়লে মিত্র বাহিনীর অফুরন্ত সমর সম্ভার ‘চারচিল সাপ্লাই’ দখল করে তাঁর ফৌজ মাছের তেলে মাছ ভাজতে-ভাজতে আসামের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে। তাঁর দূরদৃষ্টি সফল হতে পারত। কারণ, সেই সময় ‘অ্যালায়েড ফোর্থ কোর’ সেনাদলের অবস্থা এই অতর্কিত আক্রমণে এত করুণ হয়ে উঠেছিল যে, সমতল আসাম থেকে খাদ্য ও সামরিক সরবরাহের পথ বন্ধ হয়। তাদের রেশন অর্ধেক করে দেওয়া হয় যাতে অন্তত পঁচিশ দিন তারা আই. এন. এ-কে আটকাতে পারে।···আই. এন. এ-র এয়ার আমব্রেলা ছিল না বলে ব্রিটিশ পক্ষ ইম্ফলের ভিতরেও আজাদ হিন্দ ফৌজের পিছন থেকে এরোপ্লেন যোগে দেড় কোটি রেশন, সাড়ে আট লাখ গ্যালন পেট্রল আর দেড় হাজার টন খচ্চরের খাদ্য নামিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় ‘অপারেশন থার্সডে’ এই সাংকেতিক নামের একটি গোপন অপারেশন সুদূর লুজাই অঞ্চলের একটি এরোড্রাম থেকেও প্লেনে-টানা টাগ ট্রান্সপোরটের সাহায্যে আই.এন.এ-র পিছনে নয় হাজার সৈন্য, আড়াই শো টন অস্ত্র-শস্ত্র, কামানের সম্ভার যার প্রতেকটির ওজন ছিল পাঁচশো পাউণ্ড, বুল ডোজার, এমকি খাল-নালা পার হবার জন্য বেইলি ব্রিজ নামিয়ে দেওয়া হয়।

“অবশেষে নেতাজীর বাহিনীকে পিছু হটতে হয় তাঁর রণ-কৌশলের শৌর্য-বীর্যের অভাবে নয়, শত্রুর সমর-সম্ভারের চাপে। বীরোচিত সত্যনিষ্ঠ ভাষায় তিনি সেকথা স্বীকার করে ১৯৪৪-এর ১৩ই আগস্ট ঘোষণা করেন যে, এই স্বাধীনতার অভিযান বড় বেশী দেরীতে শুরু হয়েছিল। দারুণ বর্ষা প্রবল প্রতি-

বন্ধক হয়েছিল। কিন্তু মাতৃভূমির স্বাধীনতা না হওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করতে কৃতসংকল্প। সেই সংকল্প তিনি পালন করতে পেরেছিলেন। তাঁর যুদ্ধবিজয় হয়েছিল সীমান্তের রণক্ষেত্রে নয়, দেশের মানসভূমিতে। আই. এন. এ. সেনা সমতল ভারতে সশস্ত্র হয়ে অবতীর্ণ হতে পারেনি, কিন্তু যুদ্ধে ধৃত আই. এন. এ. নেতাজীর দূরদর্শী ব্যবস্থার ফলে লালকেল্লার বিচারে যুদ্ধবন্দী ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের সকল সুরক্ষার অধিকারী বলে সাব্যস্ত হয়। অহিংস কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ মায় ভাবীকালের প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই সশস্ত্র সংগ্রামীদের সমর্থন করেন। এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ভাষণ ও বৃটিশ পার্লামেন্টের রেকর্ড থেকেই আইনসঙ্গত যুক্তি উদ্ধৃত করেন। নেতাজীর দূরদর্শী রণনীতির ফলেই এই জয় সম্ভব হয়। পরবর্তীকালে লালকেল্লার বিচার তখন সামরিকভাবে 'দিল্লী চলো' নয়, মানসিকভাবে সারাভারত অধিকার করে। তারই ফলশ্রুতি যুদ্ধোত্তর কালে, বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সামরিক, নৌবাহিনী ও পুলিশ বিদ্রোহ। অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ শক্তির স্তম্ভগুলোর ক্ষয়, দেশের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল।"৩৩

১৯৪৫-এর ১৩ই মে শাহনওয়াজ, ধীলন প্রভৃতি পেগুতে যুদ্ধ বন্দীর মর্যাদায় এবং শর্তাধীনে ব্রিটিশ যুদ্ধ বিভাগের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যান্য ইউনিটগুলো ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করে ও দিল্লীতে সকলকে নিয়ে আসা হয়।

৩৩। দেবেশ দাস : নেতাজীর রণনীতি শেষ পর্যন্ত জিতেছে : পরিবর্তন প্রজাতন্ত্র দিবস-সংখ্যা—পৃষ্ঠা ১৮

সপ্তম অধ্যায়

লালকেল্লার বিচার-মঞ্চে

১৯৪৫ সাল, আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনাপতির বিচার। আদালত-কক্ষ, ভারত ইতিহাসের পরম গর্ব—দিল্লীর লালকেল্লা। এই সুরম্য রাজপ্রাসাদ দুর্গে ঠিক ৮৮ বৎসর পূর্বে ১৮৫৮ সালের বিচার-মঞ্চের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। সেদিন বসেছিল এক কোর্ট মার্শাল বা মিলিটারী আদালত, বিশ্ব ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় বিচার-মঞ্চ এই রেড-ফোর্ট বা লালকেল্লার চত্বরে। লালকেল্লার গেরুয়া-লাল পাথরগুলো সেদিন ঠক ঠক করে কেঁপে উঠেছিল কিনা, কিংবা এই বিশাল দেড় মাইল পরিধির তিনশ বছরের মোগল মহিমার, কাশ্মীর-লাহোর গেট থেকে শুরু করে যমুনার তীর পর্যন্ত প্রতিটি মহলে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে চোখের জল ফোঁটায় ফোঁটায় কিংবা শ্রাবণের ধারায় গড়িয়ে পড়েছিল কিনা—তার সাক্ষী আজ আর কেউই নেই—শুধু ইংরেজ-ভারতীয় ঐতিহাসিকদের কিছু কিছু বর্ণিত কাহিনী ছাড়া। হ্যাঁ, সেদিনের সে দৃশ্য ছিল অতি করুণ, অতিবড় মর্মন্তুদ।

সেদিনের বিচার-মঞ্চের কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান, অভিযুক্ত ব্যক্তি আর কেউ নন, হিন্দুস্থানের শেষ স্বাধীন সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুরশাহ জাফর, আর অভিযোগকারী—ব্রিটিশ মিলিটারী বিভাগ। আদালত—ব্রিটিশ মিলিটারী আদালত। আর আজ ১৯৪৫-এর ৫ই নভেম্বর, ইতিহাসের ঐ একই পুনরাবৃত্তি। ব্রিটিশ-মিলিটারী আদালত, বিচারালয়—রেড-ফোর্ট, এবং অভিযুক্ত ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন গভর্নমেন্টের রাষ্ট্রপ্রধান ও আই.এন.এ-র সুপ্রীম কম্যাণ্ডার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 'আদর্শবাদ' বা ঐ আদর্শবাদের প্রতিভূ আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনানায়ক—শাহনওয়াজ, ধীলন, সাইগল। আর ভারতের বহু দূর-দূরান্তরের দুর্গে তখন বন্দী প্রায় পঁচিশ হাজার আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য। ৮৮ বছর আগের ও পরের অপরাধের চার্জ একই প্রকারের, প্রসিকিউটিং কাউনসেল অর্থাৎ অভিযোগকারীর প্রায় একই ভাব ও ভাষায় চার্জ উত্থাপন। সেদিনের আদালতে ব্রিটিশ-মিলিটারী প্রসিকিউটরের শেষ

বক্তব্যটি বড়ই চিত্তাকর্ষক—হিন্দুস্থানের সম্রাটের বিরুদ্ধে 'অপরাধী' হিসাবে বিচারের রায় দাবী করে তিনি সেদিন কোর্ট মার্শালকে বলছেন—

"এই বিচার-মঞ্চে আপনাদের স্থির করতে হবে, এই নিঃসঙ্গ বন্দী এখনো সিংহাসনচ্যুত একজন রাজার সম্মান পেতে পারেন কিনা অথবা ইতিহাসের এক বড় যুদ্ধাপরাধী। আপনাদের ঘোষণা করতে হবে, দুর্ভাগ্য এবং বার্ধক্য জর্জরিত তৈমুর রাজবংশের এই শেষ সম্রাট তাঁর পূর্বপুরুষের প্রাসাদ থেকে আজই চিরতরে বিদায় নেবেন, হয়তো-বা তাঁর জাতির দীর্ঘকালের দুর্দশা দুর্ভোগের জন্য তাঁকে উর্ধ্বে তুলে ধরা হবে! আর না হয় এই ঐশ্বর্যশালী—'হল অব অডিয়েন্স' বিচারের উচ্চ মহান বেদী থেকে আপনারা রায় ঘোষণার দ্বারা চরম জয়ে অভিষিক্ত হবেন—যা সমস্ত যুগের জন্য নথিভুক্ত হয়ে যাবে যে, রাজারা তাঁদের পাপের জন্য গুরুতর অপরাধী রূপে অধোগামী পরিগণিত হবেন এবং রাজবংশের দীর্ঘ গৌরব-কাহিনী একদিনেই মুছে ফেলা হবে।" এমন কি মিলিটারী অভিযোক্তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেদিন যে, ১৮৫৭-র ভারতীয়দের অভ্যুত্থান ছিল ক্ষমতা অধিকারের সংগ্রাম, যে সংগ্রাম—ধর্মে, রক্তের সম্পর্কে, দেহের রঙে, সামাজিক অভ্যাসে, অনুভূতিতে এবং প্রতিটি বিষয়ে সম্পর্কহীন বিদেশী শ্বেতাঙ্গ শক্তিকে তাদের স্বদেশ থেকে বিতাড়নের যুদ্ধ।"[১]

১৮৫৭-এর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সিপাহী যোদ্ধাগণ যাঁর নেতৃত্বে ও নামে যুদ্ধ করেছিলেন, যাঁর নামে পরিচালিত হয়েছিলেন—সেই শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রাজদ্রোহীতা, ইংরেজ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং লালকেল্লার মধ্যে ৪৯ জন ইংরেজকে হত্যার আদেশ দান-এর অপরাধের জন্য বিচারে অভিযোগ আনা হয়েছিল। মিলিটারী আদালত ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে সেদিন তাঁদের রায়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, দিল্লীর প্রাক্তন রাজা, বন্দী বাহাদুর শাহ্ সবকয়টি এবং প্রত্যেকটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত। তাঁকে সেই অতি বৃদ্ধ বয়সে রেঙ্গুনে নির্বাসন করা হয়েছিল এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আর আজ আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিদের লালকেল্লায় আর এক অবিস্মরণীয় বিচার। তাঁদের পক্ষে প্রধান আইনজ্ঞ ভুলাভাই দেশাই, সহকারী

১। Kusum Nair : The Story of INA : Introduction—
Yusuf Meherally. 4. 1. 1946

আইনজ্ঞ স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও ডঃ কৈলাস নাথ কাটজু। আর রেড-ফোর্টের বাইরে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ, জয়হিন্দ ধ্বনি এবং কোন কোন দিন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (ব্যারিস্টার) লালকেল্লার হাজতে তিন বন্দীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে চলেছেন। সুবিশাল এই উপমহাদেশ ভারতবর্ষ উত্তাল-উদ্দাম। এই কোর্ট মার্শাল বিশ্ব ইতিহাসের এক অনন্য ও অভূতপূর্ব ঘটনা। সমস্ত বিচারকমণ্ডলীর দৃষ্টির অগোচরে একটি নাম, শুধু একটি ছায়া এমনি পরিব্যাপ্ত হয়ে দিল্লীর বহুদূরে লণ্ডনের রাজপ্রাসাদ, ওয়েস্ট মিনিস্টার দপ্তর পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই বিচারকমণ্ডলী চিন্তাগ্রস্ত।

ব্রিটিশ-ভারতের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল অকিনলেকের নেতৃত্বে প্রস্তুত হলো কোর্ট মার্শাল পরিকল্পনা। বন্দী সৈনিকদের চার শ্রেণীতে ভাগ করা হল—হোয়াইট, গ্রে, ব্ল্যাক্ এবং ব্র্যাকেস্ট। সাময়িকভাবে যে সব ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্য আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছে এবং সুযোগ পাওয়া মাত্রেই আবার ফিরে আসতে চেয়েছে, তারা হোয়াইট। তাদের পূর্বের মাহিনা ও পদমর্যাদায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে। গ্রে-শ্রেণীভুক্ত যুদ্ধবন্দীদের কাগজপত্র দেখেই তাদের সৈন্যবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হবে, বকেয়া মাহিনা কিম্বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সমস্ত নাকচ করে দেওয়া হবে। আর যারা ব্ল্যাক, তারা স্বেচ্ছায় ইংরেজ রাজ-সম্রাটের পক্ষ ত্যাগ করে নেতাজীর নির্দেশে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, সেজন্য তাদের শাস্তি দীর্ঘ দিনের জন্য জেলে বন্দী-জীবন যাপন। আর চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত যাদের করা হলো, তারা ব্র্যাকেস্ট। তারা পূর্বের ইংরাজ সৈন্য বাহিনীর দায়িত্ব, বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় এবং ইংরাজ বন্দীদের উপর শাস্তি ও অত্যাচার এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী। তাদের শাস্তি ফাঁসি বা গুলি করে হত্যা। মিলিটারী আইনের সাধারণ নিয়মে আজাদ হিন্দের এসকল সৈনিকের বন্দী হওয়া মাত্র, ইম্ফল-মণিপুর কিম্বা কোহিমা, সিঙ্গাপুর যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যাই তাদের বিচারের একমাত্র রায় হওয়ার কথা। তা ছাড়া, সুযোগও সেদিন ছিল যথেষ্ট পরিমাণে ইংরাজ শাসকদলের হাতে। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত অতি কৌশলে ব্রিটিশ যুদ্ধ বিভাগ ভারতবাসীর কাছে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজীর যুদ্ধ, এমন কি এর অস্তিত্ব পর্যন্ত বেশী পরিমাণে গোপন রাখতে সমর্থ ছিল। কিন্তু 'বিচারের ভুলে' সেদিন তাদের হল পরিপূর্ণ পরাজয়।

মার্শাল অকিনলেকের পরিকল্পনা অনুযায়ী আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের স্থান নির্বাচিত হল দিল্লীর লালকেল্লা। কারণ, নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধধ্বনি ছিল 'দিল্লী চলো'—এ তারই সমুচিত প্রত্যুত্তর ; নেতাজীর আদর্শ ও ভারতীয় জাতীয়তার গর্বমূলে প্রচণ্ড বিদ্রূপ, চরম আঘাত। বিদ্রোহ, দলত্যাগ এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, এই সব অপরাধের জন্য যুদ্ধ বিভাগীয় নিয়মে যে শাস্তির ব্যবস্থা হবে, তার ভয়ঙ্কর ফলাফল শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী পঁচিশ হাজার সৈন্যের পরিবারবর্গকেই নয়, বিরাট ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পঁচিশ লক্ষ সৈনিক এবং সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে, তাদের নৈতিক বল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে। অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি করে হত্যা অপেক্ষা ভারতের রাজধানীতে তথা বিশ্বের সমস্ত কূটনীতিক, সাংবাদিক ও জনগণের সমক্ষে বিচার করে শাস্তিদান অধিকতর কার্যকরী হবে। তা ছাড়া সম্পূর্ণ বিচারের পর গুলি করে হত্যা, তা সে যত ঘৃণিতই হউক তথাপি তা 'আদালতের বিচার'। অতএব জনসাধারণের চক্ষে ইংরেজের ন্যায়নীতির পরাকাষ্ঠা কত, তা তুলে ধরা যাবে। ব্রিটিশ ন্যায়নীতির বিচার প্রহসনের সঙ্গে ভারতবাসীর ইতিপূর্বেই অবশ্য বহু পরিচয় হয়েছে—নির্দোষ ব্রাহ্মণ মহারাজ নন্দকুমারের বিচার ও ফাঁসী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। এখানে ইংরেজ ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডস-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, যাঁরা বোসকে ঘৃণা ও ভয় করতেন, তাঁরা প্রথমত আজাদ হিন্দের কীর্তিকাহিনী প্রচারে আদৌ উৎসাহী ছিলেন না। আর যাই হোক, কংগ্রেস নেতারা যেখানে শুধু জেলেই গিয়েছেন—বোস সেখানে প্রকৃত যুদ্ধ করেছেন এবং ভারত স্বাধীন করতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন ভারতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনাপতিদের কোর্ট মার্শাল করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিচার ব্যবস্থা সমর্থন করলেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, যে পর্যন্ত না তাঁরা উপলব্ধি করতে পারলেন যে, এই বিচার ইংরেজের প্রতি ভারতীয় জনগণের ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার করবে—ইংরেজের উপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে, দেশবাসীর বাহবা পাওয়া যাবে। আর যখন নেতাজী ১৮ই আগস্ট মৃত বলে ঘোষণাই হয়ে গিয়েছে, অতএব··· ।"[২]

২। The Last Years of British India : Page 92.

ভারতের যুদ্ধ বিভাগের সেক্রেটারী ফিলিপ ম্যাসন এই কোর্ট মার্শালের ব্রিটিশ সিদ্ধান্তের ইস্তাহার প্রস্তুত করেন। তিনি লিখেছেন—"আমি নিজেই এই ইস্তাহার ড্রাফট করি এবং প্রথমত এমন কি কংগ্রেসও এই ব্যবস্থাকে অতি তৃপ্ত মনে সমর্থন করেন।"৩ ভারত তখন সম্পূর্ণ শান্ত, কোন বিপ্লব আন্দোলনের সামান্য আবহাওয়া কোথাও দেখা যায় না। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের পরাজয়ে অনেকে আনন্দ উৎসব করেছেন। ইংরেজ শাসনের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতার কারণই বা কোথায়! 'বঙ্গভঙ্গ' কিংবা 'জালিয়ানওয়ালা বাগ'-এর মত কোন স্পর্শকাতর বিষয়ও নেই যা নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলনের আবহাওয়া সৃষ্টি করা যায়। হ্যাঁ—কার্য-কারণের ঐ ত জীবন্ত ছায়া আকাশ জুড়ে, ইংরেজ শাসকবর্গকে ভয় পাইয়ে দেওয়া যায়—নেহরু-প্যাটেলের সেদিনের পরিবর্তিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের দূরদৃষ্টি, কংগ্রেসকে—ভারতকে—গ্রেট ব্রিটেনকে ইতিহাসের নতুন ক্রসরোডে পৌঁছে দিল। আজাদ হিন্দ সৈনিকেরা হাজারে হাজারে দিল্লীতে যুদ্ধবন্দী হয়ে আসছেন। নেতাজীর শেষ নির্দেশ—"বীরের ন্যায় ভারতের জাতীয় সৈনিকের পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে যেভাবে হোক, যুদ্ধবন্দী হয়েও ভারতের মাটীতে পৌঁছে যাও, জয় আমাদের হবেই। ভারতের মাটিতে স্বদেশবাসীর সম্মুখে আজাদ হিন্দের বাণী মূর্ত হয়ে উঠবে—৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ শুনবে তোমাদের বিজয় গৌরবের কথা…।"

পণ্ডিত জওহরলাল ২০শে আগস্ট ঘোষণা করলেন…"It would be a very grave mistake leading to far reaching consequences if they were treated just as ordinary rebels. The punishment given them would in effect be a punishment on all India and all Indians, and deep wound be created in millions of hearts." "যদি ওদের সাধারণ বিদ্রোহীদের মত ব্যবহার করা হয় তাহলে খুব ভয়ঙ্কর ভুল করা হবে এবং তার ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী। ওদের ওপর শাস্তি, সমগ্র ভারত এবং সমস্ত ভারতবাসীর শাস্তি, আর কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে তা গভীর আঘাতস্বরূপ।" রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে I.N.A. (বিচারকে) কংগ্রেস দারুণভাবে কাজে লাগলো।*

৩। The Springing Tiger—Foreword : Philip Mason : IX

* "But as a political weapon the INA had been of the greatest use to the Congress of India." Subhas Chandra Bose, The Springing Tiger.

১৯৪৫-এর ২২শে সেপ্টেম্বর অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি গড়ে তুললেন INA Defence Committee—আসফ আলি, রঘুনন্দন সরণ, তেজবাহাদুর শপ্রু, ভুলাভাই দেশাই, কৈলাসনাথ কাটজু, ও নেহরুকে নিয়ে। আজাদ হিন্দ সৈন্য ও সেনাপতিদের পক্ষে ১৭ জন আইন বিশারদ। ভারতের বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিস্টার ভুলাভাই দেশাই গ্রহণ করলেন আইনজ্ঞদের নেতৃত্ব। তাঁর সঙ্গে ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু, স্যার তেজবাহাদুর শপ্রু আর তাঁদের জুনিয়র হিসেবে ব্যারিস্টারের পোশাকে ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার এন. পি. ইঞ্জিনিয়ার ও মেজর ওয়ারল্স। সাতজন যুদ্ধবিশারদ নিয়ে গড়ে ওঠে 'সমর আদালত'—এঁদের মধ্যে আছেন মেজর জেনারেল এ. বি. ব্ল্যাকল্যাণ্ড, ব্রিগেডিয়ার হার্ক, কর্নেল সি. আর. স্কট প্রভৃতি। সম্পূর্ণ সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে নির্দিষ্ট কূটনীতিক ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে শুরু হলো লালকেল্লার দুর্গচত্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ-অপরাধের বিচার। ইণ্ডিয়ান আর্মি অ্যাক্ট ৪১ ধারায় এবং ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১ এবং ৩০২ ও ১০৯ ধারা অনুযায়ী যথাক্রমে ধীলন, সাইগল এবং শাহনওয়াজের বিরুদ্ধে (১) মহামান্য ভারত সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ, (২) যুদ্ধে হত্যা এবং (৩) হত্যার সাহায্য—এর চার্জশীট দাখিল করলেন ভারত সরকারের এ্যাডভোকেট জেনারেল।

তাঁরা প্রথম সাক্ষী হাজির করলেন আই.এন.এ.-র প্রাক্তন সদস্য ডি. সি. নাগকে, যিনি আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের আইন রচনা করেছিলেন। তারপর ক্যাপ্টেন ধারগলকার, সুবেদার মেজর বাবুরাম, জমাদার আলতাফ রাজা এবং নায়েক সন্তোষ সিং, সকলে সাক্ষ্য দান করলেন। ৩০শে নভেম্বর আদালত মুলতুবী থাকল। ৬ই ডিসেম্বর ইংরেজ সেনাপতি লেফটেন্যান্ট কর্নেল জে. এ. কিটসন সাক্ষ্য দান করলেন। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, কর্নেল পি. কে সাইগল, কর্নেল জি. এস. ধীলন—এঁরা ইংলণ্ডের রাজার কমিশন প্রদত্ত ব্রিটিশ বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার, এঁদের রাজার পক্ষ ত্যাগ করে ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রধানতম শত্রু নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান ও যুদ্ধ—রাজদ্রোহের প্রচণ্ডতম অপরাধ। ইংরেজের পক্ষে মোট ৩০ জন ও আজাদ হিন্দের পক্ষে ১২ জন সাক্ষী ও ১২৫টি জিনিস (একজিবিট) উপস্থিত করা হলো আদালতে আর ৩৮৭ পৃষ্ঠার ঘন লাইনে ছাপানো প্রকাশিত রিপোর্ট।

ক্লড অকিনলেকের মিলিটারী আইনের বেড়াজাল ভেঙে দিতে উঠে দাঁড়ালেন শেষবারের মত মিস্টার ভূলাভাই দেশাই—১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫ সাল। আজাদ হিন্দের পক্ষে প্রধান কৌঁসুলি তাঁর ভাষণ দিলেন ক্রমাগত দশ ঘণ্টা, ১৮ই ডিসেম্বর শেষ হলো। তিনি এক ইংরেজ আইন বিশেষজ্ঞের ১৭৯৭ সালের একটি জটিল আইনের ধারা উদ্ধৃত করে বললেন, "যেখানে রাজশক্তি তার অধীনস্থ দুর্বল প্রজাদের রক্ষায় ব্যর্থ হয়, তখন সেই দুর্বল জাতি আপনাআপনিই স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। সিঙ্গাপুর পতনে মৃত্যু, অনাহার ও অচিকিৎসার মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীভুক্ত সহস্র সহস্র ভারতীয়কে ভেড়ার পালের মত ১৯৪২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের 'ফেরের পার্কে' যেদিন ব্রিটিশ সেনাপতি কর্নেল হাণ্ট জাপানী শত্রুসেনা বাহিনীর হাতে তুলে দিলেন, সেই মুহূর্তেই ইংরেজ রাজার প্রতি ভারতীয় অফিসার কিংবা সৈনিকদের সকল আনুগত্য শেষ হয়ে গেল। কোন ইংরেজ যদি ইংলণ্ডে তার শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখনই ইংরেজ রাজার প্রতি তার রাজদ্রোহ—যেমন আপনাদের পূর্বপুরুষেরা করেছিলেন রাজা প্রথম চার্লসের সময়; আপনাদের ম্যাগনাকার্টার ইতিহাসই বা-কি? মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রাম। দ্বিতীয় জেমসের ক্ষেত্রেই বা ইংলণ্ডের অধিবাসী আপনারা কি করেছিলেন? ঐ রাজবিদ্রোহীদের মাথায় শাসন-সভ্যতার, ইতিহাসের জয়ের মুকুট সেদিন পরিয়ে দিয়েছিলেন। আজাদ হিন্দের যুদ্ধবিদ্রোহ সে ত সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। গর্জন করে উঠলেন ভূলাভাই 'What is on trial before the court now is the right to wage war with immunity, on the part of a subject race for their liberation.'—পরাধীন জাতির স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ, এমন কি যুদ্ধ করার অধিকার—এই প্রশ্নেরই বিচার আজ বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত। ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩-এ আরজি হুকুমত-ই-আজাদ হিন্দ (অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্ট) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর নয়টি রাষ্ট্র তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের নিজস্ব মুদ্রা, আইন, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, পতাকা, নিজস্ব গেজেট, সর্বোপরি স্বেচ্ছায় যোগদানকারী ভারতীয় এবং ভারতীয় অফিসারগণের গঠিত সেনাবাহিনীর দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধ এবং সুদূর আন্দামান, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্ম, মালয় থেকে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমানা পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের অধিকার এ সমস্তই আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত।" আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের কি জটিল ব্যাখ্যা! কি অপূর্ব যুক্তিজাল রচনা! এ যেন নেতাজীর সেই ভাব ও

ভাষার প্রতিচ্ছায়া—"যে জাতির ভারতবর্ষ শাসন করার অধিকারকে আমি মনে-প্রাণে স্বীকার করি না।" ডিফেন্স-এর প্রথম সাক্ষী ছিলেন জাপান পররাষ্ট্র দপ্তরের মেজর সুবরো ওহতা। তিনি লালকেল্লার আদালতে নথিপত্র তুলে প্রমাণ করলেন কিভাবে ১৯৪৩-এর অক্টোবরে তাঁর গভর্নমেণ্ট আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টকে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাপানের পররাষ্ট্র বিভাগের উপমন্ত্রী মিস্টার মাতসুও মোতো তাঁর জবানবন্দীতে বললেন কিভাবে আই এন. এ. একটি স্বাধীন সৈন্যবাহিনীর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও মর্যাদায় যুদ্ধ করেছেন।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব আজাদ হিন্দের অন্যতম ডিরেক্টার মিস্টার দীননাথ, আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী মিস্টার এস. এ. আইয়ার, ক্যাপ্টেন আর. এস. আরসাদ, জাপানী জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর চীফ অফ স্টাফ মেজর জেনারেল কাতাকুরা এবং জাপানের বৈদেশিক উপমন্ত্রী মিঃ রেঞ্জুর সওদা, লেফেটেন্যাণ্ট কর্নেল মিঃ লোকনাথন, যমুনা খণ্ড হেডকোয়ার্টার্সের বৃটিশ অফিসার লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল মিঃ কে. কে. স্কোয়ার ও অন্যান্য বহু ব্যক্তির সাক্ষ্য দান এবং আজাদ হিন্দ সৈন্যদের ডায়েরী এবং আদালতে উপস্থিত ফাইলের পাতা খুলে মিস্টার ভুলাভাই প্রমাণ করলেন যে, সৈনিকদের রেশনে চাল, সামান্য তেল এবং অতি সামান্য পরিমাণ চিনি এই ছিল বরাদ্দ। ধীলন তাঁর স্বাক্ষ্যে বলেন—'Many a time I had to go without water for 20 to 30 hours and without food for two or three days. If as Brigade Commander I had to undergo these hardships, my men must have suffered much more and yet they accompanied me. No man who had joined under duress or coercion could have done so.'[৪] তাঁরা কখনও জাপানের ক্রীড়নক হতে পারেন না এবং নেতাজীর ভীতিপ্রদর্শনে আজাদ হিন্দে যোগদানের কথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। না—কিছুতেই না, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় স্বদেশের জন্য, মাতৃভূমির শৃঙ্খল মুক্তির জন্য মহানায়ক নেতাজীর আহ্বানে সর্বস্ব পণ করে আজাদ হিন্দ সৈন্যগণ ব্রিটেন-আমেরিকার যুক্তবাহিনী তথা তাদের মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন···।

বিচারকমণ্ডলীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে সংকেত করেন প্রধান কৌঁসুলি ।ভাই।

---

[৪] Kusum Nair : The Story of INA : Page 42

"অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন—এখানে আপনারা বিচারকের আসনে উপবিষ্ট, আপনারা রাজনীতিবিদ নন এবং আমি চাই আপনারা বিচারকের সম্মান রক্ষা করবেন—যদি আপনারা দেখতে পান একটি সুগঠিত সৈন্যবাহিনী তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে এবং যথানিয়মে গঠিত গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণে যুদ্ধ করার সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত অধিকার রাখে, তাহলে আপনাদের সুচিন্তিত বিচারের রায় নিশ্চয়ই এঁদের পক্ষে ঘোষণা করবেন—কমও নয়, তার চেয়ে বেশীও নয়, যা আপনাদের লোকেরা যুদ্ধে অন্যদের হত্যা করলে আপনারা গর্বের সঙ্গে করতেন, শুধু সেইটুকুই।"

পণ্ডিত জহরলাল এই বিচার প্রসঙ্গে পরে লিখেছেন—"The trial dramatized…… The old contest; England versus India. It became in reality not merely a question of law… but rather a trial of strength between the will of the Indian people and the will of those who held power in India…"৫

"এ বিচার-মঞ্চে সেই একই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিনয়—ইংল্যাণ্ড বনাম ভারত। শুধু আইনের প্রশ্ন এখানে নয়, ভারতবাসার ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে ভারতের শাসন-মঞ্চে রাজার অভিনয়ে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জবাসীর ইচ্ছাশক্তির লড়াই-এর প্রশ্ন—এক ক্ষুদ্র দেশের আর একটি বিশাল দেশ শাসনের অধিকারের প্রশ্ন।"৬

আজাদ হিন্দের বিচার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ভারতে অদক্ষ শাসন ব্যবস্থার সর্বশেষ নিদর্শন। ভারতের রাষ্ট্রজীবনে বাস্তব অবস্থায় অজ্ঞ চার্চিল মন্ত্রীসভার মতই ওয়েস্টমিনিস্টারের নতুন লেবার পার্টির মন্ত্রী পরিষদও ঠিক তেমনিই অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন দিল্লীর লালকেল্লায় এই বিচারের সম্মতি জানিয়ে। কোটী কোটী ভারতবাসী, যারা নেতাজী ও আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট এবং তাঁদের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে, ঝাঁসি রানী বাহিনী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, এই বিচার ব্যবস্থার আয়োজনে, প্রচারে, তাঁরা বিদ্যুৎচকিত হয়ে উঠলেন। ৫ই নভেম্বর থেকে ১৮ই ডিসেম্বর—৩রা জানুয়ারী—দিনে দিনে দিল্লীর লালকেল্লা শুধু নয়, দিল্লীনগর জনসমুদ্রে পরিণত হলো। দেশব্যাপী সেকি প্রচণ্ড আলোড়ন! অহিংসার পূজারী স্বয়ং গান্ধীজী যুদ্ধবন্দী আজাদ হিন্দের সেনাপতিদের সঙ্গে বারে বারে বন্দীশালায় দেখা করতে লাগলেন। মহান নেতাজীর নির্দেশ, পবিত্র রণ-নির্দেশ "দিল্লী চলো, চলো দিল্লী! যতদিন না ভারত এশিয়ার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শীর্ষভূমি ঐ দিল্লীর

৫। Kusum Nair : The Story of INA p. 42

৬। The Last Years of British India : Page 93

রাজপথে আমাদের ভারতের সৈন্যবাহিনী রণবাদ্য বাজাইয়া গর্ব ভরে মার্চ করিয়া যাইবে, প্রাচীন দিল্লীর ঐ লালকেল্লার প্রাসাদ শীর্ষে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা আমরা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইব, ততদিন আমাদের এই স্বাধীনতা যুদ্ধ থামিবে না।" শুধু ভারতবর্ষে নয়—এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার স্বাধীনতাকামী প্রতি মানুষের অন্তঃস্থলে গিয়ে পৌঁছায় সে বাণী, এই লালকেল্লার বিচারের বাণী—সরবে, বজ্র নির্ঘোষে। ইতিহাসের অদৃশ্য আদালতে সে দেওয়াল-লিখন বুঝে নিতে এতটুকুও ভুল হয়নি সেদিন ভারতে ব্রিটিশ প্রধান সেনাপতি ক্লড অকিনলেকের। শ্বেতাঙ্গ বিচারকমণ্ডলী লালকেল্লার মঞ্চে বসে মুক্তি যোদ্ধাদের ফাঁসীর হুকুম দিতে সাহস করলেন না, রায় দিলেন—'ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ খান, ক্যাপ্টেন সাইগল এবং লেফটেন্যান্ট ধীলন তিনজনই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে অপরাধী। তাঁদের বকেয়া মাহিনা, ভাতা সমস্ত বাজেয়াপ্ত ও তাঁদের আজীবন দ্বীপান্তর।'

প্রধান সেনাপতির সহি ছাড়া কোর্ট মার্শালের রায় কার্যকরী হয় না। বুদ্ধিমান প্রধান সেনাপতি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিলেন—দ্বীপান্তরের শাস্তি প্রত্যাহার করে নিয়ে। ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে এই রায় প্রত্যাহার একান্ত বিরল ঘটনা। বিদ্রোহী, বিপ্লবী সমর নায়কগণ ঐ একই দিনে ৩রা জানুয়ারী, ১৯৪৬, আসামীর কাঠগড়া থেকে, লালকেল্লার মঞ্চ থেকে রক্ততিলক, পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হয়ে ভারতের ইতিহাস মঞ্চে অবতরণ করলেন কোটি কণ্ঠে জয়হিন্দ, নেতাজী জিন্দাবাদ জয়ধ্বনির মধ্যে। প্রকৃতভাবে এখন থেকে ভারতের পরাধীনতার লৌহ শৃঙ্খল খসে খসে পড়তে থাকে, আজাদ হিন্দের বিচারের প্রতিক্রিয়া ইংরেজ রাজত্বের ভাগ্যাকাশে বয়ে আনে অশনি সংকেত। ভারতের রাজকীয় বিমান বাহিনী মহাবিদ্রোহের প্রস্তুতির পথে এগিয়ে চলে, কিন্তু প্রথম বিপ্লব ও প্রাণ বিসর্জনের গৌরব অর্জন করেন ভারতীয় নৌবাহিনীর ত্রিশ হাজার সেনানী। আরব সাগরে জাহাজের মধ্যে সমস্ত ইংরেজ নৌ-অফিসারদের বন্দী করেন ও অস্ত্রাগার হস্তগত করেন বোম্বাই বন্দরে। 'The Royal India Air Force imitating the RAF also became insubordinate and even went so far as to declare its sympathy with the INA. But again there was no violence. That was to be left to the Indian Navy.' ১৯৪৬-এর মার্চ মাস। তারপর কলকাতা, মাদ্রাজ, করাচীর নৌ-বিদ্রোহ ভয়াবহ আকার

ধারণ করে, প্রাণ দিতে হয় বহু ভারতীয় নৌ-সৈনিককে। শুধু তাই নয়, ভারতের সর্বত্র সাধারণ মানুষের মধ্যেও একই বিপ্লবী ভাবধারা। হিন্দু মহাসভা, শিখ সম্প্রদায়, মস্কো প্রত্যাগত বামপন্থী নেতৃবৃন্দ—সর্বস্তরে একই বিক্ষোভ, কে প্রথম ইংরেজ-বিরোধী বিপ্লব বিদ্রোহ শুরু করবেন! আজাদ হিন্দ সৈনিকদের তথা সুভাষচন্দ্রের পথ ও আদর্শই ভারতের আদর্শ। 'If Subhas and his men had been on the right side—and all India now confirmed that they were...'

ইংরেজ ঐতিহাসিক, সৈনিক-সাংবাদিক, মাইকেল এডওয়ার্ডসের মতে—"হ্যামলেটের পিতার ন্যায় সুভাষচন্দ্রের বিদেহী আত্মা লালকেল্লার সেই প্রাচীর গাত্রে বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ এমন বিশাল আকৃতি ধারণ করিল যে, ব্রিটিশ শাসকবর্গ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং তাহাই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে পৌঁছে দিল।"

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার চলার সময় ব্রিটিশ-ভারতীয় গভর্নমেন্টের সদর দপ্তর থেকে একজন উচ্চপদস্থ অফিসার দিল্লীর চেমসফোর্ড ক্লাবে ১৯৪৫-এর ১৫ই নভেম্বর সন্ধ্যায় (আদালত বসে ৫ই নভেম্বর) ভুলাভাই দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ অকিনলেক-কে এই হঠাৎ সাক্ষাৎকারের একটি বিবৃতি গোপনে পাঠান, তা অকিনলেকের জীবনীকার জন কোনেল লিপিবদ্ধ করেছেন।

তিনি উল্লেখ করেছিলেন—"তাঁদের প্রপাগাণ্ডার ক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার তাঁদের হাতে মোক্ষম অস্ত্রটি তুলে দিয়েছে এবং ওঁদের কাউকেই যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাহলে ভারতে আজ পর্যন্ত যত শহীদ আছে তাঁদের মধ্যে এঁরাই শ্রেষ্ঠতম শহীদরূপে পরিগণিত হবেন এবং তিনি বলেই চললেন, যে-ভাবে এখন ঘটনা-প্রবাহ চলেছে তা সশস্ত্র বিপ্লবে পরিণত হতে পারে। এই কথায় এক পক্ষ জিজ্ঞেস করলেন যে, অস্ত্রশস্ত্র কোথায় যে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটবে? তিনি উত্তর করলেন, লোক রয়েছে, যারা সব সময়ই আগ্রহী অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে।......এই আলোচনার সময় তিনি বললেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এবং তাঁদের কার্যাবলী (দেশকে) প্রমাণ করেছে যে, ভারতীয়েরা যুদ্ধে ট্রেনিং দিতে, যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারেন। কারণ, তাঁর মতে আই.এন.এ-র ৩০০ জন 'পার্সনেল' অতি অল্প সময়ে তাঁদের ১২০০ জন অফিসারকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করেছিলেন। আর ঐ ১২০০ জন

আবার ৬০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনীকে যুদ্ধশিক্ষায় প্রস্তুত করেছিলেন এবং তাঁরা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে কোহিমা অধিকার করতে প্রায় সমর্থ হয়েছিলেন।"[৭]

আজাদ হিন্দের বিচারের প্রতিক্রিয়া ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে সেই মুহূর্তেই কি ভীষণ অবস্থার সৃষ্টির করলো তার কতকগুলি নজির খুবই তাৎপর্যময়। ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স মিলিটারী হাইকম্যাণ্ডের হুকুম মেনে চলতে অস্বীকৃত হয়, এবং এমনকি, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি সমর্থন খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে—আর বম্বে-করাচীর নৌবহরে ভারতীয় নৌসেনাগণ এক বিরাট নৌবিদ্রোহ ঘোষণা করে, ইংরেজ নৌসেনা ও অফিসারদের বন্দী ও বিতাড়নের পর নৌবহর দখল করে নেন ও যুদ্ধ করেন। (পরবর্তী অধ্যায়ে নৌবিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে)। লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের প্রতিক্রিয়া ভারতের বিপ্লব-নগরী এবং ইংরেজ রাজশক্তি ও নেতাজীর আদর্শ সংঘাতের কেন্দ্র কলকাতার অবস্থা একান্ত চমৎকার এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট বিভীষিকা স্বরূপ।

২১শে নভেম্বর, ১৯৪৫, আই. এন. এ. বন্দীদের মুক্তির দাবীতে কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীটে, ডালহৌসি স্কোয়ারে যাবার পথে ছাত্র মিছিলের ওপর গুলি বর্ষিত হয়। গুলিতে নিহত হন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। মিছিল তবু ছত্রভঙ্গ হলো না সেদিন। পরদিন সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালে কলকাতার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাকার সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির লাল পতাকা উড়তে থাকে মানুষের হাতে। রামেশ্বরের হত্যা সম্পর্কিত ঐ দিনের ঘটনার প্রতিফলন দেখা যায় মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' উপন্যাসে ও কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায়।*

"১৯৪৫-এর ১লা ডিসেম্বর ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার ক্লড অকিনলেক লেখেন, 'সামনের বসন্তকালে ভারতে সংগঠিত বিপ্লবের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে···যে গণবিদ্রোহ হতে পারে তা ১৯৪২ সালের চাইতে ব্যাপকতর হবে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলাদেশে'।" ১৯৪৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী লালকেল্লাতে শুরু হলো আই. এন. এ.-র ক্যাপ্টেন রশিদ আলির বিচার। খবর শোনা মাত্র ছাত্ররা ধর্মঘট ডাকলেন কলকাতায় এবং

৭। Auchinleck—By John Connell : pp. 802-803

* 'মুক্তির সংগ্রামে ভারত', পৃঃ ১৮০, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার।

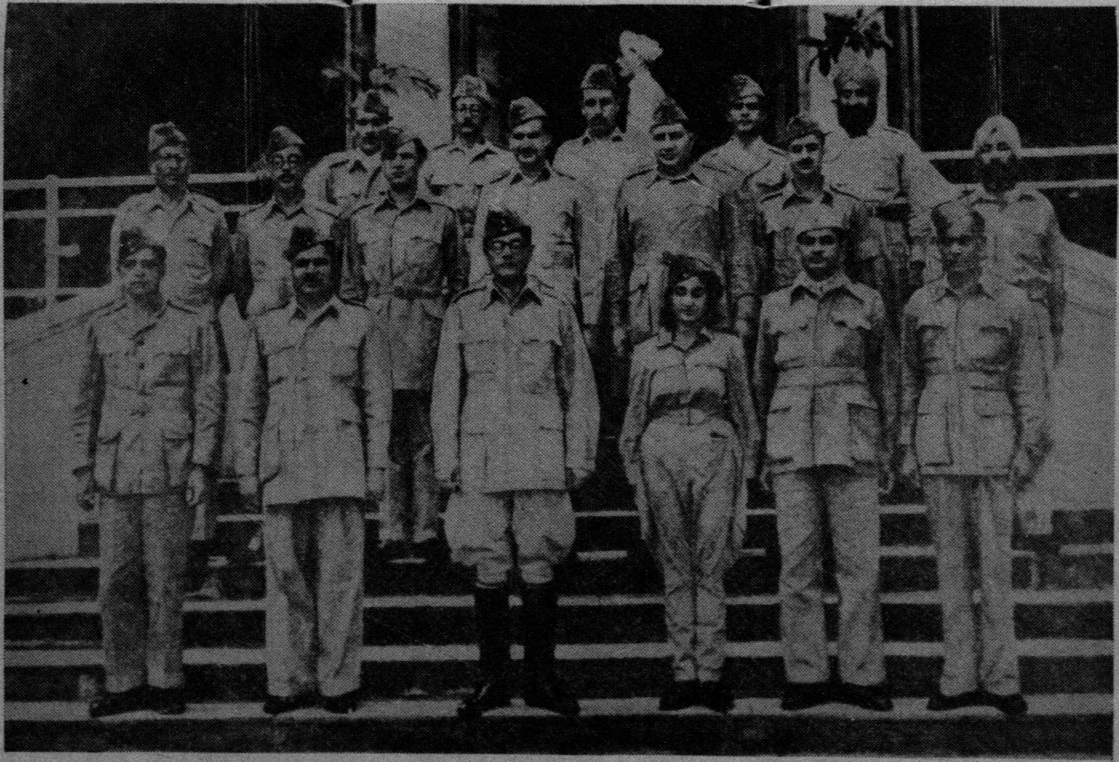

আজাদ হিন্দ সরকারের (প্রভিশন্যাল গভর্ণমেণ্ট অব ফ্রি ইণ্ডিয়া) মন্ত্রীপরিষদ ও উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে নেতাজী (সিঙ্গাপুর ঃ ১৯৪৩-৪৪)

সৈন্যবাহিনী পরিদর্শণরত
আজাদ হিন্দ ফৌজের
সর্বাধিনায়ক নেতাজী

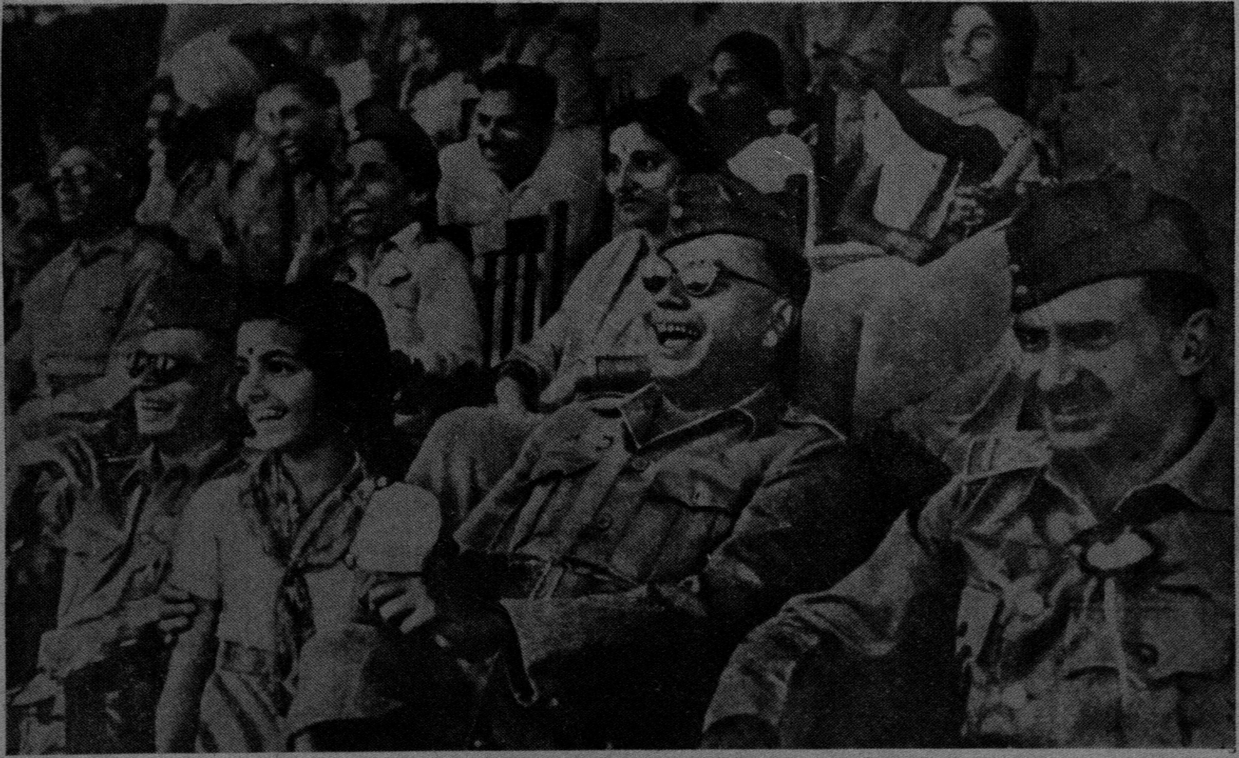

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যায়ামক্রীড়া উপভোগরত হাস্যমুখর নেতাজী ঃ তাঁর বামে মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানী

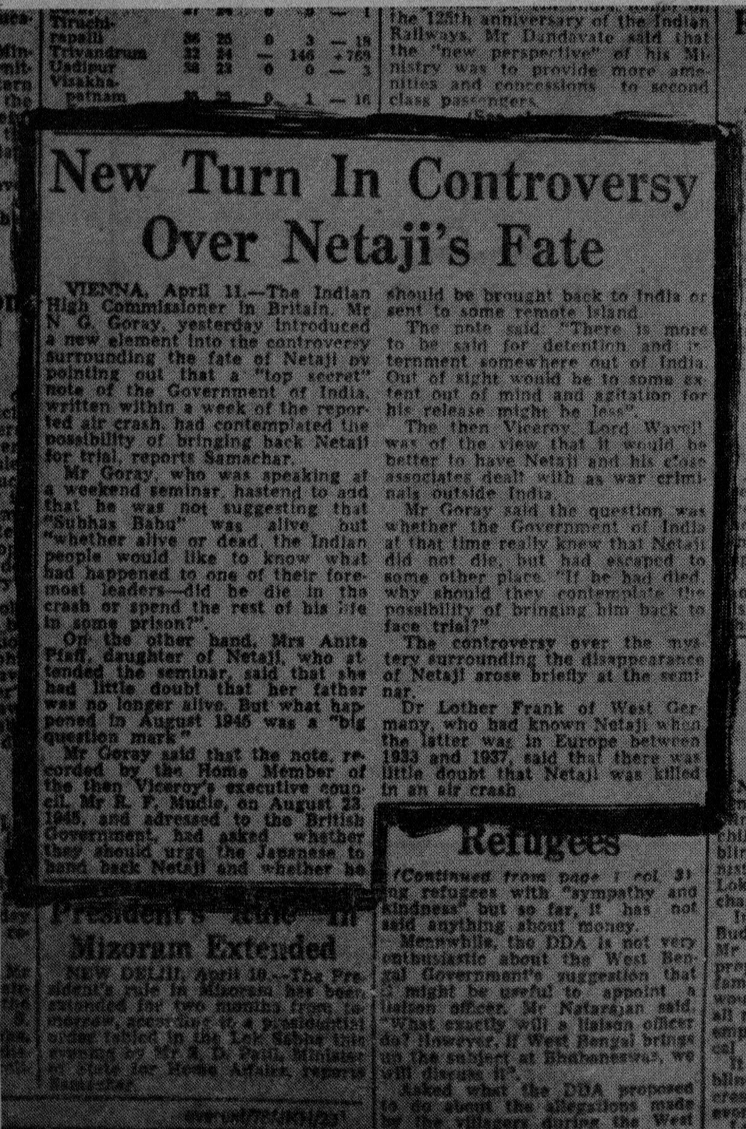

New Turn In Controversy Over Netaji's Fate

VIENNA, April 11.—The Indian High Commissioner in Britain, Mr N G Goray, yesterday introduced a new element into the controversy surrounding the fate of Netaji by pointing out that a "top secret" note of the Government of India, written within a week of the reported air crash, had contemplated the possibility of bringing back Netaji for trial, reports Samachar.

Mr Goray, who was speaking at a weekend seminar, hastend to add that he was not suggesting that "Subhas Babu" was alive but "whether alive or dead, the Indian people would like to know what had happened to one of their foremost leaders—did he die in the crash or spend the rest of his life in some prison?".

On the other hand, Mrs Anita Pfaff, daughter of Netaji, who attended the seminar, said that she had little doubt that her father was no longer alive. But what happened in August 1945 was a "big question mark".

Mr Goray said that the note, recorded by the Home Member of the then Viceroy's executive council, Mr R. F. Mudie, on August 23, 1945, and adressed to the British Government, had asked whether they should urge the Japanese to hand back Netaji and whether he should be brought back to India or sent to some remote island.

The note said: "There is more to be said for detention and internment somewhere out of India. Out of sight would be to some extent out of mind and agitation for his release might be less".

The then Viceroy, Lord Wavell, was of the view that it would be better to have Netaji and his close associates dealt with as war criminals outside India.

Mr Goray said the question was whether the Government of India at that time really knew that Netaji did not die, but had escaped to some other place. "If he had died, why should they contemplate the possibility of bringing him back to face trial?"

The controversy over the mystery surrounding the disappearance of Netaji arose briefly at the seminar.

Dr Lother Frank of West Germany, who had known Netaji when the latter was in Europe between 1933 and 1937, said that there was little doubt that Netaji was killed in an air crash.

বিমান দুর্ঘটনায় নিহত অথবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে বিদেশের কারাগারে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বন্দী থাকার সংশয়—১৯৭৮ সালে স্টেটসম্যানে প্রকাশিত সংবাদের ফটোকপি (১২ই এপ্রিল ১৯৭৮)

হাজারে হাজারে লোক আগুয়ান হলো ডালহৌসির নিষিদ্ধ অঞ্চলে। পুলিশবাহিনী শুরু করল নৃশংস লাঠি চালনা। ১১ই, ১২ই দুদিন ধরে চলে কলকাতার শহরতলীতে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অভিযান। ট্রাম-বাস, যান চলাচল সমস্ত বন্ধ, বিক্ষুব্ধ জনতা জ্বালিয়ে দিল মিলিটারী গাড়ী। পুলিশ ও মিলিটারীর সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান ছাত্র ও বস্তির নওজওয়ানদের সংগ্রামে শহীদ হলেন ১২ জন। সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল কম্যুনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলি। ১২ই ফেব্রুয়ারী ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিপুল সমাবেশের মিছিল সোহ্‌রাওয়ার্দী ও গান্ধীবাদী নেতা সতীশ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে ডালহৌসি স্কোয়ারের নিষিদ্ধ অঞ্চল পেরিয়ে এগিয়ে গেল। পুলিশ কমিশনার গোপন রিপোর্ট লিখলেন, "এ বিক্ষোভে সবচেয়ে বিপজ্জনক সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি।...এদের লক্ষ্য সশস্ত্র বিপ্লব।"

আই. এন. এ. বন্দী মুক্তির দাবীতে দেশের মানুষ, বিশেষ করে কলকাতার ছাত্রসমাজ যে প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে জ্বলে উঠেছিলেন সেদিন তা প্রকাশ পেয়েছিল সুকান্তের কবিতায়—

"বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে
আমি যাই তারই দিন পঞ্জিকা লিখে।"**

পুলিশ বিভাগের এই বিষয়ের ফাইল পর্যালোচনা করলে তার এক সুস্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। সেই ফাইলের প্রয়োজনীয় কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো—

Home Department File No. 21/16/45—Poll (1) Subject: Disturbance in Nov., 1945 in connection with the Indian National Army trials.[৮] (2) Situation in Calcutta. SECRET

1. SITUATION IN CALCUTTA

(Received by telephone from CIO. Calcutta on 23.11.45 morning)

"......The normal life of the city is at a standstill...and public meetings in favour of the Indian National Army."

** 'মুক্তির সংগ্রামে ভারত', পৃঃ ১৮২, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার।

৮। Bose Brothers and the Indian Struggle—Amiya Nath Bose

১। কলকাতার অবস্থা

"শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ। হাওড়ায় কতিপয় জুটমিল থেকে কর্মচারীরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে এসেছে এবং কুলিরা ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল লাইনের ওপর বসে পড়েছে। জানা যায়নি কোন ট্রেন আটক করা হয়েছে কিনা। বিক্ষোভ প্রদর্শনে ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছে এবং তরুণদের মধ্যে আইন অমান্যতার দৃঢ় মনোভাব সাধারণভাবেই লক্ষ্য করা গেছে। কিছু মুসলিম ছাত্র এই বিক্ষোভে যোগদান করেছে এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে সার্বিকভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করানোর চেষ্টা হচ্ছে। শ্রমিকদের এক বিরাট অংশের সমর্থনপুষ্ট কম্যুনিস্টরা এই বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগদান করেছে। সি.আই.ও-র রিপোর্ট এই যে, এই সমস্ত আলোড়নের প্রত্যক্ষ কারণ জাতীয় সৈন্যবাহিনীর (আজাদ হিন্দ ফৌজ) পক্ষে সংবাদপত্রে ও জনসভায় অবাধ প্রচার।"

2. POLICE

"Police morale by Friday morning was giving genuine concern. ··· The next outbreak will find little police forces available.

This is not an exaggeration."

২। পুলিশ

"শুক্রবার সকালের মধ্যেই পুলিশ লাইনে তাদের নৈতিক-শক্তির অবনতিতে যথার্থ দুর্ভাবনার কারণ দেখা গেছে। ইন্সপেকটররা নালিশ করেছেন, গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে কড়া নির্দেশের অভাব রয়েছে, এমন কি পুলিশ সার্জেন্টরা বাইরে না বেরুনোর বিভিন্ন অজুহাত দেখাচ্ছেন। এ জন্য নয় যে, তাঁরা কাজ গুটিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু এইজন্য যে, বিক্ষোভ দমন করতে গিয়ে তাঁরা বাদামীদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে জনতার কাছে আত্মরক্ষা করবে এবং 'স্যালীমাসী'র অভিনয় করে যাবেন আর গভর্নমেন্টের হুকুমের অভাবে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পারবেন না। একজন ইন্সপেকটর-ড় বললেন যে, জনতাকে ঠেকাবার নির্দেশ দেওয়া হলো এবং সেই সঙ্গে বলা হলো যদি জনতা তাদের দিকে তেড়ে আসে তাহলে তাঁরা সরে আসবেন এবং আরো পিছিয়ে এসে 'কর্ডন' গড়বেন। যদি ওপর মহল থেকে পুলিশকে সাহায্য না করা হয়, তাহলে পরের বিক্ষোভে আর পুলিশ ফোর্স পাওয়াই যাবে না। এটা কোন অত্যুক্তি নয়।"

3. CIVILIAN

"The effect of Govt.'s attitude during the recent troubles on the European···and the country will be plunged into orgy of lawlessness and bloodshed."

৩। অসামরিক

"বর্তমান গোলযোগে, ইউরোপীয় ও অনুগত ভারতীয় জনসাধারণের ওপর গভর্নমেন্টের মনোভাবের প্রতিক্রিয়া ২৮শে নভেম্বর স্টেটসম্যান পত্রিকার একটি চিঠিতে প্রতিফলিত হয়েছে। আদৌ সন্দেহ নেই যে, ইউরোপীয় সমাজে এক বিরাট উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে। ক্রমে এই মনোভাব বেড়ে উঠেছে যে, ভারতে বর্তমান গভর্নমেন্ট শিথিল হয়ে পড়ছে এবং এই মুহূর্তে যদি দৃঢ় কর্তৃত্ব আরোপ করার ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে এমন অবস্থার উদ্ভব হবে যাতে করে গভর্নমেন্টের আদৌ কোনরকম শাসন কর্তৃত্ব আর থাকবে না এবং সমগ্র দেশ উচ্ছৃঙ্খলতা ও রক্তপাতজনিত ভৈরবী চক্রে নিক্ষিপ্ত হবে।"

MOTIVE BEHIND THE DISTURBANCES

"1. The demonstrations began in support of the INA. Throughout they were of a political nature and were markedly anti-police, anti-European and anti-Government. Although the rapidity with which the disturbances spread and the demonstrators were organised indicate some form of preparation, their very spontaneity is undoubtedly symptomatic of the general feeling amongst all but a small section of the Indian public of whatever class. The temper of the mobs were highly dangerous and the whole disturbance was worse than in 1942. The implications of this are considerable."

"2. Seen in retrospect, the result of these three days of agitation, especially as it was not sponsored by Congress, bodes ill for the future. The ordinary forces of Law and Order were very nearly overwhelmed by the magnitude of their task. There are indications that many Indians, who ordinarily do not engage in politics and many of those who have relations in the Indian Army have been captivated by the glamour and ideals of the INA slogans such as 'Jai Hind' and 'Azad Hind' are now being introduced for greetings between individuals both in letters and in speech. It is an almost universal

opinion, even among Indian members of the public that the whole handling of the INA Trials, and indeed the very decision to hold public trials in India, is a mistake on the part of the Government. Since propaganda concerning them has been unbridled and allowed to go unchecked by Government, the effect has been seriously to influence persons who otherwise might have kept out of politics and political trouble and the Indian Independence Movement as a whole and feeling against Government, have received considerable impetus as a result.

"3. There is a general feeling of pessimism in European circles as to the future and this feeling is not confined to non-officials. Doubts have been expressed that the loyalty of the Indian Army, if called upon to quell disturbances as they may have to be, may have been affected by this insidious INA propaganda. This feeling of pessimism is engendered to a large extent by the opinion—shared alike by many loyal Indian and most Europeans—that HM Government and the Government of India do not know their own minds as to how they will deal with the immediate future of the Indian political problem. They feel matters are just drifting for the worse."

ভবিষ্যতে কি হবে তা নিয়ে ইউরোপীয়ান মহলে সকলের মধ্যে হতাশাবোধ এবং এই বোধ শুধু বেসরকারী ইউরোপীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সংশয় ছড়িয়ে পড়েছে যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে যদি বিক্ষোভ দমনের জন্য ডাক দেওয়া হয় তবে তা এই বিভ্রান্তকারী আই. এন. এ. প্রপাগাণ্ডার দ্বারা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য নষ্ট হতে পারে। এই হতাশা বহু অনুগত ভারতীয় এবং বেশীর ভাগ ইউরোপীয়ানদের মধ্যে আরো বেশীমাত্রায় উপ্ত হয়েছে; তার কারণ ব্রিটিশ রাজতন্ত্র এবং ভারত সরকার (ব্রিটিশ) যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাকে কিভাবে পরিচালনা করবেন, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ। তাঁদের ধারণা ঘটনা প্রবাহ মন্দ থেকে মন্দতরের দিকে ভেসে চলেছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মনোভাব কিরূপ সৃষ্টি হয়েছিল প্রধান সেনাপতি জেনারেল অকিনলেক বড়লাটকে ১৯৪৫-এর ২৬শে নভেম্বর একখানি চিঠি লেখেন—

"I know from my long experience of Indian troops how hard it is even for the best···that there is a growing feeling of sympathy for the INA"[১]

"ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি জানি যে, একজন দক্ষ এবং অত্যন্ত দরদী ব্রিটিশ অফিসারের পক্ষেও কত কঠিন, ভারতীয় সৈন্যের মনের ভাব মাপা এবং ইতিহাসও আমার এই অভিজ্ঞতা সমর্থন করে। আমি মনে করি না আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি ভারতীয় সৈন্যদের প্রকৃত মনোভাব কোন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ অফিসার আজ আন্দাজ করতে পারবেন। আমি নিজে প্রধানত আমার সহজাত অনুভূতি এবং এছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে যে তথ্য পেয়েছি তা থেকে বুঝতে পারি যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি ভারতীয় সৈন্যগণের সহানুভূতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে।"

লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজ বিচার-প্রবাহ সাইক্লোনের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার উপর সহস্র ফণা বিস্তার করে আছড়ে পড়লো। অসামরিক জনসাধারণ, পুলিশ, ছাত্র, যুবক ও শ্রমিক শুধু নয়, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িকতা ভুলে গেলেন ভারতবাসী। কম্যুনিস্ট পার্টি, যাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইঙ্গ-রুশ-মার্কিনী-মিত্রশক্তির যুদ্ধকে জার্মানীর বিরুদ্ধে 'জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই সুবাদে জার্মানী-জাপান-ইটালী মিত্রশক্তির সহয়তা গ্রহণ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজের মতো অত্যন্ত অন্যায় নিন্দাবাদ করেছিলেন, তাঁরাও আজাদ হিন্দের কোর্ট মার্শালের সময় এক হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভে যোগদান করলেন। অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি হলো আসমুদ্র হিমাচলে আর বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও রক্ষার যে মূল শক্তি-মেরুদণ্ড ভারতীয় জওয়ানদের দিয়ে গড়া— তার ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ইংরেজের প্রতি তাদের আনুগত্য নিঃশেষ হয়ে গেল।

নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজকে যুদ্ধক্ষেত্রে যে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন এবং সুমহান সত্যদ্রষ্টা ঋষির দৃষ্টিতে, অঙ্গীকারের ভঙ্গীতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; বেতার ভাষণে বারে বারে ভারতবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন—ভারতের মাটিতে ভারতবাসীর মধ্যে যে কোন-ভাবে এমন কি বন্দী হয়েও আজাদী সেনারা উপস্থিত হওয়া মাত্র আগ্নেয়-

---

[১] Bose Brothers and the Indian Struggle—Amiya Nath Bose

গিরির মহাবিপ্লব সৃষ্টি হবে এবং ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ লুপ্ত হবে। তাঁর প্রতিটি শব্দ, পদ ও বাক্য আশ্চর্য মহিমায় ও সত্যে রূপায়ণের ক্ষণ এগিয়ে আসে—এখন শুধু একটি স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন মাত্র। যুদ্ধোত্তর ভারত বিপ্লবের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত—সৈন্যবাহিনী, জনসাধারণ, পুলিশ, ছাত্র প্রস্তুত। বিদেশী সৈন্য-সেনাপতি-শাসকমণ্ডলীর তখন হৃৎকম্প, এত সুখের সাম্রাজ্য সসম্মানে পরিত্যাগ করে শুধু প্রাণ-মানসহ আপন দ্বীপপুঞ্জ রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা! কিন্তু সে বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করবার, নেতৃত্ব দেবার পৌরুষ গান্ধীজির নিকট কে আশা করবে? আর পণ্ডিত জওহরলাল! তিনি যে আপোষধর্মী, শান্তিকামী ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর স্থায়ী পদে অভিষেকের জন্য দার্শনিকতায় বিভোর! মহম্মদ আলি জিন্না, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং ব্রিটিশ কূটনীতি কি বিচিত্র সহ-অস্তিত্বে স্ব-স্ব স্বার্থের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে চলেছেন—শুধু একটি ভয়, একটি মাত্র আতঙ্ক—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাবের দুঃস্বপ্ন। ভারত ভাগ আর ক্ষমতাপ্রাপ্তির দিকে তাঁদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে একান্ত হিসেবি পদক্ষেপে।

অষ্টম অধ্যায়

নৌবিদ্রোহে

১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী—রয়্যাল-ইণ্ডিয়ান নেভীর মিউটিনি অর্থাৎ ব্রিটিশ নৌবহরের ভারতীয় রেটিংস (নৌ-সেনারা) এক অতি দুঃসাহসিক বিপ্লব করেছিলেন—এই বিদ্রোহই ভারতে ইংরেজ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধ, ভারত ইতিহাসে শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গ এবং তাঁর দুঃসাহসী আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপ এই বীর নৌ-সেনাদের প্রেরণার প্রত্যক্ষ উৎস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ১৯৪৫-এ ইংরেজ-মিত্রশক্তির জয় হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল শাখা নৌবহরের এ-বিদ্রোহ বিস্ময়কর শুধু নয়, যাদের সকলেরই বয়স ১৮ ও ২৫-এর মধ্যে এবং বয় নেভীর ক্যাডেটদের ১৫, সেই নৌযুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত রেটিংদের সশস্ত্র বিপ্লব এবং যুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস—সে কথা আজও সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়নি বা বলতে দেওয়া হয়নি। বীরত্বের অবমাননা, সত্যের সে কণ্ঠরোধ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কতভাবেই না আমরা ঘটতে দেখেছি, কিন্তু সে কৃষ্ণ যবনিকার উত্তোলনের কাল সমাগত!

বোম্বাই, করাচী, কোচিন, মাদ্রাজ, কলকাতাসহ প্রায় সব নৌঘাঁটির বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিরিশ হাজার (একমাত্র বোম্বাইতে কুড়ি হাজার)। ব্রিটিশ-ভারতীয় নৌবহরের প্রায় সত্তর-আশিটি যুদ্ধ জাহাজ অংশ গ্রহণ করেছিল এ-বিদ্রোহে। শুধু বোম্বাই-করাচী নৌ-বন্দরেই নয়, মাঝ সমুদ্রে যুদ্ধ-জাহাজগুলোতে সমস্ত ইংরেজ নৌ-সেনা ও অফিসারদের নিরস্ত্র করে, বন্দী অথবা বিতাড়িত করেছিলেন বিদ্রোহীগণ। রয়্যাল-ইণ্ডিয়ান নেভী সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল নেভী' বা ভারতীয় জাতীয় নৌবহরে রূপান্তরিত করেছিলেন তাঁরা। 'রয়্যাল-ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্স' বা ব্রিটিশ-ভারতীয় বিমান বাহিনীর অফিসারগণ এঁদের সমর্থনে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, আংশিক বিদ্রোহও করেছিলেন। বোম্বাইয়ের শ্রমিক, ছাত্র,

পুলিশ এবং জনসাধারণসহ বহু স্থল-সৈন্য বিদ্রোহী নৌ-সৈন্যদের পক্ষে ধর্মঘট করেছিলেন। এমনকি, ইংরেজ রাজ-শাসনের অতি বিশ্বস্ত গুর্খা, বালুচ, পাঞ্জাব ও গাড়োয়াল রেজিমেণ্টের সৈন্য বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের ওপর গুলি চালাবার আদেশ অমান্য করেছিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী এবং তাদের ট্যাঙ্ক ও মেশিনগান-এর বিরুদ্ধে সেদিন বিশেষ করে ছাত্র ও শ্রমিক জনসাধারণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছিলেন বোম্বাইয়ের পথে পথে। ভারতীয়দের তুলনায় এই যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যগণের মৃত্যু, বন্দীত্ব ও আহতের সংখ্যা ছিল দ্বিগুণের কিছু বেশী, কিন্তু করাচীতে দুঃসাহসিক ভারতীয় নৌ-সেনারা বেশীর ভাগই প্রাণবিসর্জন দিয়েছিলেন এক রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ সম্মুখ যুদ্ধের পর।

এই নৌ-বিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য—বিপ্লবীরা ব্রিটিশ নৌবহর অধিকার করে ভারতের জাতীয় নেতাদের হাতে তা সমর্পণ করে তাঁদের নির্দেশেই চলতে চেয়েছিলেন। অথচ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই নেতাগণ কেউই এগিয়ে আসেননি—জয় যখন হাতের মুঠোর মধ্যে। তখন তাঁরা উপদেশ দিলেন এবং ঘোষণায় বললেন শান্ত হতে, অহিংস থাকতে এবং ইংরেজ নৌ-কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করতে। পঞ্চাশের উর্ধ্বে বর্তমানে জীবিত সকল নৌ-বিপ্লবীদেরই বক্তব্য—জাতীয় নেতৃবৃন্দের ঐ কাজ পরিপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা এবং জাতীয় পাপ। ইতিহাসও এই মতবাদ সমর্থন না করে পারে না।

চীনের উপকূল, প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপপুঞ্জ ও বহুরাষ্ট্র—পার্লহারবার থেকে ভারতের দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন শাসন লোপ পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ১৯৪৫-এর আগস্টে আমেরিকা যখন সভ্যতার বিভীষিকা 'এ্যাটম বোম্ব' বিস্ফোরণ করলো এবং জাপানের পতন হলো, তখন ব্রিটিশ অধিকার পুনরুদ্ধার করতে রীয়ার এ্যাডমীরাল মাউণ্টব্যাটেনের নেতৃত্বে 'কম্বাইণ্ড অপারেশনের' ব্যবস্থা হয়। এই কাজে বোম্বাই থেকে নৌ-যুদ্ধের বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত রেটিংদের নিয়ে আর. আই. এন. অর্থাৎ 'রয়্যাল-ইণ্ডিয়ান নেভী' পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—বালি, মালয়, জাভা, বোর্নিও, শ্যাম, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি এলাকায় যায় এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের শত শত সৈনিক ও অফিসারদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ এবং আত্মত্যাগের কাহিনীর সঙ্গে নৌ-সেনাগণের সেই প্রথম পরিচয়। তাঁরা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন, উদ্দীপ্ত বোধ করেন। মালয় থেকে ফেরা সলিল শ্যাম নামে একজন 'রেটিং' আজাদ হিন্দ

গভর্নমেন্টের এক অতি গোপনীয় চিঠি এবং অন্যান্য কাগজপত্র ও আজাদ হিন্দের ফটো-ফিল্ম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দাদা শরৎচন্দ্র বসু এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছে পৌঁছে দিতে তার জাহাজে বোম্বাই ফিরে আসেন। কিন্তু কি করে এ 'বেআইনি ও বিপজ্জনক' জিনিস যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার হদিশ করতে পারে না অল্পশিক্ষিত উত্তর ভারতের সেই তরুণ নৌ-সৈনিক—ব্রিটিশ-ভারত নৌবহরের অংশীদার। বুকে তার দুরন্ত আবেগ। শেষ পর্যন্ত একটু উঁচু পর্যায়ের আর একজন রেটিংকে বলে সে তার উদ্বেগের কথা। জ্বলে ওঠে দীপ। ওমনি বারুদের মহাবিস্ফোরণের কাল এগিয়ে আসে। 'লীডিং টেলিগ্রাফিস্ট' বি. সি. দত্তকে বোম্বাইয়ের নেভী সিগনাল স্কুল 'তলওয়ার'-এ গিয়ে সে মহার্ঘ দলিলের সঙ্গে ফটো ও আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে কাগজপত্র, ফিল্ম প্রভৃতি হস্তান্তর করে সলিল শ্যাম। ঐ সময় 'রয়্যাল মেলে' ভারতীয় রেটিংদের ঐরকম চিঠিপত্তর প্যাকেট প্রভৃতি পাঠানোর সুযোগ ছিল না এবং একই পদাধিকার সত্ত্বেও ইংরেজ রেটিংদের মত খাওয়া, থাকা ও মাইনের সমান মর্যাদা দেওয়া হতো না।[১] একজন ইংরেজ রেটিং যেখানে মাসে পেতেন ১৮০ টাকা, একজন ভারতীয়কে দেওয়া হতো ৬০ টাকা। পরাধীন ভারত—আত্মমর্যাদার অধিকার তার কোথায়! যেন মন্ত্রপুত, মহামূল্যবান রত্ন সে-দলিল বুকের মধ্যে চেপে ধরে তুচ্ছ এক ব্রিটিশ নৌবহরের বাঙালী নৌ-সেনা বি. সি. দত্ত! আর কোন মায়াজাল সরে যায় দুচোখের সামনে থেকে, সেই মুহূর্তে সেই অতি সাধারণ তরুণ নৌ-সেনাটি স্বাধীনতার মহাবিপ্লবীতে রূপান্তরিত হন। ইনিই নৌ-বিদ্রোহের অন্যতম পথিকৃৎ। বি. সি. দত্তের কথায়—

"আগত সপ্তাহগুলোতে জীবনের ধারা যায় বদলিয়ে, তখন আমি বাইশ বছরের তরুণ নাবিক। কমনওয়েলথ দেশগুলোর নৌ-সেনার পাশাপাশি ব্রিটিশ নৌবহরের পক্ষে অনেক সমুদ্রে যুদ্ধ করেছি। ওরা জানে কিসের জন্য কার জন্য যুদ্ধ করছে, কিন্তু আমি নিজে? সে কি আমার দেশ ভারতের জন্য যুদ্ধ করছি? আমার অধীত যুদ্ধবিদ্যা, আমার সমগ্র সত্তা কার জন্য উৎসর্গীকৃত?" প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলুম নিজেকে। সেদিন খুব কঠিন হলো না, 'তলোয়ার' নৌ-প্রতিষ্ঠানে খুঁজে বের করতে সমব্যথীদের। কিন্তু প্রচণ্ড

---

[১] B. C. Dutt—Mutiny of the Innocent—page 75
'In the ensuing weeks, my way of life changed.…In whose service have I placed my professional experience?'

ঝুঁকি নিয়ে ঠিক ঠিক দেশপ্রেমিক নাবিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে ; দুঃসাহসী সেই সব রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীর সৈনিকদের চাই। তারা নিজেদের ‘আজাদ হিন্দী’ নামে অভিহিত করলো (ফ্রি ইণ্ডিয়ানস)। কিন্তু আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করছে কঠোর গোপনীয়তা যারা রক্ষা করতে পারবে শুধু তাদেরই ওপর। তলওয়ারের ক্যানটিনকে বিদ্রোহী সংগ্রহের কেন্দ্র নির্বাচন করা হলো, আর তার পাশেই রিডিং রুম এবং আর তিনটে ইনডোর গেমস-এর ঘরও। চা এবং পানীয়ের জন্য আমন্ত্রণ দরাজ হাতে করা হতে লাগলো, এই সুযোগে যুদ্ধে অভিজ্ঞতা ও ইংরেজ অফিসারদের দুর্ব্যবহারের কথা। খুব সাবধানে ব্রিটিশদের প্রতি ক্ষুব্ধ নাবিকদের—একসঙ্গে মাত্র একজন করে ব্যারাকের বাইরে শহরের মধ্যে নিয়ে খাবার ও পানীয় দিয়ে খুব চতুরতার সঙ্গে মন বুঝে নেয়া হতে থাকলো।

“There were always more than two of us at these recruiting sessions—including a supposed teetotaler, who kept his eyes and ears open. If the other did not open up even in his worst drunken state, we offered tentative feelers. When all of us felt safe with his reactions he was baited with oblique hints about our intentions and objectives············It was a slow, labourious and time-consuming process. It also cost money. But it worked. And our precaution paid enormous dividends. There was no betrayal. The Security Police was completely outwitted. The RIN Mutiny was the one conspiracy against the crown in which there was no King’s witness. They tried their best. They drew blank. The strength of the Azad Hindi did not exceed twenty regular’s and about a dozen sympathisers during the four months of its existence. Enough precaution had been taken to the effect that most of the twenty-strong conspirational wing did not quite know, much about one another. This extreme precautionary measure paid its price in full during the period of later trials of the mutineers···”.[২]

ক্যানটিন আর পাশের পড়ার ঘর এবং তিনটে ইনডোর গেমস-এর ঘর হলো বিদ্রোহী-সংগ্রহের কেন্দ্র। গল্পগুজবের মাধ্যমে বিভিন্ন যুদ্ধে অভিজ্ঞতা ইংরেজ অফিসারদের দুর্ব্যবহার ইত্যাদিতে ওদের মনের ক্ষোভ জেনে নিয়ে

২। B. C. Dutt—Mutiny of the Innocent—page 78

বাছাই করে একসঙ্গে মাত্র একজনকে মিলিটারী ব্যারাক থেকে শহরের মধ্যে রেস্টুরেন্টে নিয়ে আসা হতো। সেখানে বসে চলতো স্ক্রিনিং; প্রত্যেক অধিবেশনে অন্তত দুজন চোখ-কান খোলা রেখে সমস্ত আলোচনা চালাত। কঠোর পরিশ্রম ও সতর্কতার মাধ্যমে নিশ্চিন্ত হলে তবেই তাকে বিদ্রোহী বলে নির্বাচন করা হতো। মিলিটারী পুলিশের নিরাপত্তা বিভাগ সম্পূর্ণ বিফল হয়েছিল; একটিও বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা নৌবিদ্রোহের আগে বা পরে কোর্ট মার্শালের সময়ও ঘটেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ এক নজির। তারা নিজেদের 'আজাদ হিন্দী'—এই নামে ডাকতেন। অতি কঠোর সতর্কতা, সাবধানতা ও চাতুর্যের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ চার মাসের পরিশ্রমে ২০ জন বিদ্রোহী ও এক ডজন সমর্থক সংগৃহীত হলো আর বিদ্রোহ কার্যকর করতে এক বিস্তৃত পরিকল্পনার ছক প্রস্তুত হলো। এ বিষয়ে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ব্যর্থতার পর আত্মগোপনকারী কয়েকজন চরম বামপন্থী কংগ্রেসী নেতার গোপন সাহায্যও পেয়েছিলেন নৌবিদ্রোহীগণ। নৌবিদ্রোহের একটা মহড়া হলো, আশ্চর্য তার পদ্ধতি, প্রকাশভঙ্গীও চমৎকার।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৫ সাল। বম্বেতে 'নেভী ডে' নৌদিবসের উৎসব সেদিন! এই দিনটাকেই বিদ্রোহীগণ নির্বাচন করলেন 'রয়্যাল-ইনডিয়ান নেভীতে' ইনডিয়ান রেটিংস-এর তাত্ত্বিক বিদ্রোহ বা আগত রক্তাক্ত বিদ্রোহের ভূমিকারূপে। সেই প্রথম, বোম্বাইয়ের অসামরিক নাগরিকদের আমন্ত্রণ করা হলো নৌপ্রতিষ্ঠান 'তলোয়ার' সিগন্যাল স্কুল ভিজিট করার। কিন্তু নভেম্বরের শেষ রাত্রির অন্ধকার যেন বড় রহস্যময় হয়ে ওঠে। বিদ্রোহের গুপ্ত শিখা ছড়িয়ে পড়ে এক অদ্ভুত দুঃসাহসভরা কর্মপদ্ধতিতে। ঝকমকে সুপরিচ্ছন্ন প্যারেড গ্রাউণ্ড ন্যাভাল এসটাবলিসমেন্টের চিরকালের বৈশিষ্ট্য। সেখানকার বিরাট প্রান্তরে ভোর হতেই দেখা গেল ছেঁড়া পাল, ভাঙা পতাকা দণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে আর বিরাট মাস্তুলে ঝাঁটাঝুড়ি বাঁধা। দেওয়ালে দেওয়ালে ফুটমাপের অক্ষরে গভীর রাতে লেখা হয়ে গেছে 'কুইট ইণ্ডিয়া', 'ডাউন উইথ ইম্পিরিয়ালিস্ট', 'রিভল্ট নাউ', 'কিল দ্য ব্রিটিশ'। রেটিং রিভলিউশনের প্রথম টেস্ট—ভারতে নৌবিদ্রোহের উন্মেষ মুহূর্ত।

এ ধরনের ঘটনা নেভীতে যা কোনো দিন ঘটেনি, তা কর্তৃপক্ষকে বিমূঢ় করে দিল। তবে বম্বে শহর-বন্দরের উপরের তলার আমন্ত্রিত নাগরিকদের এসে পড়ার আগেই সমস্ত পরিষ্কার করে ফেলতে হলো তড়িৎগতিতে। কিন্তু, এ-যে কোন একক উত্তপ্ত মস্তিষ্কের ক্ষণিক প্রকাশ

নয়, খুব সুসংগঠিত একটি দলের কাজ তা বুঝে ফেলতে অসুবিধা হলো না ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের। ন্যাভাল পুলিশের কড়া পাহারা এড়িয়ে এ ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা খুব সহজ নয়। প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর 'ওয়াচ' (ডিউটি) পরিবর্তন হয়··· ···সাধারণত রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত 'মিডল ওয়াচ'—এ ঘুমের সময়টা কেউই দায়িত্বে আসতে চান না। আর এই-ই ছিল মাহেন্দ্রক্ষণ বিদ্রোহের নেতার পক্ষে। যাই হউক ষড়যন্ত্রকারীকে ধরবার জন্য চষে ফেলা হলো সমগ্র তলোয়ার নৌপ্রতিষ্ঠান। নৌবহরের গোয়েন্দা দপ্তরের সমস্ত প্রকার কৌশল অবলম্বন সত্ত্বেও ব্যর্থ হলো সূত্র খুঁজে পেতে—অন্তত কিছু দিনের জন্য তো বটেই। প্রস্তুতি এতই নিখুঁত ছিল যে, কাউকেই এ্যারেস্ট করা সম্ভব হলো না—আর এই ব্যাপারে খুব বেশী হৈ-চৈও করলেন না নিজেদের ব্যর্থতাকে মেলে ধরতে বড় অফিসারের দল। কিন্তু মোটামুটি সন্দিগ্ধদের তলোয়ার থেকে অন্যত্র বদলী করা চললো ধূর্ততার সঙ্গে।

প্রথম সফলতার পর বিদ্রোহীগণ এবার বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজনে অগ্রসর হলেন এবং আরো গভীর ও শক্তিশালী বাস্তব প্রোগ্রামের পথে। আর. কে. সিং নামে একজন রেটিং সম্পূর্ণ অধৈর্য হয়ে উঠলেন, এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের পথ তাঁর আদৌ মনঃপূত নয়। গান্ধীবাদের পথ বেছে নিলেন তিনি ; ব্রিটিশের অধীনে নৌবহরে চাকুরী করতে রাজী নয় বলে পদত্যাগ করলেন। কিন্তু যুদ্ধ বিভাগে চাকুরী ছেড়ে দেওয়ার অধিকার নেই—চার্জশিট করা হলো আইনভঙ্গ হয়েছে বলে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর কম্যাণ্ডিং অফিসারের সম্মুখেই তাঁর টুপী মাথা থেকে খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং লাথি মেরে তাকে গড়িয়ে দিলেন। ব্রিটিশ রাজমুকুটের প্রতি এবং মিলিটারী চাকুরীর প্রতি পরিপূর্ণ অবজ্ঞার নিদর্শন। এই বিস্ময়কর ঘটনা ব্যারাকে ব্যারাকে বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁকে তিন মাসের জেল দেওয়া হলো—তিনি শহীদের সম্মান পেতে থাকলেন সহস্র নৌসেনা মহলে। 'আজাদ হিন্দীরা' তাঁদের কর্মধারায় অর্থাৎ বিদ্রোহ প্রস্তুতিতে এবার আরো অধিক সতর্ক হলেন যাতে ভেস্তে না যায়—অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ কোনভাবেই যেন নিভিয়ে দেবার সুযোগ না দেওয়া হয়। বিস্ফোরণের আগেই যেন বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের পরিকল্পনা ধরা না পড়ে যায় ব্রিটিশ পক্ষের হাতে। বিকেল ৪টায় চায়ের সময় গোপন জমায়েতে রাতের 'এ্যাকশান প্ল্যান' নেওয়া হলো কিন্তু আধ ডজনেরও কম বিদ্রোহীকে স্বেচ্ছায় সে রাতের জন্য মূল কাজে পাওয়া গেল। আর 'সেন্ট্রি' অর্থাৎ ফটকে রাতের

ন্যাভাল পুলিশ গার্ড এতই কঠিন কঠোরতা নিল যে, তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণভাবেই অসম্ভব। কেননা, ঐ দিনের সকালে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ তারিখে যে ভারতের কমাণ্ডার-ইন-চীফ পরিদর্শনে আসছেন। অল রাইট! 'ওয়ারলেস রুম-এ রাত দুটোর ডিউটি তাকেই ত নিতে হবে ভার। তিনি বহুজনের প্রিয় অভিজ্ঞ টেলিগ্রাফিস্ট—৬০১৭ ; কারুরই সন্দেহ তাঁর ওপর নেই। তার আগেই লিফলেট সাইক্লোস্টাইল করে গোপন পথে তলওয়ারের ব্যারাকে ব্যারাকে চলে গিয়েছে।

২রা ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ-ভারতের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল স্যার ক্লড অকিনলেক সেই প্রথমবার নৌ-প্রতিষ্ঠান 'তলোয়ার' ভিজিট করতে আসছেন। হঠাৎ ভোর পাঁচটায় এ্যালার্ম বা সাবধানী ঘন্টা জোরে জোরে বেজে উঠলো, আর লাউড স্পীকারে নির্দেশ ঘোষণা করা হলো—'গার্ডরুম' থেকে সকলকে ডাবল মার্চ করে (দৌড়ে এসে) সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে। ভারতের কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ অকিনলেক যে তিন ফুট উঁচু কাঠের প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে নৌ-সৈন্যদের স্যালুট গ্রহণ করবেন, ধবধবে সাদা ক্যানভাসে মোড়া সেই প্লাটফরমের গায়ে রক্ত রঙে পেণ্ট করে বড় বড় হরফে কেউ লিখে রেখেছে—'জয় হিন্দ', 'কুইট ইণ্ডিয়া' আর দেওয়ালে বাইবেলের বাণী—'কোন মানুষ দুই প্রভুকে একসঙ্গে সেবা করতে পারে না—তাহলে সে একজনকে ঘৃণা করবে, অন্যকে ভালবাসবে। বন্ধুগণ, এই হচ্ছে ঘৃণা এবং ভালবাসা প্রকাশের সময়। শত্রুকে চিনে নিয়ে তাকে ঘৃণা করতে হবে, মা-কে ভালবাসতে হবে, যে মাতৃভূমিতে তুমি জন্মেছো—'।[৩]

এক সপ্তাহের বিনিদ্র পরিশ্রমে, অতি গোপনে বিদ্রোহ আয়োজন গড়ে তোলাও তার রূপায়ণ করার চাঞ্চল্যে 'পেণ্ট'-এর শিশি সরিয়ে লুকিয়ে রাখার কথা মনে নেই। লকারের ভেতরেও পাওয়া গেল 'ইণ্ডিয়ান মিউটিনি—১৮৫৭' (সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস) নিষিদ্ধ বইখানা। এই দু-দুটো জিনিসসহ

৩। The Pioneer of the RIN Mutiny—Leading Telegraphist : No. 6017—B. C. Dutta quoted from the Bible-Mathew, Chapter 6 : 24—"No man can serve two masters ; for either he will hate the one and love the other. Or else he will hold to the one and despise the other." Rhetorically, he called on the ratings : "Brothers, this is the time for hate and this is the time for love. You must learn to recognise your enemy and hate him. You must love your mother, the land you are born in."

বন্দী হলো নৌ-সেনাদের সুপরিচিত বন্ধু 'লীডিং টেলিগ্রাফিস্ট' বি. সি. দত্ত[৪], আর. কে. সিং। আর সলিল শ্যামকেও খুব শীঘ্রই এ্যারেস্ট করা হলো। 'সায়লেণ্ট সারভিস'—রাজকীয় ব্রিটিশ নৌবহরের কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ নীরব প্রতিরক্ষা শাখা সচকিত, কম্পিত হয়ে ওঠে। তলোয়ারের কম্যাণ্ডিং অফিসার কম্যাণ্ডার কিং-ত দূরের কথা, কোর্ট মার্শালের সময় রীয়ার এ্যাডমীরালের সামনে নৌ-সেনাটি দাবী করে বসে—'রাজনৈতিক বন্দী'র অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা। বিমূঢ় বোম্বাই ন্যাভাল হেড কোয়ার্টার্স আর একটি মিনি আজাদ হিন্দের লালকেল্লা ট্রায়ালের সম্মুখীন হওয়ার সাহস করলেন না তাঁরা। নেভী-ডে উৎসবের ঘটনা ও বন্দী বি. সি. দত্ত প্রভৃতির সমস্ত ফাইল ও কাগজপত্র পাঠিয়ে দিলেন তখন সিমলায় ভারতের কম্যাণ্ডার-ইন-চিফের প্রধান দপ্তরে।

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ ইতিহাসের কালচক্র এগিয়ে আসে, শেকল ভাঙ্গার মুহূর্ত জন্মলাভ করে। ক্লাসরুমে রেটিংগণ নেতাজীর প্রতিমূর্তি এঁকে 'জয় হিন্দ', 'ইংরেজ ভারত ছাড়' প্রভৃতি শ্লোগান লিখেছেন। ঐ স্কুলের কম্যাণ্ডিং অফিসার কম্যাণ্ডার কিং ভারতীয় রেটিংদের 'কুত্তার বাচ্চা', 'ভিখারী', 'রক্তখেকো জংলীর বংশধর'—প্রভৃতি সম্বোধনে অসহনীয় অমার্জনীয় গালিগালাজ দিলেন। পরাধীনা, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা ভারতের সেদিন হিসেব মেটাবার ক্ষণ উপস্থিত। বুকের মধ্যে আগ্নেয়গিরির জ্বালায় ফেটে পড়লেন তাঁরা, প্রতিক্রিয়ার ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়লো দিল্লীতে ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে। খবরের কাগজে ভারতের জনসাধারণ তা জানতে পারলেন। (১) প্রথমে এক পক্ষকাল কারাদণ্ড দান, (২) তারপর তাঁকে তাঁর পদ থেকে নামিয়ে দেওয়া হলো। এরপর (৩) নৌবাহিনী থেকে বি. সি. দত্তকে বিতাড়নের আদেশ ঘোষণা ১৭ই ফেব্রুয়ারী, (৪) আর ৪৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নৌপ্রতিষ্ঠানের সীমানা ত্যাগ করার কঠোর হুকুম। এর বেশী কিছু না-করার পাঠশিক্ষা ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ রাজশক্তির হয়ে গিয়েছে লালকেল্লার আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার-মঞ্চে।

[৪] *রেটিং-এর পদ-পর্যায়ক্রম ঃ* (১) রেটিং, (২) এবল সি-ম্যান, (৩) লীডিং সি-ম্যান, (৪) পেটি অফিসার ও (৫) চীফ পেটি অফিসার। *অফিসারের পদ-পর্যায়ক্রম ঃ* (১) সাব লেফটেন্যাণ্ট, (২) লেফটেন্যাণ্ট, (৩) লেফটেন্যাণ্ট কম্যাণ্ডার, (৪) কম্যাণ্ডার, (৫) ক্যাপ্টেন, (৬) কমোডোর, (৭) রীয়ার এ্যাডমীরাল, (৮) ভাইস এ্যাডমীরাল ও (৯) এ্যাডমীরাল।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬—এগিয়ে এলো মহাবিপ্লবের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। তার আগেই আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের খবর নেভীর এডুকেশন অফিসার গোপনে (করাচীতে) রেটিংদের জানিয়েছেন, আজাদ হিন্দের পক্ষে বিচার পরিচালনার খরচের জন্য যে 'ডিফেন্স ফাণ্ড' গড়ে উঠেছিল, নৌ-সৈনিকগণ দু-তুবার সেখানে অর্থ সাহায্যও করেছেন। নেতাজী ও আই. এন. এ-র যুগজয়ী সংগ্রাম ও কর্ম প্রচেষ্টা, ৫ই নভেম্বর ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৬-এর ৩রা জানুয়ারী পর্যন্ত লালকেল্লায় কোর্ট মার্শাল ও তার ঐতিহাসিক ফলাফলে নৌ-সৈনিকগণ শুদ্ধ-স্নাত ও উজ্জীবিত হয়েছেন ইতিমধ্যে। ব্রিটিশ নেভী অফিসারদের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য ও মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্য এখন বিপরীত-মুখী—এই প্রেক্ষাপটে শুরু হয়ে গেল তাঁদের বিপ্লব-বিদ্রোহের মহা প্রস্তুতি। সর্ববাদী সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো—টারগেট রয়্যাল-ইণ্ডিয়ান নেভী অধিকার ও জাতীয় নেতাদের হাতে সমর্পণ। অজুহাত স্বরূপ তাঁরা নীতি দাঁড় করালেন—নীচুমানের ও অপ্রতুল খাদ্য সরবরাহ এবং কম্যাণ্ডার কিং-এর বর্বরোচিত উক্তির বিরুদ্ধে একযোগে অনশনের ঘোষণা। কিন্তু এটা যে 'ফুড রায়ট' নয় এবং একজন অমার্জিত শ্বেতাঙ্গ অফিসারের কু-রুচির বিরুদ্ধে শুধু জেহাদ নয়—এ বিদ্রোহের ফলে রেটিংগণ স্বাধীন ভারত ও তার ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছেন, তা-ই বুঝিয়ে দেওয়া হলো ব্যারাকে ব্যারাকে। বোম্বাই নৌবহরের উচ্চতম অফিসার রীয়ার এ্যাডমীরাল র‍্যাট্রে ছুটে এলেন, কম্যাণ্ডার কিংকে সরিয়ে দিলেন তলওয়ার সিগন্যাল স্কুল থেকে এবং তার জায়গায় আর একধাপ উঁচু পদের অফিসার ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনসকে নিয়োগ করা হলো এবং রেটিংদের রেশনের উন্নতির প্রতিশ্রুতি। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গিয়েছিল সেদিন। লালকেল্লার বিচার-মঞ্চ থেকে নবভারতের অভ্যুদয়ের রঙীন ইশারা তখন দিকে দিকে—নৌবিদ্রোহীগণ বজ্র নির্ঘোষে গর্জন করে উঠলেন—'কুইট ইণ্ডিয়া', 'জয়হিন্দ'। মুহুর্মুহু এই শ্লোগানের সম্মুখে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে সাহসী হলেন না—বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম নৌবহরের রীয়ার এ্যাডমীরাল র‍্যাট্রে, তৎক্ষণাৎ তিনি স্থান ত্যাগ করলেন, আর কম্যাণ্ডার কিং চিরদিনের জন্য বোম্বাই নৌবহরের সিগন্যাল স্কুল তলওয়ার পরিত্যাগ করে পলায়ন করলেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই নৌবহরের বিভিন্ন যুদ্ধ জাহাজ থেকে নেমে আসছেন সি-মেন রেটিংগণ, অদূরবর্তী সুবৃহৎ নৌপ্রতিষ্ঠান 'ক্যাসল ব্যারাক' থেকে হাজারে হাজারে নৌসেনা, 'তলওয়ার' এবং সঙ্গে এঁদের মিলিত শক্তি

এখন প্রায় বিশ হাজার। ঐ দিনই গড়ে ওঠে সেন্ট্রাল ন্যাভাল স্ট্রাইক কমিটি। তাঁদের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন আপার পাঞ্জাবের মুসলিম তরুণ লীডিং সিগন্যালম্যান সিনিয়র ওয়ারলেস টেলিগ্রাফিক মহম্মদ এম. এস. খান, ভাইস প্রেসিডেণ্ট জনৈক শিখ যুবক, পেটী অফিসার টেলিগ্রাফিস্ট মদন সিং এবং পরিকল্পনায় বি. সি. দত্ত। অন্যান্য যাঁরা সদস্য নির্বাচিত হলেন—তাঁদের মধ্যে নাওয়াজ, বেদী, বসন্ত সিং, আশরাফ খান, নূরুল ইসলাম, হুসেন, এস. সেনগুপ্ত ও গোমেজ। নৌবহর কর্তৃপক্ষের কাছে দাবীপত্র উত্থাপন করা হলো—(১) স্বাধীনতা সংগ্রামে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, (২) আজাদ হিন্দ ফৌজের গ্রেপ্তার হওয়া সকলের বিনা শর্তে মুক্তি (তখনো ভারতের বিভিন্ন দুর্গে প্রায় তিরিশ হাজার আই. এন. এ.-র অফিসার ও সৈনিক মুক্ত হননি), (৩) ইন্দোনেশিয়া থেকে ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার, (৪) ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ, (৫) কম্যাণ্ডার কিং-এর দুর্ব্যবহারের প্রকাশ্য বিচার, (৬) ধৃত সকল নৌ-সৈন্যের বিনা শর্তে মুক্তি, (৭) ভারতীয় নাবিকদের নৌবহরে চাকুরী সংক্রান্ত সকল দাবী পূরণ, (৮) ইংরেজ নাবিকদের সমান হারে ভারতীয় নাবিকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, (৯) স্বাস্থ্যকর ভারতীয় খাদ্য সরবরাহ, (১০) চাকুরীর মেয়াদ শেষে নাবিকদের ইউনিফরম প্রদান, (১১) অধীনস্থ নাবিকদের প্রতি অফিসারদের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার, (১২) সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় অফিসার নিয়োগ ইত্যাদি।[৫]

রয়্যাল-ইণ্ডিয়ান নেভীর বোম্বাইতে পাঁচটি বড় যুদ্ধ জাহাজ (স্লুপ)—হিন্দুস্থান, কাবেরী, শতদ্রু, নর্মদা ও যমুনা; সাতটি ছোট জাহাজ (করভেট ট্রলার)—আসাম, বেঙ্গল, পাঞ্জাব, ত্রিবাঙ্কুর, কাথিয়াওয়াড়, বেলুচিস্থান ও রাজপুত এবং তিনটি ট্রেনিং জাহাজ—ডালহৌসী, কলাবতী, দীপালী ও দুটো খুব ছোট জাহাজ—নীলম ও হীরা এই নৌবিদ্রোহে সরাসরি যোগদান করলো। ভারতে প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম বা ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ

৫। নৌ-বিদ্রোহ ১৯৪৬ঃ বিশ্বনাথ বসু (শ্রীবিশ্বনাথ বসুর পদ 'এবল সী-ম্যান', তিনি নৌ-বিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক ও বিদ্রোহে 'গানারী'র দায়িত্বে ছিলেন। 'এইচ. এম. এস. ফিরোজ' জাহাজে ড্রাফটিং রিজার্ভে তাঁর নিযুক্তি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মাউণ্টব্যাটেন প্রেরিত 'বি ২১ কম্বাইণ্ড অপারেশন'-এ অন্যতম নাবিকরূপে প্রেরিত হন এবং সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে)।

(সিপাহী বিদ্রোহ) কালে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যে সময় নীতি অনুসরণ করেছিলেন—এই মুহূর্তে ঠিক তাই করতে এগিয়ে এলেন। বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়া এবং কার্যকর হওয়ার আগেই ব্রিটিশ নৌ-কর্তৃপক্ষ বোম্বাই ও করাচী ছাড়া কলকাতা, মাদ্রাজ ও কোচীনে 'গানারী' (গোলা-বারুদের জায়গা) থেকে সমস্ত রাইফেল, কামান, গোলা-বারুদ আগে-ভাগে ভারতীয় নৌ-সেনাদের অধিকার থেকে সরিয়ে ফেলতে পারলো। সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ ও নৌ-প্রতিষ্ঠানে বিদ্রোহীরা উড়িয়ে দিলেন কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের পতাকা যুক্তভাবে। ইংরেজ রাজ পতাকা—'ইউনিয়ন জ্যাক' একটিও দেখা গেল না পাঁচদিন ধরে। বোম্বাই বন্দরে জনসাধারণ, শ্রমিক, ছাত্র খদ্দরের গান্ধী টুপি ও জাতীয় পতাকা তুলে দিতে লাগলেন বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের হাতে। যুদ্ধ জাহাজে সমস্ত ইংরেজ নেভী অফিসারদের নিরস্ত্র করা হলো—বাধাদানকারী ইংরেজ সৈন্যদের জাহাজের জেলে নিরস্ত্র করে আটক করে রাখা হলো, কিন্তু অনুমতি দেওয়া হলো নিরস্ত্র অবস্থায় নৌ-প্রতিষ্ঠান ও যুদ্ধ জাহাজ থেকে চলে যাবার। লেফটেন্যাণ্ট সোবানী ব্যতীত ভারতীয় সকল নেভী অফিসারই ইংরেজ প্রভুদের পথ অনুসরণ করলেন। পৃথিবীর এককালের শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ নৌবহরের সেদিন কলঙ্কিত অধ্যায় রচিত হলো—যখন নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষ ভাইস এ্যাডমীরাল জে. এইচ. গডফ্রে রয়্যাল-ইণ্ডিয়ান নেভীর সমস্ত অফিসারদের জাহাজ ও নৌ-প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে নিজ নিজ নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে আদেশ জারী করলেন। স্থলবাহিনী থেকে ভারতীয় সৈন্য সরিয়ে কর্তৃপক্ষ যখন ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর ওপর বিদ্রোহ দমনের ভার অর্পণ করলেন, নিমিষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অভিজ্ঞ ভারতীয় নৌ-সেনাগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। বিদ্রোহীদের পক্ষে তখন গানারীর দায়িত্বে যিনি—সেই বিশ্বনাথ বোস বলেন—'আমরা তখন নির্ভীক মরীয়া। রাইফেল ও গোলাবারুদ বিতরণের পর 'স্ট্যাণ্ডবাই'-এর নির্দেশ মাইকে ঘোষণা করা হলো আর 'চার ইঞ্চি কিউ. এফ. এবং বি. এফ. কামান'সহ বিমান বিধ্বংসী কামানের দায়িত্ব নিয়ে প্রস্তুত আমি, বিমান বহর থেকে বোমা বিস্ফোরণ করলেই আমাদের টারেট-ও সমান সক্রিয় হয়ে উঠবে।

২০শে ফেব্রুয়ারী পুলিশ, ভারতীয় মিলিটারী, ছাত্রসমাজ, শ্রমিক ইউনিয়ন একযোগে নৌ-বিপ্লবীদের সাহায্য-সমর্থনে ধর্মঘটের ডাক দিলেন; 'জয় হিন্দ', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিই ছিল এই বিচিত্র ধর্মঘটীদের রণহুংকার। এর সঙ্গে দেখা যায় বিচিত্র অভাবনীয় সে দৃশ্যাবলী—বোম্বাই বন্দরে আরব

সাগরের উপকূলময় সে মহতী সমাবেশ। আলিঙ্গনে চুম্বনে তাঁরা অভিনন্দিত করছেন স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ সৈনিকদের। চিন্তাশীল, পরিণত বুদ্ধি ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়াই পরাধীনতার গ্লানি মুছিয়ে দিতে এই তরুণ নৌ-সেনাদের অসম-প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অনড় ভাব-ভাবনা, বুকের অসহনীয় জ্বালায় জ্বলে ওঠা অগ্ন্যুদগারের সামনে ব্রিটিশ রাজশক্তি বিচলিত। নেতাজী ও আজাদ হিন্দের মহা বহ্নিমান দুর্জয় গতিবেগ, আদর্শ ও রণহুঙ্কার ছাড়া তাঁদের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না সেদিন। ব্রিটিশ গোয়েন্দা ও প্রচারযন্ত্র ব্যর্থ করেই বোম্বাইয়ের জাতীয়তাবাদী এবং বিরোধী সমস্ত সংবাদপত্র 'ইভনিং নিউজ', 'ফ্রি প্রেস',[৬] 'ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড', 'রেনল্ড নিউজ', 'ডেইলী মেল', নৌ-বিদ্রোহের রাজনৈতিক দাবী প্রকাশ না করে পারেননি—এমনকি ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (বি. বি. সি.), 'টাইমস', 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' প্রভৃতিও এ সংবাদ পৃথিবীকে জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন সেদিন।

বিস্ময় জাগে, ছাত্র-শ্রমিক-পুলিশ-মিলিটারীর মিলিত ধর্মঘটের বিরোধিতা করে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ২১শে ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট বিরোধী ইস্তাহার প্রচার করেন। সকাল ৯-টায় স্থলবাহিনী, বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের ওপর প্রথম গুলি বর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীরা 'এ্যাকশান স্টেশনে' উপস্থিত (ন্যাভাল সোলজাররা আর্মি সোলজারদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে গোলাগুলি চালনায় বেশী দক্ষ)। সঙ্গে সঙ্গে বিরতি! তারপর পুনরায় 'ক্যাসল ব্যারাক' নৌ-প্রতিষ্ঠানে ব্রিটিশ টমীদের আক্রমণ শুরু হলে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়। কিন্তু রেটিংগণ তাঁদের জাহাজ থেকে কামান ব্যবহার করলেন না, অন্যথায় তাঁদের সহস্র গোলার আঘাতে শ্বেতাঙ্গ বিদেশী আর শাদা-কালো পাহাড় প্রমাণ ধ্বংস কোন কিছুতেই রোধ কবতে পারতো না সেদিন। একটি খণ্ড যুদ্ধে কৃষ্ণান নামে এক রেটিং (হসপিট্যাল সহকারী) গুলিতে প্রাণ বিসর্জন করেন, আর অধিকাংশ ইংরেজ টমী ও মেরীন গার্ড মৃত্যুবরণ করলো বিদ্রোহীদের হাতে। যখন ইংরেজ সেনা নিরস্ত্র ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ওপর নিষ্ঠুর আক্রোশে-হিংসায় ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক

৬। 'ফ্রি প্রেস' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী এস. নটরাজন-ই সর্বপ্রথম ১৮ই ফেব্রুয়ারীর নৌ-বিদ্রোহের ঘটনা জনসমক্ষে প্রকাশ ও প্রচার করেন। অন্যান্য জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি প্রথমত এই বিদ্রোহের ঘটনা বিশ্বাস করেননি অথবা সেনসরের ভয়ে বিরত ছিলেন।

বাহিনীকেও বোম্বাইয়ের রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে বিদ্রোহীদের অধিকৃত যুদ্ধজাহাজগুলো ধূম উদগীরণ করে ভীমগর্জনে উপকূল-দরিয়ায় চক্কর দিতে থাকে ; কিন্তু বিদ্রোহী কমিটির নেতৃবৃন্দের নির্দেশে কামানের ব্যবহার করা হয়নি—নির্দোষ বহু মানুষের প্রাণনাশের সম্ভাবনায়। ব্রিটিশ টমী ও তাদের এদেশীয় সাহায্যকারীরা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়।

কিন্তু রাজনীতির জটিলতা, কূটনৈতিক সে লাভালাভের হিসাব বোঝা যৌবনের ধর্ম নয়। ব্যক্তি বা দল-স্বার্থের বেড়াজাল ভেদ করে এগিয়ে চলার কোন বিমান বা নৌবহর সম্ভবত আজো আবিষ্কৃত হয়নি। ন্যাভাল স্ট্রাইক কমিটির নেতৃবৃন্দ অরুণা আসফ আলি, বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কত কঠিন চেষ্টা করলেন। কম্যুনিস্ট নেতা অরুণা আসফ আলি স্ট্রাইক কমিটির সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও উপস্থিত হলেন না, উল্টে বিপ্লবীদের শান্ত থাকতে বললেন।[৭] কংগ্রেস নেতা বল্লভ ভাই প্যাটেল রেটিংদের পরামর্শ দিলেন আত্মসমর্পণ করার ; স্বয়ং গান্ধীজী পুনের প্রার্থনা সভায় উল্লেখ করলেন খাদ্য-রেশন বা চাকুরীতে অসুখী হলে রেটিংরা চাকুরী ছেড়ে দিতে পারে।[৮]

[৭] নৌ-বিদ্রোহের নেতা বি. সি. দত্তের মতে, কম্যুনিস্ট পার্টির এই নৌ-বিদ্রোহের প্রতি 'পঞ্চম বাহিনী' স্বরূপ ক্রিয়াকাণ্ড ছিল—কিন্তু এই মতবাদে বিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক বিশ্বনাথ বসু একাত্ম নন। বসুর মতে, কম্যুনিস্ট পার্টির অবদান অনেক, তবে তা নাবিকদের যন্ত্রণার বিনিময়ে।

[৮] "…And Gandhiji ! Then in Poona, he made a casual remark in his prayer meeting to the effect that if the ratings were unhappy they could have resigned ! The apostle of non-violence had tried to teach his followers the efficacy of his chosen path for more than two decades and had seen to it that all those who did not fall in line with him were kept out of the national liberation movement—of course, his non-violence violently opposed Subhas Chandra Bose with failure—a judgement of his history only. And in the case of revolt of the Indian ratings with all in arms—whether ratings were in a position to resign at all was a peripheral matter, as all other questions. He did not even bother to find out ratings could really resign their posts. (As per rules of the R.I.N. resignation was not allowed)"

কায়েদে আজম জিন্না তখন কলকাতায়। তিনি বাণী পাঠালেন মুসলীম নৌ-সেনারা সমস্যা সৃষ্টি না করে আত্মসমর্পণ করুক। দিল্লীতে তখন ভাইসরয়ের কাউন্সিল নৌ-বিদ্রোহ বিষয়ে অতিব্যস্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মধ্যপ্রদেশ-বেরার ও মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং হিন্দু মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি ও ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য ডাঃ নারায়ণ ভাস্কর খারের নিম্নলিখিত বক্তব্য—

"While the Executive Council was considering this mutiny of the naval ratings in Bombay, Lord Wavell interrupted in the middle and said,

" 'I am not at all afraid of this mutiny of the naval ratings in Bombay as two big leaders of a big political party have assured me of all help to suppress the rebellion.' These two big leaders must have been Maulana Azad and Sardar Patel, because within four or five days of this incident, a statement signed by these two leaders was published in the press exhorting the ratings to withdraw their strike unconditionally. It is possible that this assurance could have been given without any interview either direct or through an intermediary! Certainly not. It is clear, therefore, that the Congress policy was two faced. They used to say Quit India outside or openly, and privately assured the British Government of all sorts of help. At this very meeting of the Council the Viceroy disclosed that he had received blessings of Mahatma Gandhi in the matter of quelling this mutiny of the ratings. I was amazed at this strange disclosure, and I silently praised the cunning diplomacy of the British.

"This episode of the blessings created bitter feeligs in my heart about the duplicity of Gandhi and Wavell. As a result, I said to the Viceroy, 'I am surprized that in this 20th century, a British Viceroy is depending upon the blessings of a sadhu or a Mahatma for continuance of his rule. I challenge Your Excellency to show one single example of such an event in the whole history of the world. From Your Excellency's solicitude towards the Mahatma, I am convinced that you are doubtful about the stability of your rule and you want to strengthen it by taking an adventitious support from a political party. But this is not proper. Under these circumstances, it is your duty to hand over power to the people and quit India.' There was a pin drop silence in the meeting of the Executive Council after this..."[৯]

এই ঐতিহাসিক বক্তব্যের ভাবানুবাদ এইরূপ ঃ

'কংগ্রেসের নীতি দ্বিমুখী—তাঁহারা প্রকাশ্যে বলেন 'ভারত ছাড়' অথচ গোপনে ইংরেজের কাছে সর্বতোভাবে সাহায্যের অঙ্গীকার করেন। সেদিন বড়লাট প্রকাশ্যে বলিয়াই ফেলিলেন যে, মহাত্মার আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন, যাহা দ্বারা নৌবিদ্রোহ দমন করা যাইবে। আমি আশ্চর্য হইলেও মনে মনে ব্রিটিশ কূটনীতির প্রশংসা করিলাম। ...আমি বলিয়াই ফেলিলাম যে, আমি অবাক হইতেছি যে এই বিংশ শতাব্দীতে একজন মহাত্মা বা সাধুর আশীর্বাদের ওপর ইংরেজ বড়লাটের শাসনকার্য নির্ভর করে। আমি আপনাকে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত রাখিতে আহ্বান জানাইতেছি। মহাত্মার প্রতি আপনার এই আস্থা এবং আপনার উক্তিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আপনি আপনার শাসনকার্যে আস্থা হারাইয়াছেন এবং সেইজন্য আপনি একটি রাজনৈতিক দলের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন, যাহাতে আপনার শাসন পরিচালনা জোরদার করা যায়। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। এই পরিস্থিতিতে আপনার কর্তব্য হইল জনগণকে স্বাধীনতা অর্পণ করিয়া ভারত পরিত্যাগ করা। এই বক্তব্যের পর তথায় সূচীপতন নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল।' হায় ভারত, কি বিচিত্র তোমার রূপ! প্রেম-অহিংসার রাজনীতি-কূটনীতির কি মহান প্রকাশভঙ্গী।

আর করাচীতে ছিল 'হিন্দুস্থান', 'ত্রিবাঙ্কুর' ও 'তীর' নামে তিনটি যুদ্ধ জাহাজ; 'বাহাদুর', 'হিমালয়' ও 'চমক' নামে তিনটি নৌ-প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ-ভারতীয় নৌবহরের বয়েজ ট্রেনিং স্কুল 'দিলওয়ার'ও এইখানেই অবস্থিত। বোম্বের বিদ্রোহীদের মত এবং তাদের সিগন্যাল অনুযায়ী, সুযোগ যখন ছিল তখন করাচীর রেটিংগণ যুদ্ধ করেননি, দেশীয় নেতৃবৃন্দের দিকে আকুল আগ্রহে চেয়ে থেকেছেন। কিন্তু যখন গুলি দিয়ে তাদের বাধ্য করা হলো, 'হিন্দুস্থান' যুদ্ধজাহাজের নৌ-সৈন্যগণ বীরের মতই শত্রুদের যুদ্ধদান করলেন। জাহাজ

৯। N. B. Khare : My Political Memoirs : Page 120
[Dr. N. B. Khare was the Prime Minister of Central Province of Berar, later Chief Minister of Maharashtra and President of Hindu Mahasabha].

থেকে 'ইউনিয়ন জ্যাক' নামিয়ে অগ্নিদগ্ধ করা হলো—কংগ্রেস-মুসলীম লীগের পতাকার সঙ্গে মেসিনগানের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হোসেনের রক্তাক্ত নেভীর পোশাকটাকে পতাকারূপে ব্যবহার করা হলো—'রক্ত তিলক ললাটে পরালো বীরগণ জননীরে'। আপোষ, অনশন, আত্মসমর্পণ—সমস্ত পায়ের তলায় দলিত করে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় কিশোর-তরুণ নৌ-সৈনিকগণ রাইফেল, মেশিনগান, ছোট কামান নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

যুদ্ধজাহাজ 'হিন্দুস্থানের' মাত্র দু-ফার্লং দূরে ২১শে ফেব্রুয়ারী রাতের শেষ প্রহরে ব্রিটিশ গোলন্দাজ সৈন্য ও কামান বাড়ীর ছাদের ওপর তোলা হতে থাকে, সেইসব বাড়ীর অসামরিক বাসিন্দাদের গভর্নমেণ্ট বলপূর্বক ঘর থেকে বিতাড়িত করেন। ৭৫ মিলি মিটার কামানসহ, মেসিনগান ও বহু যুদ্ধাস্ত্র সেইসব বাড়ীর ওপর এক মাস্টার ডক ইয়ার্ডে প্ল্যানের সাহায্যে সবদিক থেকে প্রস্তুত হয়। কতিপয় প্লাটুন ঐ রাতেই করাচী ডক ইয়ার্ডে হিন্দুস্থান যুদ্ধজাহাজকে তিনদিক থেকে ঘিরে ধরে। অখণ্ড ভারতে করাচী ন্যাভাল হেড কোয়ার্টার্স ইংরেজদের এক অতি সুরক্ষিত সুন্দর নৌ-প্রতিষ্ঠান, অর্ধচন্দ্রাকার তার গঠন। ২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে দশটায় ব্রিটিশ বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত; ভারতীয় নৌ-বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের জন্য চরম নির্দেশ ঘোষণা করলেন তাঁরা। ভাঁটার টানে হিন্দুস্থান যুদ্ধজাহাজটি নীচে নেমে যায়। বিদ্রোহী নৌ-সেনারা তাঁদের নিম্নমুখী জাহাজের 'টারেট' ঘুরিয়ে কামানের নিশানা ইংরেজবাহিনীর প্রতি যথাযথ এ্যাঙ্গেলে সেট করতে না করতেই করাচীর প্রচণ্ড শক্তিশালী 'ন্যাভাল ব্যাটারী'র (নৌদুর্গে বিভিন্ন ঘাঁটি তৈরী করে এক একটিতে অনেকগুলি কামান সেট করে নদী-সমুদ্রের দিকে তাক করা থাকে) গোলায় হিন্দুস্থানের ডেক ধ্বংস হয়ে গেল। 'বাহাদুর' ও 'চমক' থেকে লঞ্চের সাহায্যে গোলাবরুদ এসে পৌঁছানোর আর সময় হলো না— চল্লিশ মিনিট এক নাগাড়ে যুদ্ধ চললো।

যুদ্ধজাহাজ 'এইচ.এম.আই.এস. বাহাদুরে'র পঞ্চাশ বছর বয়সের ক্যাপ্টেন টড ডেকের ওপর এসে দাঁড়ালেন সকাল ৮-টায়। হিন্দুস্থান, চমক, হিমালয় জাহাজগুলোর নাবিকেরা জড় হলে তিনি আন্তরিক অনুরোধ জানালেন যে যার জাহাজে ফিরে যেতে, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হলো। ঐদিনই ২১শে ফেব্রুয়ারী কম্যাণ্ডার পেরেরা (তখন করাচীর উচ্চতম নৌ-অফিসার; পরবর্তী-কালে ভারতীয় নৌবহরের প্রধান সেনাপতি এ্যাডমীরাল আর. এল. পেরেরা) সকাল ১০ টায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে জাহাজের ডেকের ওপর দেখা করে একই কথা

বললেন। নৌ-সৈনিকগণ তাঁকেও প্রত্যাখ্যান করলেন। ভারতীয় নৌ-সেনারা একত্রে করাচী বন্দরের মধ্যে মার্চ করে যাবার জন্য যেই জাহাজ থেকে নামলেন, অমনি স্থলসৈন্যরা তাঁদের ওপর মেসিনগান, রাইফেলের গুলি বর্ষণ শুরু করলো। তারপর অবিরাম চল্লিশ মিনিটের শুধু জাহাজের রাইফেল, ও মেসিনগান দিয়েই ইংরেজ স্থল ও বিমান বাহিনীর মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সে অসম ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কল্পনা করা খুবই কঠিন। একশো কুড়িজন ভারতীয় নৌ-বিদ্রোহীর মুখে 'জয়হিন্দ' ও 'কুইট ইণ্ডিয়া' যুদ্ধ ধ্বনি, আর রাইফেল মেসিনগান দিয়েই বজ্রের নির্ঘোষে বহু ডজন ব্রিটিশ ন্যাভাল ব্যাটারীর কামানের গোলাবর্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সে এক অবিশ্বাস্য দুঃসাহসী মৃত্যুর মহাসমর বলা যায়। যেন এক কল্পকথা, মাতৃভূমির জন্য আত্মবলিদানের সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। সে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বেশীর ভাগ বিদ্রোহীই প্রাণ দিলেন, গোলাবারুদ নিঃশেষিত হয়ে গেল, খাদ্য ও পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ—তারপর মুষ্টিমেয় আহত-জীবিত, জীবন্মৃতদের আত্মসমর্পণ।[১০]

বিমূঢ়, বিপ্লবী ন্যাভাল স্ট্রাইক কমিটি—আর উৎসাহিত ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। নৌ-কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে রেটিংদের নিজ নিজ জাহাজ ও প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাওয়া ও আত্মসমর্পণের হুকুমনামা, অন্যথায় সমগ্র নেভী ধ্বংসের পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। ইংরেজ দম্ভ-মানসিকতা ভাঙতে শুরু হয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হয়েও ; সমগ্র ইংরেজ জাতির মেরুদণ্ড বেঁকে নুয়ে পড়েছিল ইতিমধ্যেই। অক্ষশক্তি জোটের কর্ণধার জার্মানীর আঘাতে আঘাতে তার শিল্প ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সঙ্গে প্রায় সমস্ত সাহসী যুবসমাজ প্রাণ হারিয়েছিল। বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষায় বিশ্বজয়ী তার নৌ-বাহিনী, প্রতিরক্ষা সম্ভার, ব্যবসা-বাণিজ্য, সবই প্রায় আমেরিকার সাহায্য-ঋণের ওপর তখন নির্ভরশীল—তার রাজমুকুটের শ্রেষ্ঠ মণিটি (ভারতবর্ষ) এখন খুলে পড়ার মুখে। ঐ তো ওদের

১০। করাচীর বিদ্রোহী নাবিক—এস. কে. ব্যানার্জ্জী, Sailor of Royal Indian Navy—No 36170 Jellicoe Division 'H.M.I.S. Bahadur' Monro Island, Karachi (লেখকের সাক্ষাৎকার ২৭. ১. ১৯৬৬) ইনি—কংগ্রেসের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে—এই কথার প্রতিবাদে কংগ্রেস সরকারের প্রস্তাবিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর 'পেনসন' গ্রহণ করেননি। লেখকের নিকট তাঁর স্বহস্ত লিখিত একটি Will বা Testament মর্যাদার সঙ্গে সংরক্ষিত আছে। [পরিশিষ্ট ১৪ : এক নৌ-বিদ্রোহীর টেস্টামেণ্ট দ্রষ্টব্য]।

সবার সেরা শত্রু আর তার বাহিনী নেতাজী ও আজাদ হিন্দের সমর্থনে সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনী আজ শ্রদ্ধায় অবনত মস্তক। যুদ্ধক্ষেত্রে ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তারা—জানতেই পারেনি নেতাজী ও আই. এন. এ-র মুখোমুখী ব্রিটিশ যুদ্ধ বিভাগ তাদের লেলিয়ে দিয়েছিল। ওদের দিয়েই ওদের দেশকে এবং আফ্রিকা, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার দেশগুলোকে কয়েক শতাব্দী ধরে শাসন সম্ভব হয়েছে। ওরাই যে আজ মুখ ফিরিয়ে! অতএব, ১৭৫৪-তে গ্রেট ব্রিটেনের মাটি ছেড়ে ইণ্ডিয়ার ভূমি স্পর্শ করেছিল প্রথম যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী, আজ ১৯৪৬-এ যদি ভারতের উপকূল ছেড়ে যেতেই হয় ব্রিটিশ বাহিনীকে তাহলে সব ধ্বংস করে দিয়ে যাওয়ার পোড়া মাটির নীতিই তো ভাল! তাছাড়া ইংরেজ নৌ-অফিসারগণ সপরিবারে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধজাহাজ ও নৌ-প্রতিষ্ঠান থেকে তো নিরাপদ আশ্রয়ে ইতিমধ্যে সরেই গিয়েছেন। কিন্তু নেভীর কমপ্লীট ডেসট্রাকসান তো ভারতবাসীর সম্পদেরই ধ্বংস, তাদেরই রক্ত শোষণে এ যুদ্ধ সম্ভার প্রস্তুত হয়েছে; স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষায় এই নৌবহরই কর্মক্ষম হবে। অতএব ধ্বংস হয়ে গেলে সে সর্বনাশ সহস্র সহস্র প্রাণ বলিদানেও কি সে ক্ষতিপূরণ সম্ভব!

তিনদিন অনশনকারী নাবিকদের খাদ্য সরবরাহের আদেশ ও খাদ্য রেশনের উন্নতি ছাড়া আর সমস্ত দাবীই নাকচ করে দেওয়া হলো। প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেণ্ট এটলী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন[১১] নৌ-বিদ্রোহী ও কজন রাজনৈতিক নেতার মধ্যস্থতার কথা; রয়্যাল নেভীর ক্রুজার 'গ্ল্যাসগো'সহ সাতটি যুদ্ধজাহাজ বোম্বাই-করাচীর পথে রওনা হয়ে গিয়েছে, সে কথাও ঐদিন তিনি ঘোষণা করলেন। দিল্লী থেকে যুদ্ধ সচিব ফিলিপ ম্যাসনের প্রচারে জানা গেল—পুনা, করাচী ও বোম্বাইয়ের দিকে নৌ-বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর স্থল ও বিমান বাহিনীর যাত্রা। তথাপি ২২শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র, শ্রমিক ও জনসাধারণের খালি হাতে ইট, পাথর অথবা ব্রিটিশ টমীদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রাইফেল-বন্দুক নিয়ে হাতাহাতি সে অসম যুদ্ধ—হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সে রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ—স্বাধীনতা অর্জনে শেষ রক্তদানের সে অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা।

ন্যাভাল সেন্ট্রাল স্ট্রাইক কমিটির ৩৬ জন সদস্যের অধিবেশন সারা রাত্রি ধরে চললো—সে এক সঙ্কটময় মুহূর্ত নৌ-সেনাদের। সামরিক শিক্ষায় সিদ্ধান্ত

---

[১১] House of Commons – Prime Minister's Speech
dt. 22 February, 1946.

নেওয়ার যে সহজ পদ্ধতি তাঁদের জানা, আজ তা ব্যর্থ হতে চলেছে। রাতের প্রহর শেষ হয়ে আসে—প্রেসিডেন্ট মহম্মদ এম. এস. খানের কণ্ঠ রুদ্ধ, গাল বেয়ে জলের ধারা, জলের ধারা অন্যান্য অনেক সদস্যদেরও। রেটিংগণ একে অপরকে আলিঙ্গন করলেন, চুম্বন করলেন—করুণ সে হাসি-অশ্রুর অপূর্ব মহিমা। জাতীয় নেতাদের আসন্ন ভারত ভাগ ও পদ-সম্পদের প্রাপ্তিযোগের বলি হয়ে গেলেন বিপ্লবীগণ—তাঁরা পরাজিত! তাঁরা কলকাতা, মাদ্রাজ, কোচীন, বিশাখাপত্তনম, করাচী সমস্ত নৌ-ঘাঁটিতে ও যুদ্ধজাহাজগুলোতে সিগন্যাল পাঠিয়ে দিলেন তাঁদের 'ন্যাভাল স্ট্রাইক' প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা—আর, বল্লভ ভাই প্যাটেলের প্রতিশ্রুতির কথা—'কোন রেটিং-এর শাস্তি হবে না'। বিদ্রোহীগণ ঘোষণায় বললেন, জাতীয় জীবনে এই প্রথম বিপ্লব—যেখানে সামরিক ও অসামরিক মানুষের রক্ত একস্রোতে একই লক্ষ্যে মিলিত হয়েছে—যে কাহিনী ভারতের ইতিহাস কোনদিন ভুলে যাবে না। জয়হিন্দ অভিভাষণের সঙ্গে বিদ্রোহের সমাপ্তি হলো। যুদ্ধ বিভাগের চিরদিনের 'সায়লেণ্ট সারভিস'—নেভী, ২৩শে ফেব্রুয়ারী সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার 'সায়লেণ্ট' হয়ে গেল, কিন্তু ইংরেজ শক্তির কাছে নয়, বিদ্রোহীগণ জাতীয় নেতাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিলেন।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কিন্তু তাঁদের কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষায় প্রয়াসী হলেন না। অজ্ঞাত বন্দী শিবিরে 'তলোয়ার', 'ক্যাসল ব্যারাক' এবং 'হিন্দুস্থান' প্রভৃতি জাহাজ ও প্রতিষ্ঠান থেকে রাতের অন্ধকারে রেটিংদের এ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হলো। কল্যাণ, মুলান্দ, মালীর পার্বত্য বন্দীশালা ছাড়াও আলিপুর জেলসহ ভারতের বিভিন্ন কারাগারে নৌ-সেনাদের শাস্তিভোগের পর মুক্তি। বসন্ত সিং শিখধর্মাবলম্বী একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। নৌ-বিদ্রোহে এই যুবক বন্দী অবস্থায় মুলান্দ কারাগারে প্রবেশের মুখে অতি গোপনে জাতীয় পতাকা ও নেতাজীর ছবি তাঁর পোশাকের মধ্যে বহন করে নিয়ে যান। প্রতিদিন সকালে পতাকা উত্তোলন, নেতাজীর ছবিকে শ্রদ্ধা-প্রদর্শন আর জয়হিন্দ ধ্বনিতে বন্দীশালাকে মুখর করে রাখতেন। ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে সাবলেফটেন্যাণ্ট সর্দার রেখী ও শ্রীনাদিং গুড্ডি—পদস্থ অফিসার ও রেটিংদের মধ্যে যোগাযোগ সূত্র রক্ষা করে চলতেন। সাবলেফটেন্যাণ্ট গ্রোভার এক সুযোগ-সন্ধানী ভারতীয় নৌ-অফিসার—ইনি বিদ্রোহীদের ফটোগ্রাফ সমেত ১৭ দফা অভিযোগ ইনকোয়ারী কমিশনের সময় উত্থাপন করেন, কিন্তু এই দেশদ্রোহীর পক্ষে কেউই সাক্ষ্য দেননি।

মহম্মদ আলি জিন্না ও সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের পরামর্শে কয়েকজন নৌ-বিদ্রোহী নেতার আত্মসমর্পণের পক্ষে মতদান, সেদিনের নৌ-সৈনিকদের সুমহান ঐক্যে ভাঙনের সৃষ্টি করে এবং লক্ষণীয় যে, মুসলীম রেটিংদের অধিকাংশই জিন্নাকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু হিন্দু-শিখ রেটিংদের একজনও প্যাটেলের পক্ষে ছিলেন না। স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নৌ-বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ে তাঁর সিঙ্গাপুর সফর থেকে বিদ্রোহীদের প্রেরণাদান করেন এবং যতদূর জানা যায় 'টেলিগ্রাফিক মেসেজ' পাঠিয়ে তিনি বিপ্লবীদের সমর্থন জানিয়েছিলেন; কিন্তু দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর সম্পূর্ণ নীরবতায় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, যদিও বোম্বের চৌপট্টীতে তাঁর বক্তৃতা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।[১২]

'নৌবিদ্রোহী নেতারা অজানা বন্দী শিবিরে যাইতেছে'-এই রকম একটি গোপন ছোট্ট কাগজখণ্ডপ্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলে বোম্বাইয়ের ছাত্র ও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যগণ ক্ষোভ ও বিদ্রোহের অসন্তোষ বৃহৎ ছাত্রসমাজ এবং বোম্বে ডকের সহস্র সহস্র শ্রমিক মহলে ছড়িয়ে দেন। অন্যথায় এই বিদ্রোহী

১২। Jawaharlal Nehru 26 Feb 1946.
Address at Chowpatty, Bombay

"......My heart bled when I read reports of the mounting death rolls I could not resist the temptation of coming to Bombay despite my pre-occupations. The RIN Strike and the city disturbances are inter-related. I shall take up the RIN Strike first. The RIN episode has opened an altogether new chapter in the history of the armed forces of India.

......During the past, these armed forces have worked as a part of the army of occupation and have been freely used as instrument of repression by our foreign rulers. During the Second World War, nearly 20 lakhs of our boys enlisted themselves in the Army, the Navy and the Air Force of these many were politically conscious and some of them had actually been active political workers ... Our armed forces have every right to revolt against the foreign ruler in order to achieve the freedom of our country......In the recent RIN Strike, the brave youths did commit a mistake. But we have to forgive them and do all in our power to prevent any victimisation ......The authorities must hold an open enquiry in to the cases of all RIN boys, not only from Bombay but from all over India......".

—(Mutiny of the Innocent : Page—213–216)

বন্দীদের সংগোপনে হত্যাপর্ব অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা অতি প্রবল ছিল। নৌ-বিদ্রোহের সময় ছাত্র ও শ্রমিক সম্প্রদায় সর্বাধিক সহযোগিতা দিয়েছিলেন—গভর্নমেণ্টের গাড়ী আটক, অগ্নিসংযোগ, রাইফেল, গোলাবারুদ লুণ্ঠন ও বিদ্রোহীদের হাতে বিলিয়ে দেওয়া এবং তাঁদের অনশনের সময় হাজারে হাজারে খাবারের প্যাকেট সরবরাহ, সংবাদপত্র অফিসে ও সাংবাদিকদের সঙ্গে রেটিংদের পরিচয় যোগাযোগ করানোর অমূল্য অবদান।

‘ফোরাম’ পত্রিকার ২৪শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় উল্লেখ করা হয় ‘এইচ. এম. আই. এস. (হিজ ম্যাজেস্টিস ইণ্ডিয়ান শিপ)’ আসামের নাবিকেরা ‘জয়হিন্দ’ ও ব্রিটিশ বিরোধী শ্লোগান দিতেছে—জাহাজের গায়ে ‘ইংরেজ সরকার ভারত ছাড়’—বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। জাহাজে ‘ইউনিয়ন জ্যাক’ (ব্রিটিশ রাজ-পতাকা)-এর পরিবর্তে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড্ডীন। বোম্বাইয়ের সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ নৌ-অফিসার ‘ফ্ল্যাগ অফিসার’ গডফ্রে ধর্মঘটের কারণ অনুসন্ধানে আসিলে তাঁহাকে ‘জয় হিন্দ’ সম্বোধনে অভ্যর্থনা করা হয়।’

এই বিদ্রোহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—ব্রিটিশ সৈন্যের ওপর বিদ্রোহীদের বন্দী করার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ভীত হয়ে সে আদেশ পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে, কিন্তু বাছাই করা ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গভীর রাতে বিদ্রোহীদের বন্দী করে ও কল্যাণের পাহাড়ী দুর্গে রেখে অকথ্য অত্যাচার চালায়। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনশন হওয়ায় অন্য বন্দী-শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং রাজবন্দীর সুযোগ-সুবিধা দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়। জাতীয় পতাকা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য ইংরেজ সৈন্যদের আদেশ দিলেও তারা ভয়ে রাজী হয়নি। বিচারের পর জাতীয় পতাকা ফেরৎ পাবার প্রতিশ্রুতিতে বিদ্রোহীগণ ভারতীয় অফিসারদের হাতে পতাকা অর্পণ করেন। বন্দী শিবিরে আজাদ হিন্দ ফৌজের গান নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে থাকে। শ্রীবিশ্বনাথ বোস ও শ্রীনূরুল ইসলাম সহ ৯ জন বিদ্রোহীকে ৪২ দিন তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসেবে শাস্তিভোগ করতে হয়; সেজন্য বোম্বাই পুলিশের তত্ত্বাবধানে রেলযোগে তাঁদের কলকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হয়। আবার ‘তৃতীয় শ্রেণী’-হাজত বাসের বিরুদ্ধে আলিপুর জেলের সকল বন্দী একযোগে ধর্মঘট করেন এবং বন্দী মুক্তির পর জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি জেলের ফটকে তাঁদের মাল্যভূষিত করে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু এই রাজনৈতিক দলগুলি তাঁদের সদর দফতরে আপ্যায়িত করে ফটো তোলার অনুরোধ জানালে নৌ-বিদ্রোহীগণ প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৪৬-এর নৌবিদ্রোহ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন পাটনা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার সৈয়দ ফজল আলি। অন্যান্য সদস্য নিযুক্ত হন বিচারপতি কে. এস. কৃষ্ণস্বামী, বিচারপতি মহাজন, ব্রিটিশ মিলিটারী ডিপার্টমেন্টের পক্ষে ভাইস এ্যাডমিরাল প্যাটারসন, মেজর জেনারেল রিস্ প্রমুখ। বোম্বে, করাচী, মাদ্রাজ ও কলকাতায় এই কমিশনের অধিবেশন হয় এবং একটি ৬০০ পৃষ্ঠার রিপোর্ট এই কমিশন গভর্নমেন্টের নিকট পেশ করেন—কিন্তু তা আজো অপ্রকাশিত। জনসাধারণের প্রচণ্ড চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী মাত্র ২ হাজার শব্দের যে সামান্য অংশ প্রকাশ পায় তাতে বলা হয়—'কয়েকজন হতাশাগ্রস্ত ও খাদ্য-রেশনে অসন্তুষ্ট রেটিং কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।' যেটুকু সত্য স্বীকার করা হয় তাতে বলা হয়—'আজাদ হিন্দ ফৌজের উপস্থিতি ও তাঁদের জনসম্বর্ধনা এই নৌবিদ্রোহে ইন্ধন যুগিয়েছে।' কয়েক মাসের পর ভারত ভাগ ও ক্ষমতালাভের বিষয়ে রাজনৈতিক নেতাগণ এমন ব্যাপৃত হয়ে পড়েন এবং ঘটনা এত দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে যে, এই ঐতিহাসিক দুঃসাহসিক নৌবিদ্রোহ বিষয়-বিস্মরণে ঢেকে যায়।

নবম অধ্যায়

শেষ প্রহর

আজাদ হিন্দ ফৌজের সুপ্রিম কমাণ্ডার ও আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের রাষ্ট্রপ্রধান নেতাজী। তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনীর ঘনিষ্ঠতম সামরিক অফিসারদের অন্যতম ছিলেন ইউনুস আন্‌সারী। তিনি নেতাজীর অন্তর-বাইরের একটি ছোট্ট বর্ণনা দিয়েছেন—"জীবনে আমি সুন্দর মানুষ অনেক দেখেছি, ব্যক্তিত্ববান পুরুষও কম চোখে পড়েনি, কিন্তু একই সঙ্গে ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য, অথচ ধীর-স্থির, শান্ত-সমাহিত পৌরুষের এমন অপরূপ সমাবেশ আর কারও মধ্যে কখনও দেখিনি।" যে দুর্জয় আশায় জীবনের যা কিছু সম্পদ, উপলব্ধি আহুতি দিয়ে দিনের পর দিন, মাস-বছর, বিনিদ্র দিন-রাত্রি কারাযন্ত্রণা, আহার, নিদ্রা, সুখ, দুঃখ সবকিছু ভুলে শুধু মাতৃভূমিকে তার ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করতে যে দুঃসহ পর্বতপ্রমাণ ভার একা কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছেন—পৃথিবীর এক দিক থেকে আর এক দিগন্তে, আজ সেই নিঃশঙ্ক সব্যসাচীর সম্মুখে এক বড় প্রশ্ন!

তিনি তাঁর গভর্নমেন্ট ও সমর পরিষদের উচ্চপদস্থ অফিসারদের ১৯৪৫-এর ১৪ই আগস্ট শেষ রাতে বলছেন—আপনারা ভুল করছেন, ভারতের স্বাধীনতা-লাভ কিছুতেই দুবছরের বেশী দেরী হবে না। সুতরাং ভেবে দেখুন, আজ যদি ধরা দিই তা হলে কি হবে? যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ইংরেজ আমার বিচার করবে। কিন্তু কোথায়? সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক কিংবা রেঙ্গুনে? না, সে সাহস তারা পাবে না। তাহলে? আমি নিশ্চিত, সে বিচার হবে দিল্লীতে—লালকেল্লায়। এবং বিচারে তারা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করবে। অর্থাৎ আমার মৃত্যুদণ্ড হবে। এবং সেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবে হয় ফাঁসীতে কিংবা ফায়ারিং স্কোয়াডে। কিন্তু তারপর? আমি নিশ্চিত, এই ঘটনার এক মাসের মধ্যেই ভারত স্বাধীন হয়ে যাবে। কারণ যুদ্ধোত্তর ভারতে লক্ষ লক্ষ লোকের মুখ বন্ধ করা যাবে না; ব্রিটিশ প্রচারকের দল কিছুতেই আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীরত্ব গাথা চেপে রাখতে পারবে না। বিচার চলাকালীনই

সমগ্র ভারতবর্ষ পরিণত হবে এক বারুদ স্তূপে। আর সেই স্তূপে অগ্নিসংযোগ ঘটাবে আমার মৃত্যু। এ একেবারে অবধারিত। দ্বিতীয়ত এও হতে পারে, প্রবল বিদ্রোহের আশঙ্কায় ইংরেজ আমাকে বিনাশর্তে মুক্তি দিয়ে দেবে। সে ক্ষেত্রে রাশিয়ায় নয়, আমি আমার মাতৃভূমিতে দাঁড়িয়েই আবার নতুন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে পারবো। সুতরাং আজ যদি এখানে আত্মসমর্পণ করি সেটাই হবে সবদিক থেকে যুক্তিযুক্ত।

লেখনী স্তব্ধ হয়, দেশের স্বাধীনতার জন্য এমন করে সজ্ঞানে স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে মৃত্যুর আহ্বানে সুন্দর ও সর্বাত্মক প্রস্তুতির কথা কেউ ঘোষণা করতে পারেন— কি অনুপ্রেরণায়, তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে লেখা অসম্ভব।

১৯৪৫-এর ১৪ই আগস্ট রেঙ্গুন থেকে সিঙ্গাপুর পৌঁছনোর পর নেতাজী ঘন ঘন মন্ত্রীপরিষদ ও যুদ্ধ বিভাগের উপস্থিত মন্ত্রী ও জেনারেলদের নিয়ে একের পর এক অধিবেশন করে চলেছেন। কারণ, জাপানের উপর আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর জাপানের পতন হতে চলেছে। ইতিমধ্যে লেফটেন্যান্ট কর্নেল লক্ষ্মী স্বামীনাথনের রানী ঝাঁসি বাহিনীর 'ঝাঁসির রানী' নাট্যোৎসবে পৌরোহিত্য করার আমন্ত্রণ! মিউনিসিপাল পার্কে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর বীরত্ব ও আত্মদানের অভিনয় দেখছেন—আর তাঁর অন্তরজগতে, চোখের সামনে ঘটে চলেছে শেষ স্বাধীনতার মরণজয়ী মহাসংগ্রাম, যার নায়ক তিনি নিজে। ঠিক সেই সময় আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের ল-মিনিস্টার এ. এন. সরকার ব্যাঙ্কক থেকে সিঙ্গাপুর এয়ার পোর্টে নেমেই সোজা নাট্যোৎসব সভায় জরুরী বার্তা নিয়ে নেতাজীর চেয়ারের পাশে অস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নেতাজী বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে রাতে সঙ্গে বসে খাওয়ার আমন্ত্রণ করলেন তাঁর আইনমন্ত্রীকে। সেইদিনই সকালে নেতাজী সিঙ্গাপুরে জেনারেল ইটাগাকিকে এক জরুরী বার্তায় জানিয়েছিলেন—যেন কোন অবস্থায়ই জাপ কর্তৃপক্ষ আজাদ হিন্দ ফৌজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ না হন। অন্যথায় জাপানী কর্তৃপক্ষের সে কাজ হবে অন্যায় হস্তক্ষেপ ও অধিকার বহির্ভূত। কারণ জাপ বাহিনীর মত আজাদ হিন্দ বাহিনীও একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আর্মি। কিন্তু জাপ বাহিনীর সাউথ-ইস্ট এশিয়ার কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরাউচির সিদ্ধান্ত ছাড়া নেতাজীর এ প্রস্তাবে রাজী হওয়া সম্ভব নয়, জেনারেল ইটাগাকি তা জানিয়ে দিয়েছেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর পরিষদের জরুরী বৈঠক রাত একটায় শুরু হলো। আগে অতি বিশ্বস্ত অনুগামীদের সঙ্গে ঠিক হয়েছিল, নেতাজী শেষ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে সব সৈন্যবাহিনী সমেত ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে বন্দীত্ব স্বীকার করবেন। কিন্তু আইনমন্ত্রীর সংবাদ—হিকারী কিকানের অধিকর্তা জেনারেল ইসোদা ও আজাদ হিন্দ সরকারে জাপানী মন্ত্রী হাচিয়া নেতাজীকে মালয় ও থাইল্যাণ্ড থেকে আরো পূর্বে এমন কোনো নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য সাহায্য করতে উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন, সেখানে গেলে ইংরেজ-আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর হাতে তাঁর বন্দী হওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে যাবে। এই সংবাদে আলোচনার সূত্র নতুন মোড় নিতে থাকে। সকলেরই মত—আজাদ হিন্দ ফৌজ সিঙ্গাপুরে থেকে আত্মসমর্পণ করুক, কিন্তু নেতাজী সেখানে কিছুতেই উপস্থিত থাকতে পারবেন না। আশ্চর্য ঘটনা, সাম্যবাদী, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া বাধ্য হয়েই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ও ধনতন্ত্রী আমেরিকার সঙ্গে সাময়িকভাবে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করলেও সে মৈত্রী যে স্থায়ী হবে না, নেতাজীর ক্ষুরধার বুদ্ধির বিচারে তা সুস্পষ্ট ছিল। তারই চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে সানফ্রান্সিসকোতে রুশ-মার্কিনী অনৈক্যের মধ্যে। (এপ্রিল মাসের শেষেই জার্মানীর পতন হয়েছে)। অতএব, ব্রিটিশের যে শত্রু, ভারতের সেইই মিত্র—একথা নেতাজী ঘোষণা করলেও তিনি এখন পুনরায় ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে তাঁর আত্মসমর্পণের পক্ষে যুক্তিজাল তৈরী করে দেখাচ্ছেন, তারতে তাঁর বিচার ও মৃত্যু ঘটলে একমাসের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ঘটবে। কিন্তু তাঁর আইন সচিবের পরামর্শ এই যে, নেতাজী ভিন্ন অন্য সৈন্যাধ্যক্ষ ও মন্ত্রীরা আত্মসমর্পণ করলে ভারতের মাটিতে তাঁদের বিচারের সময় যে বারুদস্তূপ সৃষ্টি হবে, নেতাজী বাইরে থাকলে তাঁর দ্বারাই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির একমাত্র সম্ভাবনা—অন্যথায় কারুর পক্ষেই তা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত সারারাত বরাবর কনফারেন্স শেষে যুদ্ধ ও মন্ত্রীপরিষদে নেতাজীর ঘোরতর প্রতিবাদ সত্ত্বেও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, নেতাজী আত্মসমর্পণ করবেন না।

তার অনেক আগেই ১৯৪৫-এর এপ্রিলে জাপ সৈন্যবাহিনীর ব্রহ্মদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার মুহূর্ত থেকেই নেতাজী সঙ্গীন পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছিলেন এবং ঐ মাসের শেষের দিকে তাঁর গভর্নমেন্টের শ্যাম ও মালয়ের অসামরিক অফিসারদের সাহায্যে ঝাঁসি রানী বাহিনীর বেশীরভাগ নারী সৈন্যদের উনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাঁদের নিজ নিজ পরিবারে নিরাপদে পাঠাবার ব্যবস্থা

করেছিলেন। অবশিষ্টদের তিনি তাঁর ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লীগ বা ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের ৫০ জন অফিসারের পরিচালনায় ২৪শে এপ্রিলের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিজ নিজ গৃহে পৌঁছে দিয়েছিলেন। দীর্ঘ দুর্গম পথে এই সময় তাঁর গভর্নমেণ্টের কয়েকজন মন্ত্রী উধ্ব'তন অফিসারসহ কখনও নিজেই তিনি সঙ্গী ছিলেন এবং জাপ কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে নারী সৈন্যদের জন্য কিছু ট্রান্সপোর্টেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়—আজাদ হিন্দ বাহিনীর মধ্যে ছিল তার সুভাষ রেজিমেণ্টের ১ নং ব্যাটেলিয়ান থেকে নির্বাচিত দুটো 'সুইসাইড স্কোয়াড'—প্রতি স্কোয়াডে আড়াইশ করে দুঃসাহসী মরণজয়ী সৈনিক। তাঁদের পায়ে হাঁটা পথে তিনি মৌলমিন পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যথাসময়েই।

১৯৪৫-এ আমেরিকা জাপানের হিরোসিমায় ৬ই আগস্ট এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, মৃত্যু হয় ১ লক্ষ ১৩ হাজার ২৭১ ; নাগাসাকীতে ৯ই আগস্ট দ্বিতীয় এ্যাটম বোমায় ৬৪ হাজার ১৮৬ জন আত্মবিসর্জন দেয় (পরবর্তীকালের রিপোর্ট অনুযায়ী)। ১৫ই আগস্ট জাপান সরকারীভাবে আত্মসমর্পণ ঘোষণা করলো। ব্রিটিশ-আমেরিকান মিত্রবাহিনীর পূর্ব-এশিয়া খণ্ডের প্রধান সেনাপতি ডগলাস ম্যাকার্থার তাঁর বিশাল নৌ-বাহিনী নিয়ে জাপানের মূল ভূখণ্ডে অবতরণে এগিয়ে আসছেন। জাপানের মিত্রশক্তি আজাদ হিন্দ ফৌজকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে নেতাজী সিঙ্গাপুর ত্যাগ করলেন ১৬ই আগস্ট। শুরু হলো ইতিহাসের চিররহস্য। বর্তমান শতাব্দীর বৃহত্তম বিস্ময়, এক বিচিত্র ইতিহাস—যে ইতিহাসের মহাজিজ্ঞাসা—(১) নেতাজী কি এখনো জীবিত ? অথবা (২) তাঁকে হত্যা করা হয়েছে ? কিংবা, (৩) স্বাভাবিকভাবে দৈহিক মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করেছে ? অথবা (৪) বৈরাগ্যে তাঁর মহোত্তরণ ?

ভাবালুতা বা মনস্তাত্ত্বিক উচ্ছ্বাস নয়, ইতিহাসের কষ্টিপাথরে আমাদের এ চারটি প্রশ্ন ও সম্ভাব্য উত্তর খুঁজে পেতে হবে। ইতিহাস একান্ত নিস্পৃহ বস্তু। নির্মম তার বিচার, নির্বেদ তার স্বরূপ। কারুর প্রতি, কোন কিছুর প্রতিই সে দৃকপাত করে না—এই তার নীতি—তাই সে কঠিন কঠোর। ঘটনাপ্রবাহ তার নীতি নির্ধারণ করে মাত্র, বিরুদ্ধ রাজনীতি বা কূটনীতি বা রণনীতি হয়ত তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে আপাত-মোহাচ্ছন্ন করতে পারে কিন্তু সত্য যা, তা বড় নগ্নরূপেই এক সময় প্রতিভাত হয়। তাই, দ্বিতীয় মহাসমরের শেষপর্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কি পরিণতি হলো, তা তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্য দিয়েই আমাদের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

৩ নং অনুমানের বক্তব্য—স্বাভাবিকভাবে নেতাজীর দেহাবসান যদি প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে ১ম, ২য় ও ৪র্থ এই তিনটি প্রশ্ন কিংবা প্রশ্নোত্তরের আর প্রয়োজন পড়ে না। এইখানেই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণকে প্রথমত আমাদের কেন্দ্রীভূত করতে হবে। কোনও জায়গায়, কোন রোগ পীড়ায় নেতাজীর হঠাৎ দেহাবসানের কোন কাহিনী বসু-পরিবারের কোন ব্যক্তি বা কোন ভারতবাসীর কাছ থেকে কোন সূত্রেই পাওয়া যায়নি। জাপান ও ভারতের ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এবং পণ্ডিত নেহরু ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট এক বিমান দুর্ঘটনায় ফরমোজার হাসপাতালে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে—এই কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কারণ, জাপান সরকার নিয়ন্ত্রিত টোকিওর 'দোমেই এজেন্সী' নামে সংবাদ প্রতিষ্ঠান ২২-২৩শে আগস্ট প্রথমে উপরিউক্ত ঘোষণা করে। তারপর রয়টার সে সংবাদ সারা বিশ্বে প্রচার করে দেয়। ঘটনার বিবরণ এইরকম ঃ

মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানীকে সাময়িক ভারত গভর্নমেণ্ট অর্থাৎ আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিনিধিরূপে সিঙ্গাপুরে দায়িত্বভার অর্পণ করে নেতাজী তাঁর গভর্নমেণ্ট ও সমর পরিষদের সেই মুহূর্তে উপস্থিত সদস্য এস. এ. আইয়ার (ক্যাবিনেট মন্ত্রী), কর্নেল হবিবুর রহমান (সমর বিভাগে চীফ-অফ-স্টাফ), মিস্টার নেগিশী (জাপানী দোভাষী), এবং কর্নেল প্রীতম সিং (সমর বিভাগ) সমভিব্যাহারে ব্যাঙ্ককে পৌঁছান। এই উদ্দেশ্যে একটি বোমারু বিমান বিশেষভাবে চার্টার করা হয়। বিমানে করে ১৬ই আগস্ট সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাঙ্ককে পৌঁছেই নেতাজী সেখানে মেজর জেনারেল জে. কে. ভোঁসলে, মন্ত্রী দেবনাথ দাস, কর্নেল গুলজারা সিং, মেজর আবিদ হাসান সাফরানী এবং জেনারেল ইশোদা ও মিস্টার হাচিয়া সহ জাপ সামরিক অফিসারদের সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়ে রাশিয়া চলে যাওয়ার প্ল্যান নিয়ে সমস্ত রাত্রি ধরে আলোচনা করেন। এ বিষয়ে সহযোগিতার জন্য জাপানের 'সাদার্ন আর্মি' হেড কোয়ার্টার্সে' যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে নেতাজী ১৭ই আগস্টের সকালেই উপরিউক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সায়গন যাত্রা করেন।

কর্নেল প্রীতম সিং-এর সায়গন বিমানঘাঁটির বক্তব্যে জানা যায়, বিপর্যস্ত জাপ সরকারের আত্মসমর্পণের মুখে লুকিয়ে নেতাজীকে অতি গোপনীয় স্থানে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে তাঁর সঙ্গে এত বড় দল নিয়ে যেতে তাঁরা নারাজ হন ; কারণ নেতাজীর নিরাপত্তার জন্য শুধুমাত্র তাঁর একক সেই 'আন্‌নোন্ ডেস্টিনেশন'—অজ্ঞাত গন্তব্যস্থলে যাওয়া দরকার। নেতাজী

এবিষয়ে জেনারেল ইশোদা ও মিস্টার হাচিয়াকে বলেন, সেই 'আন্নোন্ ডেস্টিনেশন'-এ তিনি নিজেকে লুকোবার বা আত্মরক্ষার জন্য যাচ্ছেন না, তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। অতএব সে জন্য তাঁর গভর্নমেন্টের কয়েকজন অফিসারের তাঁর সঙ্গে যাওয়া একান্ত দরকার —তাই তিনি হবিবুর রহমান, এস. এ. আইয়ার, প্রীতম সিং, দেবনাথ দাস, গুলজারা সিং ও আবিদ হাসান সাফরানী—এই ছয়জনকে বোমারু বিমানে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। জেনারেল ইশোদা ও মিস্টার হাচিয়া এই প্রস্তাব নিয়ে একটি বিমানে করে নিকটবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপানী হেড কোয়ার্টার্সের অধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরাউচীর কাছে দালাতে নির্দেশ গ্রহণ করতে যান (ফিল্ড মার্শাল তেরাউচী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের অন্যতম প্রধান সেনাপতি, মাঞ্চুরিয়া থেকে বর্মা পর্যন্ত যুদ্ধ অঞ্চলের অধিনায়ক এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সমপর্যায়ের ছিলেন) এবং ফিরে এসে, সময় ও পরিস্থিতির বিচারে কাউন্ট তেরাউচীর মতামত জ্ঞাপন করেন যে, একমাত্র নেতাজীকেই নিয়ে চলে যাওয়া হবে এবং তাদের সমগ্র জাতীয় বিপর্যয়ের মুখেও "টু রেসপেক্ট নেতাজী'স লাস্ট উইসেস"—তাঁদের মহাসম্মানিত বন্ধু ভারতের রাষ্ট্রনায়ক, নেতাজীর শেষ ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাবশত শেষ পর্যন্ত শুধু একজনকে সঙ্গী করেই (কর্নেল হবিবুর রহমানকে) নিয়ে যাওয়া হবে,[১] এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে।

সায়গন ও দালাত বিমানঘাঁটিতে বিস্তৃত ও গোপন আলোচনা প্রভৃতির জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় এবং সায়গন থেকে বিমান ছাড়তে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। (যে ঘটনাগুলোর বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, তা সমস্তই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ চীন সাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলের ঘটনা। সিঙ্গাপুরের উত্তরে থাইল্যাণ্ডের মধ্যে ব্যাঙ্কক; তার পূর্বে লাওস ছাড়িয়ে ভিয়েৎনামে সায়গন অবস্থিত। এখান থেকে বহুদূর পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তাইওয়ান বা ফরমোজা দ্বীপে তাইহোকু বিমানবন্দর ; সেখান থেকে বিমান বা সমুদ্র

১। Dissentient Report : Suresh Chandra Bose—pp.–72–73
১৯৫৬ সালে গঠিত নেতাজী তদন্ত কমিটির শাহনওয়াজ খান, এস. এন. মৈত্র ও সুরেশচন্দ্র বসু—এই তিনজন সদস্যের মধ্যে সুরেশচন্দ্র বসু অন্য দুজন সদস্যের রায়ের বিরোধী রায় দান করেন—তাঁর সেই রায় Dissentient Report নামে প্রকাশিত হয়।

পথে দূর উত্তর-পূর্বে জাপান দেশ—রাজধানী টোকিও। আর চীনের উত্তর-পূর্বাংশের নাম মাঞ্চুরিয়া, এরই উত্তর-পূর্বে সোভিয়েট রাশিয়া। মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণতম প্রণালীর বিমানবন্দর দাইরেন ও পোর্ট আর্থার।)

সায়গন বিমান বন্দর পর্যন্ত নেতাজীর চাঞ্চল্যকর বিমানযাত্রা বিষয়ে ভারতীয়-জাপানী-ব্রিটিশ-আমেরিকান সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে বিশেষ কোনো মতপার্থক্য লক্ষ্য করার নেই। নিরুপায় হয়ে একমাত্র ভারতীয়—আজাদ হিন্দ সেনা-দপ্তরের চীফ-অফ-স্টাফ কর্নেল রহমানকে নিয়ে—আরো দশজন, মতান্তরে বারোজন জাপানী সামরিক ও অসামরিক অফিসার, পাইলট, ইঞ্জিনিয়ারসহ নেতাজী প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকারে সায়গন ত্যাগ করেন। প্রায় দু-ঘণ্টা পর রাত্রির জন্য তুরেন বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। আর ঐ রাত্রির অন্ধকারেই হারিয়ে গেছে পরবর্তী ইতিহাস। কারণ, এখনকার প্রেক্ষামঞ্চে আর শুধু জাপান নয়, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুটি শক্তিশালী মহারাষ্ট্র আমেরিকা ও রাশিয়া—তাদের রাজনীতি ও সমরনীতির ঘেরা জালের মধ্যে সাময়িক স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান ও জাতীয় সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কম্যাণ্ডার নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আবৃত করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-সূর্য কতকাল অস্তমিত হয়েছে (আমেরিকানদের পরিভাষায় এখন সে তাদের ঊনপঞ্চাশতম রাষ্ট্রে পরিণত), তাদের শ্রেষ্ঠ শত্রু বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্রের জন্য আজ আমাদের দৃষ্টি বর্তমান পৃথিবীর তৃতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের দিকে যতোটা না, তার থেকে বেশী মস্কো ও ওয়াশিংটন এবং নিজ দেশ ভারতের রাজধানী দিল্লীর দিকে ফিরতে চায়—আমাদের সেই মহত্তম ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসীর কায়া অথবা ছায়ার কোন হদিশ যদি পাওয়া যায়।

সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৭টার মধ্যে অর্থাৎ সায়গন থেকে ২ ঘন্টার দূরত্বে বিমান আরোহীদের তুরেন বন্দরে রাত্রির জন্য ১৭ই আগস্ট থামতে হয়। নেতাজী তদন্ত কমিটির সম্মুখে কর্নেল হবিবুর রহমান—সাক্ষী নম্বর ৪ বলেন, তুরেনে বিমান ছাড়বার মুখে নেতাজী এসে পৌঁছোন—পরনে বুশশার্ট, কোট, খাকী ড্রিল ট্রাউজার—সমস্তই সূতীর তৈরী, সার্জের তৈরী টুপি, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ব্যাজ আর শু (অসামরিক ভারতীয় আজাদ হিন্দ অফিসারের পোশাক)। লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল টি. সাকাই (জাপানী সামরিক অফিসার যাত্রী)-এর লিখিত বক্তব্যে জানা যায়, ১৮ই আগস্ট দুপুরে তাঁদের বিমান, যে বিমানে প্রচুর পরিমাণে মেসিনগান, ছোট কামান, ব্রেন-গান ও বহু গোলাবারুদের বাক্স ভরে নেওয়া হয়েছিল, তুরেন বন্দরে সবই

প্রায় নামিয়ে জ্বালানি তেল প্রচুর পরিমাণে নেওয়া হল এবং প্রায় দুটো-আড়াইটায় আবার আকাশে উড়ল। কর্নেল এস. নোনোগাকী—সাক্ষী নম্বর ৩৭ এবং মেজর টী. কোনো—সাক্ষী নম্বর ৪১—দুইজন দু'রকম বক্তব্য বলেছিলেন। নোনোগাকীর কথা—শত্রুবিমান দক্ষিণ চীনের সোয়াতানের কাছাকাছি দেখা গেছে, সে জন্য তাদের ঘুরপথে পূবের দিকে উড়ে যেতে হয়, আর দ্বিতীয় জন, অর্থাৎ কোনোর কথা—যেহেতু রাশিয়া ইতিমধ্যে পোর্ট-আর্থার অধিকার করে নিয়েছে, এর পরেই দাইরেনে এসে পড়বে, অতএব তার আগেই নেতাজীর বিমান সেখানে অতি তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া দরকার।

'নেতাজী এনকোয়ারী কমিটি'র সম্মুখে সাক্ষ্য দান করেন—সাক্ষী নম্বর ৫১—ক্যাপ্টেন এম. নাকামুরা (ইয়ামামোতো), ইনি সে সময় তাইহোকু বিমান বন্দরের গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার ও বিমান বাহিনীর অফিসার। তাঁর বক্তব্য: ১৭ অথবা ১৮ই আগস্ট এক বড় ধরনের বিমান দুর্ঘটনা ঘটে, যাতে মিস্টার সুভাষচন্দ্র বোস, জেনারেল শিদেই এবং অন্যেরা আক্রান্ত ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি নব্বুই ভাগ নিশ্চিত যে, ১৮ই আগস্ট ঐ দুর্ঘটনা ঘটেনি। কারণ সেদিন প্রায় ৩০টি আমেরিকান বিমান ফিলিপাইনস থেকে তাইহোকুতে নেমেছে এবং অনেক জাপানী বিমান সেই বিমান বন্দরে ওঠা-নামা করেছে—তার প্রত্যেকটিই তিনি দেখা-শোনা করেছেন। আর নেতাজীর পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—তিনি 'টপ বুট' এবং নিশ্চিতভাবেই 'ব্রিচেশ' পরেছিলেন, সামরিক উর্ধ্বতন অফিসারের পোশাক; অথচ অসামরিক পোশাকেরই বিষয় রহমান বর্ণনা দিয়েছেন। কর্নেল নোনোগাকীর মতে যদিও নেতাজীর বিমানটা ছিল ৯৭ কে. ভি. হেভী বম্বার কিন্তু খুব পুরোনো হয়ে যাওয়ার জন্য তখন এটাকে 'ট্রান্সপোর্ট প্লেন' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল অথচ জেনারেল ইশোদা—সাক্ষী নম্বর ৩৫, সুনির্দিষ্টভাবেই এটিকে দাবী করেছেন 'ব্র্যাণ্ড নিউ প্লেন'।[২]

নেতাজীর পোশাক ও প্লেন সম্বন্ধে উপরিউক্ত বিচিত্র ও বিরুদ্ধ রিপোর্টের সঙ্গে আর একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা হচ্ছে, তিন ভিন্ন নামের তিনজন ব্যক্তি দাবী করেছেন, নেতাজী যে বোমারু বিমানে তাইহোকু বিমান বন্দরে অবতরণ করেন সে বিমান তিনিই চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'নেতাজী তদন্ত কমিটি'—(শাহনওয়াজ কমিটি) প্রকাশ করেছেন, 'বিমানটির মুখ্য

---

[২] Dissentient Report: pp. 83-84

চালক ছিলেন মেজর তাকিজাওয়া। প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে তাইহোকু বিমান বন্দরের ভারপ্রাপ্ত গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন নাকামুরার বক্তব্য। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কর্নেল নোনোগাকীই ছিলেন সেই বিমানের মুখ্য চালক। কথাটা তিনি বলেছিলেন খোসলা সাহেবের সামনে[৩] গত সাতই এপ্রিল একাত্তরে। এর থেকে আশ্চর্যের কথা বলেছিলেন তৎসুও হায়াশিদা—সাক্ষী নং ৪৭। এই হায়াশিদার মতে, তাকিজাওয়া কিংবা নোনোগাকী—এ দুজনের কেউই নন, সেই বিমানটি সায়গন থেকে তাইহোকু পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন ডবল্যু. আইওয়াগি। এই আইওয়াগিই ছিলেন বিমানের মুখ্য চালক।'[৪]

এর পর সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক অংশটি বলা দরকার। তাইহোকুর মিলিটারী হাসপাতালের অফিস থেকে—যেখানে 'ডেথ সার্টিফিকেট' অর্থাৎ কেউ মরলে তার নাম-ধাম, ঠিকানা এবং রোগ-ভোগ ও মৃত্যুর কারণ, সময়, এবং মৃতদেহ প্রভৃতি বিষয়ে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, সেই 'ডেথ সার্টিফিকেটের' বিষয়। ডঃ টি. ইয়োশিমি (Dr. T. Yoshimi : Witness No. 48) তখন নানমন মিলিটারী হসপিটালের মেডিকেল অফিসার-ইন-চার্জ ; আর মেডিকেল অফিসারদের অন্যতম ডঃ সুরুতা (Dr. T. Tsuruta : Witness No 39)। শাহনওয়াজ কমিটির নিকট (সাক্ষী নং ৩৯) তাঁর সাক্ষ্যে জানা যায়, ১৮.৮.৪৫ তারিখে প্রায় ২-৩০ মিনিটে নেতাজীকে হাসপাতালে আনা হয়। ...তাঁর অবস্থা ভালো নয় দেখে ডঃ সুরুতাকে ভিটা ক্যামফোর (Vita Camphor) ইনজেকশন আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ডঃ ইয়োশিমি অন্যদের দেখতে গেলেন। তিনি মিস্টার বোসকে কর্নেল রহমানের সঙ্গে খুব নীচু স্বরে কথা বলতে দেখলেন। তাঁর 'পালস' খুব দুর্বল দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভিটা ক্যামফোর ও ডিজিটামাইন (Digitamine) ইনজেকশন দিলেন কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না—সন্ধ্যা ৮টার অল্প কিছু পরেই মিস্টার বোস শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

---

[৩] পণ্ডিত নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ১৯৫৬ সালে নেতাজী এনকোয়ারী কমিটির রায়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জনমত সৃষ্টি হওয়ায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্ব সময়ে ১৯৭০ সালে অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস. তথা জাস্টিস জি. ডি. খোসলার পরিচালনায় একক 'খোসলা কমিশন' গঠিত হয়, ১৯৭৪ সালে সংসদে খোসলা কমিশন রিপোর্ট দেওয়া হয়।

[৪] শ্যামল বসু : সুভাষ ঘরে ফেরে নাই—পৃষ্ঠা ৬৯১

তাইহোকু আর্মি হেড কোয়ার্টার্স-এর সেকেণ্ড এ্যাডজুট্যাণ্ট মেজর এস. নাগাতোমো-র সাক্ষ্য (সাক্ষী নং ৬০) বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি এরোড্রাম থেকে বিমান দুর্ঘটনা বিষয় এবং নেতাজীর অবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং মৃত্যুর খবর পর পর বিকেল ৩টার মধ্যেই পেয়ে গেছেন। এরপর আর্মি কম্যাণ্ডার জেনারেল আঁদো হাসপাতালে যান এবং ৪টার মধ্যে নেতাজীর মৃতদেহ দেখতে পান এবং মেজর নাগাতোমো ও জেনারেল আঁদো আবার ৫টার মধ্যেও দেখতে পান—তাহলে ডঃ ইয়োশিমি ৮টার পর মিঃ বোসকে মারা যেতে দেখেছেন—অথচ বিকেল ৩টা থেকে ৫টার মধ্যে তাঁর মৃতদেহ দুই মিলিটারী অফিসার দেখেছেন, বললেন।[৫]

ডাক্তার ইয়োশিমি নেতাজীর জন্য যে 'ডেথ সার্টিফিকেট' দেন তাতে মৃতের নাম লেখা 'কাতা কানা'—'চন্দ্র বোস' নয় ('চন্দ্র বোস' নামই জাপানী কাগজপত্রে ব্যবহার হতো যুদ্ধের সময়)। বোম্বের 'ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়া নিউজ এজেন্সী'র প্রতিনিধি হারিন শা এর একবছর পর ঐ হাসপাতালের রেকর্ড 'ফোটোস্ট্যাট' করে দেখতে পান, সেখানে রয়েছে 'ওকারা ইচিরো' এবং এই ইচিরো ১৯শে আগস্ট মারা যান, আর ডাক্তার ছুলকা তোয়েজীর স্বাক্ষরে তা রয়েছে, ডাক্তার ইয়োশিমির নয়, যিনি তাঁর চিকিৎসা করেছেন এবং ডেড বডি নিয়ে যেতে তাঁর স্বাক্ষরে নির্দেশ দিয়েছেন। হবিবুর রহমান বলেছেন, নেতাজীর মাথার বাঁদিকে এক ৪ ইঞ্চি গভীর গর্ত হয়ে যেতে তিনি দেখেছেন—কিছুতেই রক্ত বন্ধ করা যাচ্ছে না। অথচ ইয়োশিমি বলেছেন, কোন হেড ইনজুরিই ছিল না তাঁর মাথায়, তিনি 'হার্ট এ্যাটাকে' মারা যান। আর তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর পর তাঁকে দাহ করার বিষয়ে তাঁর একমাত্র ভারতীয় সঙ্গী রহমান একবার বলেন ১৯শে আগস্ট, আর একবার ২০শে ও অন্য এক সময়ে বলেছেন ২১শে আগস্ট সে কার্য সম্পন্ন করান তিনি ;

৫। Dissentient Report : p—136
('Major S. Nagatomo, Witness No. 60, has stated that, as Second Adjutant in the Army Headquarters at Taihoku, he received a series of telephone messages from the aerodrom and subsequently from the hospital about the plane crash, injuries to Netaji, his treatment in the hospital and subsequent death, which news he also received at about 3 P M., after which the Army Commander, Gen. Ando, went to the hospital and saw Netaji's dead body within 4 P.M. and he, the Major, saw the dead body also within 5 P.M.')

এবং তাঁর ও জাপ সরকারের ঘোষণায় সে মরদেহ টোকিওতে পাঠানর নির্দেশের কথা, টোকিওতে দাহ করার কথা বলা হয়েছে। আবার ফরমোজাতেই সে দেহ পুড়িয়ে তার চিতাভস্ম সেখানে রেনকোজী মন্দিরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে—যদিও আমেরিকান গোয়েন্দা বিভাগ দুজন ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট অনুযায়ী ঘোষণা করেছেন—ঐ চিতাভস্ম কোন মানুষের নয়, যে কোন প্রাণীর, সম্ভবত কুকুরের দেহভস্ম।[৬]

ভারত সরকারের এই আধা-বিচার-বিভাগীয় কমিশনগুলোতে সাক্ষীদের বক্তব্যে বিচিত্র রকমের গরমিল ও বৈপরীত্য থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪৫-এর ১৮ই আগস্ট ফরমোজার তাইহোকুর বিমান বন্দরে কোনো বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি—বিশেষ করে মাদ্রাজের এম.এল.এ. ইউ মথুরালিঙ্গম থেবর শাহনওয়াজ কমিটির কাছ থেকে তাঁর সাক্ষ্যদানের পূর্বে লিখিতভাবে জানতে চান (১৯৫৬ সালে), যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় নেতাজীর নাম তখনো আছে কিনা, কমিটি সে বিষয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করায় শ্রীথেবর তাঁর সাক্ষ্যদান করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ, চীনের স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্বে ১৯৪৯ সালের শেষদিকে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে তিনি সেখানে বেআইনি প্রবেশ করেছিলেন নেতাজীর অগ্রজ শরৎ বসুর সাহায্যে। তিনি চীনে যে চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন, তা যুদ্ধ অপরাধীর তালিকায় নেতাজীর নাম নেই এ বিষয়ে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। যাইহোক, এ সমস্ত বিষয় মানুষের যুক্তিবাদী মনের কাছে গ্রহণীয় নয় সুস্পষ্ট জেনেও শাহনওয়াজ কমিটির চেয়ারম্যানসহ দুজন সদস্য মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান ও শ্রী এস. এন. মৈত্র আই.সি.এস.—নেতাজী ঐ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত বলে রায় দিলেন, কিন্তু অন্যতম সদস্য নেতাজীর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু উপরিউক্ত দুজনের মতের বিরোধী রায় (Dissentient Report) দিলেন যে, নেতাজীর মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই এবং শ্রীথেবর ও শ্রীগোস্বামীর বক্তব্যে এটা স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেছে যে, নেতাজী মৃত নন। তাঁর রায়ের শেষ প্যারাতে তিনি বলেন, "I consider myself extremely unfortunate in having been victim of such machinations on the part of some of the highest officials of our Government, apparently, because I did not fall in with their opinion was that Netaji was dead because my considered opinion was that the evidence placed before us justified the only

---

৬। অমৃতবাজার পত্রিকা—১৫.৪.৬২

me the requisite conclusion that Netaji did not die. He in His Grace has given strength and courage to do what I have been able to do in the service of my esteemed countrymen in my humble way keeping aloft the banner of Truth and Justice."

Satyameba Jayate !! Jai Hind !![৭]

ভাবানুবাদ ঃ আমাদের গভর্নমেণ্টের সর্বাপেক্ষা উচ্চতম কতিপয় ব্যক্তির বাহ্যত ষড়যন্ত্রের বলি হয়ে নিজেকে একান্ত হতভাগ্য বিবেচনা করছি—কারণ আমি তাঁদের মতামতের সঙ্গে একমত হয়ে বলতে রাজী নই যে, নেতাজী মৃত, এবং আমার সুচিন্তিত মত যে, যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে তাতে একটি মাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, নেতাজী মারা যান নি। তিনি তাঁর করুণায় আমাকে যথা-প্রয়োজন শক্তি ও সাহস দিয়েছেন যা করতে, তাই আমি করেছি। সত্য ও ন্যায় বিচারের নীতিকে সর্বোপরি রেখে আমার সশ্রদ্ধ দেশবাসীর কার্য আমার সাধ্যের মধ্যে করেছি।

সত্যমেব জয়তে !! জয়হিন্দ !!

কলকাতা,
মহালয়া,   স্বাঃ সুরেশচন্দ্র বসু
৩রা অক্টোবর, ১৯৫৬   বেসরকারী সদস্য, নেতাজী তদন্ত কমিটি

ভুলাভাই দেশাই, যিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিদের পক্ষে ব্রিটিশ মিলিটারী আদালতে বিচারের সময় ব্যারিস্টারদের মধ্যে প্রধান আইনজ্ঞ ছিলেন, তিনি মৃত্যুর পূর্বে রোগশয্যার পাশে কর্নেল হবিবুর রহমানকে এক প্রাণস্পর্শী আবেদন করেন—"Colonel, please say—only once at least, Subhas is living and positively."—কর্নেল, তোমাকে অনুরোধ করছি—অন্তত একবার বল—সুভাষ বেঁচে আছে এবং নিশ্চিতভাবে।" "The helpless Colonel evasively stated, 'I am a soldier, I am bound to obey the order.'—অসহায় কর্নেল এড়িয়ে গিয়ে বললেন—'আমি একজন সৈনিক, আমি আদেশ মেনে চলতে বাধ্য' !" কিন্তু কার আদেশ ?

অবশ্য এখানে বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন যে 'নেতাজী তদন্ত কমিটি' গঠন করার প্রয়োজন গুরুতর হয়ে পড়েছিল। কারণ লালকেল্লার বিচারমুক্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান স্বয়ং লক্ষ লক্ষ লোকের কলকাতা-জনসভায় ২৩শে জানুয়ারী ১৯৫১-তে ঘোষণা করেন, "আগামী বৎসর

---

[৭] Dissentient Report......page 181

যখন তাঁহারা নেতাজীর ৫৬তম জন্মোৎসব করিবেন, তখন তিনি (নেতাজী) স্বয়ং তাঁহাদের মাঝে একান্তভাবে থাকিবেন বলিয়া আশা করেন।" তদন্ত কমিশন পরিচালনার সময় চেয়ারম্যান, নেতাজীর সহকর্মী স্বয়ং মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ তা অস্বীকার করায় অন্যতম সাক্ষী (Witness No. 24) নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅরবিন্দ বসু ২৪. ৪. ৫৬ তারিখে এ বিষয়ে চ্যালেঞ্জ জানান এবং অন্যান্য পত্রিকাসহ ২৪শে জানুয়ারী ১৯৫১ তারিখের হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড এবং ২৫শে জানুয়ারী ১৯৫১ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা কমিশনের সামনে উপস্থিত করেন। আসলে আইনের এবং ইতিহাসের পদ্ধতি অনুসরণ না করে, বিশেষত মানবিকতার বিচার অগ্রাহ্য করে যেন রাজক্ষমতা ও ঔদ্ধত্য তার ওপর রক্তচক্ষুর কটাক্ষপাত করতে থাকে—এ সত্য নিম্নলিখিত অবস্থা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে।

১৯৫২ সালের ৫ই মার্চ ভারতীয় পার্লামেণ্টে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু মাননীয় এম.পি. শ্রী এইচ. ভি. কামাথের প্রশ্নোত্তরে বলেন—'I have no doubt in my mind···There can be no enquiry about that.' প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতের সর্বোচ্চ জনআদালত, লোক-সভার কক্ষে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'আমার মনে কোন সন্দেহ নাই, তখনো ছিল না এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের মৃত্যু সম্বন্ধে আজ নিঃসন্দেহ হয়েই সে কথা বলছি। আমি বলছি যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের মৃত্যুর প্রশ্নটি, আমি মনে করি, সন্দেহাতীতভাবে স্থির হয়ে গিয়েছে। সে বিষয়ে কোন তদন্ত হওয়ার দরকার নাই।' এবং তিন বছর পরেই অর্থাৎ ১৯৫৫ এর ৬ই অক্টোবর নেতাজী 'স্মারক সমিতির' অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে শাহনওয়াজও ঘোষণা করেছিলেন—প্রধানমন্ত্রীর কোনরকম তদন্ত সংগঠনের অনিচ্ছার কথা। অথচ সেই শাহনওয়াজকেই চেয়ারম্যান করে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে 'নেতাজী তদন্ত কমিটি' গঠন করতে হয়েছিল। ইতিহাসের এ অতি আশ্চর্য, দুর্বোধ্য স্বরূপ! শাহনওয়াজ কমিটীর তদন্ত রিপোর্টের রায়ের বর্ণনা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে, অবশ্য বলা হয়নি শ্রী শাহনওয়াজের এ যোগ্যতার পেছনে কোন কারণগুলি কাজ করেছে। তাঁর তিন পুরুষ ধরে ব্রিটিশ রাজের প্রতি গভীর আনুগত্য, পরাজিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মির বন্দী সৈনিক হিসাবে আজাদ হিন্দ ফৌজে তাঁর যোগদান না করতে চাওয়া ও অন্যান্য অফিসারদের যোগদানে বাধাদান করা। পরে যদিও যোগদান ও বীরত্বময় যুদ্ধ করেছিলেন, এবং সম্ভবত তিনিই প্রথম আত্মসমর্পণ করেন।

নেতাজীর জীবন রোমাঞ্চময়, কিন্তু তার মধ্যে বেশী কৌতূহল ও বিস্ময় সৃষ্টিকারী,—যুদ্ধক্ষেত্রে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু বিষয়ে এবং বিমান দুর্ঘটনা আদৌ না ঘটা, ও তাঁর জীবিত থাকার বিষয়ে যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস। তারই দ্বিতীয় পর্ব 'খোসলা কমিশন'—পাঞ্জাবের এক প্রাক্তন হাইকোর্ট-বিচারপতি ও অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান শ্রী জি. ডি. খোসলাকে নিয়ে একক-সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশন ১৯৭০ সালে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান মন্ত্রীত্বকালে গঠিত হয় এবং শ্রী খোসলা ১৯৭৪ সালে পার্লামেন্টে তাঁর কমিশন রিপোর্টে নেতাজীকে নিশ্চিতভাবে তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় নিহত বলে রায় দান করেন ; কিন্তু সংসদ তা সত্য বলে গ্রহণ করেনি, এবং মিথ্যা বলে বর্জনও করেনি। নেতাজীর অন্তর্ধান 'রহস্যময়'—এই মন্তব্যে সমাপ্ত করেছেন খোসলা কমিশনের রায়কে। খোসলা কমিশন তাঁর রিপোর্টে শাহনওয়াজ খানের (১৯৫৬ এর প্রথম তদন্ত কমিটী—নেতাজী এনকোয়ারী কমিটির চেয়ারম্যান) ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন যে, শাহনওয়াজ খানের মতামতকে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা সহকারে দেখা উচিত। পাঠকের অবগতির জন্য এইখানে উল্লেখ থাকা দরকার যে শ্রী শাহনওয়াজ ও শ্রী খোসলা উভয়েই নেতাজীকে ১৯৪৫ এর ১৮ই আগস্ট ফরমোজায় বিমান দুর্ঘটনায় নিহত বলে রায় দান করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারত পররাষ্ট্র দফতরের নথিপত্র, ভারত সরকার ও ব্রিটিশ-আমেরিকান মিলিটারী, পুলিশ, গোয়েন্দাদের রিপোর্ট, সাক্ষ্য এবং জাপানী ও আই.এন.এ-র সদস্যগণের প্রদত্ত সাক্ষ্য, নথিপত্র, যা ঘটনার দীর্ঘ ১১ ও ২৫ বৎসর কাল বহু তথ্যানুসন্ধানের পর দু-দুটি তদন্ত সংস্থার নিকট উপস্থাপিত হয়েছিল—তা অবশ্যই পাঠক ও ভবিষ্যতের ইতিহাস গবেষকদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ বিচারের নিয়ম ও আদালতের সুমহান আদর্শকে সর্বোচ্চে তুলে ধরার বদলে, রাজনৈতিক ও স্বার্থ বুদ্ধিই সত্যকে আচ্ছন্ন করতে সফল হয়েছিল সেদিন—এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। বিচার্য বিষয় ও আদালতের সাধারণ নিয়ম অবহেলিত হয়েছিল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে—কারণ এই কমিটি ও কমিশনগুলি ভারতে ও বিদেশে বহুজনের সম্মুখে ও বহুস্থানে সংঘটিত হয়েছে, এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে নেতাজীর মৃত্যু কোনভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এবং ভারতের কোটি কোটি মানুষ তা গ্রহণও করেনি।

উদাহরণ : খোসলা কমিশন, একজিবিট নং ২৯-আই :

১৯৪৫ সনের ১৭ই অক্টোবর, অর্থাৎ তাইহোকুর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার দুমাস পরে চীনে অবস্থিত ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা দপ্তরের

ডিরেক্টর ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধানকে জানান : "বোস যখন বর্মা থেকে বিমানে যাত্রা করছে—তখন চীনারা গোপনে একটা জাপানী বার্তা মাঝ পথে শুনতে পায়। সেই বার্তায় জাপানীরা বোসকে বলছে, সে যেন তার সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। ডি. এম. আইয়ের হাতে কোন কাগজপত্র নেই, তবে ডি. এম. আই. নিশ্চিত যে বোসের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যা বলা হচ্ছে তা নির্ভুল।"৮ (India Government Foreign Ministry Report before Khosla Commission : No. 29-I)

খোসলা কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আই. এন. এর একাধিক অফিসার বলেছেন, নেতাজী শাহনওয়াজ খানকে খুব বেশী একটা বিশ্বাস করতেন না—এমন কি যুদ্ধের শেষ দিকে যখন তিনি বুঝতে পারলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন পদস্থ অফিসার গোপনে ইংরেজদের কাছে খবরাখবর দিচ্ছে, তখন তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের গোয়েন্দা বাহিনীকে শাহনওয়াজ খানের ওপর নজর রাখতে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এখানে বিতর্কের অবকাশ আছে, কারণ, ঐ কমিশনেই একাধিক সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে দেখা গেছে, যাঁরা বলেছেন শাহনওয়াজ খানকে নেতাজী অত্যন্ত পছন্দ করতেন। যা তর্কাতীত বিষয়, তা হচ্ছে, আই. এন. এর আরো উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার এবং উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ পদস্থ ও আইন অভিজ্ঞ আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের মন্ত্রীদের মধ্যে—"আর কাউকে নেহরু ও তৎপরবর্তী কংগ্রেস নেতারা পাত্তা না দিলেও, শাহনওয়াজ খানের জন্য বরাবরই একটা বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। সেই বিশেষ ব্যবস্থা এখনও চলছে—শাহনওয়াজ খান এখনও একজন কেন্দ্রের মন্ত্রী। মাঝখানে যখন ছিলেন না, তখন তাঁর জন্য রাজকীয় ব্যবস্থা ছিল"—একথা যথার্থই লিখেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবরুণ সেনগুপ্ত, ১৯৭৫ সনে প্রকাশিত তাঁর 'নেতাজী অন্তর্ধান রহস্য' পুস্তকে।

তাইহোকুর বিমানঘাঁটীতে কোন বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর আদৌ জড়িত না হওয়া অপেক্ষা অন্যত্র চলে যাওয়া বিষয়ে তাঁর নিজের পরিকল্পনার বহু তথ্য বর্তমানে সরকারী দপ্তরে এসেছে ; তার মধ্যে নিম্নলিখিত দলিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত খোসলা কমিশনের নিকট উপস্থাপিত বিষয়বস্তু। খোসলা কমিশন কাজ শুরু করে প্রথমেই প্রথম দিনে শাহনওয়াজ কমিটির

৮। বরুণ সেনগুপ্ত—নেতাজী অন্তর্ধান রহস্য : পৃষ্ঠা—৮০

চেয়ারম্যান স্বয়ং শাহনওয়াজ খানের যে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন তা নিম্নরূপ ঃ

খোসলা ঃ আপনি মন্ত্রীসভার (অর্থাৎ আজাদ হিন্দ মন্ত্রীসভার) যে শেষ বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কিছু মনে আছে ?

শাহনওয়াজ ঃ সম্ভবতঃ আমি শেষ যেবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে যোগ দিই, সেটা বসেছিল ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে।

খোসলা ঃ তারপর আর আপনি নেতাজীকে দেখেছিলেন ?

শাহনওয়াজ ঃ আমি মন্ত্রিসভার সেই বৈঠকের কথা বলেছিলাম। এই বৈঠকে নেতাজী আমাদের যুদ্ধের গতি পরিবর্তন সম্পর্কে বলছিলেন। তিনি বলছিলেন, 'আমার মতে এই যুদ্ধের একটাই পরিণতি হতে পারে। সেই পরিণতি হল ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি জোটের জয়।' তিনি বলছিলেন, 'সেটা আমাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক, কারণ আমরা ভারতের মুক্তির জন্য লড়ছি। ওরা যদি হারেও এবং যদি আত্মসমর্পণ করেও, তাহলেও আমরা ভারত মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবো।' ··· তিনি বলছিলেন যে, ভারতের মুক্তির জন্য রাশিয়া এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট শক্তিগুলির সাহায্য চাইবেন।

··· তিনি বলছিলেন, এই জন্যই তিনি রুশদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান। (I was referring to the cabinet meeting. ... Therefore he said he would like to contact Russia).[১]

তাছাড়া খোসলা কমিশন সাক্ষ্য বিবরণীর ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা পড়লে জানা যায়, শাহনওয়াজ খান আরও বলেছিলেন ঃ "রাশিয়া তখনও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি—সে সময় জ্যাকব মালিক টোকিওতে রুশ রাষ্ট্রদূতের পদে আসীন। নেতাজী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেননি। তারপর তিনি আনন্দমোহন সহায়কে হ্যানয়ে প্রেরণ করেন এবং সেখান থেকে হো চি মিনের সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশ দেন। নেতাজীর পরিকল্পনা ছিল, জাপানীরা তাঁকে বিমানে মাঞ্চুরিয়ার জাপ যুদ্ধ সীমানায় পৌঁছে দেবে এবং তারপর তিনি হেঁটে রুশ এলাকায় ঢুকে পড়ার ঝুঁকি নেবেন।"

জার্মান গোয়েন্দা দপ্তরেরও একটা রিপোর্ট খোসলা কমিশনের কাছে এসেছিল। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, একবার শোনা গিয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসু চীনে আছেন। আলফ্রেড ওয়েগ নামক এক মার্কিন সাংবাদিকের বক্তব্যও খোসলা কমিশনের সামনে পেশ করা হয়েছিল। ওয়েগ দিল্লীর

---

[১] খোসলা কমিশন সাক্ষ্যের বিবরণ ঃ পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

কর্তাদের বলেছিলেন, তিনি নিজে ১৯৪৮ সনে হ্যানয়ে সুভাষচন্দ্র বসুকে দেখেছেন। আর একটা রুশ রিপোর্টের কথাও উল্লেখিত হয়েছে খোসলা কমিশনে। সেই রিপোর্টের বক্তব্য ঃ ১৯৪৫ সনের ১৯শে আগস্ট তিনজন লোককে প্যারাস্যুটে করে মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে নামতে দেখা গিয়েছিল।"[১০] সেনাবাহিনীর দপ্তরে চিফ অফ স্টাফকে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের চেয়ে প্রধানত রাজনৈতিক শাখার কাজ করতে হয়। জাপ বাহিনীর ঐ দপ্তরের চীফ, লেফটেন্যাণ্ট তাকাকুরা খোসলা কমিশনের নিকট তাঁর সাক্ষ্যে বলেন—'Two months before the surrender of Japan···Chandra Bose was taking action on the basis of such decision.' জাপানের আত্মসমর্পণের দুমাস আগে আমি ব্যাঙ্কক যাই এবং সেখানে জেনারেল তেরোচি, চন্দ্র বোস এবং লেঃ জেনারেল ইসোদার সঙ্গে দেখা করি। আমাদের আলোচনায় স্থির হয় যে, চন্দ্র বোস জাপানের দক্ষিণাঞ্চলের জাপ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। জাপানী সামরিক মহলে এই রকম একটা সিদ্ধান্ত ছিল যে, চন্দ্র বোস জাপানে না এসে যদি অন্য কোথাও যেতে পারেন যেখানে তাঁর কাজের স্বাধীনতা থাকবে, তাহলে ভালো হয়। কারণ জাপানে এলে তিনি গ্রেফতার হতে পারেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে ভালো হয় যদি তিনি রুশ-মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে যান। চন্দ্র বোস সেইভাবেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন।"

এই কমিশনে, উপরিউক্ত সাক্ষ্যের পরেই, ফরোয়ার্ড ব্লকের নিযুক্ত এ্যাডভোকেট অমর প্রসাদ চক্রবর্তী লেফটেন্যাণ্ট তাকাকুরাকে প্রশ্ন করেন—

চক্রবর্তী ঃ "তাহ'লে কি এটা বলা ঠিক হবে যে, টোকিও সদর দপ্তর নেতাজীর দাইরেন হয়ে রাশিয়া যাওয়ার পরিকল্পনাটা মেনে নিয়েছিল এবং সেইমতই নেতাজীর সঙ্গে যাওয়ার জন্য লেঃ জেনারেল সিদেয়িকে বাছাই করেছিল ?

লেঃ কর্নেল তাকাকুরা ঃ হ্যাঁ তাই। সদর দপ্তর সব জানত।

(খোসলা কমিশন—সাক্ষ্যের বিবরণ ঃ পৃষ্ঠা ২৪৫০-২৪৫১)

এখানে উল্লেখ থাকে যে, লেঃ জেনারেল ইসোদা ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে জাপ সৈন্যবাহিনীর সংযোগকারী অফিসার ; আর লেঃ জেনারেল

---

[১০] বরুণ সেনগুপ্ত—নেতাজী অন্তর্ধান রহস্য ঃ পৃষ্ঠা ৮৭

সিদেয়ি রুশ ও জার্মান ভাষা খুব ভালোভাবে জানতেন। জাপান আত্মসমর্পণ করার আগে জাপ গভর্নমেণ্ট তাঁকে মাঞ্চুরিয়ায় বদলি করেছিলেন। সিদেয়ি মাঞ্চুরিয়া যুদ্ধফ্রণ্টে বদলি হয়ে যাচ্ছিলেন ১৭-১৮ আগস্ট, এবং ১৭ই আগস্ট সায়গন থেকে নেতাজী ও সিদেয়ি—একই সঙ্গে একই বিমানে যাত্রা করেছিলেন এবং তৎকালীন জাপ সরকার ঘোষণা করেছিলেন, তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় সিদেয়িও মারা গিয়েছেন।"[১১]

আমাদের এখন বিচার্য, যেহেতু ১৯৪৫ এর ১৮ই আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু প্রমাণিত হল না, অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যু তাঁর হয়নি—তাহলে এবার আমাদের দ্বিতীয় তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, অর্থাৎ অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু ঘটা—যার সাধারণ অর্থ গোপন হত্যা। উপরিউক্ত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু কাহিনীকে সম্পূর্ণ অসত্য প্রমাণে মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য, যুদ্ধ অপরাধে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক ডঃ রাধাবিনোদ পালের লিখিত ষ্টেটমেণ্ট, ব্রিটিশ-আমেরিকান গোয়েন্দা দপ্তরের অতি গোপনীয় রিপোর্ট, মাউণ্ট ব্যাটেন প্রেরিত পুলিশ-মিলিটারী বাহিনীর নেতাজীকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় বন্দী করার হুকুম—বিষয়গুলির বিচার বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ।

(i) জানা যায়, ১৯৪৫-এর ২২শে আগস্ট নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার পর ২রা সেপ্টেম্বর গান্ধীজী বলেছিলেন—"ইয়ে সব ঝুটা হ্যায় ; সুভাষ মরনা নেহি সক্‌তা, দুস্‌রা কিসিকা লাশ জ্বালা দিয়া হোগা।" তাছাড়া এই দুর্ঘটনার পরে পরেই একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—গান্ধীজী তাঁর Nature Cure Clinic থেকে প্রতিদিনের অভ্যাসমত বাইরে বেরিয়েছেন—দেখতে পেলেন একদল পুলিশ ও জনতা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তাঁর বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী জানলেন যে গভর্নমেণ্টের অনুমান, নেতাজী সুভাষচন্দ্র সাইগন থেকে পালিয়ে এসে সম্ভবত গান্ধীজীর আশ্রমে (Nature Cure Clinic) আত্মগোপন করে রয়েছেন। গান্ধীজী তাঁর স্বাভাবিক স্থৈর্য বজায় রেখে বললেন, গভর্নমেণ্টের ভুল হয়েছে। সুভাষবাবু সেখানে নাই। তিনি নেতাজীর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুকে টেলিগ্রাম করে জানালেন, সুভাষ বসু মৃত নন, তাঁর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান যেন না হয়। তখন অবশ্য শরৎচন্দ্র কারাগারে বন্দী।

নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী অরবিন্দ বসুর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকারে—২৯-১০-৮৫ তারিখে শ্রী বসু বলেন : ১৯৪৫ এর ১৮ই আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায়

---

[১১] নেতাজী অন্তর্ধান রহস্য : পৃষ্ঠা ৮

কথা বলা হয়। ২১/২২ আগষ্ট টোকিও রেডিও সেই ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করে, ৫ থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বরের কোন তারিখে গান্ধীজী শরৎ চন্দ্র বসুকে Telegram করেন Not to perform Sradh as Subhas Babu was not dead.

(ii) নেতাজীর অন্যতম ছোট ভাই শৈলেশচন্দ্র বসুর সঙ্গে শারীরিকভাবে এবং কণ্ঠস্বরে নেতাজীর খুবই সাদৃশ্য। ১৯৪৫এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে কোনও সময়ে শৈলেশচন্দ্র বসু ভ্রাতুষ্পুত্রী (অমিতা) বেলা মিত্রকে সঙ্গে করে তাঁর স্বামী হরিদাস মিত্রের ফাঁসী রদ করার জন্য গান্ধীজীর কাছে পুনেতে গিয়েছিলেন। পুলিশ-গোয়েন্দা বিভাগ শৈলেশ চন্দ্র বসুকে নেতাজী বলে সন্দেহ করে গান্ধীজীর 'নেচার কিওর ক্লিনিকে' উপস্থিত হয়েছিল।*

উদাহরণ ঃ ইঙ্গ-আমেরিকান মিত্রশক্তির গোপন সদর দপ্তর, প্রধান ফাইল নং ১০-বিবিধ ঃ আজাদ হিন্দ ফৌজ, সুভাষচন্দ্র বোস (Secret Headquarters, Main File 10 Misc I. N. A. 273, Subject : Subhas Chandra Bose)

At page 10—Reference B=dated 5.10.45
Bose had been trying to persuade the Japanese…'Although at this stage one can not rule out the possibility of Bose being still alive……'[১২]

ফাইলভুক্ত রিপোর্টের ভাবানুবাদ এইরকম ঃ "১৯৪৪-এর অক্টোবর থেকে নেতাজী মঞ্চুরিয়ায় চলে যাওয়ার জন্য জাপ কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন। তিনি তাদের বলেছিলেন বার্মার ভেতর দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, মস্কো হয়ে অন্য পথে দিল্লী আক্রমণই প্রকৃষ্ট পথ। এই ব্যাপারে বোস সায়গনে পৌঁছানর পর হিকারীর টেলিগ্রাম উল্লেখ্য। ইশোদাও সেখানে ছিলেন, এবং ব্যাপারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে হিকারী কিকানের সাহায্যে বোসের সরে পড়া এবং একটি বিমান দুর্ঘটনায় বোসের মৃত্যু হয়েছে এই মিথ্যা প্রচার করে দেওয়ার প্ল্যান ইশোদার পক্ষে

---

* (নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিসভুক্ত ডাঃ পবিত্র মোহন রায় ডুবোজাহাজে করে উড়িষ্যার উপকূলে পৌঁছে আজাদ হিন্দের প্রচারের সময় ১৯৪৪ সালে কলকাতায় তাঁর সহযোগী হরিদাস মিত্র সহ বন্দী হ'ন, অন্যান্যদের সহ হরিদাস মিত্রের ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল। —পরিশিষ্ট ঃ আই. এন. এ. সিক্রেট সার্ভিস দ্রষ্টব্য)

১২। Dissentient Report—pp : 149-150

কার্যকরী করার সময় ও স্থান খুবই উপযোগী ছিল। এবং তা ছিল সুচিন্তিত বিরাট ছলনার একটি অংশ। আর দলিল, কাগজপত্র, ফাইল ও টেলিগ্রাম প্রভৃতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরী করে ফেলে রাখা হয়েছিল, ব্রিটিশ মিলিটারী গোয়েন্দাদের যাতে চোখে পড়ে। মোটের ওপর এই পর্যন্ত অনুসন্ধানে বলা যায়—বোস-এর এখন পর্যন্ত বেঁচে থাকারই সম্ভাবনা।”

উপরিউক্ত দুটি তথ্য—অর্থাৎ গান্ধীজীর উক্তি এবং মিলিটারী গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট একই অর্থ বহন করে—১৮ তারিখে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পরও নেতাজী স্বাভাবিকভাবেই জীবিত! আর কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রগাঢ় বিশ্বাস—বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু-কাহিনী ইচ্ছাকৃত প্রস্তুত একটি রিপোর্ট মাত্র। কতিপয় স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক মানুষ ব্যতীত নেতাজী এই অর্ধশত কোটি ভারতবাসীরই নিকট অতি প্রিয় নেতাজী সুভাষ। সে জন্য প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে নিজের সিদ্ধান্ত সেদিন শুধু বাতিল করতে হয়নি, শাহনওয়াজ কমিটী গঠন করে তদন্ত করতে হয়েছিল। তাতেও দেশবাসী সন্তুষ্ট না হওয়ায় পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ১৯৭০-৭১ সালে আবার একটি তদন্ত কমিশন—খোসলা কমিশন গঠন করতে হয়েছিল। এই দ্বিতীয় কমিশনের রায়েও কোন গুরুত্ব ভারতীয় সমাজে অনুভূত হয়নি। জনসাধারণের মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য উদ্রেক করে আবার নীরবতার আবরণ! [এই কমিশনের কলকাতা অধিবেশনে এই লেখক উপস্থিত ছিলেন—যেদিন নেতাজীর ব্যবহৃত দুটি তরবারী পুলিশ হেড কোয়াটার থেকে দুজন বাঙ্গালী গোয়েন্দা ইনসপেক্টার কমিশনের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। (… Police officers, Shri H. K. Rai and Sri K. P. De, witnesses Nos. 14 & 15 respectively were members of two teams, under the leadership of Messrs. Davies and Finney, that had been despatched by the British Indian Government to the Far East, soon after the surrender of the Japanese for arresting Netaji, against whom a case had been started under the Enemy Agents' Ordinance, as they did not believe the announcement made by the Japanese that Netaji had died as the result a plane crash.) এই অফিসারদ্বয় মাউন্টব্যাটেন প্রেরিত বহুসংখ্যক পুলিশ-মিলিটারী গোয়েন্দা বিভাগের অন্যতম সদস্য ছিলেন, যাঁদের ওপর নেতাজীকে দূরপ্রাচ্যে বন্দী করার দায়িত্ব ছিল।

নেতাজীকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে এ্যাংলো-এ্যামেরিকান মিলিটারী গুপ্তচর বিভাগ বন্দী করে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এরকম সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। যুদ্ধের সাধারণ নিয়মে বিজয়ী পক্ষ বিজিতদের কোর্ট মার্শাল বা সামরিক আদালতে দ্রুত বিচারের মারফৎ সাধারণত হত্যা করে। কিন্তু শত্রু যদি বিশ্ব আলোড়নকারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হয়, সাধারণত বিশ্বজনমতের প্রভাবে তাকে সরকারীভাবে সমর আদালতে বিচারের মধ্যেই মুক্তি বা ক্ষমা করার নামে মুক্তি দিতে অনেক সময় বাধ্য হতে হয়। যদি প্রতিহিংসাপরায়ণতা এমনই পর্যায়ে পৌঁছয়, যে তাঁকে সে সুযোগ আদৌ দেওয়া হবে না, তখন বন্দী করা মাত্র অতি গোপনে তাঁকে হত্যার সম্ভাবনা থেকে যায়, অন্তত সে সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না! দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় ব্রিটিশ-আমেরিকান গোয়েন্দা দপ্তরের নাম ছিল এম. আই-টু—আগেই তা উল্লেখিত হয়েছে। শ্রীলঙ্কার ক্যাণ্ডি থেকে এ বিভাগ পরিচালিত হতো। প্রাচ্যের দেশপ্রেমিক কয়েকজন বিশিষ্ট নেতৃবর্গকে হত্যার জন্য এই বিভাগ একটা 'ডেথ স্কোয়াড' গঠন করেছিল, এবং তাদের সম্ভাব্য হত্যার তালিকায় নেতাজী, হো চি-মিন, জেনারেল আউংসান, চীন-পেন প্রমুখের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৪৫-এর জুলাই মাস পর্যন্ত নেতাজীর রেডিও বক্তৃতা প্রতিদিন মনিটরিং করা হতো এম. আই-টুর পরিচালনায়। নেতাজীর সম্ভবত বুঝতে অসুবিধা হয়নি, পরাজিত জাপানী সেনাপতিদের উৎপীড়ন বা অত্যাচারের দ্বারা তাদের সাহায্য নিয়ে এক জঘন্য চক্রান্তের জালে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তাঁকে ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কতিপয় সেনাপতিকে বিচারের প্রহসনের পর ব্রিটিশ পক্ষ হত্যা করতে দ্বিধা করবে না। যাই হউক, একটি টেলিগ্রামের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এ বিষয়ে শ্রী শিবপ্রসাদ চৌধুরী যিনি ক্যাণ্ডিতে পলিটিক্যাল ওয়ার ফেয়ার বিভাগে তাঁর তরুণ বয়সে মিত্রশক্তির এই গোয়েন্দা বিভাগে ফরাসী অনুবাদকের কাজ করতেন। ছয় খণ্ড বিশিষ্ট, পরবর্তীকালে অপসৃত সেই 'চন্দ্র বোস' ফাইল অবলম্বনে তাঁর উর্দ্ধতন অফিসার ভিয়েৎনামী বন্ধু মাই-যে-ফাউ বললেন—'··· The death squad has done its job ···।' টেলিগ্রামের ভাষা ছিল এইরকম : Kandy 17/8 Stop 1510 Stop Azad Hind Govt Leader Shot Dead Paraides Snoon While Meeting At Bankok Hotel Stop Details Awaited Eom' ১৩

১৩। শিবপ্রসাদ চৌধুরী—চন্দ্রবোস ফাইল : পরিবর্তন : ২৬শে জানুয়ারী '৮৩

'ব্যাঙ্কক হোটেলে মিটিং করার সময় ১৭ই আগস্ট ৩টা দশে আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট নেতা গুলিতে নিহত।'

ঐ ১৭ তারিখে অবশ্য আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের সর্বাধিনায়ক নেতাজী ব্যাঙ্ককে পৌঁছেছিলেন। ডেথ স্কোয়াডের চোখে ধূলো দিয়ে তাঁর অজ্ঞাত গন্তব্যে চলে যাবার জন্য নেতাজী অবশ্য ঠিকই জানিয়েছিলেন, জরুরী বিষয়ে আলোচনা করতে তিনি টোকিও যাচ্ছেন, এবং সেইমত সিঙ্গাপুর থেকে জাপানের রাজধানী টোকিওর পথে যাত্রা করেছিলেন। ভারতের মত ব্রহ্মদেশকে টুকরো টুকরো করতে চেয়েও লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ব্যর্থ হয়েছিলেন—ব্রহ্মদেশের পিপলস ফ্রিডম পার্টির চেয়ারম্যান জেনারেল আউংসানের প্রবল বাধাদানের জন্য এবং যতদূর জানা যায়, এই এম. আই-টুর 'ডেথ স্কোয়াড' সেজন্য আটজন মন্ত্রীসহ জেনারেল আউংসানকে জঘন্যভাবে হত্যা করে। ব্যাঙ্ককের হোটেলে ডেথ স্কোয়াডের হাতে নেতাজীর মৃত্যুবরণ-তত্ত্ব গ্রহণীয় হতে পারে না—কারণ নেতাজীর ব্যাঙ্কক ছেড়ে নিরাপদে সায়গনে পৌঁছানো ও তুরেনে অবস্থানের বিষয় ব্রিটিশ-শক্তি জোট ও জাপ-আজাদী সকলের দ্বারা স্বীকৃত।

এরপর, তাঁর অন্তর্ধান রহস্য ও গুপ্ত হত্যা বিষয়ে যে চাঞ্চল্যকর ২টি তথ্য ভারতে, বিশেষত কলকাতায় সংবাদপত্রে অতি অধুনা প্রকাশলাভ করেছে—তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় চিঠিপত্র শিরোনামায় 'Netaji Mystery' Sir,—The report, 'Netaji did not die in air crash' (August 12-13) reminds me of a footnote in the Goebbels' Diary edited and translated by Lovis P. Lochner: "Subhas Chandra Bose was head of the Zentrale Freies Indiane (Central Bureau for Free India), which had its Berlin office at No. 2 Lichtenstein Allee.··· Later he left for Japan and, according to reports, was seized there by the Americans, tried and executed for treason."—Dilipkumar Sen. Kalyani, August 12.[১৪]

এই উক্তির মূল বক্তব্য—হিটলারের প্রচার মন্ত্রী গোয়েবলস-এর ডায়েরীর অনুবাদক ও সম্পাদক মিষ্টার লোভিস পি. লোচনার-এর 'ফুটনোট'। সেই ফুটনোটে তিনি মন্তব্য করেছেন—জার্মানীতে সেণ্ট্রাল ব্যুরো ফর ফ্রি ইণ্ডিয়া ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র বোস জাপানে যান—এবং রিপোর্টে জানা যায়,

---

[১৪] The Statesman, September 4, 1985

আমেরিকানরা তাঁকে বন্দী করে এবং রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁর বিচার হয় ও প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকরী করা হয়। আর—'জনমন জনমত' নামে একটি এক বৎসর বয়সের বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম—"টোকিওতে মারকিন সামরিক কর্তৃপক্ষ নেতাজীকে মৃত্যুদণ্ড দেন।" সমগ্র রিপোর্টটি এইরকম—"নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত খোসলা কমিশন শেষ কথা বলতে পারেননি। সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অনেক পরস্পর বিরোধী তথ্য রয়েছে। যেখানে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত নেতাজীর দেহ বিকৃত ও অগ্নিদগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাতঘড়ি ও চশমা কিভাবে অক্ষত থেকে গেল তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভা (উইনষ্টন চার্চিল তখনও এই মন্ত্রীসভার প্রধান মন্ত্রী) ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ এম. আই-সিক্সকে নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ দেন। এম. আই-সিক্সের পক্ষ থেকে যারা তদন্ত করেন, তাদেরই একজন ঐ রিপোর্টের একান্ত গোপনীয় অংশ বাদে মোটামুটি তদন্ত ফলাফল 'The Springing Tiger' (নেতাজীর প্রতীকস্বরূপ 'লম্ফনোদ্যত ব্যাঘ্র') নামে একটি গ্রন্থে লেখেন—তাদের তদন্ত টোকিওতে মিত্র শক্তির সর্বাধিনায়ক জেঃ ডগলাস ম্যাকার্থারের সদর দপ্তর পর্যন্ত নেতাজীকে জীবিতাবস্থায় নিয়ে আসার সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু জেঃ ম্যাকার্থারের নির্দেশে তাদের তদন্ত ওখানেই শেষ করতে হয়।"[১৫]

উপরিউক্ত বাংলা সংবাদপত্রের বিশেষ প্রতিনিধির উপরিউক্ত তথ্যের সঙ্গে উল্লিখিত ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রে নেতাজী মৃত্যু সম্পর্কে প্রায় একই ধরণের অঙ্গুলি সংকেত রয়েছে। অর্থাৎ বিজয়ী আমেরিকান কর্তৃপক্ষ টোকিওতে জাপানের আত্মসমর্পণের সময় নেতাজীর প্রাণদণ্ড দান করে; ইংরেজীতে অনুবাদক লোভিস পি. লোচনার-ও গোয়েবেল-এর ডায়েরীর অনুবাদ ও সম্পাদনায় আমেরিকানদের দ্বারা নেতাজীর প্রাণদণ্ড দান সংবাদের উৎস প্রকাশ করেননি। স্বয়ং হিটলার ও তাঁর মন্ত্রী গোয়েবেলস ১৯৪৫-এর ৩০শে এপ্রিলের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেছিলেন—জার্মানীর পতন হয়েছিল। তার তিন মাস পরেও নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ

১৫। 'জনমন জনমত'—বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক—১ম বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ১৩. ৯. ৮৫

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তথা মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছিলেন—অতএব গোয়েবেলস তাঁর রোজনামচায় নেতাজীর মৃত্যু বিষয়ে কিছু লিখে যেতে পারেন না।১৬

যাই হোক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর নিযুক্ত তদন্ত কমিটীর চেয়ারম্যান যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে এত নিশ্চিত সেই পণ্ডিত জওহরলাল কিংবা শাহনওয়াজ খান অথবা প্রধান সাক্ষী হবিবুর রহমান—কেউই আর এখন ইহজগতে নেই অথবা নেহরু-সুহৃদ মাউন্টব্যাটেনও তাঁর স্বদেশের বিপ্লবীগণের দ্বারা নিহত। গত দীর্ঘ তিরিশ বছর কাল কোটি কোটি ভারতবাসী তাঁদের ঐ সিদ্ধান্তের (বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু) বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড মানসিকতা প্রকাশ করে এসেছেন—তাই আজ গৃহীত হলো অর্থাৎ নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়নি, তাঁকে জীবিতাবস্থায় টোকিওতে মার্কিনী সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তা হলে কি এটাই প্রতিপন্ন হয় যে ডগলাস ম্যাকার্থার ও তাঁর সমর দপ্তর নেতাজীকে বন্দী করতে পেরেছিলেন এবং মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন ?

এরকম ঘটনা, পরিস্থিতির বিচারে, অনুষ্ঠিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়—কিন্তু তা আদৌ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কারণ জেনারেল ম্যাকার্থারের পক্ষে নেতাজীকে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়ার বিষয় সে সময়ের মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে না-জানান এবং তাঁর মারফৎ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লীমেন্ট এটলীকে অবহিত না-করা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ আমেরিকা, জাপান এবং ইংলণ্ডে এ ধরনের কোনো সরকারী ভাষ্য আজো পর্যন্ত নেই। আর যদি তাঁরা এ বিষয়ে জেনেও সম্পূর্ণভাবে গোপনীয়তা বজায় রাখার চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা স্বাধীন ও দোর্দণ্ড প্রতাপশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলি সে বিষয়ে নীরব হয়েই রইলো, এ কথা আদৌ স্বীকার করা যায় না। প্রথমত যে কোন গোপন তথ্যই ঘটনার তিরিশ বছরের পর জনসাধারণের অবগতি ও গবেষণার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়—আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকতা এতই শক্তিমান যে তার প্রতাপে স্বয়ং

১৬। যে 'গোয়েবেলস ডায়েরী' এত গুরুত্বপূর্ণ বলে যুদ্ধ ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করেছে তা বার্লিন পতনের পর ডাস্টবিন থেকে পাওয়া টাইপ করা মার্কিনী-প্রকাশন। এর মৌলিকতা সন্দেহের ঊর্দ্ধে নয়। নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র ডঃ অশোকনাথ বসুর ঐ 'গোয়েবেলস ডায়েরী' পড়ার সুযোগ হয়েছিল—তিনি লেখকের নিকট এইরূপ মতামত দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্টকেও সে মহাদেশের সর্বোচ্চ পদ হারাতে হয়েছে। সেখানে সরকারী যে কোনো ডিপার্টমেন্টের ফাইলপত্র অনুসন্ধান করার আইনানুগ অধিকার সে দেশের সাংবাদিকদের আছে।

শৌলমারী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সাধু সারদানন্দজী এই লেখককে ১৯৬৪ সালের ৭ই জুন তারিখে প্রশ্নোত্তরে তাঁর আশ্রমে বলেন, জাপানী গোয়েন্দাদের গুলিতে নেতাজী নিহত হয়েছেন। যুক্তি প্রদর্শন না করতে পারলেও, এ তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা। তিনি ঐ একই দিনে দীর্ঘ-সাক্ষাৎকারের সময় সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন,—নেহরু ও তাঁর কয়েকজন এ্যাসোসিয়েটস-এর বিশ্বাস, নেতাজী বেঁচে আছেন, এবং যদি তিনি ভারতে এসে পড়েন, তখন তাঁকে 'ইম্পষ্টার' (নকল) বলে ঘোষণা করা সুবিধে হবে, যদি সারদানন্দজী নিজেকে সুভাষচন্দ্র বলে স্বীকারোক্তি দেন। অবশ্য কয়েক কোটি টাকা সে জন্য আশ্রমকে দেওয়ার প্রস্তাবের সঙ্গে শর্ত ছিল, তিনি—আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা সারদানন্দজী কোন সোসিও-পলিটিক্যাল কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না। (পরিশিষ্ট : শৌলমারীর সাধু সারদানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার)। এ বক্তব্যের দ্বারা এই বোঝায় যে ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী যে কোন কারণেই হোক মনে মনে বিশ্বাস করতেন, নেতাজী জীবিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দীর্ঘ ৩০ বছর পর ১৯৭৬ সালে ইংলণ্ডের গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে নথিপত্র প্রকাশ করেছেন। ঐ ঐতিহাসিক দলিলে ৬ষ্ঠ খণ্ডে লিখিত হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট অর্পিত হলে ঐ গভর্নমেণ্ট নেতাজীকে কি দণ্ড দিতে পারে—তার গোপন তথ্য। ঐ দলিলের সারাংশ—যা অতি চাঞ্চল্যকর এবং লোমহর্ষক—২৪. ৮. ৭৬ তারিখে স্টেটসম্যান পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। সেই প্রতিবেদন নিম্নরূপ :

British Dilemma over Netaji's Trial

London, August 23—The British Government had one time considered the possibility of having Subhas Chandra Bose tried and hanged outside India—in Malaysia or Singapore, reports Samachar.

But the fear that it would be accused of judicial murder and that such a course might lead to severe long-term political consequences prompted the Home Department in New Delhi to think other alternatives.

This dilemma over the treatment of Bose in the event of his being handed over by the Japanese after their surrender in World War II is revealed in the sixth volume of the historical records relating to the transfer of power to India, published here recently.

A note written by Mr. R. F. Mudie, Home Member in the Government of India, on August 23, 1945, to Sir E. Jenkins, Private Secretary to Lord Wavell, then Viceroy, said :

"There is more to be said for detention and internment somewhere out of India. Out of sight would be to some extent out of mind and agitation for his release might be less."

This note was in response to Mr. Jenkins' letter in which he made a reference to the surrender list of 'traitors' whom the Government of India wished to be handed over to it and to the treatment of Bose and his National Army associates. Mr. Jenkins had suggested that Lord Wavell was not at all sure that Bose and his immediate associates should be returned to India for trial. The Viceroy thought it would be better to have them dealt with as war-criminals outside India.

Mr. Mudie's note said "As regards the treatment of Bose there are the following possibilities: (i) bring him back to, India and try him either for waging war or under Enemy Agents' Ordinance ; (ii) have him tried by a Court in Burma or Malaya for waging war against the king of the country ; (iii) have him tried by a military Court outside India ; (iv) intern him in India ; (v) intern him in some other British possession, for example, Seychelles islands ; (vi) leave him where he is and do not ask for his surrender."

"I do not think that there is any chance of Bose being hanged if he were tried in India. The pressure for his release would be too great. Also his trial would result in great publicity for his doings, motives etc. On the other hand, trial in India would be a straightforward course and the trial as such could not be criticized. If it is accepted, the execution would, in the end, be impossible then reprieve him immediately after conviction, to forestall agitation, would be the best course."

The note added : "It is extremely unlikely that the Government of Burma, which is engaged in appeasing the Burma National Army, would agree to try Bose and even more unlikely that, if they did, they would hang him. The Government of Malaya might possibly have no such scruples, and we might get a hanging if His Magesty's Government agreed to ignore agitation in India and Parliament, however strong."

"But a trial in Singapore would cause almost as much agitation in this country as a trial here unless it was held in Camera and no news released till after his execution. But in that case we would be said—and truly said—that we have kept the proceedings secret to prevent his friends and supporters from doing all they could do to save his life. Also, what reason could be given for trying Bose outside India when the leaders of INA are to be tried openly in India ? The long-term political consequences of this course might be serious."

Obvious Subterfuge

"Trial and execution by a military Court outside India would be open to similar objections but to a less degree, as the trial would presumably be less prolonged and military punishments are expected to be more severe than civil ones. Again, trial by a military Court would sugggest that his crime was killing our-soldiers, whereas trial by Civil Court at once raises the independence issue. On the other hand this would be an obvious subterfuge and it is unlikely the military would lend themselves to it."

"Interning Bose in India would lead only to an agitation to let him out and to his release after a short-time. He might then escape to Russia, as he did in 1940. There would be also the usual agitation for a trial and would incur the odium of detention without trial."

The note continued : There is more to be said for detention and intenment somewhere out of India. Out of sight would be to some extent out of mind and agitation for his release might be less also. Escape to Russia would be difficult."

"In many ways the easiest course would be to leave him where he is and not ask for his release. He might, of course,

in certain circumstances, be welcomed by the Russians. This course would raise first immediate political difficulties, but security authorities consider that in certain circumstances his presence in Russia would be so dangerous as to rule it out altogether."

The note concluded : "The choice seems to be between deporting and interning him outside India or trying him in India and commuting his death sentence. The two might be combined and Bose deported (or transported) after conviction. There would be considerable long-term advantages in a trial, but reprieve might raise the question of why military officers who joined Bose's Army should be hanged. The answer would be that their position in the Army greatly aggravated their offence, but this might not be accepted by the Army."

১৯৪৫-এ দিল্লীতে ভারতীয় গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব (হোম ডিপার্টমেণ্ট) আর. এফ. মুডির উপরিউক্ত গোপন রিপোর্ট বিশ্লেষণ করলে নেতাজীর পরিণাম সম্পর্কে কতগুলি তথ্য অবহিত হওয়া যায় কিনা বিচার করা দরকার। প্রতিবেদনটি তাইহোকু বিমান বন্দরে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর যুক্ত থাকার (১৮. ৮. ৪৫) ৫ দিন পরে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যার ই. জেনকিনসের কাছে লেখা। ২৩. ৮. ৪৫ তারিখে ঐ রিপোর্ট লেখা হয়, যে তারিখেই প্রথম জাপানের সংবাদ সংস্থা দোমেই নিউজ এজেন্সি ১৮ তারিখের বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর নিহত হওয়ার কথা ঘোষণা করে। অর্থাৎ বিমান দুর্ঘটনার কথা না জেনেই ঐ রিপোর্ট রচনা এবং ২৩শে আগস্টের আগেই ভারত গভর্নমেণ্ট জানতেন নেতাজী বন্দী অবস্থায় একটি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন এবং আরও একটি বক্তব্য স্পষ্ট হয় ঐ প্রতিবেদন অনুযায়ী যে, নেতাজী সোভিয়েত রাশিয়ায় যেতে ঐ তারিখের মধ্যে সমর্থ হননি।

ব্রিটিশ সরকারের ২৩.৮.৪৫ তারিখের মানসিকতা এই যে, যে কোন প্রকারে ভারতের বাইরে নেতাজীর বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে তাঁকে প্রাণদণ্ড অথবা নির্বাসন দণ্ড দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে দেওয়া এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে নেতাজী যেখানে বন্দী অবস্থায় আছেন তাঁর হস্তান্তর দাবী না করে সেখানেই তাঁকে সেই অবস্থায় রাখা। সিঙ্গাপুর, মালয় অথবা দিল্লীতে তাঁর বিচারের আয়োজন করলে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, তার মুখোমুখি হওয়া তাঁদের পক্ষে বিপজ্জনক। বর্মাতেও কার্যকর সম্ভব নয়।

জাপানের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব বিবেচনার সময় ব্রিটিশ সরকার জাপানের কাছে যে সব ব্যক্তিকে তাদের হাতে সমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নাম অবশ্যই ছিল। আর নেতাজীর রাশিয়ায় চলে যাওয়ার বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী ছিল এবং নেতাজী যাতে রাশিয়া সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারেন সে বিষয়ে ইংরেজ যথেষ্ঠ সতর্ক ছিল.।

উপরিউক্ত ব্রিটিশ তথ্যটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে, তথাকথিত তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়নি—কিন্তু নেতাজী কোন্ রাষ্ট্রের হাতে আবদ্ধ, তার উত্তর নেই; তবে উক্ত রিপোর্টে শুধু আভাস ইঙ্গিত রয়েছে যে, যেন ঐ রাষ্ট্রটি জাপান। ১৭. ৮. ৪৫ তারিখে নেতাজী সায়গন বিমানঘাঁটিতে তাঁর আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট ও সৈন্যবাহিনীর উর্ধ্বতন অফিসারদের সঙ্গেই উপস্থিত ছিলেন, এ বিষয় ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাহলে ১৮. ৮. ৪৫ থেকে ২২. ৮. ৪৫-এর মধ্যে কোনও তারিখে জাপান তাঁকে বন্দী করতে পারে। কিন্তু মিত্রশক্তি জোটের রাষ্ট্রগুলি যথা ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি তা আজও পর্যন্ত দাবী করেনি (রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে বিরোধ হওয়ার যে ভবিষ্যৎবাণী নেতাজী করেছিলেন তা সানফ্রানসিসকো অধিবেশনে ঐ তারিখের আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল)। আর বিরাট ধ্বংসের আতঙ্কে সন্ত্রস্ত হলেও, যে জাপান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক বীর জাতি—তার পক্ষে নেতাজীর মত মহান বিপ্লবী বন্ধু রাষ্ট্রপ্রধানকে আবদ্ধ করা বা ঘাতকের হাতে সমর্পণ করা—এ-ও কি সম্ভব ?

১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘোষণার পরেও ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে নেতাজীর অনুসন্ধানে পৃথকভাবে অনুসন্ধান অথবা ঐ দুর্ঘটনাজনিত নেতাজীর মৃত্যু সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করে ব্রিটিশ সরকারের কোন প্রতিবাদ না জানানোর বিষয়ও বিস্ময়কর। অন্যদিকে ১৯৪৫ সালের ২৫শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী এটলির সভাপতিত্বে ব্রিটিশ মন্ত্রীপরিষদের অধিবেশনে ভারতে তাদের গভর্নমেন্টের হোম মেম্বার উপরিউক্ত আর. এফ. মুডির নেতাজী বিষয়ক প্রতিবেদনটি অনুমোদন লাভ করে। এ থেকে অবশ্যই প্রতিপন্ন হয়, ১৯৪৫-এর ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবিত এবং কোথাও অবরুদ্ধ অবস্থায়

ছিলেন। একজন ভারতবাসী হিসাবে লেখকের অবশ্যই এরূপ মন্তব্য নথিভুক্ত করতে হয় যে, সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী ব্রিটিশ শাসকদের উক্ত গোপন নথিপত্রের ভাষায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু 'ট্রেটর' বা বিশ্বাসঘাতক —কারণ ঐ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্যই নেতাজীর যুদ্ধ। কিন্তু তদপেক্ষা অনেকগুণ ঘৃণ্য 'ট্রেটর' ছিলেন ইংরেজ শাসকগণ—আমাদের ভারতবাসীর কাছে শুধু নয়, মানবসভ্যতার কাছে। কারণ যুদ্ধ না করেও কেবল ব্রিটিশ রাজশক্তির জন্য যুদ্ধের রসদ যোগাতে গিয়ে বাংলায় একমুঠো ভাতের জন্য প্রাণ দিয়েছিল ৭০ লক্ষেরও বেশী মানুষ পঞ্চাশের মন্বন্তরে। অথচ নেতাজীর চাল পাঠানোর প্রস্তাব উপেক্ষা করেছিল ইংরেজ। (পরিশিষ্ট: পঞ্চাশের মন্বন্তরে নেতাজীর ভূমিকা)। আর আন্তর্জাতিক আইনে পরাধীন জাতির স্বাধীনতা অর্জনে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করার অধিকার তো সম্পূর্ণ বিধিসঙ্গত এবং নেতাজী ও অগণ্য ভারতবাসী সেই যুদ্ধই করেছিলেন—গান্ধীজির নেতৃত্বে নিরস্ত্র সৈনিকরূপে আর নেতাজীর পরিচালনায় সশস্ত্র যুদ্ধের মারফৎ। অতএব দিল্লীর একজন ইংরেজ প্রশাসক লণ্ডনের মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট নেতাজীকে 'ট্রেটর' উক্তি করলেও ইংরেজই ছিল ভারতের নিকট নিকৃষ্ট 'ট্রেটর'। নেতাজীর মহাবীর্যবত্তার সম্মুখে নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরাজয় বরণ করে ইংরেজ রাজশক্তি এই দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন; আর লালকেল্লার আদালতে নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দের সেনাপতি, তথা তাঁরই আদর্শবাদের বিচারক ইংরেজ সরকারই প্রকারান্তরে অপরাধীর কাঠগোড়ায় দণ্ডায়মান হয়েছিলেন সেদিন। ইতিহাসের বিচারালয়ে তাদের পরাজয় হয়েছিল আর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সাম্রাজ্য ধূলিস্যাৎ হয়েছিল পৃথিবীর ভূগোল ও ইতিহাস থেকে।

অন্য একটি বিশ্লেষণে বলা যায়, ইংরেজ-আমেরিকান শক্তি তখন সতর্ক থাকায় সোভিয়েত রাশিয়ায় নেতাজীর চলে যাওয়া সম্ভব নয় এ রকম মন্তব্য উক্ত ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যেভাবে রিপোর্ট করেছেন—সে তত্ত্ব যে নির্ভুল, তা গ্রহণ করার কোন কারণ নাই। কারণ ১৯৪০-৪১ সালে কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ী থেকে নেতাজীর অন্তর্ধানের সময় তাঁকে ঘিরে সদা সতর্ক প্রহরার সর্বপ্রকার নিখুঁত ব্যবস্থাসত্ত্বেও ইংরেজ ঔদ্ধত্য, অহমিকা ধূলায় লুটিয়ে ছিল; আর ১৯৪৩-এ সম্মিলিত ব্রিটিশ-মার্কিন সামরিক সতর্কতার বেড়াজাল সম্পূর্ণভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়ার সমুদ্র মহাসমুদ্র ভেদ করে নেতাজী আবির্ভূত হয়েছিলেন দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র। উভয় ক্ষেত্রেই শত্রুর সকল সতর্কতাই পরাভূত হয়েছিল। মূলত বুদ্ধি-চাতুর্যে এবং সংগঠনী বিচক্ষণতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রায় অতিমানুষী ক্ষমতার আধার ছিলেন—আর সর্বোপরি তিনি ছিলেন মাতৃভূমির মুক্তিমন্ত্রে সিদ্ধকাম দুর্জয় মহাযোগী—জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ভেদাভেদ তাঁকে স্পর্শ করতো না। সেজন্য বরং কষ্ট কল্পিত নয় যে, আণবিক বোমা বিস্ফোরণে সে সময় জাপানের জটিল অবস্থার মধ্যেও তাঁর পক্ষে চীন-—রাশিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করার সম্ভাবনা খুবই যুক্তিগ্রাহ্য। বিশেষত, জানা যায়, তিনি পূর্ব থেকেই হোচিমিনের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁর আই. এন. এ.-র সেনাপতিদের মারফৎ যোগাযোগ করে চলেছিলেন। তথাপি সত্য যেমন কখনো কখনো কল্পনাকেও অতিক্রম করে, তেমনি তাঁর অতি সংগোপনে ঐ সময় নিহত হওয়াও অসম্ভব নয়। তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নিহত নেতাজীর কোন ফটোগ্রাফ না দেখাতে পেরে মার্কিন সেনাপতি ডগলাস ম্যাকার্থারের হাতে আত্মসমর্পণকারী জাপানী কর্তৃপক্ষের রেহাই পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। এবং সেইজন্য হতাবশিষ্ট জাপানী বোমারু বিমান, যাতে করে নেতাজী শেষ যাত্রা করেছিলেন, জাপ জেনারেল সিদেই-সহ নেতাজীকে জীবিত অবস্থায় সেই বিমান জাপ কর্তৃপক্ষ ম্যাকার্থারের হাতে সমর্পণ করতে পারে। আর জঘন্য জিঘাংসায় হত্যা অপরাধের সমস্ত সাক্ষ্য বিশ্বের জনগণের কাছে বিলুপ্তির উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ডামাডোলে তাঁকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে (আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার উভয় দেশের সৈন্যরা স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছিল) অতি গোপনে হত্যা করাও যুক্তিহীন নয়। কিন্তু পূর্বে আলোচিত হয়েছে এ তত্ত্ব ইতিহাস সম্মত নয়, বা যথার্থভাবে বলা যায়, বিজ্ঞানভিত্তিক নয় এবং তথ্য দ্বারা সমর্থিতও নয়।* রুশ সীমান্তের ওপারে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে পূর্ণ সামরিক বেশে নিরাপদে নেতাজীর পৌঁছে যাওয়ার বিষয়ে নির্দিষ্ট পথরেখার ইঙ্গিত অনেকে দিয়েছেন। চারদশককাল ধরে নেতাজীর

* বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, মাত্র ৮ বছর আগে, ১৯৭৮ সালের ১০ই এপ্রিল ভারত গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি, ব্রিটেনে ভারতীয় হাইকমিশনার মিঃ এন. জি. গোরে ভিয়েনায় আলোচনা সভায় বলেন, ...নেতাজী জীবিত কিংবা নিহত, যা-ই হোক, ভারতবাসী, তাঁদের অন্যতম প্রথম স্তরের নেতার জীবনে কি ঘটলো, অবশ্যই জানতে চায়—তিনি কি বিমান দুর্ঘটনায় মৃত অথবা তাঁর অবশিষ্ট জীবন কোন কারাগারেই কাটছে? "......Whether alive or dead, the Indian

ভারতে প্রত্যাবর্তন না করার কারণে কোন কোন রাষ্ট্রনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকের এ ধারণা যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ইংরেজ-মার্কিন প্রীতির সম্পর্ক অতিক্রুত রুশি-চীনা সৌহার্দ্যে রূপান্তরিত হয় ; তাই নেতাজীর স্থায়ী পথরোধের বিনিময়ে হয়ত নেহরু ও তাঁর পরবর্তী একই রাষ্ট্রনৈতিক মতাবলম্বী প্রশাসকগণ একই রকম কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করেছেন, আর একাধিক তদন্তের ইতিহাস রচনার মধ্যে ধূম্রজালের বাতাবরণে সত্য আচ্ছন্ন হয়েছে।

প্রতি পদক্ষেপে বিস্ময়, সন্দেহ, আশা-নিরাশা নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে জনমানস। বিবেকানন্দের ভাববহ্নিতে প্রজ্বলিত বীর সুভাষচন্দ্রের, মহান নেতাজীর দৈহিক অস্তিত্বের পরিণতি কোথায়! তিনি ত স্বামীজীর প্র্যাকটিক্যাল দর্শনের জীবন্ত রূপকার—তাহলে সমস্ত কিছু জাগতিক জীবনের আকর্ষণ পরিত্যাগ করে, যে ডাকে অর্থাৎ সেই 'কল অব দ্য হিমালয়াজ'-এর অরুণালোকের স্পর্শে, কৈশোরেই বেরিয়ে পড়েছিলেন সে পথে যাত্রা করেননি তো ? কিন্তু তা কি সম্ভব ? তিনি যে বলেছিলেন—'Swamiji was full blooded masculine personality and......that was the frequent cry of his......'. "স্বামীজী এক পূর্ণ পুরুষ ব্যক্তিত্ব, তাঁর অস্তিত্বের অন্তরতম প্রকোষ্ঠেই এক যোদ্ধা, শক্তিমন্ত্রের মহান পূজারী এবং তার দেশবাসীর উৎকর্ষের জন্য বেদান্ত দর্শনকে বাস্তব রূপদান তিনিই করেছিলেন। উপনিষদ সর্বদাই বলে শক্তি আর শক্তি, ওই ছিল তাঁর আহ্বান বাণী"—কিন্তু নেতাজী নিজে ত ঠিক তাই সারা জীবনভোর প্রদর্শন করলেন। মহাশক্তি মন্ত্রের সাধক, রূপকার, আর তাঁর স্বদেশের মুক্তি, কিন্তু সে দেশের সমাজজীবন যে যন্ত্রনাকাতর, অতএব কোন দুর্গম পর্বত গুহায় ধ্যানমগ্ন নেতাজীর রূপ—সে বড় কষ্টকল্পনা, তা যেন বিশ্বাসের গণ্ডি অতিক্রম করে যেতে চায়।

এবার আমাদের শেষ উত্তরের জন্য প্রস্তুত হতে হয়, অর্থাৎ উল্লিখিত ২, ৩ ও ৪ 'প্রপোজিসন' গুলোতে—নেতাজীর স্বাভাবিক মৃত্যু, অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং বৈরাগ্য—কোনটিই ঐতিহাসিক কিংবা বিজ্ঞানভিত্তিক বা সহজে যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়রূপে গৃহীত হওয়ার পক্ষে যথার্থ নয়। সেজন্য প্রথমটির মধ্যেই

people would like to know what had happened to one of their foremost leaders—did he die in the crash or spend the rest of his life in some prison ?"—The Statesman, April 11, 1978

সে ব্যাখ্যা নিহিত আছে। তিনি জীবিত; কিন্তু তাঁর প্রকাশলাভের পথ কঠিন ও ইস্পাত অর্গলে আবদ্ধ। এ ছাড়া অন্য কোন রকম ব্যাখ্যার সুযোগ কোথায় ?

একজন পাইলট, একজন রেডিও অফিসার, একজন গানার (প্রয়োজনে গোলা ছুঁড়তে পারেন) এবং সে-দেশ, ও সে দেশের ভাষা, রাজনীতি ও যুদ্ধ বিষয়ে অভিজ্ঞ—এই ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সংখ্যার ৪ জন জাপানীসহ নেতাজী ১৭/১৮ আগস্ট চীন-রাশিয়ার সীমান্তে দক্ষিণপ্রান্তের বিমানবন্দর দাইরেনে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর সেই সময়ই রুশ সেনাবাহিনী দাইরেন বিমানবন্দর জাপানীদের কাছ থেকে অধিকার করে নেয় এবং রাশিয়ার যুদ্ধবন্দীরূপে তাঁর ৯০ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবরুদ্ধ থাকার সম্ভাবনা আজো থেকে যায়। কারণ ভারতের গান্ধী-নেহরু পরিচালিত কংগ্রেস এবং তদানিন্তন কম্যুনিস্ট পার্টি, গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা এবং সাম্যবাদী রাশিয়ার বিচারে সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বন্ধু, অতএব তাঁর প্রতি এই পাঁচ পক্ষেরই অনীহা। যদি তাঁকে মুক্ত করে ভারতে প্রেরণ করার ব্যবস্থা হয়, তাহলে ভারতের বণিক-ধনিক-সর্বস্ব রক্ষণশীল রাষ্ট্র সমাজের প্রতিক্ষেত্রে ভীষণতম প্রতিক্রিয়া ঘটবে আর আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রমণ্ডলে হয়ত তার ফল হবে সুদূর-প্রসারী। তাই মুখ বন্ধ,—ইতিহাসের পথরোধ—বড় নিষ্ঠুর, বেদনাদায়ক সে প্রতিরোধ ব্যবস্থা। কিন্তু এইখানেই বিচারের ভুল !

১৯৪৫-এর ১৮ই আগস্ট তাইহোকুতে কয়েক ঘণ্টার তফাতে দুটি বিমান পৌঁছেছিল। বহুল প্রচারিত নেতাজীর একমাত্র ভারতীয় সঙ্গী কর্ণেল হবিবুর রহমান একটি বিমানে নেতাজীর সঙ্গী ছিলেন না—এটাই সত্য। আর ১৯৪৪ সালের ২৩ শে অক্টোবর ঐ বিমানঘাঁটিতে যে দুর্ঘটনা ঘটে তাকেই সুযোগমত প্রচার করা হয়েছিল। নেতাজী ও জেনারেল সিদেই-সহ পাঁচজন আরোহী দাইরেনে উড়ে গিয়েছিলেন—তাঁদের নিরাপদে পৌঁছানোর সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তাইহোকুর সংবাদ তাঁরা প্রচার করেননি—এজন্য ২২শে আগস্ট পর্যন্ত অসীম আগ্রহে অপেক্ষা করতে হয়েছিল জাপানকে। ব্যবস্থা ছিল, জেনারেল সিদেইকে নেতাজীসহ নামিয়ে অন্য তিনজন টোকিওতে ফিরে আসবেন ; কিন্তু তাঁরাও বন্দী হওয়ায়, শেষে আর অপেক্ষা না করে 'দোমেই এজেন্সী' টোকিও থেকে বিমান দুর্ঘটনায় ঐ কয়জনের মৃত্যুকাহিনী ঘোষণা করেছিলেন। ব্রিটিশ-আমেরিকান মিলিটারী গোয়েন্দা বিভাগ নেমে পড়েই যে সব কাগজপত্র, হাসপাতালের রিপোর্ট ও বিমানবন্দরের দলিল

দস্তাবেজ 'সিজ' করেছিলেন—তা অতি সূক্ষ্মতম, সুদক্ষ জাপানী বুদ্ধি বিবেচনা ও কর্মতৎপরতার এক অমূল্য নিদর্শন, নেতাজীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধাপ্রীতির আত্মিক সহমর্মিতার এক দুঃসাহসী নজিরহীন দলিল।

১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে সেই সময়ে সাউথ ইস্ট এশিয়া কম্যাণ্ডের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার মাউণ্টব্যাটেন (পরে ভারতের বড়লাট) ১৯৪৫-এর ২রা নভেম্বর তাঁর ডায়েরীতে লেখেন—'যতক্ষণ না পর্যন্ত দুর্ঘটনাস্থলের তোলা ছবি এবং বোসের প্রকৃত দেহাবশেষ পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ উক্ত কাহিনী চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা যায় না। কাহিনী যে বানানো, তার সম্ভাবনা ৩টি কারণে উড়িয়ে দেওয়া যায় না : (ক) দুর্ঘটনা সম্বলিত ৪টি বার্তাসহ ফাইলটি ছাড়া ব্যাঙ্কক এবং সায়গণের সমস্ত নথিপত্র জাপানীরা ধ্বংস করে গেছে (সম্ভবত এটি একটি সাজান কাহিনী), (খ) বোসের প্রস্থান ভারতীয়দের জানানর জন্য জাপানী জেনারেল ইসোদা অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিলেন, সম্ভবত তাঁর মৃত্যু সংবাদের জন্য তাঁদেরকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে, (গ) ঘটনা হচ্ছে, একটি সংবাদসূত্র বলছে বোস জাপানে মারা গেছেন, যখন অপরটি প্রচার করছে ফরমোজায়।'[১৭]

১৭ই আগস্ট সন্ধ্যায় সায়গন বিমানবন্দরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সুপ্রীম কম্যাণ্ডাররূপে নেতাজীর গৃহীত ফটোই তাঁর শেষ ফটোগ্রাফ, তাইহোকুতে তাঁর অবতরণ ও পুনরায় বিমানে ওঠা এবং বিমান ধ্বংসের সঙ্গে হাসপাতালে চিকিৎসা বা মৃত্যুর কোন ফটোগ্রাফ বা প্রমাণ আমেরিকান গোয়েন্দা দপ্তর বা কোন ভারতীয় আজও পর্যন্ত দেখেননি। ভারতীয় তদন্ত কমিশন ফরমোজায় কোন তদন্তই করেননি।

১৭। Summary of Records in the Mountbatten Diaries (WO. 172 in P. R. D.) Relating to death of Chandra Bose : The Review comments that the story can not be taken as final until the photographs said to have been taken on the spot, and the actual remains of Bose have been examined. The Review also comments that the possibility that it is fictitious can not be overlooked for 3 reasons : (a) All records of Bangok and Saigon were destroyed with the incidents (a plausible plan), (b) The Japanese General Isoda was anxious to inform the Indian community of Bose's departure, possibly in order to prepare them for the news of his death, (c) The fact that one source stated that Bose died in Japan whilst the other said in Formosa [পরিশিষ্ট—Viceroy Wavell's Journal]

এস. এ. আইয়ার আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের প্রচারমন্ত্রী ছিলেন। স্থানাভাবে সায়গন থেকে নেতাজীর বিমানে যেতে পারেননি এবং আই. এন. এ-র অন্যান্য অফিসার ও মন্ত্রীদের সঙ্গে তিনিও সায়গন বিমানবন্দরেই তাঁকে বিদায় জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রকাশিত 'আণ্টু হিম এ উইটনেস' বইতে লিখেছেন—"কিন্তু কোথায় নেতাজী যাচ্ছিলেন? আমরা সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম না এবং তিনি আমাদের তা বললেন না। কিন্তু আমরা তা জানতাম এবং তিনি জানতেন যে আমরা তা জানি। বিমানটি মাঞ্চুরিয়ায় যাবার জন্য প্রস্তুত।"১৮

গান্ধীজী ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে পাবলিক মিটিং এ বলেন, তাঁর বিশ্বাস বোস জীবিত এবং আত্মগোপন করেছেন, এবং এ ধারণা তাঁর অন্তরের আদেশ থেকেই বলছেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস, তাঁর এই অন্তরের আদেশ তিনি যে গোপন সংবাদ পেয়েছেন তার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এই গোপন রিপোর্ট-এর ভিত্তি: নেহরু রাশিয়া থেকে নেতাজীর যে একটি চিঠি পেয়েছেন তাই। সে চিঠিতে তিনি পালিয়ে ভারতে আসতে চেয়েছেন, এবং সেই কথা নেহরু ও শরৎচন্দ্র বসুই একমাত্র জানতেন এবং এটা সম্ভাব্য যে ঐ চিঠিখানা পৌঁছানর কাল ও জনসভায় গান্ধীজীর উপরিউক্ত ভাষণ একসূত্রে গ্রথিত। ... ... ডিসেম্বর মাসের এক রিপোর্টে জানা যায় যে, খোস্ত-এর আফগান প্রদেশের গভর্নরকে কাবুলের রুশ রাষ্ট্রদূত জানিয়েছিলেন যে মস্কোতে বহু কংগ্রেস রিফিউজী রয়েছেন এবং নেতাজী তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। এইসব উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে নেতাজীর বিষয় পল্লবিত করে বাড়িয়ে গল্প বলার কোন কারণ থাকতে পারে না। এই সংবাদের আর একটি সূত্র হচ্ছে তেহেরান থেকে যাওয়া একটি সরকারী সংবাদ—যা বলছে, রাশিয়ান ভাইস-কনসাল জেনারেল মোরাডফ মার্চ মাসে প্রকাশ করেছেন যে নেতাজী রাশিয়ায় আছেন এবং সেখানে ভারতের স্বাধীনতার জন্য একদল রাশিয়ানকে নিয়ে অতি গোপনে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর ধারায় এক সংগঠন গড়ে তুলছেন। তাইহোকু কাহিনী, কংগ্রেসের সংবাদসূত্র এবং কাবুল, তেহেরানে রুশ প্রতিনিধিদের রিপোর্ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় একথা

১৮। S. A. Iyer—Unto Him A Witness : Page 69 :—"But where was Netaji going? We did not ask him and he did not tell us. But we knew and he knew that we knew. The plane was bound for Manchuria."

নিঃসন্দেহে বলা যায়।[১৯] এই তথ্যের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা মস্কো প্রত্যাগতা ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের দিল্লীতে ফিরে যে অব্যক্ত ইঙ্গিত।

ভারত ভাগ হয়ে ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর ভগিনী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূতের পদে মস্কোতে প্রেরিত হন। তিনি রাশিয়া থেকে প্রথম প্রত্যাবর্তন করেই দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ মাত্রই প্রধানমন্ত্রী নেহরুসহ বহুজনের সাক্ষাতে বলেছিলেন—রাশিয়ায় এমন এক তথ্য জেনে এসেছেন তিনি যা জেনে সমগ্র ভারত আনন্দে পাগল হয়ে উঠবে। হয়তবা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রামলীলা ময়দানে সে সংবাদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা তিনি দেননি। —শুধু তাই নয়, এই তিরিশ বছরকাল সে সংবাদ পরিবেশন নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কি-সে গূঢ় ও গোপনীয় তথ্য যা কোটি প্রাণে আনন্দদায়ক হওয়া সত্ত্বেও অনড় ও স্তব্ধ হয়ে রইল কার স্বার্থে ও কোন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে, সে কথা এখনো অজ্ঞাত। শ্রীমতী পণ্ডিতকে লেখক ১২-৪-৮৬ তারিখে এ বিষয়ে অনুরোধ

১৯। "Gandhi stated publicly at the beginning of January that he believed that Bose was alive, and in hiding ··· ascribing it to an inner voice ··· ··· Congressmen believe that Gandhiji's inner voice is secret information which he had received ··· This is, however, a secret report which says Nehru received a letter from Bose saying he was in Russia and that he wanted to escape to India ··· The information alleges that Gandhi and Sarat Bose are among those who are aware of this ··· it is probable that the letter from Bose arrived about the time Gandhi made his public statement. ··· On the 7th of January, the Russian paper 'Pravda' denied in strong terms that Bose was in Russia ··· in December a report said, the Governor of the Afghan province of Khost had been informed by the Russian Ambassador in Kabul that there were many Congress refugees in Moscow and Bose was included in their number. There is little reason for such persons to bring Bose into fabricated stories ··· is supplied in another report received from Teheran. This states that Moradoff, the Russian Vice Consul General disclosed in March that Bose was in Russia, where he was secretly organising a group of Russians to work on the same lines as the I.N.A. for the freedom of India."

—Dissentient Report : pp 165-66

জানিয়েছিলেন—কিন্তু তিনি নিরুত্তর। তাহলে কি যথেষ্ট সংশয়ের উদ্রেক করে না যে, সে সময়ে স্ট্যালিন পরিচালিত রাশিয়ার লৌহ কঠিন শাসন ব্যবস্থা, বিশেষত তাঁর দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা বিভাগ কে.জি.বি.র শ্যেন দৃষ্টির পরিধির মধ্যেই নেতাজীর অবস্থান এবং সেই অবস্থা দিল্লীর শাসকবর্গেরও সমর্থনপুষ্ট। শুধু জানা নাই অথবা জানতে দেওয়া হয়নি সে কথা এই বিশাল দেশ ভারতের অধিবাসীদের। লেখক দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সত্যতা যাচাই-এর জন্য লিখিত অনুরোধ করেছিলেন, প্রধানসচিব তার প্রাপ্তি স্বীকার করলেও ঐখানেই তার সমাপ্তি ঘটে।

এ বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্যের পরিসমাপ্তির পূর্বে, নেতাজীর মাঞ্চুরিয়া পৌঁছানো এবং সেই পথ ধরে রাজনীতির বেড়াজাল, যুদ্ধক্ষেত্রের দাবানল, জাপান-চীন-রাশিয়ার দুরধিগম্য সীমান্ত অতিক্রম করে তাঁর ইউরোপের সুদূর সাইবেরিয়ায় উপস্থিত সম্ভব এবং বিজ্ঞানসম্মত কিনা দেখা দরকার।

ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ অভাবিতভাবে ফরমোজার তাইহোকুতে উপস্থিত হন এবং তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি নেতাজীর অন্তর্ধান বিষয়ে বেসরকারী তদন্ত সংগঠিত করেন। তিনি জাপান এবং রাশিয়ায় এ জন্য একাধিকবার অনুসন্ধান পরিচালনা করেন। তাঁরই, 'নেতাজী রহস্য' বই-এর প্রথম বাক্যটি এইভাবে শুরু হয়েছে—"১৯৪৫-সালের ১৮ই আগস্ট ফরমোজা দ্বীপের যে জায়গায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিমান দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন বলে খবর বেরিয়েছিল, ঠিক সেইখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম ১৯৬৪ সালের ১৮ই নভেম্বর তারিখে।" ... ফরমোজা সরকার তাঁদের ভারত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কয়েকজন বাছাই করা পদস্থ কর্মচারীকে আমার অনুসন্ধান কার্যে সহায়তা করার নির্দেশ দিলেন ... শ্রীচুয়াং হলেন বৈদেশিক দপ্তরের এবং শ্রীতাও সাংস্কৃতিক সংস্থার। শ্রীচুয়াং জেনারেলেসিমো চিয়াং কাইসেকের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইনি ছিলেন নয়া দিল্লীতে চীন সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ... তাঁর আসল কাজ ছিল সামরিক এবং অসামরিক ব্রিটিশ ও চীনা গুপ্তভথ্য সংগ্রহকারী বিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা। 'নেতাজী রহস্য' পৃষ্ঠা ৬ঃ

"... তিনি আমাকে স্থানটি দেখিয়ে বলেন, এই সেই বিমান দুর্ঘটনার স্থান। তাইপের (তাইহোকু) ইতিহাসে এটাই একক।'

'দুর্ঘটনার তারিখ?'

‘১৯৪৪ সালের ২৩শে অক্টোবর। টৌকিও-সময় অপরাহ্ণ ২টায়।’

‘জাপানী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের খবরে তারিখটা কি ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট বলা হয়নি ?’

‘খবরটা সঠিক নয়। আমি আপনাকে যে সংবাদ দিলাম সেটি ছাড়া তাইপেতে কোনো বিমান দুর্ঘটনা হয়নি। ”

পৃষ্ঠা-১২ ঃ “ ‘… তাইপের মধ্যেই লুয়াংশান মন্দির। অভ্যন্তরে সোনা দিয়ে মোড়া সব প্রতিম' এবং পাথরের থামগুলো খোদাই করা। ২৩০ বছরের এই পুরানো বুদ্ধ মন্দির আলঙ্কারিক স্থাপত্যে সমৃদ্ধ।’ প্রণিপাত শেষে তিনি চলে যাবার উপক্রম করছেন দেখে তাঁকে প্রশ্ন করলাম যে, তিনি তাইপে বিমানপোতের একজন প্রবীণ কর্তা কিনা।’

‘হ্যাঁ। যুদ্ধের সারা সময়টাই আমি জাপানীদের অধীনে বিমানপোতের ফায়ার ব্রিগেড বাহিনীর কর্মী ছিলাম।’

‘আপনার সময়ে কোনও দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে ?’

‘হ্যাঁ, ১৯৪৪-এর অক্টোবরে একটি হয়েছিল। কিন্তু সেই সোনাবাহী বিমানটি লুট করার জন্যই জাপানী ষড়যন্ত্রকারীর দল ভূপাতিত করে। সে দিনটি আমাদের খুব কষ্টে কেটেছে। ঐ য়ুয়ানশান পাহাড়ে জাপানীদের তৈরী নতুন মন্দিরটি একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শত শত লোককে জঙ্গল সাফ এবং সোনা খুঁজে বের করে জাপানীদের দেবার কাজে লাগানো হয়। ঐ দুর্ঘটনার বহু প্রত্যক্ষদর্শী ফরমোজার বিভিন্ন অঞ্চলে এখোনো বাস করছেন…।’

‘১৯৪৫-এর আগস্টে আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল ?’

‘১৯৪৫-এ কোনও দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিনি। কিন্তু হলে নিশ্চয়ই জানতে পারতাম। কারণ আমি দমকল বাহিনীর লোক। দুর্ঘটনার স্থানে ছুটে যাওয়াই আমাদের কাজ।’ ”

পৃষ্ঠা-১৪ ঃ “… পূর্ব ব্যবস্থামত শ্রীতাও মন্দিরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর কাছে কয়েকটি দরকারী খবরও পেলাম। তিনি বললেন, যুদ্ধকালীন আমাদের নয়াদিল্লীর কূটনৈতিক ও সামরিক মিশনের কাগজপত্র দেখলাম। এটা সন্দেহের অতীত যে, ব্রিটিশ গোয়েন্দা দল সুভাষ বসুর পশ্চাৎ অনুসরণ করেছিল। টৌকিও থেকে যে বিমানে শ্রীবসুর আসার কথা ছিল সেটিকে তাইপেতে নামাবার জন্য ব্রিটিশ অর্থে একদল ষড়যন্ত্রকারী মোতায়েন থাকে। ভ্রমণ সূচীর কিছু পরিবর্তনের ফলে শ্রীবসুর যাত্রা সময় পিছিয়ে যায়।

কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সংগ্রহ করা সোনা বোঝাই বিমানটি টোকিও পাড়ি দেবার পথে জাপ মাফিয়া দল তাইপেতে ভূপাতিত করে। আমাদের অনুচরদের অনুমান, শ্রীবসু ঐ বিমানে ছিলেন। আর সেইমত আমাদের কাগজপত্রে তাঁকে ১৯৪৪ সালের ২৩শে অক্টোবর নিহত ঘোষণা করা হয়।'

পৃষ্ঠা-১৫ : " '… কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হল ১৯৪৫-এর ১৮ই আগস্ট বিমানে সায়গন ত্যাগের পর তাঁর কি হল, সে সম্পর্কে খবর নেওয়া।' 'যা হোক, এটুকু আমরা নিঃসন্দেহ যে সেদিন এখানে কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। সুতরাং তাইপেতে শ্রীবসুর মৃত্যুর প্রশ্নই ওঠে না। সুপ্রসন্ন ভাগ্য যে তিনি ১৯৪৪-এর দুর্ঘটনায় পড়েননি। কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ এটিকেই ১৯৪৫-এর আগস্ট প্রচার করল।'

'এমন প্রচারের কি প্রয়োজন ছিল ?'

'তাদের অপরাধ গোপন করা।'

'এই অপরাধের বিস্তৃত বিবরণ আমাদেব খুঁজে বের করতে হবে।' শ্রীতাও বললেন, 'একবার শ্রীবসু সম্পর্কে আমাদের নথিপত্র প্রকাশ করলে নয়া দিল্লীতেও একটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হবে। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন বাস্তবে যিনি মরণকে পরাজিত করেছেন, তাঁর সম্পর্কে সত্য আমাদের উদ্ঘাটন করতে হবেই।' "

জাপানী গোয়েন্দা বিভাগ শুধু খবর রটিয়েই ক্ষান্ত হয়নি—বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যে তারা ফটোগ্রাফারেরও ব্যবস্থা করেছিল। ১৯৪৪, ২৩শে অক্টোবর সত্যি সত্যি ইউনসান মন্দিরের সোনা-লুঠকারী দস্যুদের সংকেতে একটা বিমান দুর্ঘটনা হয়েছিল। তাকেই নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেবার জন্য তাঁরা কর্নেল হবিবুর রহমানকে ব্রিটিশ-আমেরিকান গোয়েন্দাদের একথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে দুর্ঘটনাটি ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের নেতাজী তদন্ত কমিটির সামনেও জাপানীদের শেখানো কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন হবিবুর রহমান, আর জাপানীদের দেওয়া একটি ফটোগ্রাফ প্রদর্শন করেছিলেন যা অদ্যাবধি ছাপা হয়ে চলেছে। আজও ভারত সরকার নেতাজীর মৃত্যুর কল্পিত কাহিনী আঁকড়ে ধরে রয়েছেন—তাতে পর্যবেক্ষক ও গবেষকদের এ ধারণা বদ্ধমূল করানোর প্রয়াস যে নেতাজী মৃত এবং দেশবাসীকে তাই মেনে নিতে বলা।

ডাঃ সিংহ লিখেছেন,—"যে তদন্ত সরেজমিনে করতে পারা গেল না, সেই তদন্তের মানে কি ? ফরমোজার জাতীয়তাবাদী চীন সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জের

বিশিষ্ট সদস্য। ভারত সরকার যদি ফরমোজা সরকারকে তদন্তের সুবিধা দেবার অনুরোধ জানাতেন, তবে তাঁরা নিশ্চয়ই প্রত্যাখান করতেন না। কারণ এটা একটা মানবিক ব্যাপার। পূর্ব-জার্মানীর সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও আমি বার্লিনে ভারতীয় সামরিক মিশনের সদস্য হিসাবে মিশনের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে পূর্ব-বার্লিন ও পূর্ব-জার্মানীতে গিয়ে আমাদের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ পালন করেছি। ··· ভারত সরকারের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এই সত্যের মুখোমুখি হতে ভীত যে তাইপের বিমান দুর্ঘটনার সঙ্গে নেতাজীর কোন সম্পর্ক নেই।

··· খাস ফরমোজা দ্বীপে অনুসন্ধান চালিয়ে আমি নিজে যা জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে নেতাজী ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট বেলা ২-৩০ মিনিটে দাইরেন যাত্রা করেছিলেন। এবং ঐদিনই সন্ধ্যায় নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছিলেন।" ('নেতাজী রহস্য'—পৃষ্ঠা ২৫)

১১ই আগস্ট ১৯৪৫, রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে বিশাল রাশিয়া ক্ষুদ্র জাপানের কাছে পরাজিত হয়েছিল। জাপানীরা রাশিয়ানদের কাছ থেকে পোর্ট আর্থার ও দাইরেন কেড়ে নিয়েছিল। সেই কলঙ্ক মুক্তির জন্য রাশিয়ার লাল ফৌজ মার্শাল এ. ভি. ভ্যাসিলেভস্কির নেতৃত্বে মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণ প্রান্তের এই বিমানবন্দর ও পোতাশ্রয় পুনরুদ্ধারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নেতাজী এই ইতিহাস ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই, জাপানের আত্মসমর্পণে, দাইরেনে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তি এবং রাশিয়ার পরিসীমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে ব্রিটিশ-আমেরিকান ব্যূহের বাইরে তাঁর চলে যাওয়া এবং বিপ্লবী ও সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার সহযোগিতায় আবার ভারত অভিযানের আয়োজন—এই পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। কিন্তু আণবিক বোমা বিস্ফোরণে মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েও, দুর্জয় জাপ সৈন্যবাহিনী হার স্বীকার ও আত্মসমর্পণ করলেও মাঞ্চুরিয়ায় লাল ফৌজের বিরুদ্ধে মরণ যুদ্ধ চালিয়ে যায়—১৬ই আগস্ট নূতন জাপ মন্ত্রীসভার দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত অনুসারে।

দাইরেনে যুদ্ধের দায়িত্ব নিয়ে জেনারেল সিদেই সেইজন্য চলেছেন। ৯৭/২ স্যালী টাইপের দু-ইঞ্জিনের এক বোমারু বিমান সিদেই ও নেতাজীকে নিয়ে সায়গনের বিমানঘাঁটী থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে দাইরেনের পথে উড়ে চলল। আর দু'ঘণ্টা দূরত্বে তুরেন বন্দরে বিরতি ও গোপনতম পরিকল্পনা। যুদ্ধাস্ত্র-গোলাবারুদের ওজন কমিয়ে জ্বালানী তেল ভরা হলো, হবিবুর

রহমানসহ অধিকাংশ জাপানী অফিসার আর মালপত্রের অনেকখানিই আর একখানি পৃথক বিমানের ব্যবস্থায় রইল। ১৮ই আগস্ট সকালে তুরেন ছেড়ে ফরমোজার (তাইপে) তাইহোকু বিমানঘাঁটিতে আধ ঘণ্টার বিরতি ও লাঞ্চ দুপুর দুটোয়। —তখনো দাইরেনে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে জাপানী সৈন্য-বাহিনীর আমরণ যুদ্ধ চলেছে। জাপ মিলিটারী গোয়েন্দা ও গুপ্তচরদের কিভাবে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে জেনারেল সিদেই ও নেতাজী দাইরেনের পথে যাত্রা করেন। নেতাজীকে বন্দী করার জন্য সায়গনের পথ ধরে ব্রিটিশ-আমেরিকান বিমানের তাইপের পথে যে কোনো মুহূর্তে পৌঁছে যাবার সমস্ত প্রকার সম্ভাবনা। পরিস্থিতি এতই দ্রুত আবর্তিত হয়ে চলেছে যে, টোকিওর সঙ্গে নেতাজী-সিদেইর টেলি যোগাযোগ প্রায় অসম্ভব—আর তাই-ই নেতাজীর দুঃসাহসিক, বিপজ্জনক পরিকল্পনার অনুকূল। মহাজীবনের মহাঅভিসার।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পোশাকে তাইহোকু থেকে বিমানে নেতাজীর দাইরেন যাত্রার প্রত্যক্ষদর্শী জাতীয় চীন সরকারের কর্নেল ইয়ে। এবং ঐ কর্নেল তখনকার চুং কিং-স্থিত তাঁর গভর্নমেণ্টকে সে বিষয়ে তৎক্ষণাৎ অবহিত করেছিলেন ; আর তাইহোকু ত্যাগের কিছুক্ষণ পরেই কর্নেল হবিবুর রহমানসহ তুরেন থেকে দ্বিতীয় বিমান এসে অবতরণ করে। পূর্ব-প্ল্যান অনুযায়ী জাপানী গোয়েন্দা বিভাগ, এ্যাংলো-মার্কিন মিলিটারী কর্তৃপক্ষকে বিমান দুর্ঘটনার সাজানো কাহিনীর (ইউরানসান পাহাড় মন্দিরে এক বছর আগের বিমান দুর্ঘটনার বিবরণ) বর্ণনা দেন, প্রায় দশদিন ধরে দুর্ঘটনা রটানর ট্রেনিং পাওয়ার পর। তাছাড়া তাইহোকুর মিলিটারী হাসপাতালে নাম্মুন ওয়ার্ডের কাগজ, ফাইলপত্র ও মেডিক্যাল রিপোর্ট ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। দাইরেনে নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের চাঞ্চল্যকর কাহিনীর বর্ণনা দেন নেতাজীর কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট থাকাকালে কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে চীনা প্রবাসী মিঃ তিং নামে চুং কিং সরকারের একজন গোয়েন্দা কর্মী। ইনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় মাঞ্চুরিয়ার জাপানী তৎপরতার গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য দাইরেনে ঢুকে পড়েন, সেখানে তাঁর 'বিউটী সেলুন' থেকে তাঁকে জাপানী সামরিক অফিসাররা নেতাজীর বাসস্থান 'বিলে ভিলায়' গাড়ীতে তুলে নিয়ে যায়—সেই বাড়ীতেই নেতাজীকে তিং দেখতে পান, এবং কলকাতাতে শেখা বাংলা ভাষাতেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যে দাইরেন রুশ বাহিনীর

অধিকারভুক্ত হয়। রুশ ও জাপানী উভয় সরকারই মিষ্টার তিংকে তাঁদের পক্ষে বিশ্বস্ত মনে করে গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত করে, যদিও তিনি তাঁর চিয়াং-কাইসেক সরকারের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তিতে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে যান। ইনি যুদ্ধ শেষে ফরমোজাতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহকে রহস্য উদঘাটনে নেতাজীর গুণমুগ্ধ এই চীনা ১৯৬৪ সনে সর্বোতভাবে সাহায্য করেন।

‘প্রমাণ চান’—

‘দেখেই চিনতে পারলাম, এটি সুভাষবাবু। বিলক্ষণ, এটি তাঁরই ফটো।’ ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ লিখেছেন—‘প্রতিভাদীপ্ত সৌন্দর্যময় দৃঢ়তাব্যঞ্জক অভিব্যক্তি, কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে একটি আপনভোলা স্মিতহাসির প্রশ্ন —অতঃপর ?—কনফুসীয় পণ্ডিতের বেশে একজন সন্ন্যাসী। সেই প্রশস্ত কপাল। দীর্ঘায়ত নিরীক্ষণকারী দৃষ্টি। কিন্তু তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে এই বেশে কখনও দেখেননি ··· মাঞ্চুরিয়া থেকে আগত চীনা কনফুসীয় পণ্ডিতের আলখাল্লায় ভূষিত নেতাজীর প্রতিকৃতি। পটভূমিতে রয়েছে একটি বন্দরের প্রাকৃতিক দৃশ্য। তিং বললেন এটি দাইরেন বন্দর। ছবিটি দেখলে মনে হবে নেতাজী তখন অস্বাভাবিকভাবে গভীর চিন্তামগ্ন। ছবিটি নেতাজীর অজ্ঞাতসারেই টেলিলেন্সে নেওয়া। ছবিটি ১৯৪৯-এর গ্রীষ্মে। ··· তাঁর নামকরণ হল ‘তাওলিন’। আমার কাছে প্রয়োজনমত ব্যবহারের জন্য জাতীয়তাবাদী চীনা সরকারের কয়েকটি অলিখিত পাশপোর্ট ছিল। তার একটাতে নেতাজীর ফটো সেঁটে দিলাম। নাম লিখলাম তাওলিন। জন্মস্থান—য়ুয়েন। তারিখ ২৩শে অক্টোবর ১৮৯২ সাল’।’

“১৯৪৫ সালের ২৬শে আগষ্ট এক সন্ধি চুক্তির ফলে দাইরেন অবাধ বন্দর ঘোষিত হলো। ঠিক হলো বন্দরের অধিকর্তা হবেন একজন রাশিয়ান, দাইরেনের বাইরে যাবার নিয়ন্ত্রণ অধিকার তাঁর ওপর। ফলে দাইরেন নগরীর বাইরে যাওয়া বা জগতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা খুবই কঠিন হলো। নেতাজী বাইরের সাহায্যের প্রতীক্ষায় বৃথা রইলেন।······ তারপর রাশিয়ানরা চীনাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। দেখাতে হল পাশপোর্ট।······ যাহোক, যতদিন আমি দাইরেনে ছিলাম ততদিন এ সম্পর্কে নেতাজীর কোন চিন্তার কারণ হয়নি। কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াল, যেদিন মাছধরা বোটের মাঝি সেজে আমি দাইরেন থেকে সরে পড়লাম। তাঁর জন্যও এই পথ ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু

সব ব্যর্থ। জানেন, চীনাদের কতগুলি জাতীয় বৈশিষ্ট্যমূলক ছলচাতুরী জানা আছে, যা অন্যের পক্ষে নকল করা কঠিন। ...... তারপর এল সেই ১৯৪৯-এর দুর্দিন। আমাদের সরকারকে মূলভূমি ছেড়ে ফরমোজায় চলে আসতে হলো। (মাও সে-তুং ক্ষমতাসীন হন, চিয়াং কাইসেক ফরমোজায় বিতাড়িত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত জাতীয় চীন বা 'তাইওয়ান' গভর্নমেন্টের রাষ্ট্রপ্রধানরূপে মার্কিন সরকারের সাহায্যলাভ করেন।)* এই সময় আমাদের বহু গোপনীয় নথি চিকমদের (কম্যুনিষ্ট চায়না) হাতে পড়ে।...... চিকম গোয়েন্দা পুলিশ দাইরেনে ঢুকলো। তারা আমার ক্রিয়াকলাপ টের পেল। তার সঙ্গে পেল নেতাজীর সংবাদ। নেতাজীর খবর সম্পর্কে তারা রুশদের হুঁশিয়ার করে দিল। শীগগিরই নেতাজী রুশদের হাতে ধরা পড়লেন।"[২০]

নেতাজী দাইরেনে আশ্রয় নিয়েছেন, ভারত গভর্নমেন্টের সহযোগিতায় মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছেন—সে তথ্য এই কম্যুনিষ্ট বিরোধী জাতীয়তাবাদী চীনা নাগরিক ভিং রাজনীতির দিক থেকে বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও নেতাজীর বিরাটত্ব ও তাঁর সুমহান আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবশত, বহু বিপদের ঝুঁকি নিয়েও নানকিংয়ের ভারতীয় দূতাবাসে গোপনে জানিয়েছিলেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ঐ দূতাবাসের সামরিক এ্যাটাসে মারফৎ সম্ভবত তা অবহিত হয়েছিলেন। কিন্তু 'রেড চায়না' বা মাও সে-তুং ক্ষমতাসীন চীনের সঙ্গে ভারত গভর্নমেন্টের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর এই ব্যক্তি ভারতের নিকট মার্কিনী প্রতিভূরূপে চিহ্নিত হন এবং নেতাজী প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীরূপে হস্তক্ষেপ করা এবং নেতাজীকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার কোন চেষ্টাও নয়ই, আমাদের প্রধানমন্ত্রী দাইরেনের সংবাদটির কোন মূল্যই দেননি সেদিন।[২১]

---

* INDIA-CHINA-TIBET TRIANGLE—Ram Gopal: p. 38 "At the end of the summer of 1949, the Kuomintang Government of China which had for years being registing the Communist onslaught, collapsed, and on 1st October, Mr Mao Tse-tung, the Communist leader, proclaimed the inauguration of the People's Republic of China."

[২০]। নেতাজী রহস্য: পৃষ্ঠা—৩৮-৪৩

[২১]। নেতাজী রহস্য: পৃষ্ঠা—৫৩

দাইরেনে সে সময়ে নেতাজী যদি জীবিত ছিলেন, তাহলে তিনি ভারতে ফেরেননি কেন—এবং রুশ সরকার ত আমাদের মিত্রদেশ, তাঁদের নিকট কি করেই বা তিনি আবদ্ধ থাকতে পারেন ? এ প্রশ্ন খুব সাধারণ অথবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ওঠার সম্ভাবনা।—কিন্তু নেতাজীকে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা ত দূরের কথা, এমনকি ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁর অন্তর্ধানের বিষয়ে সামান্যতম অনুসন্ধানও করেননি। স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ এগার বৎসর পর্যন্ত বহু তথ্য স্বাভাবিকভাবেই নিখোঁজ হয়ে যায়। প্রথম যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় তা অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রীর প্রচণ্ড অনিচ্ছায় এবং কেবলমাত্র জনসাধারণের প্রবল চাপের ফলে—এ এক খুবই বিস্ময়কর ঘটনা। যে কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দেশ ও জাতি প্রথম সুযোগেই তার এরূপ মহান সন্তানের সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে অগ্রণী হতেন। ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনীর গৌরবময় যুদ্ধ ও আত্মোৎসর্গের বিষয়ে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করে সঠিক ইতিহাস রচনা করতে অগ্রণী হতেন। জাতীয় মহাযুদ্ধের দুঃসাহসী সৈন্য ও সেনাপতিদের স্বাধীন দেশের কর্মে অঙ্গীভূত না করা সে আর এক বিস্ময়কর ঘটনা—যা থেকে দেশবাসীর এই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের অপরাধবোধ এবং কোনও প্রকার ভীতি তাঁদের আচ্ছন্ন করেছিল।

ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধের পর (১৯৬২) চীনের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মুক্তি হলে তিব্বত থেকে ফেরা জনৈক ক্যাপ্টেনের নিকট ১৯৬৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী জানা যায় তাই লিং-বেশী নেতাজীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রুশ গোয়েন্দা-পুলিশ ঘাঁটীতে (কে.জি.বি.) নিয়ে যাওয়া হয়। আইভান লিং নামে এক চীনা সৈনিক (চীন-রুশী শঙ্করজাত) ঐ কে.জি.বি.-তে ওয়ার্ডার ছিলেন। সেইখানে আইভান ঐ ছদ্মবেশী ভারতীয়ের ঘনিষ্ঠ হন এবং ভারতের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির মরিয়া হয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা ও বিফলতা দেখতে পান। আইভান লিং তিব্বতে তার বদলী হয়ে যাওয়ার কথা জানালে নেতাজী তিনটি শব্দবিশিষ্ট অতি গোপন একটি 'নোট' তাঁর হাতে দেন—এই আশায় যে, একদিন তাঁর সে কথা নিশ্চয়ই তাঁর জন্মভূমি ভারতে পৌঁছুবে। সেই তিনটি শব্দ ছিল :—"বস্পমৃনিশে-মায় জয়হিন্দ" (মনে রেখো আমার জয়হিন্দ)।[২২]

---

[২২] নেতাজী রহস্য : পৃষ্ঠা-৪৫

ভারতের স্বাধীনতার জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজী জার্মানী ও জাপানের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন—জার্মানী ও জাপানের শত্রুজোট ছিল ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স। সেই নিয়মে নেতাজী, এই যুদ্ধে জয়ী রুশ-ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার শত্রুরূপে বিবেচিত। আবার চীন ও রাশিয়া দুই দেশই সমাজতন্ত্রী দেশ হওয়ায়—মাও সে-তুং ও স্ট্যালিনের ১৯৫০-এর প্রথমেই ক্রেমলিনে সাক্ষাৎকারে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা—এক কথায় রাজনীতির স্বাভাবিক নিয়মে রুশ-চীন মৈত্রী সম্পাদন একই অর্থের পরিপূরক। সে কারণে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ আকিমভের গোঁড়ামীভরা উক্তি ছিল যে, তিরিশের দশকে ইউরোপ সফরের সময় সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিস্ট দলে যোগদান করেছেন এবং তাঁর এ মানসিকতার সমর্থনে কতিপয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির রিপোর্টের উল্লেখ তিনি করেন। এই আকিমভই দাইরেনে বন্দী নেতাজীকে জেরা করার জন্য মাঞ্চুরিয়ায় যান এবং জার্মান ফ্যাসীবাদের মিত্র হিসেবে চিহ্নিত করে বহু অনুগামীসহ তাঁকে অন্য নামে সাইবেরিয়ার ইয়াকুটস্ক কেন্দ্রীয় বন্দীশিবিরে অবরুদ্ধ করেন।[২৩]

উল্লিখিত, তিব্বত-ফেরা ভারতীয় স্থলবাহিনীর ক্যাপ্টেন নেতাজী সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টে কতগুলি স্পষ্ট গোঁজামিল দেওয়ার যে অভিযোগ ১৯৬৫-র ২৬শে জানুয়ারীতে করেছিলেন তারমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত ঐ ক্যাপ্টেনের সর্বশেষ অভিযোগ ছিল—"নেতাজী তদন্ত কমিটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে 'নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে' এই কথা ঘোষণা করে মানবিক বিচার-বিবেচনার বিধি লঙ্ঘন করেছেন। কারণ দাইরেনে নেতাজী রাশিয়ানদের কবলে পড়েছেন সে সম্পর্কে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তিব্বতের চিকমদের বন্দীশালা থেকে ফেরার সময় আমি স্বয়ং যে সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে এসেছি সেটাই নেতাজী সম্পর্কে সত্য উদঘাটন করে সুবিচার করার পক্ষে যথেষ্ট। সরকার আমার কোর্ট মার্শাল করতে পারেন। প্রমাণ হবে যে, ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্মুখে নেতাজী যে শৌর্যের আদর্শকে মূর্ত-প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—শুধু আমি নই—দুনিয়ার দরবার বলছে সে আজ বিগত দিনের ইতিহাস। আমাদের

২৩। নেতাজী রহস্য : পৃষ্ঠা-৯৮

স্বাধীনতালাভের পর বোধ করি জাতীয় জীবনে এত বড় বিচার প্রহসন আর ঘটেনি।"

"নেতাজী সম্পর্কে সত্য একদিন নিশ্চয়ই প্রকাশ পাবে।"

"সোজা পথে তা অসম্ভব। জাতির ইতিহাসে নেতাজীকে যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠা করে ভারতের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য নেতাজী-আদর্শে অনুপ্রাণিত কিছু বীর এবং দেশ-প্রেমিককে আত্মোৎসর্গ করতে হবে।"[২৪]

১৯৩৪ সালে ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ্ রাশিয়ায় সামরিক শিক্ষা গ্রহণের সময় ভারতের দুই ইতিহাস-খ্যাত বিপ্লবী বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও অবনী মুখার্জীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। অবনী মুখার্জীর রুশী সহধর্মিণী ফিটিংগফের গর্ভজাত পুত্রের নাম গোগা। ডঃ সিংহ্ পরবর্তীকালে ভারতীয় লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ইনি ১৯৫৪ সনে তাঁর অধ্যাপক আচার্য নরেন্দ্র দেব-সহ যখন রাশিয়া যান, তখন ব্রিটিশ শাসিত ভারতের রাশিয়ায় আশ্রিত বিপ্লবীগণের ভারতে প্রত্যাবর্তন না করতে পারার মতই স্বাধীনোত্তর ভারতেও ডঃ সিংহের মত বামপন্থী নেতৃবৃন্দের দাবী—ব্রিটিশ আমলের অপরিবর্তিত অবস্থা টিকে রয়েছে। যাইহোক, সাইবেরিয়ার জেলে আবদ্ধ বিপ্লবী অবনী মুখার্জীর পুত্র গোগার বিবরণ এখানে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। তা এই রকম ঃ

" ··· জ্ঞানের জগতের লোক বলে বাবা স্ট্যালিনের শুদ্ধীকরণের বলি হননি। যুদ্ধের সময়ে সাইবেরিয়ায় কমিন্টার্নের (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় তখন মস্কোয় রাশিয়ানদের একটা আধা গোয়েন্দা সংস্থা যুক্ত ছিল তার নাম কমিন্টার্ন) নির্বাসিত বিদেশী হোমরা-চোমরাদের মস্কো প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয় পঞ্চাশের দশকে। তাঁদের কাছ থেকে বাবা শুনলেন যে, সাইবেরিয়ার ইয়াকুটস্ক বন্দীশালায় তাঁরা একজন অতি শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় নেতাকে দেখেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যুদ্ধের সময় আমাদের শত্রু জার্মান ও জাপানীদের সাহায্য করেছেন। বাবার বুঝতে দেরী হলো না। তিনি আর কেউ নন। তিনিই সুভাষচন্দ্র বসু। বন্দীশালা থেকে সুভাষবাবুর মুক্তি প্রার্থনা করে বাবা স্ট্যালিনকে একটা ব্যক্তিগত পত্র লিখেছেন।

বোরিস কথার মাঝখানে মন্তব্য করল—'এইজন্যই বোধ হয় স্ট্যালিন তোমার বাবার ওপর খুব চটে যান।'

২৪। নেতাজী রহস্য ঃ পৃষ্ঠা-৪৯

'ঠিক তাই। বাবা স্ট্যালিনকে লিখেছিলেন যে, সুভাষবাবু একজন খাঁটী দেশপ্রেমিক। তাঁকে জার্মান বা জাপানীদের ক্রীড়নক বলা সঙ্গত হবে না। বার্লিন এবং টোকিওতে তাঁর তৎপরতার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে বহিঃশক্তির সাহায্য লাভ করা। আর সে সাহায্য তাঁর কাম্য ছিল একমাত্র রাশিয়ার নিকট থেকে। সুভাষবাবুর ওপর সুবিচার করার জন্য তিনি স্ট্যালিনকে অনুরোধ জানান। বাবার কাছ থেকে এমন অনুরোধকে স্ট্যালিন ফ্যাসিবাদী যুক্তি হিসেবে গণ্য করলেন। পত্রটি পাঠানোর পরের দিনেই রুশ গোয়েন্দা পুলিশরা বাবাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আজও তিনি ফেরেননি।'

'দুঃখের বিষয়', বোরিস বলল, 'সুভাষবাবুর পক্ষে প্রফেসার মুখার্জী বলেছিলেন আর তাই তাঁকেও ইয়াকুটস্‌ক বন্দী শিবিরে পাঠানো হয়েছে!'

'তুমি নিশ্চিত জানো যে, সুভাষবাবু ইয়াকুটস্‌ক বন্দী শিবিরে আছেন!' আমি গোগাকে প্রশ্ন করলাম।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সমসাময়িক কমিন্টার্নের ভারতীয় শাখার অধ্যক্ষ মাঝুত খুড়োকেও ট্রটস্কীপন্থী বলে ইয়াকুটস্‌ক পাঠানো হয়েছিল। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তিনি ফিরে এসেছেন। তিনিও বলেন যে, ইয়াকুটস্‌ক-এর কেন্দ্রীয় বন্দীশিবিরে ৪৫ নম্বর সেলে সুভাষবাবুকে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। আর আমার বাবা আছেন ৫৭ নম্বরে।'

'মাঝুত কি করে সুনিশ্চিত হলেন যে তিনিই সুভাষবাবু?'

'কেন? আপনি জানেন, যুদ্ধের আগে বহুবার মাঝুত ভারতে গিয়েছেন—প্রায়ই তিনি সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করতেন। এমনকি ডক শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল।'

'মাঝুত কোন্ সালে সুভাষবাবুকে ইয়াকুটস্‌ক কারাগারে দেখেছেন?'

'১৯৫০-৫১ সালে।'

'এরপর তাঁর সম্পর্কে আর কোন খবর তোমার জানা আছে?'

'না।'

'স্ট্যালিনের মৃত্যু এবং তার পূর্বে বেরিয়াকে (রুশি-পুলিশ বিভাগীয় মন্ত্রী) গুলি করে হত্যার পরে আমরা আশা পোষণ করছি যে, বাবা ফিরে আসবেন। তিনি ফিরে এলে নিশ্চয়ই সুভাষবাবুর সম্পর্কে তাজা খবর দিতে পারবেন।' "

“… সেখানে আচার্য নরেন্দ্র দেবজীকে রেখে এসেছি।* গোগার সঙ্গে সুভাষবাবুর প্রসঙ্গে আলোচনার কথা যখন তাঁকে জানালাম, তিনি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করে, গোগার সঙ্গে অভাবনীয় সাক্ষাৎকার এবং নেতাজী সম্পর্কে তার কাহিনী জানিয়ে জওহরলালজীকে একটা ব্যক্তিগত চিঠি দিলাম। জহওরলালজীর নিকট থেকে এ সম্পর্কে কোনো উত্তর না পেয়ে বুঝলাম যে, তিনি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চান না। এবং নেতাজী প্রশ্নের পুনঃ অবতারণা করা তাঁর পছন্দ নয়।”[২৫] …পরের বছর ১৯৫৫ সালে বার্লিন থেকে ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ মস্কোতে গিয়ে নেতাজী প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করেছিলেন। ১৯৬৩-৬৪-তেও বার্লিন হয়ে একই উদ্দেশ্যে মস্কো গিয়েছিলেন। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধী, পার্লামেণ্টে সোভিয়েত বিরোধী তাঁর বক্তৃতা প্রভৃতির জন্য মস্কোয় ভারতীয় দূতাবাস ও পার্টির রিপোর্ট অনুযায়ী সোভিয়েত সরকার তাঁকে ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য করেন—নেতাজী সন্ধানে পুনরায় রাশিয়া পরিদর্শন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৬৫ সালে কলকাতায় এক জনসভায় ডঃ সিংহ উক্তি করেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত আছেন ও সাইবেরিয়ার বন্দীশালায় ৪৫ নং সেলে বাস করছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ফ্যাসীবাদীদের সমর্থন করার মত ঘৃণ্য অপরাধ খুব কমই আছে। জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করায় রাশিয়ার জনসাধারণ যে স্বদেশপ্রেম ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, যে-ভাবে লক্ষ লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ, তরুণ-যুবা-বৃদ্ধ আত্মোৎসর্গের দ্বারা জার্মান সৈন্যবাহিনীকে পরাভূত করেছিলেন, তা অবশ্যই স্মরণীয়।

আবার এও সত্য, একনায়ক লৌহমানব স্টালিনের কোপানলে কত লক্ষ রুশ জনসাধারণ এবং বিদেশী বন্দী শুধু মত পার্থক্যের জন্য নির্বিচারে অতি নিষ্ঠুর নীরব মৃত্যুর কোলে আত্মদান করেছেন ও করছেন তা ইহুদী জাতির প্রতি হিটলারের নিষ্ঠুরতাকেও নাকি অতি সহজে অতিক্রম করে, এইরূপ মতবাদ আছে। হিটলারের জার্মানীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ‘কনসেনট্রেশন ক্যাম্প’ বা বন্দী শিবিরে আবদ্ধ করা ও ইহুদীহত্যার এবং কম্যুনিস্ট নির্যাতনের

---

* ১৯৫৪ সালের শরৎকালে ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ তাঁর প্রাক্তন অধ্যাপক আচার্য নরেন্দ্র দেবকে বার্লিন নিয়ে গিয়েছিলেন। পশ্চিম বার্লিনের হোটেলে আচার্যদেব তখন অবস্থান করেছিলেন।

[২৫] নেতাজী রহস্য ঃ পৃষ্ঠা-৮৪-৮৬

আতঙ্কজনক ইতিহাস বিশ্ববাসীর নিকট বিদিত ; কিন্তু তার বহু পূর্বেই যে রাশিয়ার এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্প-এর জন্ম এবং সেখানে একবার প্রবেশ করলে জীবিত অবস্থায় খুব কম মানুষেরই প্রত্যাবর্তন হয় তা বিশ্ববাসীর নিকট প্রায় অজানা, অথবা জানা-না-জানার ভান। বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে, যতদূর জানা যায় রুশি সাহিত্যিক ডস্টয়ভস্কী ব্যতীত আর কেউই জীবন্ত অবস্থায় সাইবেরিয়ার ঐ শূন্য ডিগ্রিরও নিম্ন হিমশীতল কারাগার থেকে প্রত্যাবর্তন করেননি। এখন অবশ্য এ-ব্যবস্থার পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজীর রাশিয়ায় দীর্ঘযুগ অবরুদ্ধ থাকা না থাকার সম্ভাবনা বিষয়ে নিম্নলিখিত আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লিখিত ডক্টর সত্যনারায়ণ সিংহ তিরিশের দশকে রাশিয়ায় তুন্দ্রাঞ্চলে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় রাশিয়ার রেড আর্মির সৈনিক প্যাভ্‌লভ্‌, বোরিসসহ তিনি ভারতীয় ইতিহাসখ্যাত বিপ্লবী বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও অবনী মুখার্জীর সঙ্গে লেনিনগ্রাডে প্রায়ই মিলিত হতেন। তিনি ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিন এবং মস্কোয় উপস্থিত হয়ে নেতাজীর অনুসন্ধান কাজে ব্রতী হন। ছাত্রজীবনের বন্ধু কমরেড পেট্রোভ এবং স্ট্যালিনের কালে কমিণ্টার্নের (পরিবর্তিত নাম কমিনফর্ম) এশীয় গুপ্তশাখার অধিকর্তা ভেরা (ইনি ডঃ সিংহের নিকট বাংলাভাষা শিখেছিলেন) নেতাজীর অনুসন্ধানে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ভেরাকে ১৯৫০ সালের শুরুতে ক্রেমলিনে মাও সে-তুং-এর সঙ্গে ভারত বিষয়ে আলোচনার সময় ভারত বিশেষজ্ঞরূপে উপস্থিত হতে হয়েছিল। ভেরার একটি বক্তব্য আমাদের আলোচ্য বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করার সম্ভাবনা আছে। তাঁর নিকট সংগৃহীত তথ্যে তিনি জানান নেতাজী এবং তাঁর অনুগামীদের ইয়াকুটস্‌ক বন্দীশিবিরে সোভিয়েত গুপ্ত-পুলিশের কড়া নজরে রাখার কথা।

ভেরা ও ডক্টর সিংহের মধ্যে কিছু কিছু আলোচ্য অংশ নিম্নরূপ :

ভেরা : "কমরেড ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে বিদেশী বন্দীদের সম্পর্কে আমাদের নীতি ক্রমান্বয়ে উদার হচ্ছে। স্বদেশের সরকারের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়ে বেশ কয়েকজন বিদেশী বন্দীকে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।"

ডঃ সিংহ : "ভেরার কথার মাঝে বাধা দিয়ে বললাম—'আপনি কি মনে করেন যে আমাদের পক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অনুমতি মিলবে' ?"

ভেরা ঃ “নয় কেন ? এ কাজটা খুবই সহজ হত যদি জওহরলাল নেহরু যখন সরকারীভাবে আমাদের দেশে কয়েকমাস আগে এসেছিলেন তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী স্তরে এবিষয়ে আলোচনা করতেন। আমাদের রাষ্ট্রীয় স্তরে আলোচনার ফলেই বন্দীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।”

মস্কো ত্যাগের পূর্বে ভেরার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের (ভারতীয়) দূতাবাসে গেলাম।

দূতাবাস অফিসার ঃ “… গুজবে কান দিয়েছেন। এমন একটা অবান্তর প্রশ্ন উঠিয়ে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কে তিক্ততা আনার কোন মানে হয় না।”

ডঃ সিংহ ঃ “আমি প্রত্যুত্তরে বললাম—‘এতে আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবার আদৌ আশঙ্কা আছে বলে আমার মনে হয় না। যাই হোক, বর্তমান সোভিয়েত শাসকগোষ্ঠী স্ট্যালিনের সময়ে যে সব অন্যায় করা হয়েছিল তার সংশোধনে তৎপর হয়েছেন। আমাদের ব্যাপারে স্ট্যালিন-হিটলার সাক্ষাৎকার সম্পর্কে দলিল প্রকাশের পর একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, ভারতের ওপর স্ট্যালিনের একটা লোভ ছিল। স্ট্যালিনই নেতাজীর ওপর অবিচার করেছেন। স্ট্যালিনবাদ অপসারণের এই ব্রাহ্ম-মুহূর্তে নেতাজী প্রসঙ্গ অনুসন্ধান করে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে বরং ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।’ আমার যুক্তি তাঁর সায় পেল না দেখলাম। ঘটনাচক্রে আমার সঙ্গে আমাদের মিলিটারী এ্যাটাশের সাক্ষাৎ হল। তাঁর ভাবটা কিছুটা যুক্তিবাদী। প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁর স্তরে বিষয়টি আলোচনা করে দেখবেন। তবে তিনি একথা আমাকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, প্রসঙ্গটি একমাত্র আমাদের (ভারতের) বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়।”

… … … … …

ভেরা ঃ “মনে রাখবেন, জীবনে আর কোনোদিন বাইরের জগতের মুখ দেখতে পাবেন না। এমন কি, আপনার কি ঘটল তাও আপনার দেশ জানতে পাবে না।”

ডঃ সিংহ ঃ “আপনারা এইভাবে আমাদের নির্যাতন করছেন অথচ ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী জাহির করে বেড়াচ্ছেন, এ কেমন ব্যবহার ?”

ভেরা ঃ “কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নে ফ্যাসীবাদীদের সমর্থন করার মত ঘৃণ্য অপরাধ আর কিছু নেই।”

ডঃ সিংহ ঃ "কিন্তু আমি আপনাকে বলেছি যে, সুভাষবাবু ফ্যাসীবাদী নন।"

ভেরা ঃ "আপনাদের এখানকার দূতাবাস আপনার সঙ্গে একমত নন।"

১৯৬৪ সালে বার্লিনে অবস্থানকালে এক সোভিয়েত লেখকের গোপন সাক্ষাতের আমন্ত্রণ লাভ করেন ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ। বিপ্লবীদের সঙ্গে ঐ লেখকের যে সাংকেতিক কথার বিনিময় হতো সেই ভাষায় আমন্ত্রণ জানালেন—"নৈরাশ্যের শ্রান্তি তুচ্ছ করে যাঁরা জাতির স্বাধীনতা রক্ষায় সদা অতন্দ্র ছিলেন তাঁদের কাহিনীর পুনরাবৃত্তিতে জগতের লুপ্ত আত্মার চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠবে। আবার তাঁরা গর্জে উঠবেন।" সোভিয়েতের সেই লেখক, পেটিয়া তাঁর নিজের দেশের গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে দেখা করলেন।

"কাপরির মেরিনা পিককোলার সেই গৃহটিতেই আমাদের সাক্ষাৎ হল। ছাত্রজীবনে এখানেই ম্যাকসিম গোর্কির সাক্ষাৎলাভ করি। জার্মানীতে হিটলার তখনও ক্ষমতাসীন হননি। যাঁর সঙ্গে আমি এখানে দেখা করছি তিনিও মস্কোতে গোর্কির ছাত্র ছিলেন। বললেন—'আপনি মাত্র কয়েকজনের জন্য উদ্বিগ্ন। কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীর মানুষ হয়েও আমাদের কি হাল স্বচক্ষে দেখছেন না! সোভিয়েত ইউনিয়নে খুব কম পরিবার আছে যাদের একজনও স্ট্যালিনের অপরাধের বলি হয়নি'।"

ডঃ সিংহ ঃ 'কিন্তু সুভাষ বসুর প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।'

সোভিয়েত লেখক—'ভাল কথা, রাশিয়াতে তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপনের আগে আপনাকে বর্তমান রাশিয়াকে চিনতে হবে। সোভিয়েত কাগজগুলো ফ্যাসীবাদ বা নাৎসী বন্দীশিবিরের কাহিনী আজকাল কম লিখছে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ। কেন জানেন? প্রথম মৃত্যুশিবিরগুলো চালু জার্মানরা করেনি, করেছিল সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ। প্রথম মৃত্যুশিবির চালু হল ১৯২১ সালে, মেরু প্রদেশের আরঘান জেলমকের কাছে খালমা গোরে। ···আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হল যে, আপনাদের যুদ্ধবন্দীরা যদি স্বদেশে ফিরে গিয়ে সোভিয়েত বন্দী-জীবনের কাহিনী প্রকাশ করেন তাহলে নাৎসী শিবিরগুলোকে মনে হবে ঢের বেশী সভ্য। ··· শিবির-জীবন বর্ণনা করে প্রায় দশ হাজার উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং স্মারক রচনা, সাহিত্য, সাময়িকী সম্পাদকদের হাতে পৌঁছেছে। সরকারী সূত্রে পাওয়া এ খবর। এতে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ

মহলের উর্ধ্বতন স্তরেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি আজ এমন দাঁড়িয়েছে যে একদিকে স্ট্যালিনবাদের নিন্দা করে প্রচার হচ্ছে যে, এতে শুধু দেশের ক্ষতি হয়নি বস্তুত স্ট্যালিনবাদ একটি অপরাধ। আবার অন্যদিকে একই সুরে ক্রুশ্চেভের নিন্দাও বাদ যাচ্ছে না। এ-পরিস্থিতি শুধু যে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট মহলের পছন্দসই নয় তা না, এতে ভারতীয় কম্যুনিস্টরাও ফ্যাসাদে পড়েছে। আমাদের মহান লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার পথে এ পরিস্থিতি কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে'।"

[লোকসভা সদস্য ডক্টর সত্যনারায়ণ সিংহের রচনা 'নেতাজী রহস্য' বইটি ধারাবাহিকভাবে ইংরেজী সংবাদপত্র 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' এবং বাংলা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে—যার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের সর্বত্র ও পার্লামেণ্টে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ পুস্তক থেকেই প্রয়োজনীয় অংশ আমার বর্তমান পুস্তকে উল্লিখিত হলো।]

দীর্ঘ বিশ বছর পূর্বের ঘটনায় ইতিহাসের বর্তমান স্বরূপ কি অর্থাৎ এখনও কি নেতাজীর মত মহামনীষা নিভৃত বন্দী-জীবনে আবদ্ধ থেকে সেইখানেই তাঁর মহামুক্তির স্পর্শলাভ ঘটেছে কিংবা হিমালয়ের আহ্বানে মহোত্তরণ ঘটেছে তাঁর—সেকথা বিশ্ব ইতিহাসের মহাজিজ্ঞাসা!

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রাশিয়ার আলেকজাণ্ডার সোলঝিনিৎসি-এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ওয়ান ডে ইন দি লাইফ অফ আইভান ডেনীসোভ' (আইভান ডেনীসোভের একদিনের কারাজীবন), 'গুলাক আর্কিপেলেগো' অথবা '৮১র পার্টি দলিল' কিংবা 'মেময়ার্স অফ ক্রুশ্চেভ'—এসব সোভিয়েট পুস্তকে রুশ গভর্নমেণ্টের সুকঠোর বন্দী শিবিরের দুঃসহ জীবন-যন্ত্রণার কথা মানুষকে উদ্বেলিত করে তোলে। বর্তমান বহিষ্কৃত এবং দেশত্যাগী দুই মহান চিন্তাবিদ—সোলঝিনিৎসি ও শাখারভ (উভয়েই জীবিত)-এর কাহিনী আজ সুবিদিত। শুধু সন্দেহের বশে সুদূর সাইবেরিয়ার মেরু কারাগারে সারাজীবন বন্দিত্ব, অবিশ্বাস্য হিম শীতলতা, অল্প খাদ্যে ও সামান্য শীতবস্ত্রে নির্বাসিত জীবনের গোপনীয়তার কাহিনী কতই না রয়েছে—কত সামান্যটুকু সংবাদই বা বহির্বিশ্ব জানতে পেরেছে।

হিটলারের আক্রমণাত্মক যুদ্ধবাজরূপকে সভ্যতা বিধ্বংসী বিভীষিকার চিত্রপটে রূপদান করেছেন ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা-ফ্রান্স-রাশিয়াসহ অহিংসবাদী ভারতের স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি বহু ব্যক্তি। সত্যই হিটলারের ইহুদী নির্যাতন অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অমার্জনীয়। কিন্তু প্রথম

বিশ্বযুদ্ধ শেষে সমগ্র জার্মান জাতিকে, তার দেশের ভূগোল-ইতিহাসকে শকুনের নিষ্ঠুরতায় দাঁত-নখ দিয়ে একেবারে খণ্ড খণ্ড করে পাশ্চাত্য বিজেতাগণ তার হাড়-মাংস খুবলে খুবলে নিয়েছিল অকরুণ নিষ্ঠুরতায়—তাদের পায়ের তলায় সমগ্র জার্মানীর সে দুঃসহ পদদলিত অবস্থা, তার বেদনার, তার অপমানের প্রতি সামান্যটুকু করুণা করতে কেন বিশ্ববিবেক বধির হয়েছিল সেদিন! ১৯৩৩-এ এ্যাডলফ হিটলার যখন তাঁর রাজনৈতিক দল 'ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টি'র নেতৃত্বে জার্মান গভর্নমেণ্টে ক্ষমতাসীন হলেন, তখন জার্মানী ইউরোপ মহাদেশে সর্বাপেক্ষা দুর্বল, অবহেলিত দেশ। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজেতা দেশগুলো সব নিঃশেষ করে দিয়েও যুদ্ধ করার শাস্তিদান পূর্ণ হয়নি—প্রত্যেকটি জার্মানের ঘাড় নুয়ে পড়ে আছে তাদের কাছে ও বিদেশী ইহুদী মহাজনদের কাছে ঋণ ও তার সুদের ভারে। তার মোট ৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ৭ মিলিয়ন লোকই বেকার, আর ১৭টা রাজনৈতিক দল ক্ষমতালাভের জন্য লড়াইতে মেতে রয়েছে। এই দুরবস্থার মধ্যে, ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিতে হিটলার এক 'মিরাকল'—যাকে বলে অলৌকিক ক্ষমতায় জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করলেন। মাত্র ৬ বছরের মধ্যে (১৯৩৩-৩৯) তাঁর দেশের অর্থনীতি—যা ইহুদী মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ এবং বিদেশী রাষ্ট্রনায়কেরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিল—এমন গড়ে তুললেন যাতে করে বেকার সমস্যা দূর হয়ে গেল। স্থল, বিমান ও নৌবহর এমনভাবে গড়ে উঠল যাতে করে শুধু ইউরোপ মহাদেশ নয় সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সমরশক্তির বিরুদ্ধে প্রায় ৬ বছর দুরন্ত শক্তিতে যুদ্ধ করলো জার্মানী, এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলিত বিশ্বশক্তির কাছে অবশেষে তার পরাজয় ঘটেছিল ঠিকই কিন্তু পৃথিবী থেকে 'সাম্রাজ্যবাদ' নামক অক্টোপাশের বাহুগুলো প্রায় সবই কাটা গিয়েছিল। হিটলারের স্বরূপ* ছিল উগ্র জাতীয়তাবোধের, অহমিকার প্রচণ্ড রূপ যা অবশ্যই নিন্দনীয়। তাঁর সরকারের ইহুদী ও কম্যুনিস্ট নিধন অতীব নির্মমতার কাহিনী। কিন্তু, আইনস্টাইনের পরামর্শকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কহীন হিরোসীমা ও নাগাসাকি দ্বীপ শহরের শান্তিকামী মানুষের ওপর এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণ করে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যে নিরীহ

---

* "I can fight only for what I love, love only what I respect and respect only what I, at any rate, know about."

(*My Struggle*, Adolf Hitler)

পৌনে দু-লক্ষ মানুষকে দু-দিনেই হত্যা করিয়েছিলেন অথবা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বাংলার গ্রামাঞ্চলের সত্তর লক্ষ মানুষের ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন আঠারো মাসকাল সময়ের মধ্যে (মিলিটারীর প্রয়োজনে সমস্ত খাদ্য-সামগ্রী গুদামজাত করে)—সে ভয়ঙ্কর, ষড়যন্ত্রমূলক, হীন, লক্ষ কোটি নরহত্যা, নিষ্ঠুরতা হিটলারের নির্মমতা অপেক্ষা কোন বিচারেই কম নয়।

এক এক যুগে এক এক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ তাঁদের ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও শক্তি অনুযায়ী ইতিহাসের অংশীদার হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর মানসিকতার, তার বিজ্ঞান, দর্শন, সমর-বিজ্ঞান, সমাজচিন্তার কতই না বিবর্তন হয়ে চলেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি ইংরেজ রাজনৈতিক মানসিকতার পরিবর্তন, তাঁর প্রতি আমেরিকান-ইউরোপীয় গবেষকদের সশ্রদ্ধ আগ্রহ এসব চমৎকারভাবে লক্ষণীয়। আগ্রহের অভাব শুধু আমাদেরই অনুদার নীতিবোধের। এই অবস্থায় এক মহাজীবনের পূর্ণতা ও উন্নয়ন প্রয়োজন—যার সমগ্র জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে সদা উজ্জ্বল, যে জীবনে সঙ্কীর্ণতা বা কোন অভিসন্ধি, নেতিবাচক রাজনীতির কোন সংস্রবই ছিল না—তা উপলব্ধি করতে রুশ জনগণের, বিশেষ করে বর্তমানের রুশ কর্তৃপক্ষের কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। বরং এইটেই হবে ইতিহাসের সম্ভবত মহাসুখকর মহতী শিক্ষা যে, তদানীন্তন লৌহযবনিকার কঠোর কাঠিন্য ভেদ করে মেরুদেশের সেই সুউচ্চ দেওয়ালের ওপর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কাঁটাতারের বেড়া টপকে সাইবেরিয়ার কারাগারের বাইরে আসা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোন বিপ্লবী কিংবা কোন ফ্যাসিস্ট নেতার পক্ষে সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রনায়ক, আধ্যাত্ম জীবন চেতনায় বহু উচ্চে উত্থিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর যে 'স্পিরিট' (?) সেই স্পিরিটকে কোন কারাগারই কোন দিন আবদ্ধ রাখতে সমর্থ নয়। তাঁর অবরোধ, মৃত্যু অথবা মুক্তির ইতিহাস যথাবিহিত দিবালোকে প্রতিভাত হলে রুশ-ভারত মৈত্রীর সেতুবন্ধন ছিন্নভিন্ন হবে না, বরং অর্থ-কারিগরী কিংবা প্রতিরক্ষার বন্ধন অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী করবে ভারত ও রুশ দেশের আত্মিক মিলন। সে হবে আত্মার বন্ধন—সেখানে হিমালয় কিংবা সাইবেরিয়া বড় তুচ্ছ।

সূর্যের বহ্নি-দীপ্তিতে একদিন সত্য আপন আলোয় প্রকাশিত হবেই ; হয়ত এক বিসদৃশ-বিতৃষ্ণ নেতিবাচক ভঙ্গিতে—শুধু এই একটি কার্যকারণকে

ভিত্তি করেই বর্তমানের তরুণ-তরুণী তাদের লব্ধ ইতিহাস জ্ঞানে অর্ধ-শতাব্দী-পূর্ব স্বাধীনতা ও বিভক্ত ভারত শাসকদের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি হারাবে। এই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক-ইতিহাস লেখক লিওনার্ড মোজলে লিখিত—'দ্য লাস্ট ডেজ অব দ্য ব্রিটিশ রাজ—১৯৭১' বই-এর একটি উক্তি খুবই প্রণিধানযোগ্য—'যদি ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের গভর্নমেণ্ট (এ্যাটলী গভর্নমেণ্ট) ১৯৪৮ সালের জুন মাসে অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা দানে প্রস্তুত ছিলেন, তাহলে তার দশ মাস আগেই ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা দেওয়া কি করে বা কেন সম্ভব হলো?' ১৯৬০ সালে স্বয়ং পণ্ডিত নেহরু লিওনার্ড মোজলেকে যা বলেছেন তা সত্যের কাছাকাছি, যে, তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং বয়সের ভারও চেপে আসছিল। বিভক্ত ভারতের পরিকল্পনা গ্রহণ না করে আবার আন্দোলন, আবার কারাবরণের কষ্ট স্বীকার করতে তাঁরা অপারক। তাছাড়া তখন পাঞ্জাবের গ্রামগ্রামান্তরে আগুন ও হত্যালীলায় প্রতিদিনের দৃশ্য অসহ্য হয়ে উঠেছিল—ভারত ভাগের পরিকল্পনা তাঁদের নিষ্কৃতির পথ পদর্শন করলো—কিন্তু গান্ধীজী যদি বাধা দিতেন তাহলে তাঁরা সংগ্রাম করে যেতেন এবং প্রতীক্ষা করতেন সে অখণ্ড স্বাধীনতা লাভে। কিন্তু যেহেতু গান্ধীজী রাজী ছিলেন—তাই তাঁরা গ্রহণ করলেন খণ্ডিত ভারত ও তার শাসনভারের দায়িত্ব।[২৬]

কিন্তু পাঞ্জাব ও গান্ধীজীর ওপর ভারতভাগ ও নিজেদের হাতে বিসদৃশ দ্রুততায় ক্ষমতা লাভের সমস্ত দায়িত্বের মতবাদ কোন দেশের দায়িত্ববান প্রথম শ্রেণীর নেতাদের পক্ষে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু প্রতীয়মান হয়। অন্য কোন বৃহত্তর

---

[২৬] Leonard Mosley—The Last Days of the British-Raj: pp. 283-85.

"If the Labour Government was prepared to give a *United* India its freedom by June 1948, how was it possible to promise a *divided* Indian freedom ten months earlier?··· But perhaps Pandit Nehru came nearer the truth in a conversation with the author in 1960—when he said: The truth is that we were tired men, and we were getting on in years too. Few of us could stand the prospect of going to prison again—and if we had stood out for a united India as we wished it, prison obviously awaited us. We saw the fires burning in the Punjab and heard everyday of the killings. The plan for partition offered a way out and we took it. But if Gandhi had told us not to, we would have gone on fighting, and waiting. But we accepted it.···"

ও গুরুতর কারণ ও আশঙ্কা—নেতাজীর আবির্ভাব—সেই রাজনৈতিক ভীতির মর্মমূলে নিহিত ছিল কি না তা অনুমান সাপেক্ষ। নিরপেক্ষ, নির্মম-ইতিহাসের নিয়মেই শুধু এককালে তা পরিস্ফুটিত করবে। ১৯৯৯ সালে যে সরকারী নথিপত্র উন্মুক্ত হবে এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখিত—'ইণ্ডিয়া উইনস হার ফ্রিডম'—তার নতুনত্ব বা বৈশিষ্ট্য কি। সে পুস্তক-দলিলে কি যা কিছু সত্য, যা কিছু নিগূঢ় তথ্য তা বিশ্ববাসীকে, বিশেষত ভারতবাসীকে নিঃসংশয় করতে পারবে! [সত্যভাষী আজাদের লেখা নথিপত্র ৫০-৬০ বছরের পূর্বে খোলা বা প্রকাশ করা হবে না শর্তে 'ন্যাশনাল আর্কাইভে' রাখা আছে।]

শুধু নেহরু-প্যাটেল-আজাদই বা কেন মুসলিম লীগের সভাপতি মহম্মদ আলী জিন্নাও তো যেন কোন কিছুর ভয়ে সন্ত্রস্ত সেদিন। সেই ভীতি সম্ভবত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু বিষয়ে সংশয়বাদ। মাইকেল এডওয়ার্ডস লিখেছেন "The spectre of Subhas Bose also frightened Jinnah. Once again Congress and the Hindu masses seemed to have been galvanized out of their torpor." ভারত ইতিহাসে এ এক আশ্চর্য ইঙ্গিত, হিন্দু-মুসলমান নেতৃবর্গ সকলেই অতি দ্রুততার সঙ্গে ভারত উপমহাদেশের গদি—তা সে যে কোন মূল্যেই হোক—অধিকারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

দশম অধ্যায়

মূল্যায়ন

আমাদের এ ভারতীয় মহাজাতির সৌভাগ্য, সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব এক মহাসন্ধিক্ষণে ঘটেছিল। তিনি তাঁর জীবনাদর্শ দিয়ে সমগ্র জাতীয় চৈতন্যকে উদ্বোধিত করলেন তাই আমাদের পরম প্রাপ্তি। নৈতিক চরিত্র—অর্থাৎ সুশৃঙ্খলা, কর্মতৎপরতা এবং স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ ও মহতের প্রাপ্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গদান—এই শিক্ষা শুধু ভারত নয়, মানব সমাজের যে কোন স্তরে প্রযোজ্য। আর বুদ্ধ, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসভ্যতায় সার্বজনীন অবদানের সঙ্গে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ নতুন পথে ও মর্যাদায় সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রয়োগ-বিধির ধারায়, বর্তমান শিল্প-বিজ্ঞান ও সমরোন্নত পৃথিবীর রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতকে প্রোথিত করে দিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে পরপদানত, ক্লীবত্বপ্রাপ্ত ভারতবর্ষকে তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ও কর্মধারায় ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার সর্বত্র স্বদেশকে স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন—এক কথায় বিশ্বরাজনীতি ও রণসমাবেশে গোটা পৃথিবী মন্থন করে তাঁর জীবনের এক মহত্তম সাধ ও স্বপ্ন যেভাবে রূপায়িত হলো তা অবিস্মরণীয়। শুধু বুদ্ধি ও আত্মিক-বল সম্বল করে এমন ঘটনার সৃষ্টির তুলনা কোন ইতিহাসেই খুঁজে পাওয়া কঠিন। শুধু মাত্র বার্লিন, টোকিও, সিঙ্গাপুর কিংবা ব্রহ্ম-সীমান্তের যুদ্ধ নয়, এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া-রুশ-চীন-জাপান-ফরাসী সর্বজাতির সৈন্য, সেনাপতি ও অসামরিক জনসাধারণের মধ্যে ভারতীয়ত্ব, ভারতীয় সৈনিকের অবিশ্বাস্য নৈতিকতা ও স্বাজাত্যবোধকেও প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি। আর ভারতের যে ঘৃণ্যতম জাতিভেদ প্রথা, তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়েছিলেন। ভারত তার স্বাধীনতালাভ করেছিল। তিনি শুধু ভারতে স্বাধীনতার অগ্রদূত নন, সমগ্র এশিয়ার মুক্তির আলো এবং দুর্বল পরাধীন যে কোন দেশ ও জাতির কাছে আদর্শ ও ত্যাগের মন্ত্ররূপ, রাজনীতির বহু উর্ধ্বে পুঞ্জীভূত শক্তিময় মহাপ্রাজ্ঞ সুভাষচন্দ্র। এই শিক্ষা যথাযথ গ্রহণের মধ্যে

ব্যক্তিজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উৎকর্ষ অবশ্যম্ভাবী, এর থেকে বিচ্যুতি ও কেবল কূট-রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি আমাদের দুর্বল করে ও আত্মিক সঙ্কোচন ঘটায়। তাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মহাজীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়গুলোর একটি সীমিত বিশ্লেষণের চেষ্টা হলো মাত্র। ভবিষ্যতের গবেষক ও ইতিহাস-বেত্তাগণের নিকট আরও বহুভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ-গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিস্তৃত আকারে উন্মোচিত হবে, মনুষ্য সমাজকে অবশ্যই সমৃদ্ধ করবে, আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করবে।

শাক্যসিংহ রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে ভিক্ষু হয়েছিলেন, সিদ্ধার্থরূপে তাঁর মহাপ্রকাশ ; বিশ্ব বিমুগ্ধ হয়েছে। আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস অথচ কত সজীব, কত নিকট—কত বর্তমান আমাদের কাছে তথাগত বুদ্ধের জীবনী। শক্তি থেকে শান্তি-করুণার কি মহিমান্বিত 'ট্রান্সফরমেশন'। সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রীয় গৌরব ও সামাজিক সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এমনকি কিছু স্বদেশবাসীর বিরাগভাজনও হয়েছিলেন। তিনি গৃহত্যাগ ও দেশত্যাগ করেছিলেন। তারপর সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের পাঞ্জা কষা—এ আর এক বিচিত্র জীবন, এক দুস্তর সাধনা। সুভাষচন্দ্রের গৃহসুখ—আই. সি. এস. ও রাষ্ট্রপতিত্ব পরিত্যাগ, কিংবা নেতাজীরূপে—আন্তরাষ্ট্রীয় মহারণে বীর—এসব তাঁর অস্তিত্বের খণ্ড খণ্ড অংশমাত্র—আর তাও এই মুহূর্তে প্রাপ্ত সীমিত ইতিহাস। কিন্তু তাঁর কৈশোরে পরাজ্ঞানের অনুভূতি, সর্বস্ব বিসর্জনের মহিমা ও যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষাত্র-যোগী অর্জুনের পূর্ণ প্রকাশভঙ্গী তা পরবর্তীকালে, শতাব্দীর শিক্ষা ও গবেষণায় মহাকাব্যের অংশীভূত হবে, বিশ্ববন্দিত হবে। তাই সুভাষচন্দ্র ভারতের গর্ব, বিশ্বমানবের সমাজসভ্যতার জীবন্ত দলিল।

শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নয়, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের নানা দেশ ও জাতিকে শতাব্দীর পর শতাব্দীর পদানত রাখার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান হাতিয়ার ছিল বেতনভোগী বা ভাড়াটে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। সেই ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান আর্মির ব্রিটিশ আনুগত্য ও বশ্যতা ধ্বংস করে গড়ে তোলা তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ পৃথিবীর বহু দেশের মুক্তির পথ সুগম করেছিল, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এ একটি অতি উল্লেখযোগ্য ও মহার্ঘ অবদান। তাই দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, পৃথিবীর প্রায় শতাধিক দেশ স্বাধীনতালাভ করেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনার সারবত্তা হলো, দেশের বাইরে গিয়ে ব্রিটিশ ও তার মিত্রশক্তির

প্রতিপক্ষের অধিকৃত অঞ্চলে মুক্তিফৌজ গঠন করতে হবে এবং যে কোন পথে আজাদী সৈন্যবাহিনীকে মাতৃভূমি ভারতবর্ষের মাটিতে প্রবেশ করতে হবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজ হবে দেশে গণবিপ্লবের আগুন প্রজ্বলিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্যকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে মাতৃভূমির প্রতি এক নতুন আনুগত্যের ভিত্তিতে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে যুক্ত করা। গান্ধীজীসহ প্রায় সকল জাতীয় নেতৃবৃন্দ তখন কারারুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাঁচিয়ে রাখার ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এবং আমাদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য অটুট রাখবার নৈতিক দায়িত্ব পড়লো, বা বলা যায়, কাঁধে তুলে নিলেন নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ। যথাযথ ঐতিহাসিক বিচার করলে দেখা যায়, ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ভারতের মুক্তি সংগ্রামের মূল ধারা নেতাজী বহিয়ে চলেছিলেন জার্মানী ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ভারতবাসীর প্রতি তাঁর বিভিন্ন বেতার ভাষণের মাধ্যমে, সৈন্য অভিযানে ও সাবমেরিনে এবং পাহাড় পর্বতের পথ ধরে তাঁর গোপন দূত মারফৎ। এ-এক আশ্চর্য ঘটনা।

তাঁর কথা ও কাজ ছিল স্বচ্ছ, সুষমামণ্ডিত, জীবন থেকে পাওয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তিতিক্ষার দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন তারিখে সিঙ্গাপুর থেকে তাঁর বেতার বক্তৃতায় বলেন, "ভাইসব,—আমি তো আগেই বলেছি, জাপানের কাছ থেকে সাহায্য নিতে আমি কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করি না। আমি এ-কথা সবার সামনে বলবার সাহস রাখি যে, সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে সাহায্য ভিক্ষা করতে পারে—তবে আমরা সাহায্য চাইব তাতে দোষ কি? আমরা তো পরাধীন, অস্ত্রহীন, অসহায় জাতি—আমরা আমাদের মিত্রশক্তির কাছে সাহায্য চাইব তাতে হীনতা কি? আজ আমরা জাপানের সাহায্য নিচ্ছি, সম্ভব হলে কাল অপর শক্তির কাছ থেকে সাহায্য নিতেও দ্বিধাবোধ করব না—যদি না তা ভারতের স্বার্থের প্রতিকূলে হয়। কোনরূপ বৈদেশিক সাহায্য না নিয়ে যদি ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্ভব হতো তাহলে আমার চেয়ে বেশী সুখী বোধহয় আর কেউ হতো না। আধুনিক ইতিহাসে আমি তো এমন একটা দৃষ্টান্তও পাই না—যেখানে কোন পরাধীন জাতি অপর শক্তির সাহায্য বিনা নিজের দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছে।" আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, ইটালীর গ্যারিবল্ডি, এমন

কি রাশিয়ার মহান নেতা ভি. আই. লেনিন* বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। অতি অধুনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ঐ একই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, তাঁর দ্বিতীয়বার জাতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি হওয়ার যৌক্তিকতা ছিল কত তাৎপর্যময়, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়—স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবরেণ্য বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডক্টর মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির প্রভৃতির প্রত্যক্ষ দাবীসহ ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বামপন্থী, কংগ্রেস ও সোস্যালিস্টপন্থী নেতৃবৃন্দের সুভাষচন্দ্রের প্রতি সরাসরি সমর্থন ঘোষণা। অন্যদিকে গান্ধীজী, নেহরুজী, সরোজিনী নাইডু, মৌলানা আজাদ, জে. বি. কৃপালনী, সর্দার বি ভি. প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীরাজাগোপালাচারীর মিলিত কংগ্রেস-রক্ষণশীল অনুরাগীদের বিরোধিতা। ত্রিপুরীতে ১৯৩৯ সালের কংগ্রেসের ৫২তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রের বিপুল ভোটে জয় হয়েছিল অর্থাৎ গান্ধীজীর নীতি অধিকাংশ দেশবাসীর নিকট পরিত্যক্ত হয়েছিল, তথাপি সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্রের কাজে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে বাধাদান করা হয়। সপার্ষদ গান্ধীজীর প্রতিবন্ধকতা নিদারুণ ব্যথিত করেছিল তাঁকে। তিনি পদত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন—"...তাহলে অন্তর্বিরোধের ফলে যে সময় ও শক্তির অপচয় হয়েছিল তা পরিহার করা যেত এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি হতো। কিন্তু মানব-প্রকৃতি নিজ নিয়মে কাজ করে থাকে। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই মহাত্মা গান্ধী দৃঢ়তার সঙ্গে বলে এসেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় সংগ্রামের কোন কথাই ওঠে না; অপরপক্ষে লেখকের ন্যায় (সুভাষচন্দ্র) অন্যান্যরা—যাঁদের দেশপ্রেম তাঁর অপেক্ষা কম ছিল না—সমান নিশ্চিত ছিলেন যে, ভেতরে ভেতরে দেশ বিপ্লবের জন্য এত প্রস্তুত আগে কখনও হয়নি এবং আসন্ন আন্তর্জাতিক সঙ্কটে ভারতের পক্ষে তার মুক্তি অর্জনের এমন সুযোগ আসবে, মানব-সমাজের

---

* "Lenin had been living in Exile in Switzerland, but was given special permit by the Germans to return to Russia through Germany."—D. M. Ketelbey : History of Modern Times.

ইতিহাসে সে সুযোগ কদাচিৎ আসে। …একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদেই ফরওয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টি হয়েছিল। সেজন্য শুরু থেকেই জনগণের ওপর প্রভাব ছিল প্রচণ্ড এবং এর জনপ্রিয়তা অতি দ্রুত বাড়তে লাগলো। বাস্তবিকপক্ষে কয়েকমাস পরে মহাত্মাজী মন্তব্য করেছিলেন যে, কংগ্রেসের সভাপতি পদত্যাগ করার পর লেখকের (সুভাষচন্দ্রের) জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যখন যুদ্ধ বাধল তখন যাঁরা আগে সন্দেহবাদী ছিলেন, তাঁরা ঐ বছরের মার্চ মাসে ত্রিপুরীতে কংগ্রেস বার্ষিক অধিবেশনে লেখক ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে ছয় মাসের যে চরমপত্র দেবার কথা বলেছিলেন, তারজন্য তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির তারিফ করলেন। এতে ব্লকের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেল।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান—কয়েক মাসের মধ্যেই আজাদ হিন্দ ফৌজ ও গভর্নমেন্টের ভেতর জাতিভেদ প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন। এ বিষয়ে সকল ভারতীয়, ভারতবিদ্বেষী বিদেশী, এবং বিশেষত মহাত্মা গান্ধীর সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময় ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন নেতাজী। গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ের জন্য ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বে প্রবেশের পর আটাশ বৎসরকাল আমরণ সংগ্রাম করে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাঁর প্রাণবলিও ঘটেছিল। ভারতবর্ষ দ্বিজাতিতত্ত্বে খণ্ড খণ্ড হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম মহাস্ত্র ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি সৃষ্টি করা ও তা বজায় রাখা। আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার পূর্বেই ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে নেতাজী ইংরেজের এই সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষুরধার একটি কূটনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন—কুখ্যাত 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণ-প্ল্যানের মারফৎ। স্বাধীনতার শেষ সূর্য বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন মুসলমান—তাঁকে কলঙ্কিত করার ব্রিটিশ স্মৃতিসৌধ হলওয়েল স্তম্ভ অপসারণে নেতাজীর সুসংহত আন্দোলনের ফলে কি হিন্দু কি মুসলমানের মধ্যে এ-সঙ্কীর্ণ মানসিকতার ক্ষীণতম সুযোগ সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস ব্রিটিশ শাসকবর্গের হয়নি সেদিন। নেতাজীর কঠোর শৃঙ্খলাবোধ, জীবনচেতনা, তাঁর স্বদেশ-ভাবনা ছিল খাপখোলা তরবারির ন্যায় উন্মুক্ত উদার, কোন ভাবালুতার সামান্য আবেগও তাঁকে স্পর্শ করার স্পর্ধা রাখতো না। হিন্দু-মুসলিম ভেদনীতির মূল ধরে টান দিয়েছিলেন সেদিন; তিনি সমগ্র ভারতীয় জাতির সামনে যেন একটি 'টেস্ট কেস' উপস্থাপিত করলেন, ভারত-স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যা একটি

শিক্ষণীয় বিষয়। কলকাতার বুক থেকে একটি জাতীয় কলঙ্ক মুছে গেল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাময়িক স্বাধীন ভারত সরকারের ও সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি, মন্ত্রী, সচিব কিংবা রাষ্ট্রদূতের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্মের ও সকল সম্প্রদায়ের বিশাল ভারত উপমহাদেশের সমস্ত প্রদেশের বীর দেশপ্রেমিকগণ হাজারে হাজারে ইউরোপ ও এশিয়ার যুদ্ধ প্রান্তরে, পর্বত-জঙ্গলে, সাবমেরিনের মধ্যে কিংবা বোমারু বিমানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নেতাজীর রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরাট দূরত্ব ছিল, কিন্তু সম্ভবত নেতাজী সুভাষচন্দ্রই মহাত্মা গান্ধীকে যে কোন ভারতবাসী অপেক্ষা শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করেছেন অন্তরের সর্বাধিক গভীরতায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তিনিই প্রথম 'জাতির জনক' এই মহতী সম্বোধনে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য গান্ধীজীর আশীর্বাদ কামনা করেছিলেন এবং তাঁর একটি সৈন্যবিভাগের নামকরণ করেছিলেন 'গান্ধী ব্রিগেড'। তিনি ঘোষণা করেছিলেন—"… যদি তোমরা মনে করে থাকো—আমি কংগ্রেস ও গান্ধীজীর সঙ্গে বিরোধিতা করে বহির্জগতে নাম কিনতে এসেছি, তাহলেও তোমরা ভুল করবে। আমি এখানে নিজের স্বার্থের জন্য পরিশ্রম ও কষ্টভোগ করতে আসিনি। আমি এসেছি ভারতকে ব্রিটিশের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত করতে। যখন আমার এই প্রচেষ্টা সফল হবে, তখন আমি ভারতে স্বাধীনতাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যাবো এবং গান্ধীজীর চরণে নিবেদন করে বলবো—আপনার স্বাধীন ভারতের ভার আপনি গ্রহণ করুন গুরুদেব। 'জিসদিন দিল্লীপর তিরঙ্গা ঝাণ্ডা লহরায়েগা, উসিদিন মানি—জাতীয় সিংহাসনপর হম মহাত্মাজীকো বৈঠায়েঙ্গে, গঙ্গেইলমে উনকে চরণ ধূলায়েঙ্গে, আউর উনসে কহেঙ্গে, আব আপ সংসারকা নেতৃত্ব আপনা হাতমে লিজিয়ে'।" গান্ধীজী এবং তাঁর অহিংস অনুরাগীগণের দ্বারা অতি গর্হিত আকারে লাঞ্ছিত এবং তাঁদের দ্বারা বহিষ্কৃত হয়েও নেতাজী সুভাষচন্দ্র উপরিউক্ত ঘোষণা করেছিলেন। ইতিহাসে উল্লিখিত আছে, গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে—'Patriot of patriots but misguided'—দেশপ্রেমিকদের সেরা দেশপ্রেমিক—তবে নাকি বিপথে চালিত, এই মন্তব্য করেছিলেন। তবে এও সত্য যে, ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে যাওয়া ও বিদেশীর হাত থেকে ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সেই সঙ্কটাবর্তের, সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তগুলোতে মহাত্মা গান্ধী তাঁর ঐ একান্ত বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্রকেই

অসহায়ভাবে খুঁজে ফিরে পেতে চেয়েছিলেন, যাঁর হাতেই একমাত্র স্বাধীন ভারতের গুরু-শাসনভার অর্পণ করে নির্ভয় হওয়া যায়। 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবে প্রথমত তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন জওহরলাল, রাজা গোপালাচারী, ভুলাভাই দেশাই ও মৌলানা আজাদ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে গান্ধীজী সখেদে বলেছিলেন—"আজ হামারা বাচ্চা নেহি হ্যায়।" আর ভারতভাগে সম্মতিদানের সময় নোয়াখালিতে আই. এন. এ.-র কর্নেল জীবন সিং-এর পিঠে হাত রেখে সজল চোখে তিনি বলেছিলেন, "নাহ্ জীবন সিং, কেউ বোঝেনি ওরা! বুঝতো একজন সে নেই।" (নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ)।

ইতিহাসে নেতাজীর স্থান অতি উচ্চে, কিন্তু তা যথাযথ নির্ণয় গূঢ় কারণে খুবই দুরূহ এবং অত্যন্ত কালসাপেক্ষ। তাঁর আই. সি. এস. ও কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি-পদ ত্যাগ থেকে শুরু করে যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয় মুকুটটি পর্যন্ত অন্যের মাথায় তুলে দেওয়ার অভূতপূর্ব মানসিক শক্তি সম্ভবত অন্তঃশক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী, যা মনুষ্য চরিত্রে সুদুর্লভ বস্তু।

সুভাষচন্দ্রের অপরাজেয় পৌরুষ, শক্তি-সৌন্দর্যের অপরিমেয় প্রকাশভঙ্গী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন অবিরাম সংগ্রামী রূপটি কোমলতার সংমিশ্রণে এমনই অপরূপ হয়ে উঠেছে, স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া আর সম্ভবত কোন ভারতবাসীই মানুষকে এত প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়নি। রাজনৈতিক দল, মত ও ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে, স্ত্রী-পুরুষ ও বয়সের ব্যবধানের সমস্ত গণ্ডী সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য হয়, রোমাঞ্চকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়, নেতাজীর নাম ও কীর্তি-কাহিনী আলোচনায়।

১৯৪৫ সালের নভেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৪৬-এর জানুয়ারী পর্যন্ত ভারতের রাজধানী দিল্লীতে যে সমস্ত ভারতীয় ও বিদেশী সাংবাদিক, কূটনীতিবিদ এবং সামরিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে—বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, পাঠান বা মাদ্রাজী, মারাঠা, রাজপুত বলে কথা নয়, অথবা হিন্দু-মুসলমান-শিখ নয়, সকলের দেহমনের সে ভঙ্গীমায়, চোখের আলোয়, কণ্ঠনিনাদে 'নেতাজী ও জয়হিন্দ' ধ্বনি সেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনানায়কের বিচারের সময় যে জনঅভ্যুত্থান, যে অগ্নিগর্ভ রূপ নিয়েছিল, তার মাঝখানে কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট বা ইংরেজ যে তিন সম্প্রদায় নেতাজীর জাতীয় সংগ্রামের ধারাকে পঁচিশ বৎসরকাল ধরে বিভিন্ন সময়ে প্রবল শক্তিতে প্রতিহত করে এসেছিলেন—তাঁরা প্রত্যেকেই সেই মুহূর্তে সম্পূর্ণ

নিষ্প্রভ হয়ে বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিলেন। কোন পুলিশ বা মিলিটারী বাহিনীর ক্ষমতা ছিল না সে লাভাস্রোতের গতি রোধ করে। এক মাসের মধ্যেই দুঃসাহসিক নৌবিদ্রোহ, বিমান বাহিনীর বিদ্রোহের প্রস্তুতি, পুলিশ-ছাত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আলোড়ন—তার ঐতিহাসিক প্রমাণ ও সাক্ষ্য বহন করে আছে। অথচ 'নেতাজী'র সশরীরী উপস্থিতি লালকেল্লার চত্বরে কিংবা ভারতের মাটীতে সেদিন ছিল না কোথাও। তাঁর ত্যাগ, বীর্য ও ব্যক্তিত্ব-মহিমার এমনই যাদু-প্রভাব।

এই লেখক গত পঁচিশ বৎসরকাল ভারতের বহু শহর ও গ্রাম পরিভ্রমণ করেছেন, লক্ষাধিক তরুণ-তরুণী সমর শিক্ষার্থী ও অফিসারের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, যাঁদের মধ্যে কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, ছাত্রসহ ব্রিটিশ ভারতীয় স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর জওয়ান ও উচ্চপদস্থ অফিসারগণ অন্তর্ভুক্ত এবং নৌবিদ্রোহী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য-সেনাপতিও রয়েছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই যে, নেতাজী নামের মোহজাল, সে স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ সগর্ব স্পর্শকাতরতা সেই ১৯৪৫ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আজো সম্পূর্ণ অটুট—এমনকি তা আরো গভীরতর—অবিশ্বাস্য হলেও তা সত্য। এর অন্যতম কারণগুলো সম্ভবত তাঁর দুর্দমনীয় তেজস্বিতা, সর্বস্ব বলিদান এবং নির্ভুল রাষ্ট্র গঠনের নীতি আর তাঁর অন্তর্ধান রহস্য। তাঁর মৃত্যুর কথা ও কাহিনী প্রমাণিত হয়নি এবং সেজন্য প্রতিষ্ঠিত নয়। তাঁর এই নব্বই বৎসর বয়সে জীবিত না থাকার কোন কারণ নেই—তাই কোটি কোটি মানুষ অন্তরে-বাইরে তাঁর কোনও 'রূপে' আবির্ভাবের রোমাঞ্চকর আশা আজও পোষণ করে চলেছেন।

প্রখর দূরদৃষ্টি, সুগভীর রাষ্ট্রচেতনাসম্পন্ন চিন্তানায়ক ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনিই ভারতে 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং' বা জাতীয় পরিকল্পনার সূচনা করেন ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এবং লক্ষ্য ছিল, পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতিগুলোর মত ভারতবর্ষের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্ত প্রকার উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তিনি এই প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন এবং ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ এর সদস্য ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—নেতৃপদে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁদের শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ভাবলে হবে না, তাঁদের চিন্তা ও শক্তির কতকাংশ জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে ব্যয় করতে হবে এবং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের সহায়তা ব্যতীত এ কাজ সম্ভব নয়। কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতিরূপে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশনের নীতি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে সুভাষচন্দ্র বলেন "… কিন্তু আমাদের সম্মুখে সমস্যা

রয়েছে শিল্পের পুনরুজ্জীবন নহে, আধুনিক যুগোপযোগী ব্যাপক যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা। আমরা এখনো যান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বস্তরে রয়েছি। এই যান্ত্রিক বিপ্লবের (Industrial Revolution) ভিতর দিয়া না গেলে কোনরূপ শিল্পের প্রসার সম্ভবপর নয়। আমরা পছন্দ করি আর নাই করি, এ ভুললে চলবে না যে, ইতিহাসের বর্তমান যুগ 'যন্ত্রবিদ্যার যুগ'। 'যান্ত্রিক বিপ্লব' হতে কোন দেশই নিষ্কৃতি পেতে পারে না। আমাদের শুধু দেখতে হবে যে, এই যান্ত্রিক বিপ্লব গ্রেট ব্রিটেনের মত ধীরে চলবে, অথবা সোভিয়েট রুশিয়ার মত দ্রুত গতিতে হবে। ··· শিল্প প্রতিষ্ঠা না হলে বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে না। বৈজ্ঞানিকভাবে কৃষিকার্যের সংগঠন না করলে দেশের উৎপাদিকা শক্তি বাড়তে পারে না; সুতরাং ইহা অবশ্য করণীয়। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী মত কৃষিকার্য প্রবর্তন করলে বহুলোক কার্যহীন হবে এবং বর্তমানে কৃষিকার্যে নিযুক্ত বহু পরিমাণ লোকেরই জমি থেকে শিল্পের কাজে লাগতে হবে।"

সুভাষচন্দ্রের জাতীয় পরিকল্পনার মূল সূত্রগুলোর মধ্যে ছিল—

১। ··· পৃথিবীর সমস্ত দেশই অর্থনৈতিক সূত্রে পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ, তথাপি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন বিষয়ে আমাদের 'জাতীয় আত্মনির্ভরতার' আদর্শ সামনে রাখতে হবে। অর্থাৎ অবশ্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই দেশে উৎপাদন করতে হবে।

২। আমাদের পলিসি হবে যে, সমস্ত মাতৃশিল্পকে (অর্থাৎ যে-সমস্ত শিল্প না গড়ে উঠলে অন্য শিল্পের সংগঠন হয় না, যেমন—শক্তির সরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্র ও হাতিয়ার তৈয়ারী, প্রধান প্রধান রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন, রেল, স্টীমার ও মোটর ইত্যাদি যোগে গমনাগমনের জন্য দরকারী সমস্ত জিনিস) দেশে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩। জাপানের মত আমরাও শিল্পকরী বিদ্যা শিক্ষার্থে প্রত্যেক বৎসরই বহু ছাত্রকে বিদেশে প্রেরণ করব। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় ছাত্ররা উচ্চশিক্ষালাভের জন্য বিদেশে যায় উদ্দেশ্যবিহীনভাবে। জাতীয় গভর্নমেণ্টের তা করা উচিত নয় ··· ।

এইভাবে, National Research Council স্থাপন, সমগ্র দেশের শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা নির্ধারণ প্রভৃতির ভিত্তিতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করা তাঁর উদ্দেশ্য। অন্যান্য রাজনৈতিক কারণসহ তাঁর কুটীর-শিল্প বিরোধী বিজ্ঞান-ভিত্তিক এই প্রগতিশীল কৃষি ও শিল্পের ন্যাশনাল

প্ল্যানিং-এর জন্য গান্ধীজী নেতাজীর প্রচণ্ড বিরোধী হয়ে ওঠেন এবং দ্বিতীয়বার তাঁকে প্রেসিডেন্ট না করার মনোভাব গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় চার দশক পর—ভারতের কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান ও তার অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি বিচার করলে, আর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোর কথা চিন্তা করলে নেতাজীর মৌলিক অবদানের কথা বর্তমানের নিরিখে মূল্যায়ন হবে এবং দ্রুত অগ্রসর পৃথিবীর সঙ্গে কত নিবিড়ভাবে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ভারতবর্ষকে পরিচালিত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়।

বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিগণ যেমন—রোঁমা রোঁলা, এইচ. জি. ওয়েলশ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, হিটলার, তোজো, ডি-ভ্যালেরা প্রমুখ সুভাষচন্দ্রের জ্ঞান, বিপ্লবচেতনা ও রণনীতিতে তাঁর মৌলিক আদর্শবাদের মহিমা কীর্তন করেছেন ; গান্ধীজী, নেহরু, ইন্দিরা গান্ধীও প্রশংসা করেছেন পরবর্তীকালে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের 'নেতাজী'তে উত্তরণের পূর্বে তাঁর সত্যদৃষ্টি এবং সংস্কৃতিবান, বিনয়নম্র জীবনবোধের সুপরিস্ফুট স্বরূপটি উপলব্ধি না করতে পারলে তাঁর জীবনের মূল্যায়ন অবশ্যই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ভারতের তথা পৃথিবীর সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনে একটি সম্বর্ধনা সেদিন সুভাষচন্দ্রকে বিচলিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বর্ধনা ভাষণে বলেছিলেন —"কল্যাণীয় সুভাষচন্দ্র, আমাদের যা বলবার কথা, হাজার বছর পূর্বেই আমাদের ঋষিরা তা বলে গেছেন। সমস্ত দেশের অভ্যর্থনার ভিতর দিয়ে তুমি এসেছ। আমাদের দেশ তোমাকে যে আসন দিয়েছে, সেই আসনের বার্তা রয়েছে ঋষিদের সেই পবিত্র বাণীর ভিতর। তাঁদের বাণীতে তুমি পেয়েছো তোমার আসন। তুমি এখানে দেশের কর্ণধাররূপে এসেছ, এখানে দেশের যা সাধনা—তা তোমাকে জানতে হবে, স্বীকার করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। তোমাকে আমি রাষ্ট্রনেতারূপে স্বীকার করেছি মনে মনে……।" বিশ্বকবির এই বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে জাগ্রত নবভারতের বেদাশ্রম শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে ভাবগম্ভীর সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর চমৎকৃত করলো সেদিন—তা থেকে তাঁর এক মনোমুগ্ধকর হৃদয়মনের প্রকাশ হলো। তিনি বললেন—"আপনার যে অখণ্ড সাধনা, সেটা সাধারণ মানুষ সহজে উপলব্ধি করবে, এটা আশা করা অন্যায়। আমিও সেই সাধারণের মধ্যে একজন। সুতরাং আমি যে আপনার অখণ্ড সাধনায় মহত্ত্ব ও গৌরব উপলব্ধি করতে পারবো, সে দুরাকাঙ্ক্ষা আমি করিনে। সে উপলব্ধি একদিনে আসে না।

আমরা যারা রাষ্ট্রীয়-জীবনে বেশী সময় ও শক্তি ব্যয় করি, আমরা মর্মে মর্মে আমাদের অন্তরের দৈন্য অনুভব করি। প্রাণের দিক দিয়ে যে সম্পদ না পেলে মানুষ বা জাতি বড় হতে পারে না, সেই সম্পদ, সেই প্রেরণা, সত্যের সেই আভাস আমরা আপনার কাছে চাই। আমরা হয়তো আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি। কিন্তু আমরা চাই মানুষের ও জাতির পরিপূর্ণ জীবন। আমরা চাই আমাদের অখণ্ড জাতি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হোক। আমাদের জীবনে তা সফল করতে পারি, না পারি—সেই আদর্শ আমরা অন্তরে রেখেছি, বাইরে রেখেছি এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি।"

অনমনীয় দৃঢ়তা ও তেজস্বিতায় রুদ্রদীপ্ত নেতাজী প্রবেশ করলেন অর্ধ-লক্ষাধিক জাতীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁর জন্মভূমি পরাধীন ভারতের পুণ্য-ভূমিতে। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে কয়েক হাজার বর্গমাইল মালয়-ব্রহ্ম-আরাকান বরাবর স্বাধীন হয়ে চলেছে তখন। তারপর ব্রিটিশ-ভারতের 'নেটিভ স্টেট'—দেশীয় রাজ্য ইংরেজ রাজভক্ত মণিপুর। প্রায় চতুর্দিকে উত্তুঙ্গ অপূর্ব সুন্দর পর্বতমালা পরিবৃত এ বনভূমি, হ্রদে শোভাময় ছোট্ট মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল যুদ্ধ-কামান-বোমারু বিমানের গর্জনে কম্পমান। মৈরাং, মণিপুরী রাজাদিগের রাজ্যাভিষেকের স্থান—স্বাধীন ভারতের সৈন্যবাহিনী ভারতের তিরঙ্গা জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছেন সেখানে। সেখানে ভারতের পূর্ব সীমান্তে ব্রিটিশের শেষ যুদ্ধঘাঁটি ইম্ফল অবরুদ্ধ—দিমাপুর রেলস্টেশন একমাত্র লাইফ-লাইন। প্রায় দেড় লক্ষ ব্রিটিশ বাহিনীর সরে পড়ার একমাত্র উপায়ও আজাদ হিন্দ ফৌজের এখতিয়ারে। মণিপুরের দুর্গম পার্বত্য এলাকা নাগা উপজাতিভুক্ত। যাঁরা ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীতে ছিলেন, তাঁদের কতিপয় সৈন্য আজাদ হিন্দে যোগদান করলেন; সেখানে নেতাজীর আগমনে তাঁর অস্থায়ী গভর্নমেন্ট ও সৈন্যবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্স ৮০ দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর আবাস স্থানটি আজো সশ্রদ্ধচিত্তে, সগৌরবে মণিপুরবাসী রক্ষা করে চলেছেন, স্মৃতিসৌধ গড়েছেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গড়া সত্ত্বেও এই মণিপুরে মহাত্মা গান্ধী প্রবেশ করতে পারেননি ব্রিটিশ প্রভুত্বের সময়; পুলিশের অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হবে জেনে, সে রাজ্যের সীমানা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফিরে এসেছিলেন—তাঁর আত্মিক অবমাননার অনুভবে। কিন্তু ব্রিটিশ ধুরন্ধরতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল নেতাজীর বজ্রস্পর্শে। শুধু তাই নয়, সরল প্রাণ নাগারা ইংরেজ সৈন্য-শাসকদের ঘৃণা

করতেন, জাপানী সৈন্যদের প্রতিও সমপরিমাণ অনীহা, কিন্তু নেতাজী ও আজাদী সেনাদের প্রতি তাঁদের ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা। মণিপুরের শুধু কতিপয় মহিলা ও পুরুষ আজাদী ফৌজে যোগদানই করেননি বা দুর্ধর্ষ নেতা সপুত্র ফিজোর প্রথমে জাপ সৈন্যদলে যোগদান ও তা ত্যাগ করে আই. এন. এ.-তে যোগদানই যথেষ্ট নয়, ইম্ফলের চারধারে বসবাসকারী এই পার্বত্য জাতি নাগারা সাহস ও দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা যেভাবে প্রদর্শন করেছেন, তা স্মরণীয়। ওখানে আজাদ হিন্দ ফৌজকে রসদের অভাবে প্রচণ্ড দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়। কর্নেল ইনায়ৎ কিয়ানী নাগা সর্দারদের এক সভা করে সে দুর্দশার কথা ভাল করে বুঝিয়ে দেন, যদি রসদের ব্যবস্থা না হয়, তাহলে তাঁর সৈন্যদলকে তামু নামক দূরের ঘাঁটিতে ফিরে যেতে হবে। নাগা সর্দারেরা কর্নেল কিয়ানীকে পশ্চাদপসরণ করতে নিষেধ করে বলেন—"আপনাদের ফৌজ ভারতের মুক্তি ফৌজ, আমাদের মিনতি আপনারা ফিরে যাবেন না। খাদ্যদ্রব্যের আমাদেরও গুরুতর অভাব, তবুও যতোটা পারি আমরা আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ করে দেবো। যদি না খেয়ে মরতে হয় তো একসঙ্গেই মরবো, বাঁচি তো এক সঙ্গেই বাঁচবো।" অনুর্বর পাহাড়ী জায়গা থেকে কর্নেলের রেজিমেণ্টের দু-হাজার সৈন্যের দীর্ঘকালের রসদ সংগ্রহ বড় কঠিন ছিল সেদিন। তথাপি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। রসদ সংগ্রহ ছাড়াও, টহলদার আজাদী সৈন্যদের পথ দেখান, শত্রুর গতিবিধি ও অবস্থিতির প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ। নাগা গ্রামবাসীদের বক্তব্য, তাঁদের রানীকে ব্রিটিশেরা বন্দী করে ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল রেখেছে। (নাগাল্যাণ্ডের সপারিষদ এই রানী গাইদালোর সঙ্গে ১৯৭৮-এ এই লেখকের দক্ষিণেশ্বরে 'বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্মেলন'এ সাক্ষাৎকার ঘটে। প্রায় ১৭ বৎসর এই যোদ্ধরানী কারারুদ্ধ ছিলেন।) তাঁরা বললেন —"আমাদের এ অঞ্চলে আমরা ব্রিটিশদের ত চাই-ই না,—জাপানীদেরও চাই না। এখানে আমরা আমাদের নিজেদের রাজারূপে চাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসকে।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে, আজ পৃথিবীর উভয় গোলার্ধেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর মর্যাদা দান করা হয়, তথাপি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শক্তির সঙ্গে আপোষমূলক অহিংস গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা, ও বিশ্বযুদ্ধে জাপ-জার্মান-ইটালীয় অক্ষশক্তির সমরসম্ভারের সাহায্যে তাঁর ইঙ্গ-মার্কিনী শক্তি-জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের

জন্য তাঁকে কোন কোন দেশের রাজনৈতিক শিবিরের স্বার্থ অনুযায়ী অপ্রিয় করবার চেষ্টাও হয়েছে যথেষ্ট। এমন কি তাঁর নব্বইতম জন্মোৎসবের প্রাক্কালে ইংল্যাণ্ডের 'গ্রানাডা টেলিভিসন' নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান —'স্প্রিংগিং টাইগার' ফিল্ম বা নেতাজীর জীবনী ছায়া-চিত্রে তাঁকে 'পাপেট'-রূপে (হাতের পুতুল) হেয় করার চেষ্টা করেছেন। লালকেল্লায় ১৯৪৫-৪৬-এ আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকালীন ভারতের সেই সর্বনাশা রূপের কথা সম্ভবত দেশী-বিদেশী, সরকারী ও বাণিজ্যিক স্বার্থান্বেষীদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। তাই গ্রানাডা টেলিভিসন কর্তৃপক্ষ—'স্প্রিংগিং টাইগার' ফিল্মটি আর ভারতবর্ষে প্রদর্শনের মূঢ়তা ও দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেননি এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্বীকার করেছেন—সুভাষচন্দ্র এখনো আরাধ্য দেবতা হিসেবে গান্ধীর সমতুল্য।

সূর্যের আলো দানের অধিকার নিয়ে তার কোন সুপারিশপত্র প্রয়োজন কিনা—যেমন স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তাঁরই দ্বিতীয় সত্তা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিশ্বজনীন শাশ্বতস্বরূপকেও তেমনি বুঝে উঠতে কারুরই সুপারিশপত্র দরকার হবে না। তিনি আপনিতে আপনিই পূর্ণ এবং উদ্ভাসিত। কিন্তু কখনো কখনো সূর্য যেমন রাহুর বলয়গ্রাসে আচ্ছন্ন হয় অথবা কালো মেঘে ঢাকা পড়ে, তেমনই ঘটনাও ঘটে—এ মনুষ্য জীবন-চরিত্রের এক প্রহেলিকা। স্বামীজী বলেছিলেন—"Worship Death ! All else is vain…and knows there is no other alternative." —'মৃত্যুকে বরণ কর আর যা কিছু সব বৃথা। তা বলে ভীরুর মৃত্যু আহ্বান নয়। যে শক্তিমান, এ তার পক্ষেই প্রযোজ্য, যে সব কিছুর অন্তরে একেবারে তলদেশ পর্যন্ত মন্ত্রিত করতে পেরেছে এবং জানে আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।' মৃত্যুতে নিঃশঙ্ক নির্ভীক পূজারী, সেই মন্ত্রের শক্তিমান সাধক ও ধারকই তো নেতাজী সুভাষচন্দ্র। স্বামীজীর উনচল্লিশ বৎসর জীবন-কালের মধ্যেই পৃথিবীর এই বীর সন্ন্যাসীর দেবদুর্লভ ভাবরাশিতে দ্যুতিমান। আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর আটচল্লিশ বছরের জীবনালোকে বহ্নিমান। পরবর্তী বিয়াল্লিশটি বছর তো আজো অজানার অন্ধকারে ঢাকা। কে জানে, সেখানে স্বরূপ কিংবা অরূপ ব্যঞ্জনায় কোন দুর্জ্ঞেয় মহিমার আপন দ্যুতিতে আপনিই বিভোর কিনা!

২

১। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন-চরিত্র বিস্ময়কর এবং বিচিত্র এক অপরূপ প্রাণ-মহিমা। বর্তমান বই-এর প্রথম অধ্যায়ের শেষতম অংশে তাঁর বংশধারা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর পূর্ব পুরুষের দুই ব্যক্তির গৌড় বাংলার বাদশাগণের শাসনকালে উচ্চতম মন্ত্রী, সেনানায়কের পদ এবং মাতৃকুলে স্বামী বিবেকানন্দের রক্তধারা মিলনের কথা উল্লেখ করেছি কিন্তু এটা আমার প্রতিপাদ্য নয় যে, অতীতকালের উন্নত কোন জীবন-চেতনা পরবর্তী বংশপরম্পরায় প্রতিবাহিত হলেই সাধারণ বংশধারায় অসাধারণ পৌরুষের আবির্ভাব হয়—তা নয়। প্রাচীন পারস্যের শিল্প-সংস্কৃতির অপরূপ ভাবধারা তৈমুরলঙ্গের মাধ্যমে এবং মহা দুর্ধর্ষ মোঙ্গল সম্রাট চেঙ্গিজ খাঁ-র মাধ্যমে তাঁর সমর পরাক্রম যথাক্রমে পিতৃ-মাতৃকুলের মিলিত রক্তধারা আকবরের ধমনীতে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রশাসকরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন—এ কথা সত্য। কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন, উইলিয়াম সেক্সপিয়ার, মহাত্মা গান্ধী কিংবা এ্যাডলফ হিটলার অথবা যোশেফ স্ট্যালিন, ইমন ডি ভ্যালেরা, জ্যাঁকুইস রুশো—এঁদের কারো বাবা-মা খনিতে, ক্ষেত-খামারে মজুরী করেছেন, কেউবা নিজে আস্তাবলে ঘোড়ার তদারকী করেছেন অথবা মুচি, ঘড়ি সারাই মিস্ত্রীর কঠিন, অতি দুঃখময় দুঃসহ জীবন যাপন করেছেন; একই সঙ্গে তুলনীয় বিদ্যাসাগর বা কার্লমার্কস-এর নিষ্ঠুর দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত জীবন। আত্মিক বা পুরুষকারের মহৎপ্রকাশ পাতার কুটির কিংবা রাজ-অট্টালিকার পার্থক্য করে না, প্রকৃতি রাজ্যে যে অসাধারণত্ব আমরা কখনো কখনো দেখি, তাই-ই সাধারণ নিয়ম এবং মানুষ তাকে দুস্তর সাধনার সাহায্যে প্রস্ফুটিত করে তোলে মাত্র।

২। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তত্ত্ব ও তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ আমাদের দেশে খুব কমই হয়েছে। বাঙালীর মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশে আলোকপাত করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ ভক্ত দিলীপকুমার রায় 'আমার বন্ধু সুভাষ' এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 'জয়তু নেতাজী' নামে দুখানি মূল্যবান জীবনী রচনা করেছেন। মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জী রচিত 'ইণ্ডিয়া'জ ফ্রিডম স্ট্রাগল' বইটি মুখ্যত নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর ইতিহাস। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, এস. এ. আইয়ার এবং এন. জি. গানপুলে লিখিত বইগুলো

যথাক্রমে 'নেতাজী এ্যাণ্ড আই. এন. এ.', 'আন টু হিম এ উইটনেস' এবং 'নেতাজী ইন জার্মানী,—এ লিটল নোন চ্যাপটার' যথেষ্ট তথ্যমূলক। চ্যাটার্জী, শাহনওয়াজ, আইয়ার এবং গানপুলে—এই চারজনই নেতাজী-র গভর্নমেণ্টে মন্ত্রী ও সেনাপতি পদে তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন। আর ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁদের 'মিনিস্ট্রী অব ইনফরমেশন এণ্ড ব্রডকাস্টিং' মারফৎ 'সিলেকটেড স্পিচেস অব সুভাষচন্দ্র বোস' এবং 'হেরাল্ড অব ফ্রিডাম' (স্বাধীনতার অগ্রদূত—[বিক্রীর জন্য নয়]) নামে দুখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া উত্তমচাঁদ মালহোত্রা, কুসুম নায়ার, এ. সি. এন. নাম্বিয়ার, বরুণ সেনগুপ্ত, নন্দ মুখার্জী, অশোকনাথ বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, সমর গুহ, শৈলেশ দে, শ্যামল বসু, গিরিজা মুখার্জী, ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নেতাজী বিষয়ে বিভিন্নভাবে আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গভীরভাবে ও সম্পূর্ণভাবে নেতাজীকে বুঝতে জানতে আগ্রহী মানুষের কাছে উপরিউক্ত কোন একখানা পুস্তক সম্ভবত সম্পূর্ণ নয়।

বিদেশীদিগের মধ্যে প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক হিউটয় রচিত—'দ্য স্প্রিংগিং টাইগার—সুভাষচন্দ্র বোস'—একখানি সম্পূর্ণ জীবনেতিহাস বলা যায়। এ বইখানি লিখে হিউটয় দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন, যদিও বইখানি নেতাজীর সম্পূর্ণতা ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ নিরপেক্ষ নয়। ইংরেজ ঐতিহাসিক ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মিলিটারী সাংবাদিক মাইকেল এডওয়ার্ডস-এর ইতিহাস —'দ্য লাস্ট ইয়ার্স অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' বইখানিতে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিরাটত্ব অতি চমৎকারভাবে প্রকাশ লাভ করেছে ও বিশ্লেষণী গুণে খুবই উৎকৃষ্ট। ডঃ শিশিরকুমার বসুর পরিচালনায় কলকাতায় 'নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো' নেতাজীর কর্মধারা ও ভাবধারা নিয়ে গবেষণার কাজে অগ্রসর হয়েছেন। এখানে আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার কিছু কিছু অভিজ্ঞ অধ্যাপক এবং বিশেষজ্ঞগণ আন্তর্জাতিক সেমিনারে মনোজ্ঞ লেখা ও পাঠ উপস্থাপিত করেন—এ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে উৎসাহোদ্দীপক। তাছাড়া 'গভর্নমেণ্ট অব মণিপুর', আজাদ হিন্দ ফৌজ ও গভর্নমেণ্টের তিনমাসের হেড কোয়ার্টার্স মৈরাং-এ নেতাজীর অবস্থান এবং আই. এন. এ. মার্টার্স মেমোরিয়াল-এর স্থায়ী রূপদানের কাজ করে চলেছেন, আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অধুনা প্রতিষ্ঠিত 'নেতাজী ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ'-এ ভবিষ্যতে হয়তো নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে নেতাজীর মূল্যায়ন হবে, এ আশা করা যায়।

৩। আই. এন. এ. এবং নেতাজীর কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত বহু মূল্যবান তথ্য আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে এবং ইংল্যাণ্ডের লণ্ডন মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে ও জার্মানীতে রক্ষিত আছে। যতদূর জানা যায় অদ্যাবধি ভারত গভর্নমেণ্ট বা দেশী-বিদেশী কোন গবেষক সে বিষয়ে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ বা সমীক্ষা প্রকাশ করেননি (বর্তমান লেখক এই দেশগুলোতে গবেষণার জন্য যোগাযোগের ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হয়েছেন)। উপরিউক্ত সমস্ত কিছুই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ—১৯৪৫-এর আগস্ট পর্যন্ত ঘটনাবলীকে ভিত্তি করে নেতাজীর জীবন-কাহিনী ইতিহাসে মোটামুটি মূর্ত হয়েছে, যদিও তা সাধারণ মানুষের, বা বলা যায়, যাঁদের অর্থ নেই এবং যাঁদের ইংরেজী ভাষা জানা নেই, তাঁদের কাছে এই মহামানবের জীবনী পৌঁছে দেবার আশানুরূপ ব্যবস্থা হয়নি। মূলত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ জীবনী রচনা এবং তা প্রচারের জন্য জাতীয় প্রচেষ্টা হয়নি; সন্দেহ হয় এ ঘটনা স্বেচ্ছাকৃত এবং সুকৌশলে তরুণের স্বপ্ন ও উত্থানকে রাজনৈতিক কুটিলতা ও জটিলতায় আচ্ছন্ন করা। যদি আজো সেই মানসিকতা চলতেই থাকে—ভাবীকালের কাছে মানুষ গড়া, সমাজ-রাষ্ট্র গঠনের একটি বিরল উপাদান অজানা থেকে যাবে। একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং খুব বড় কথা, আই. সি. এস. ত্যাগ পর্যন্ত নেতাজীর ছাত্রজীবন, কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসভার ভেতরে ও বাইরে ভারতের মধ্যে বিশ বছরে তাঁর দেশসেবার সাধনা, তারপর সাময়িক স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্ট ও সৈন্যবাহিনীর নায়কের নেতাজী বেশে ইউরোপ-এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের জীবন—এই তিনটি অধ্যায় সুভাষচন্দ্রের জীবন-সাধনার সম্পূর্ণ ইতিকথা নয়।

৪। কৈশোরের বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ ভাবে ভাবান্বিত সুভাষচন্দ্র গভীর অন্তঃসাধনা করেছিলেন। তিনি যোগসাধনার দ্বারা দেহ ও মনে প্রবল শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। ভারতের অন্যতম মহান সাধক ভোলানন্দ গিরির সঙ্গে তাঁর একাধিকবার মিলন হয়েছিল। হিমালয়ের আহ্বানে ঐ কৈশোরেই একবার গৃহত্যাগ করেছিলেন তিনি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মানসপুত্র সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দের (রাখাল মহারাজ) কথায়—সুভাষের সন্ন্যাসী হওয়ার প্রয়োজন নেই, ভারতবর্ষ তার কাছে অন্যরূপে সেবা চায়—এই উপদেশে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। যৌবনে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হয়েও ঋষি অরবিন্দের সাক্ষাৎকার ও পণ্ডিচেরী দর্শন চোখের জলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন পাছে চোখে তার যে আগুন তা নিভে যায়। এ এক অতি আশ্চর্য বিষয়বস্তু।

মাতৃ-মুক্তির মহাযজ্ঞে নিজেকে যেন বলি দিলেন নচিকেতার মত, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত-নির্বেদ বহ্নিমান সন্ন্যাসী সুভাষচন্দ্র—গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ আক্ষরিক অর্থেই প্রায় তাঁর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৬-এ সপুত্র এই লেখক রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের দর্শনে গেলে তাঁর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ক্ষণিকের জন্য এই স্মৃতিই জাগ্রত হয়েছিল যে, অগ্নিযুগের যাজ্ঞিক অরবিন্দ ঘোষের ঋষি অরবিন্দরূপে এবং বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের মহাবৈষ্ণব রূপে যথাক্রমে পণ্ডিচেরী ও বৃন্দাবনে রূপান্তর যেমন সত্য, বালক সন্ন্যাসী সুভাষ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মহাসাধকে উত্তরণ তেমনই অসম্ভব নাও হতে পারে। প্রয়োজন, ১৯৪৫-এর ১৮ই আগস্টে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সংকটাবর্তের মধ্যে বোমারু বিমানে মাঞ্চুরিয়া-চীন-রাশিয়া হয়ে কোনও সময়ে হিমালয়ের কোলে প্রত্যাবর্তন এবং ৯০ বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত, সেই জীবন প্রভাতে যে আত্ম-অভ্যুদয় ঘটেছিল, দুস্তর সাধনার পথে তার পরিনির্বাণের পথ-পরিক্রমা কতখানি সত্য এর অনুধ্যান—অন্তঃরাষ্ট্রীয় বিচারকদের মাধ্যমেই হোক কিংবা অন্য কোন সূক্ষ্ম ধারায়ই হোক, ফরমোজা থেকে ফৈজাবাদ পর্যন্ত এক দুর্গম ও সুদীর্ঘ গবেষণার দ্বারাই একমাত্র সম্ভব। উত্তর ভারতের অযোধ্যায় (ফৈজাবাদে) ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৫তে পঁচাশি-নব্বই বৎসর বয়স্ক এক সাধকের মৃত্যু বিষয়ে গোয়েন্দা বিভাগের কলকাতা নগরীতে নেতাজীর একদা তিন সহযোগীর কাছে (দীর্ঘকাল এই তিন ব্যক্তি উক্ত সাধুর সঙ্গে গোপনে যুক্ত ছিলেন) অনুসন্ধান করার কালে একজনের অর্থবহ অনুপস্থিতি: দেহাতীত সাধুর গৃহমধ্যে নেতাজী সম্পর্কিত পাঁচ বাক্স ভর্তি দলিলপত্র ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে সর্বশেষ কাল পর্যন্ত সংবাদ নথিপত্র ভর্তি দুটি বাক্স উধাও হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে দেহান্ত হবার পর উক্ত সাধুর অতি গোপনে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি, নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও বিধায়ক ডাক্তার শিশিরকুমার বসুর ত্বরিতে সে স্থান পরিদর্শন এবং দেহাতীত সাধুকে নেতাজী হওয়ার অস্বীকৃতি (যুগান্তর ১১-১১-৮৫) ও বহু অযোধ্যাবাসীসহ ফৈজাবাদের প্রাক্তন বিধায়ক প্রিয়দর্শী জৈতালির দৃঢ় দাবী—দেহাতীত সাধুই নেতাজী এবং সে রহস্যভেদের জন্য উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিশনের ব্যবস্থার কথা; স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীনন্দলাল শর্মার রিট আবেদনে রাজস্থান হাইকোর্টের বিচারপতি এস. এন. ভার্গবের নেতাজীর অন্তর্ধানকে 'নতুন করে খোলা-মনে পরীক্ষা'র জন্য ৬-মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দান (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪-১-৮৬), আর উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুর সিং-এর নিকট

নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী ললিতা বসুর ফৈজাবাদে প্রয়াত রহস্যময় সাধুর বাক্সে প্রাপ্ত নেতাজী সম্পর্কিত দুষ্প্রাপ্য কাগজ-পত্র খোসলা কমিশনের নিকট প্রদত্ত দলিল ও বসুপরিবারের দুষ্প্রাপ্য ছবি তাঁর সামনেই প্রকাশের দাবী (যুগান্তর ৫-২-৮৬)—এ সমস্তই সর্বদা মুখঢাকা সাধুর বিষয়ে ইঙ্গিতবহ নতুন এক সংযোজন। এ-ও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, ডাক্তার শিশিরকুমার বসু অযোধ্যার ফৈজাবাদে দেহাতীত সাধুর বিষয়ে অনুসন্ধানে যাননি—একথা লেখকের নিকট ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৬ তারিখে মন্তব্য করেছেন, অথচ লক্ষ্ণৌ-এর সাংবাদিক জনসাধারণকে অবগতির জন্য সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায়ই সবিস্তারে শিশিরকুমার বসুর ফৈজাবাদে উক্ত বিষয়ে যাওয়া ও তাঁর মতামত বলে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি কেন এরকম বৈচিত্র্যময় তার কোন সন্তোষজনক উত্তর নেই।

দেহতো ধ্বংস হয়-ই, কিন্তু বিশ্ববন্দিত এক মহাপুরুষের মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট আজো পর্যন্ত অজানা। সে উত্তর আজো মেলেনি। কিন্তু তাঁর যে 'স্পিরিট' বা মহাঅস্তিত্বের যে অনুভব, তা দেশে-দেশে, জীবনে-জীবনে অপরূপ সুষমা সৌন্দর্যে, সুভাষে সুবাসে সুশোভিত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনদর্শন সম্বন্ধে বলেছেন—"আমার পক্ষে বাস্তবতা হচ্ছে সচেতন উদ্দেশ্যশীল, স্থান-কালের মধ্যে ক্রিয়াশীল আত্মা। আমার দৃষ্টিতে বাস্তবতার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রেম। কি বিশ্বজগতে, কি মানবজীবনে, উভয়েরই মূলে প্রেম-চেতনাই বাস্তব, আর চেতনার মূল হচ্ছে প্রেম, যার বিকাশ নিয়তই চলেছে সংঘাত ও সমাধানের মধ্য দিয়ে। বাস্তবতা স্থানু নয় সচল, সদাই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের কি কোন গতিমুখ আছে? অবশ্যই আছে। এর গতি শ্রেষ্ঠতর অস্তিত্বের দিকে।" তাঁর কথায়, "কেন আত্মাকে বিশ্বাস করি? কারণ এই বিশ্বাসের ব্যবহারিক প্রয়োজন (Pragmatic necessity) আছে। আমার প্রকৃতির দাবী এই আত্মায় বিশ্বাস। প্রকৃতির মধ্যে আমি উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস দেখতে পাই, নিজের জীবনে দেখি বিস্ফারমান উদ্দেশ্য। আমার বোধশক্তি বলছে যে, আমি কেবল পরমাণু স্তূপ নই, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, বাস্তবতা কেবলমাত্র বিভিন্ন অণু-পরমাণুর এলোমেলো সংযোগ নয়। বিশ্ব হচ্ছে আত্মার প্রকাশ এবং আত্মার মত সৃষ্টিও অমর। কারণ সত্যের আশ্রয় বা প্রকাশ মিথ্যা হতে পারে না। সৃষ্টি পাপজাত নয়, শঙ্করবাদীর মতানুযায়ী অবিদ্যার ফলও নয়। সৃষ্টি হচ্ছে অমর শক্তির অমর লীলা।"

আত্মার মত তাঁর সৃষ্টিও অমর, কারণ সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাবজগতে, কর্মজগতে যা কিছু সৃষ্টি করেছিলেন, তা সত্য ও সাধনায় প্রতিষ্ঠিত। অমিতশক্তিসম্পন্ন, এই মহাপুরুষের আত্মিক উদ্বোধন ও জীবন-কর্ম নিয়ে আমার এ ইতিহাস মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই সমাপ্ত হোক, চির-গৌরবান্বিত হয়ে অনির্বাণ প্রজ্বলিত থাকুক যুগ থেকে যুগান্তরে, সে আত্মিক হোমবহ্নি, মহাজীবনের মহামরণের অভিযাত্রায় উৎসারিত হোক :

‘আকাশে ধ্বনিছে বারম্বার
মুখ তোলো
আবরণ খোলো,
হে বিজয়ী, হে নির্ভীক,
হে মহা পথিক
তোমার চরণক্ষেপ পথে পথে দিকে দিকে
মুক্তির সঙ্কেত চিহ্ন
যাক লিখে লিখে।’

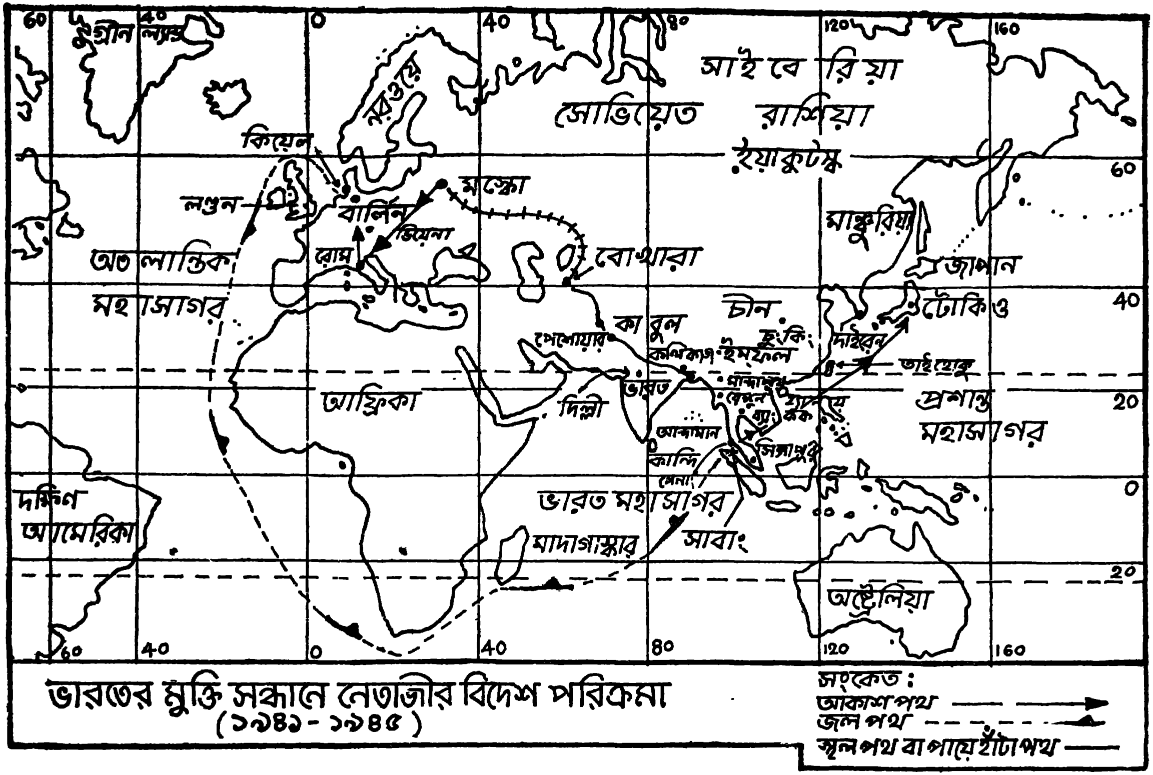

ভারতের মুক্তি সন্ধানে নেতাজীর বিদেশ পরিক্রমা
(১৯৪১ - ১৯৪৫)

গ্রীনল্যান্ড
নরওয়ে
কিয়েল
লণ্ডন
বার্লিন
ভিয়েনা
রোম
মস্কো
বোখারা
সাইবেরিয়া
সোভিয়েত রাশিয়া
ইয়াকুটস্ক
মাঞ্চুরিয়া
জাপান
টোকিও
দাইরেন
তাইহোকু
চীন
হুংকিং
কাবুল
পেশোয়ার
কলিকাতা
ইম্ফল
মান্দালয়
রেঙ্গুন
ব্যাংকক
সায়গন
সিঙ্গাপুর
আন্দামান
কান্দি
পেনাং
ভারত
দিল্লী
আফ্রিকা
আটলান্টিক মহাসাগর
দক্ষিণ আমেরিকা
ভারত মহাসাগর
মাদাগাস্কার
সাবাং
প্রশান্ত মহাসাগর
অষ্ট্রেলিয়া
60
40
0
40
80
120
160
60
40
20
0
20
সংকেত :
আকাশপথ
জলপথ
স্থলপথ বা পায়েহাঁটাপথ

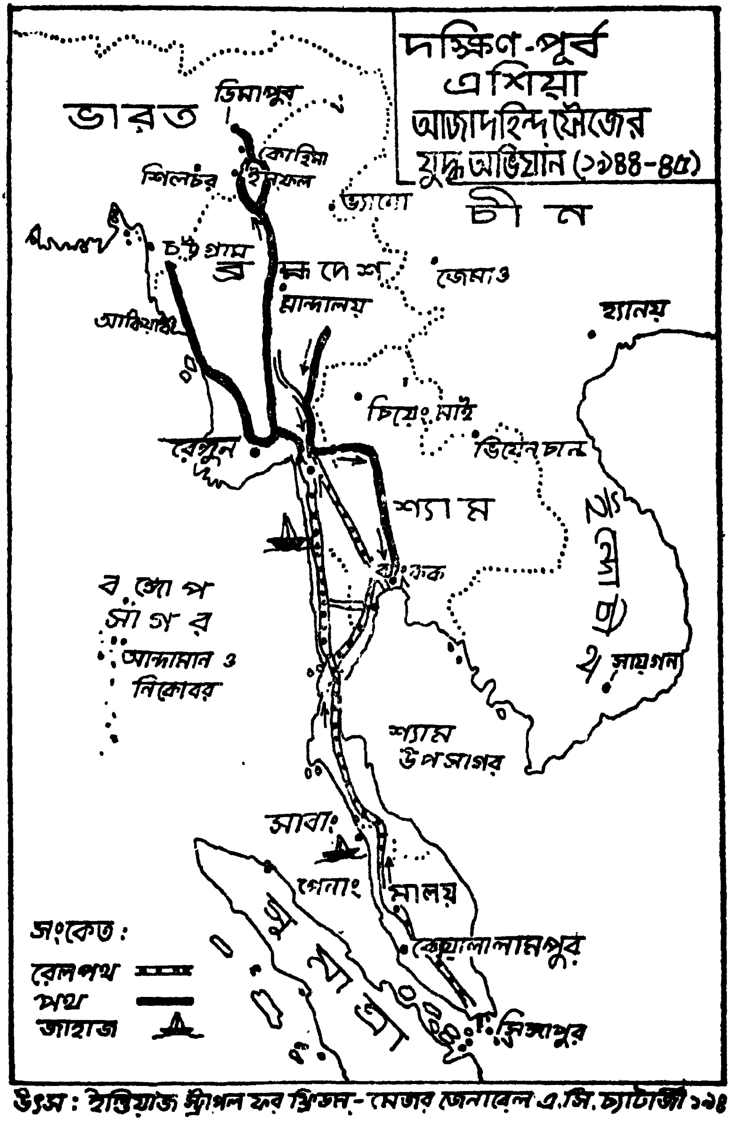
দক্ষিণ-পূর্ব
এশিয়া
আজাদহিন্দ ফৌজের
যুদ্ধ অভিযান (১৯৪৪-৪৫)
ভারত
ডিমাপুর
কোহিমা
ইম্ফল
শিলচর
ভ্যামো
চীন
চট্টগ্রাম
ব্রহ্মদেশ
জেমাও
মান্দালয়
আকিয়াব
হ্যানয়
চিয়েং মাই
ভিয়েনচান
রেঙ্গুন
শ্যাম
ইন্দোচীন
ব্যাংকক
বঙ্গোপসাগর
আন্দামান ও
নিকোবর
সায়গন
শ্যাম
উপসাগর
সাবাং
পেনাং
মালয়
কুয়ালালামপুর
সুমাত্রা
সিঙ্গাপুর
সংকেত :
রেলপথ
পথ
জাহাজ

উৎস : ইণ্ডিয়াজ স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম - মেজর জেনারেল এ.সি. চ্যাটার্জী ১৯৪৭

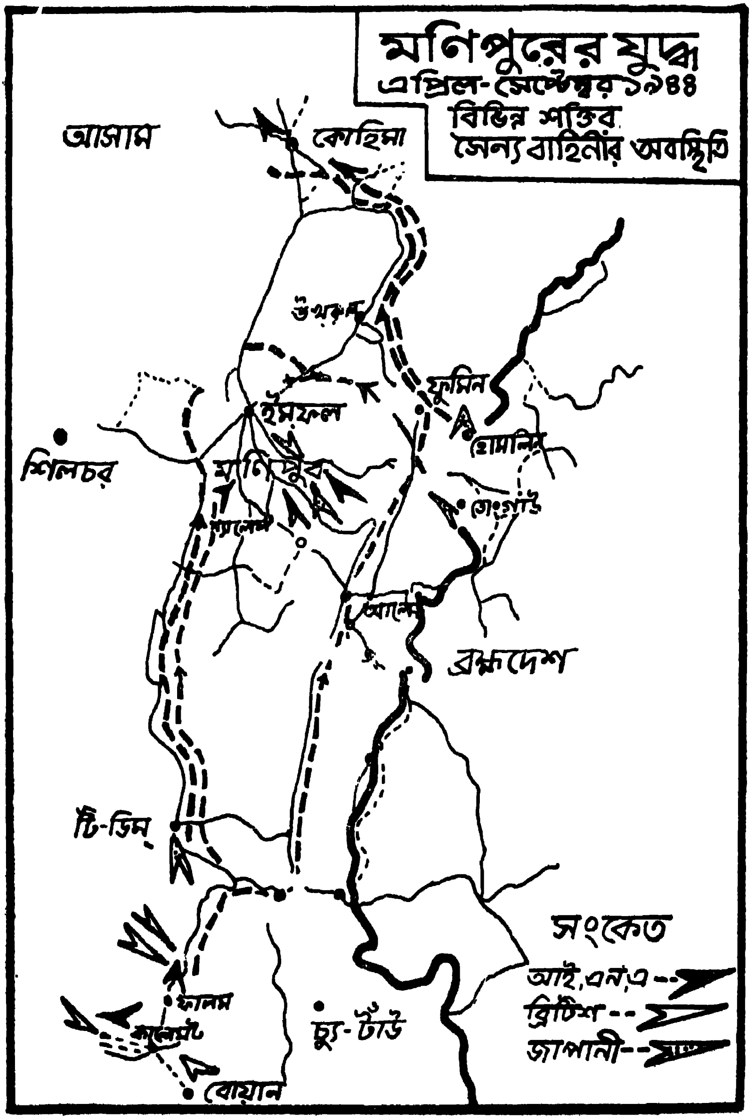
মণিপুরের যুদ্ধ
এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৪৪
বিভিন্ন শক্তির
সৈন্য বাহিনীর অবস্থিতি
আসাম
কোহিমা
উখরুল
ফুমিন
ইম্ফল
হোমালিন
শিলচর
মণিপুর
তেংগাউ
প্যালেল
আলেমি
ব্রহ্মদেশ
টি-ডিম্
ফালম
কালেম্যো
চ্যু-টাঁউ
বোয়ান
সংকেত
আই,এন,এ
ব্রিটিশ
জাপানী

উৎস: আজাদহিন্দ ফৌজ ও নেতাজী- মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান ১৯৪৭

পরিশিষ্ট—১

।। ইংরেজের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত ।।

‘জীবনের স্মৃতিদীপ’ বইতে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত পরিশিষ্টে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে নেতাজীর অবদান সম্পর্কে এ্যাটলির অভিমত শীর্ষক একটি পরিচ্ছেদ আছে। তিনি লিখেছেন, “আমার ‘বাংলাদেশের ইতিহাস’ চতুর্থ খণ্ড হইতে যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা পাঠ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চক্রবর্তী আমার গ্রন্থের প্রকাশককে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে হুবহু নকল করিয়া দিতেছি।”

স্বাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

ফণীভূষণ চক্রবর্তীর পত্র

“ডঃ মজুমদারকে দিয়া বাংলাদেশের এই ইতিহাসটি লেখাইয়া এবং ইহা প্রকাশ করিয়া আপনি একটি মহৎ কর্ম করিয়াছেন। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা বিশেষত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক মানসিক বিবর্তন সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যের সন্ধানীরা এই মহাগ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আপনার নিকট চির-ঋণী হইয়া থাকিবে। গ্রন্থটির ভূমিকায় ডঃ মজুমদার লিখিয়াছেন যে ভারতের স্বাধীনতা যে একমাত্র, অথবা প্রধানত মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ফল এই মত তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আমি তখন অস্থায়ী রাজ্যপাল ছিলাম। তখন যিনি আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়া ভারত হইতে ইংরেজ শাসন সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন সেই লর্ড এ্যাটলি ভারত ভ্রমণে আসিয়া কলিকাতার রাজভবনে দুইদিন অবস্থান করেন (১৯৫৫)। তখন তাঁহার সহিত আমার ইংরেজ ভারত হইতে চলিয়া যাইবার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, গান্ধীর Quit India আন্দোলন তো ১৯৪৭ সালের বহু পূর্বেই মিয়াইয়া গিয়াছিল, ১৯৪৭ সালে এমন কোন পরিস্থিতি বর্তমান ছিল না যাহার জন্য ইংরেজের তাড়াহুড়া করিয়া এদেশ ছাড়িয়া যাওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল, তবে তাহারা গেল কেন? উত্তরে এ্যাটলি কয়েকটি কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক ভারতের স্থল বাহিনী ও নৌবাহিনী যুক্তদেশীয় সেনানীদের ইংরেজ শাসনের

প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়া। আলোচনার শেষের দিকে আমি লর্ড এ্যাটলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ইংরেজদের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তে গান্ধীর কার্যকলাপের প্রভাব কতটা ছিল? ঐ প্রশ্ন শুনিবার পর এ্যাটলির ওষ্ঠদ্বয় একটা অবজ্ঞাসূচক হাস্যে বিস্তৃত হইল এবং তিনি চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন, 'm-i-ni-mal'।

লর্ড এ্যাটলির সঙ্গে আমার আলাপের কথা আমি নেতাজী ভবনে এক বক্তৃতায় সবিস্তারে বলিয়াছিলাম। All India Radio সেই বক্তৃতার বিবরণ broadcast করিয়াছিল কিন্তু এ্যাটলির নেতাজী সম্পর্কিত কথাগুলি বাদ দিয়া।"

স্বাঃ শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তী

পরিশিষ্ট—২

।। রেনকোজি মন্দিরে চিতাভস্ম রহস্য ।।

১৯৪৮ সালে টোকিওতে জাপানী যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচারের জন্য যে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় তার ১৮-১৯ জন বিচারকের মধ্যে অন্যতম এবং একমাত্র এশীয় বিচারক নিযুক্ত হয়েছিলেন ডঃ রাধাবিনোদ পাল, এবং তিনিই একমাত্র বিচারক যিনি পরাজিত জাপানী প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো ও অন্যান্যদের প্রাণদণ্ডাদেশের রায়ে একমত হননি। তাঁর রায় বিশ্বের নিরপেক্ষ ও চিন্তাশীল মহলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছিল। জাপানে ডঃ রাধাবিনোদ পাল অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে জাপানের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে তিনি টোকিওস্থ ভারতের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তথাকথিত নেতাজীর চিতাভস্ম দেখার জন্য রেনকোজি মন্দিরে গিয়েছিলেন। এই সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় জাপানে তৎকালীন বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যবসায়ী মিঃ এ. এস. নায়ার ঐ সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই-এর জন্য ডঃ পালকে ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ তারিখে একটি চিঠি লেখেন। তার উত্তরে ডঃ পালের চিঠি—

21, Beadon Street
Calcutta-6
24th Feb. 1953

Dear Mr. Nair,

I am thankful for your letter dated the 5th instant.

It is really surprising that my name should be used in that manner··· Statements by individual made here and there will not convince me as to the truth of the story given out. I have reasons to doubt its correctness.

Kindly remember me to all my Japanese friends and convey to them my best regards.

With kindest regards,

Yours sincerely
Sd : Radhabinod Pal

[ভাবানুবাদ ঃ “এটা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে আমার নাম এভাবে জড়ান হয়েছে। আমি রাষ্ট্রদূত সহ অথবা তাঁকে বাদ দিয়ে তথাকথিত ভস্ম দেখার জন্য কোন মন্দিরে যাইনি। সত্যি কথা বলতে কি, ফরমোজায় নেতাজীর মৃত্যু কাহিনী আমি সত্য বলে গ্রহণ করতে পারিনি। যা হোক পুরো জিনিষটার একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিবিশেষের এখানে ওখানে বিবৃতি কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে আমাকে নিঃসন্দেহ করতে পারে না। এর সত্যতায় আমার সন্দেহ প্রকাশ করার পেছনে আমার যুক্তি আছে।”]

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ শাহনওয়াজ কমিটীর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের রিপোর্টের শেষে সুপারিশ করা হয়েছে যে, রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত ‘ভস্ম’ নেতাজীর এবং তা যদি নেতাজীর হয়ে থাকে তবে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে ভারতে নিয়ে আসা কর্তব্য। (প্রথমে ‘নেতাজীর ভস্ম’ মন্তব্য করে আবার ‘যদি’ শব্দটি ব্যবহার খুবই বিস্ময়কর।) খোসলা কমিশনের রিপোর্টে বিচারপতি খোসলা রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত ‘ভস্ম’ ভারতে নিয়ে আসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। (এই ‘ভস্ম’ সম্পর্কে ব্রিটিশ মিলিটারী গোয়েন্দাগণ দু’জন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষার পর মন্তব্য করেন, তা মানুষের চিতাভস্ম তার কোন প্রমাণ হয়নি। ‘ভস্ম’ বোসের নাও হতে পারে। ভস্মের দ্বারা প্রমাণিত হয় না মৃত ব্যক্তি কে। তা যে কোনও ব্যক্তির হতে পারে এমনকি ওগুলি কোনও মানুষের নাও হতে পারে।

Ashes may not be Bose’s···but ashes don’t prove who dead man is, they might be anybody’s, they may not be those of a human being at all. —) Secret Head Quarter Main File, 10 Misc. 273, INA, Subject : Subhas Chandra Bose, page 17.

পরিশিষ্ট—৩

।। আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ।।

১৯৪৩ সালের ২৩শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে সাময়িক ভারত সরকার গঠনের পর সেই দিনই মন্ত্রীসভার প্রথম অধিবেশনে গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত হয় এবং সেই অনুযায়ী ২৪শে অক্টোবর রাত ১২ টা ৫৫ মিনিটে নেতাজী সুভাষচন্দ্র 'প্রভিসনাল গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া'র প্রধানমন্ত্রী ও সৈন্যবাহিনীর প্রধান হিসাবে ইংলাণ্ড ও আমেরিকা মিত্র-শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ সদর দপ্তরের রেডিও থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তার ঠিক ২ ঘণ্টার মধ্যে সানফ্রানসিসকো (আমেরিকা) বেতারকেন্দ্র থেকে এই সংবাদ প্রচার করে।

আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ভাষণ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের—১৯৪৫-এ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত, চীন ও আমেরিকার প্রতি দীর্ঘ ভাষণের অংশ ঃ

"I want to tell my American friends that Asia is now surging with revolutionary fervour from one end to the other... and on our mortal enemy—England. We are helping ourselves—we are helping Asia···"

[ভাবানুবাদ ঃ "আমি আমার মার্কিনী বন্ধুদের বলতে চাই, এশিয়া এখন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিপ্লব তরঙ্গে আলোড়িত হয়ে চলেছে··· আপনাদের মত আমরাও মানুষ ; আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাই এবং তা যে কোন প্রকারে অর্জন অবশ্যই করবো। আমাদের মুক্তি লাভের ক্ষেত্রে সাহায্য করার সুযোগ আপনাদের ছিল কিন্তু আপনারা তা করেননি। এখন জাপান সেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাঁদের সে আন্তরিকতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। সেই কারণেই তার পাশাপাশি আমরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আপনাদের ওপর এবং আমাদের মারাত্মক শত্রু ইংলণ্ডের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা করে আমরা জাপানকে সাহায্য করছি না, আমরা আমাদের নিজেদের সাহায্য করছি, আমরা এশিয়াকে সাহায্য করছি···"]

শুধু গ্রেটব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে কেন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো সে সম্বন্ধে আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের অন্যতম পরামর্শদাতা জন এ. থিবি বলেন—

"The reason of coupling America with Britain in the Declaration was,···and offensive measures there against attacks on British domination, either from within or from without India···" John A. Thivy.

[ভাবানুবাদ ঃ "যুদ্ধ ঘোষণায় ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমেরিকাকে যুক্ত করার কারণ আমেরিকা ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যকে সাহায্য করেছিল। ভারতের ভেতরে ও বাহিরে ব্রিটিশ শক্তিকে আক্রমণে, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার সাহায্যে আমেরিকা তার সৈন্যবাহিনী ও বিমানবহর পাঠিয়েছিল। সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে নিয়মমাফিক যুদ্ধ ঘোষণা না করলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে আমেরিকান সৈন্য ঘাঁটি আক্রমণ করতে পারে না। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সুযোগ ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে ভারতকে স্বাধীনতা এমনকি স্বায়ত্বশাসনের অধিকার না দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ বাহিনীর সহযোগীরূপে ভারতে অবস্থান করছিল।"]

পরিশিষ্ট—৪

।। প্রাইভেট লাইফ ।।

নেতাজীর *প্রাইভেট লাইফ* বা ব্যক্তিগত জীবনধারার কিছু চমকপ্রদ পরিচয় আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের অন্যতম মন্ত্রী এস. এ. আয়ার লিখিত 'আনটু হিম এ উইটনেস' (Unto Him a Witness) বই-এর ২৬৯ পৃষ্ঠায় জানা যায়। তাছাড়া, সিঙ্গাপুরে গভর্নমেন্ট পরিচালনার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শ মিশনের স্বামী ভাস্বরানন্দ লিখিত 'নেতাজীকে যেমন দেখেছি' প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য।

"...He was a heavy cigarette smoker, chain smoking, if there was anything to tax his nerves···and spend a couple of hours in meditation."

[ভাবানুবাদ ঃ "তিনি প্রচণ্ডভাবে সিগারেট খেতেন—যাকে বলা যায় চেইন স্মোকার—স্নায়ুর ওপর কাজের চাপের জন্য। এবং প্রত্যেকটি সিগারেটের শেষ-টিপটা পর্যন্ত টান দিয়ে চলতেন। তাঁর ব্যক্তিগত ডাক্তার অভিযোগ অসন্তোষ প্রকাশ করতেন, তাঁর অতি মাত্রায় সিগারেট, সুপুরী, আর অত্যধিক ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য। আর চা, সে'ত যে কোন সময়েই হোক না কেন—তিনি তার জন্য প্রস্তুত। তা সত্ত্বেও ক্রমাগত তাঁর কাছে দর্শনার্থীদের প্রতি অতিথেয়তা প্রভৃতি সবই মিটিয়ে তিনি তাঁর ধর্মনিষ্ঠ জীবনের মধ্যে যথাযথ নিহিত থাকতেন। তাঁর ব্যক্তিগত লাগেজের মধ্যে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগের মধ্যে থাকতো একটা জপমালা, একটি ছোট্ট সাইজের 'গীতা' এবং অতিরিক্ত চশমা জোড়া। সিঙ্গাপুরে প্রায়ই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গভীর সংস্পর্শে আসতেন, গভীর রাত্রে গাড়ী চালিয়ে কখনো

কখনো মিশনে পৌঁছে যেতেন। সেখানে মিলিটারী পোষাক বদল করে সাধুর সিল্কের ধুতি পরে ধ্যানের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেন এবং জপের মালা হাতে কয়েক ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন।"

"সিঙ্গাপুরে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর জন্মোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া নেতাজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বাটীতে আসিয়াছিলেন। সেইদিন ঠাকুর ঘরে তিনি প্রায় আধঘণ্টা কাল ধ্যানাবিষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন। পরে পূজান্তে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া আলাপ আলোচনাদি করেন। প্রায় এক ঘণ্টা কাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর তিনি একখানা 'চণ্ডী'র জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় আমি আমার চণ্ডীখানি তাঁহাকে উপহার দেওয়ায় তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। নেতাজী আমাদের মিশনের কাজের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখানকার মিশনের অনাথালয়ের জন্য আবেদন জানাইলেন, তিনি বাড়ী তৈয়ারীর জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন, বাড়ী নির্মাণের জন্য তিনি নিজে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার দান করেন এবং আরও পঞ্চাশ হাজার ডলার সংগ্রহ করিয়া দেন…"।—স্বামী ভাস্বরানন্দ।]

পরিশিষ্ট—৫

।। ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের উদ্দেশ্যে নেতাজীর বিশেষ ও শেষ নির্দেশনামা ।।

SPECIAL ORDER OF THE DAY ON AUGUST 17, 1945.

"Friends! In our struggle for the freedom of our motherland a crisis which has never been dreamt of has befallen us. …There is no power on earth which can keep India in Bondage. India will certainly be free and, that too, soon. Jai Hind."

[ভাবানুবাদ ঃ "বন্ধুগণ! আমাদের মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামে অকল্পিত এক সঙ্কট আমাদের ওপর এসে পড়েছে। আপনাদের মনে হতে পারে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু আমি বলব, এ আমাদের সাময়িক পরাজয় মাত্র। কোন ব্যর্থতা, কোন পরাজয়ই আপনাদের আগের বিরাট কীর্তিকে মুছে দিতে পারবে না। আপনাদের মধ্যে অনেকে ভারতবর্ষ সীমান্তে ও ভারতের ভেতরে সমস্ত রকমের কষ্ট যন্ত্রণা বরণ করেছেন। আপনাদের বহু সহযোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আজাদ হিন্দের অমর শহীদ হয়েছেন। এই মহান ত্যাগ কখনো বৃথা হতে পারে না।

বন্ধুগণ। এই অন্ধকার মুহূর্তে আপনারা এক মহান বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর যথাযোগ্য মর্যাদা, শৃঙ্খলাবোধ ও মনের বল নিয়ে নিজেদের চালিত করুন, আমি তাই চাই। আপনারা যুদ্ধক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই শৌর্য ও আত্মদানের প্রমাণ দিয়েছেন, এখন এই সাময়িক পরাজয়ের মুহূর্তে আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস ও দৃঢ়তা বজায় রাখবেন। আমি নিশ্চিত যে এই বিরূপ অবস্থায় পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও আশা নিয়ে মাথা উঁচু করে চলবেন এবং ভবিষ্যতের মুখোমুখি হবেন।

বন্ধুগণ! আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আমাদের এই সঙ্কট মুহূর্তে মাতৃভূমির ৩৮ কোটি মানুষ আমাদের দিকে, এই মুক্তি যোদ্ধা সৈন্যবাহিনীর দিকে তাকিয়ে আছেন। অতএব, আপনারা ভারতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন। ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য বিষয়ে আপনাদের বিশ্বাসে যেন চিড় না ধরে। দিল্লীর পথ অনেক প্রকারের হতে পারে। এবং দিল্লীই আমাদের এখনো লক্ষ্য। আপনাদের মৃত্যুহীন বন্ধুদের ও আপনাদের সুমহান ত্যাগে অবশ্যই জয় আমাদের হবে। বিশ্বের এমন কোন শক্তি নাই ভারতকে পরাধীন রাখতে পারে। ভারতবর্ষ নিশ্চিতভাবে স্বাধীনতা লাভ করবে এবং তা শীগগীরই। জয় হিন্দ।"]

পরিশিষ্ট—৬

।। জাতির জনক ।।

গান্ধীজী ও তাঁহার অনুরাগী কংগ্রেস কর্তৃক নেতাজীর চরম লাঞ্ছনা, বহিষ্কার, এবং পরিশেষে জন্মভূমি ত্যাগ। তা সত্ত্বেও মহাত্মাজীর প্রতি তাঁর সৌজন্য ও শ্রদ্ধাবোধ, সে শ্রেষ্ঠ মানবত্বের বিরল নিদর্শন, এক মহামূল্য শিক্ষণীয় বিষয়। গান্ধীজীর প্রতি নেতাজীর সুগভীর শ্রদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রের সদর দপ্তর থেকে বারে বারে প্রচারিত হয়েছিল এবং গান্ধীজীকে উদ্দেশ্য করে ৬ই জুলাই ১৯৪৪, আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে তাঁর যে অবিস্মরণীয় সম্বোধন 'জাতির জনক' উচ্চারিত হয়েছিল তা চিরকালের অমর ইতিহাস ঃ

"...Mahatmaji...I should now like to say something about the Provisional Government that we have set up here. The Provisional Government has, as its one objective, the liberation of India from the British yoke, through an armed struggle. Once our enemies are expelled from India, and peace and order is established, the mission of the Provisional Government will be over. The only reward that we desire for our effect, for our suffering and for our sacrifice is the freedom of our motherland. There are many among us who would like to retire from the political field, once India is free.

Nobody would be more happy than ourselves, if by any chance our countrymen at home should succeed in liberating themselves through their own efforts, or if by any chance the British Government accepts your 'Quit India' Resolution and gives effect to it. We are, however, proceeding on the assumption that neither of the above is possible and that an armed struggle is inevitable. India's last war of independence has begun. Troops of the Azad Hind Fouz are now fighting bravely on the soil of India.

Father of our Nation! In this holy war of India's liberation we ask for your blessings and good wishes."

[ভাবানুবাদ ঃ "…মহাত্মাজী,…এইবার আমি আমাদের সাময়িক গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে চাই। আমরা এখানে যে আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেছি, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো অস্ত্রের সাহায্যে ব্রিটিশ অধীনতা পাশ থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা। ভারতবর্ষ থেকে শত্রু বিতাড়িত হবার পর সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলেই এই সাময়িক গভর্নমেণ্টের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আমাদের এই উদ্যম, দুঃখ কষ্ট ও আত্মত্যাগের একমাত্র পুরস্কার আমরা চাই শুধু জন্মভূমির স্বাধীনতা। আমাদের ভেতরে এমন অনেকে আছেন—ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর যাঁরা রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে চান।

যে সব ভারতীয়েরা ভারতের অভ্যন্তরে বাস করছেন তাঁরা যদি কোনরকমে নিজেদের চেষ্টায় দেশ স্বাধীন করতে পারেন, অথবা ব্রিটিশেরা যদি আপনার 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত ছেড়ে চলে যায়, তাহলে আমাদের চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না। আমরা কিন্তু ধরে নিয়েছি, কার্যত এই দুই-এর কোনটাই সম্ভব হবে না, তাই সশস্ত্র সংগ্রাম অনিবার্য। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদল ভারতভূমিতেই এখন যুদ্ধ করছে এবং একটু ধীরে হলেও দৃঢ় পদক্ষেপে তাঁরা ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতবর্ষে একটিও ইংরেজ থাকা পর্যন্ত এবং নয়া দিল্লীর বড়লাট প্রাসাদে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা না ওড়া পর্যন্ত আমাদের এ যুদ্ধ থামবে না।

আমাদের জাতির জনক! ভারতের এই পবিত্র মুক্তিসংগ্রামে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।"]

পরিশিষ্ট—৭

।। ভাইসরয় : লর্ড ওয়াভেলের জার্নাল ।।

Viceroy, Lord Wavell's Journal dated 24.8.45 *regarding Netaji's death in plane accident*

"I wonder if the Japanese announcement of Subhas Chandra Bose's death in an aircrash is true, I suspect it very much, it is just what would be given out if he meant to underground. My first reaction when I learnt it was to tell PSV (Private Secretary to Viceroy) to ask SEAC (South East Asia Command) to make most careful inquiries into the story as soon as they could. If it is true, it will be great relief. His disposal would have presented a most difficult problem."

Viceroy's Journal : Page 164,
Exhibit of Khosla Commission

The question is, what message were sent by Lord Mountbatten from the Military H. Q. Office of South East Asia is not known. Why did Government of India not trace those papers and submit them before Khosla Commission ? Why did Khosla either not call for them ? When Mountbatten was the Chief of Anglo-American Armed Forces in South East Asia, he kept a diary. That diary has not been published even now. Only 2 days' account, out of the same, has been submitted before Khosla Commission. It was submitted by the External Office of India Government. One of these two days' record (17.10.45) contained that message of the Director of Military Intelligence of the British Armed Forces stationed in China in which he has said that Bose was not certainly in that demolished plane. Possibly Bose had fled to Siam (Thailand). The other day's writing (2.11.45) referred to that Intelligence Report where three reasons were indicated why the news of the plane accident and Bose's death in that accident could not be trusted.

[It is for this reason that on 1.3.46 the British Intelligence Office Wrote : Even now it seems that the whole matter was

doubtful. That Bose had to change the aircraft at Saigon was itself puzzling. It has been said, only two seats were made suitable for him in a plane.]

'Netaji Subhas'—S. N. Bhattacharyya

পরিশিষ্ট—৮

।। বিদেশীর দৃষ্টিতে ।।

নেতাজীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সময় অতিবাহিত হয়েছে ইউরোপে ও পূর্ব-এশিয়ায় এবং আধুনিক ইতিহাসের অগ্নিময় মুহূর্তে। এশিয়া ইউরোপে আজও অনেকে জীবিত আছেন যাঁরা নেতাজীর গৌরবময় ভূমিকাকে সপ্রশংস চোখে দেখলেও প্রকাশ করতে ভীত ও অপারগ, কারণ ফ্যাসিষ্ট বলে নির্যাতিত হবার ভয়। কিন্তু এমন কিছু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা নেতাজীর জীবন চরিত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন কথায় ও লেখায়—তাঁদেরই কয়েকজন বিদেশীর বক্তব্য এখানে দেওয়া হলো ঃ

১। চেকোশ্লভাকিয়ার প্রখ্যাত লেখিকা মিসেস কুর্টি—

"... We sense him to be pre-eminently a man of the spirit; Our respect for him is deep and real."

—'Subhas Chandra Bose as I Know'

[ভাবানুবাদ ঃ "আত্মিক চেতনায় মহাভাবসম্পন্ন পুরুষরূপেই তাঁকে আমরা বুঝি। একজন গভীর ও সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে তিনি তাঁর স্বকীয় আত্মানুভূতিকেও পাশে রেখে একজন রাষ্ট্রনীতিবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা গভীর ও প্রগাঢ়।"]

২। ইংলণ্ডের সৈনিক, ঐতিহাসিক মাইকেল এড্‌ওয়ার্ডস—

"...Bose himself welcomed the possibility of conflict. ...Other Congress leaders had no such clear-cut vision of the future."

—'The Last Years of British India'

[ভাবানুবাদ ঃ "বোস যুদ্ধবাজ ছিলেন না, কিন্তু যুদ্ধের সম্ভাবনাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কারণ ইউরোপে বৃটেনের প্রতি এক একটি আঘাত নিঃসন্দেহে ভারতে তার বজ্রমুষ্ঠি আলগা করে দেবে। অন্য কংগ্রেস নেতাদের কারুরই ভবিষ্যৎ বিষয়ে এ ধরনের পরিপূর্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টি ছিল না।"]

৩। পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত লেখক ডঃ ভোইগট্—

"Subhash Chandra Bose made a distinction between the Nazi regime and the German nation ···With this end in view only did he overcome his strong inhibitions to Nazi ideology and threw in his lot with Hitler."

[ভাবানুবাদ ঃ "সুভাষচন্দ্র বোস জার্মান জাতি ও তার নাৎসী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। কিছু লোকের যে এখনো ধারণা, নাৎসী আদর্শের বিশ্বাসের জন্য হিটলারের সঙ্গে তিনি হাত মিলিয়েছিলেন তা সত্য নয়; বোস জার্মানীর প্রথম দিকের জয়লাভে যে মুগ্ধ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি হিটলারের নীতিতে অখুশী হয়েছিলেন। নাৎসী আদর্শের প্রতি তাঁর অনীহা, জার্মানীর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে ১৯৩৬ সালে ডঃ থেয়ারফেল্ডারের কাছে লেখা চিঠি তার জাজ্বল্য প্রমাণ। এই ডঃ থেয়ারফেল্ডার ছিলেন স্টাটগার্টে 'জার্মান এ্যাকাডেমী ফর ফরেন রিলেসন্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা। কৌশলের দিক থেকে নেতাজী ছিলেন পূর্ণ সমর্থক। কিন্তু নৈতিক আদর্শের দিক থেকে তাঁর পূর্ণ অবজ্ঞা ছিল নাৎসীবাদের প্রতি। অবশ্য তাঁর মনের মধ্যে নিহিত ছিল যে বৃহত্তর ও মহত্তর কারণ তা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন, এবং এই লক্ষ্যকেই মাত্র সামনে রেখে নাৎসী আদর্শের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড অনীহাকে অতিক্রম করে নিজের ভাগ্যকে হিটলারের ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করেছিলেন।"]

৪। বর্মী নেতা ডাঃ বাম—

"সঙ্কটকালে অনেককেই আমি ভেঙ্গে পড়তে দেখেছি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ভেঙ্গে পড়ার মত লোক ছিলেন না। কোন বন্ধু যখন বিপন্ন, সুভাষচন্দ্র তখন আরও ঘনিষ্ঠভাবে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। লক্ষ্য যখন আবছা হয়ে আসছে, তখন তাকে অর্জন করবার জন্য তাঁর সংগ্রাম আরও তীব্র হয়ে উঠত। এইটেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।"

—'Break Through in Burma'র বাংলা
অনুবাদ 'দেশ' পত্রিকা ২৬শে অক্টোবর, ১৯৬৩।

৫। থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিপুল সংগ্রাম—

"বুদ্ধের পাশে বসবার একটিমাত্র লোকই আমার চোখে পড়েছে—নেতাজী বোস। একজন পরিপূর্ণ নিটোল মানুষ। সর্বকালের আচার্য। এ মানুষকে অনুগমন করে তৃপ্তি আছে।"

—ওকার রোব্‌স্—লিওপোল্ড ফিশার

৬। 'দ স্প্রিংগিং টাইগার' পুস্তকের বিখ্যাত লেখক হিউটয়—

"...After its fulfilment must come reform. He believed with every fibre of his being that until the ills of illiteracy, caste and public corruption....He gave much to his country.

Even after the ruin of all he built, something of substance remained...."

[ভাবানুবাদ : "স্বাধীনতার পর অবশ্যই আসবে সংস্কার। তাঁর অস্তিত্বের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তিনি বিশ্বাস করতেন নিরক্ষরতা, জাতিভেদ প্রথা ও অনাচার এবং স্ত্রীসমাজের প্রায়-দাসত্ব অবস্থা উৎখাত না করা পর্যন্ত ভারতে গণতন্ত্র কালোপযোগী হবে না। এই সমস্ত বিষয়গুলো ঠিক না হওয়া পর্যন্ত, কেন জনসাধারণ ভোট দিচ্ছেন তার কিছুটা অর্থ বুঝে না উঠলে, দায়িত্ববোধের উন্মেষ, সংবাদপত্রের মাধ্যমে কিছুটা না জাগান পর্যন্ত কোন শাসনব্যবস্থা দেশের সুশাসন করতে পারবে না। একনায়কতান্ত্রিক সরকার ছাড়া এই দুরবস্থা ও কুসংস্কারগুলো কিছুতেই দূর করা যাবে না। দুরারোগ্য এই ব্যাধি অনেকগুলো কায়েমী স্বার্থের অতি গভীরে তার শিকড় গেড়ে বসে আছে। এই ধারনার গুরুত্ব উপলব্ধি, অন্তরের জ্বলন্ত আবেগ, কাজ সম্পন্ন করার অদম্য উদ্দীপনা এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে দেশপ্রেমে মহত্তম ত্যাগের যে সহজাত জীবনাদর্শ পেছনে রেখে গেছেন তার দ্বারাই সুভাষচন্দ্র বোসের বিশালত্বকে পরিমাপ করা যায় মাত্র। ভারতের ইতিহাসে তাঁর স্থান অনস্বীকার্য। বাঙ্গালী জনমানসে তাঁর দেবতার রূপ, তাঁর দুঃসাহসিক তারুণ্য, তাঁর দুর্জয় সাহস সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টিকল্পনাকে উজ্জীবিত করেছিল। তিনি তাঁর দেশকে অনেক দিয়েছেন, এমনকি যা কিছু তিনি গড়েছিলেন তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তার মূলবস্তুর কিছুটা থেকেই গেছে।"]

পরিশিষ্ট—৯

।। ডায়েরী ।।

১৯৪৫-এর এপ্রিলে তোয়াঙ্গু যুদ্ধ ফ্রন্টে জাপানী প্রতিরোধ অকস্মাৎ বিনষ্ট হয়, শত্রুদল দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে আসায় জাপ কম্যাণ্ড নেতাজীকে রেঙ্গুন ত্যাগ করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। নেতাজী নারাজ হয়ে সেখান থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করবেন স্থির করেছিলেন—কিন্তু উর্দ্ধতন অফিসারদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি ব্যাঙ্ককে ফিরে যেতে রাজী হন। জাপ বাহিনী তাঁকে একখানা বিমান দেয়, কিন্তু নেতাজী বিমানযোগে যেতে রাজী হন না। নেতাজী জানতেন তিনি বিমানযোগে গেলে রেঙ্গুনে ঝাঁসি রানী বাহিনীর মেয়েরা ঐখানেই পড়ে থাকবে। সেজন্য তাঁদের না সরান পর্যন্ত তিনি রেঙ্গুন ত্যাগ করবেন না—সে কথা দৃঢ়তার সঙ্গে জাপানী কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলে ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যায় নারীসৈন্যদের জন্য একখানা ট্রেনের

ব্যবস্থা হয়, কিন্তু শত্রুপক্ষের বোমায় বিকেলেই রেল-এঞ্জিনটি ধ্বংস হয়ে যায়। শত্রুবাহিনীর অতি দ্রুত পেগুর নিকটে এগিয়ে আসার আশঙ্কায় নেতাজী নিজেই আই. এন. এ.র কম্যাণ্ডারদের নির্দেশ দান করতে থাকেন এবং ব্রহ্মদেশের ঝাঁসি সৈন্যদের নিজ নিজ বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে মালয় ও শ্যাম দেশের মেয়েদের তিনি নিজের সঙ্গে নিলেন।

ঝাঁসি রানী রেজিমেণ্টের ডিটাচমেণ্ট কম্যাণ্ডার লেফটেন্যাণ্ট, কুমারী জানকী থিবার্স-এর ডায়েরী—(ভাবানুবাদ)—

২৫শে এপ্রিল ১৯৪৫

গতরাত্রে নেতাজী একটুও বিশ্রাম করতে পারেননি। ···আজ আবার খুব ভোরে উঠেই তিনি লরীগুলির কোনটা কোথায় থাকবে এবং সৈন্যদল-গুলির কে কোথায় অবস্থান করবে তার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি অদ্ভুত কর্মী। সবকিছু খুঁটিনাটির হিসাব নিচ্ছেন তিনি। না ঘুমিয়ে চোখ দুটি তাঁর লাল হয়ে উঠেছে কিন্তু তবুও তাঁকে একটুও ক্লান্ত দেখাচ্ছে না। নেতাজী আজ একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন, আমাদের মাথার উপর শত্রুপক্ষের বহু জঙ্গীবিমান ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু নেতাজী সেগুলি দেখেও দেখছেন না। আমরা কর্নেল মল্লিকের এলাকায় এসেছি—নেতাজী এখানে একটু বিশ্রাম করবার জন্য বসলেন, তারপর তিনি দাড়ি কামাতে সুরু করলেন—হঠাৎ শত্রুপক্ষের তিনটি জঙ্গীবিমান এসে আমরা যেখানে বসেছিলাম সেখানকার গাছের উপর চক্কর দিতে আরম্ভ করলে আমরা সবাই আত্মরক্ষার জন্য পরিখার ভিতর ঢুকলাম···নেতাজী দাড়ি কামাচ্ছেন তিনি কিছুতেই পরিখায় ঢুকলেন না···আমরা খোলা মাঠে ধানের ক্ষেতের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলাম—এমন সময় শত্রুপক্ষের ৬ খানা জঙ্গীবিমান দেখা দিল। আমি নেতাজীকে নীচু হয়ে আশ্রয় নিতে বললাম কিন্তু কি করে হবে সেখানেও কোন পরিখা নেই। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম—শত্রুবিমানের জন্য নয়, নেতাজীর নিরাপত্তার জন্য। বিমানগুলি আমাদের দেখতে না পেয়ে চলে গেল। বারম্বার তিনি আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে যান। এ কি করে হয়? বুঝি না এ যাদু না মন্ত্রশক্তি! ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের নেতাজীর কোন বিপদ হতে পারে না।

এখন বেলা ৪টা। নেতাজী একটু ঘুমিয়ে উঠে একটা মানচিত্র নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে দেখলেন। এরপর তিনি একজন স্টাফ অফিসারকে ডেকে একটি মোটর সাইকেল আরোহীকে জানবাজ বাহিনীর কাছে পাঠাতে বললেন; তাদের জানাতে হবে তারা যেন সড়ক ছেড়ে রেলওয়ে লাইন ধরে আসে—কারণ, ওখানে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কবাহিনী এসে পড়ার আশঙ্কা আছে। হুকুমটা তিনি ঠিক সময়েই দিয়েছিলেন—কারণ কর্নেল রাতুরির কাছে আমি শুনেছি যে ঐ বাহিনীটি সড়ক ছেড়ে আসার কয়েক মিনিট পরেই ওখানে শত্রুপক্ষীয় ট্যাঙ্কবাহিনী এসে পড়ে। আমাদের সৈন্যরা একটুর জন্য রক্ষা পেয়ে যায়।

২৬শে এপ্রিল

…বেলা প্রায় ৩টার সময় ৬ খানা ব্রিটিশ জঙ্গীবিমান এসে আমাদের মাথার উপর চক্কর দিতে শুরু করলে আমরা সবাই গাছের গুঁড়ির আড়ালে আশ্রয় নিলাম। পাশেই কামানের গোলার ঘায়ে একটা ছোট গর্ত হয়েছিল—জেনারেল চ্যাটার্জী নেতাজীকে তার মাঝে আশ্রয় নিতে বললেন—"মেয়েরা লুকোবার জায়গা পাচ্ছে না, আর আমি গিয়ে এর মাঝে আশ্রয় নেব?" নেতাজী সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেতে লাগলেন। ভীষণ বিপদের সময়ও নেতাজীর এই রকম ধীরস্থির আচরণ দেখে আমরা উৎসাহ ও প্রেরণা পাই। শত্রু বিমানগুলি আধঘণ্টা ধরে আমাদের এলাকার উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের পাঁচখানা লরী পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। যানবাহন আমাদের অতি সামান্যই রইল…আর কি ভয়ঙ্কর মেশিনগান চালিয়েছে ওরা আজ! আত্মরক্ষার জন্য নেতাজী কোনরূপ আবরণের আড়ালে গেলেন না, তবু যে কি করে আজ অক্ষত-দেহে রক্ষা পেলেন, এ একটা অলৌকিক ব্যাপার!

২৭শে এপ্রিল

দুপুর রাত্রির একটু পরেই আমাদের গাড়ীগুলি চলতে শুরু করল। কিন্তু বৃষ্টিতে পথে কাদা থাকায় আমাদের গাড়ীর চাকা তাতে আটকে যাচ্ছিল—তাই আমরা আর বেশী পথ এগুতে পারছিলাম না। নেতাজী লরী ও গাড়িগুলি কর্নেল চোপ্‌ড়ার তত্ত্বাবধানে রেখে ঝাঁসি রানী বাহিনীর মেয়েদের নিয়ে সিত্তাঙ নদী পর্যন্ত অবশিষ্ট ১০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে চললেন।

২৯শে এপ্রিল

নেতাজী পূর্বের মত আমাদের দলের আগে আগে চলতে লাগলেন এবং তাঁর সারা পায়ে ফোস্কা থাকা সত্ত্বেও সে রাত্রে আমরা ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করলাম। নেতাজীর সঙ্গে যে জাপানী জেনারেল আসছিলেন তিনি নেতাজীকে মোটরে যেতে বল্‌লেন, কিন্তু নেতাজী রাজী হলেন না। এরপর জাপানীরা নিজেদের গাড়ীতে চড়ে মৌলমিনের দিকে ছুটল। …জাপানী জেনারেল আবার এসে নেতাজীকে মোটরে যেতে অনুরোধ করলেন। নেতাজী এবার উত্তেজিত হয়ে বল্‌লেন—"আপনি কি আমাকে ব্রহ্মদেশের 'বা ম' (Ba Maw) পেয়েছেন যে নিজের লোকজন ফেলে নিজের নিরাপত্তার জন্য আমি ছুটে পালাব? আমি কিছুতেই যাব না।"

১লা মে

পরদিন সকালবেলা আমরা মৌলমিনে পৌঁছি। এই ছয় দিন পথ চলবার সময় নেতাজী দৈনিক দুঘণ্টার বেশী ঘুমুতে পাননি। রাত্রে আমরা পথ চলেছি, কিন্তু দিনের বেলায় এক নেতাজী ছাড়া আর সবাই

আমরা বিশ্রাম করেছি।···মৌলমিন পৌঁছেও নেতাজীর বিশ্রাম নেই। তিনি কি এক দৈবশক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে চলেছেন—তিনি আমাদের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত। ছ'দিন অর্ধাহারের পর আমাদের জন্য খুব ভাল খাবারের ব্যবস্থা হয়েছিল.—২রা মে রাত্রে নেতাজী সব মেয়েদেরই মৌলমিন থেকে ব্যাঙ্ককে যাবার ট্রেনের ব্যবস্থা ঠিক করেছেন,—জেনারেল চ্যাটার্জী ও কর্নেল এস. এ. মল্লিক আমাদের সঙ্গে যাবেন। জানবাজ দলটিকে স্থানান্তরিত করার জন্য তিনি নিজে মৌলমিনে রইলেন···"

[প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের কোন রাষ্ট্রনায়ক বা প্রধান সেনাপতিকে—হিটলার, চার্চিল, ম্যাক্ আর্থার, মন্টগোমারী কিংবা তোজো, মুসোলিনী অথবা স্ট্যালিন—কারো সম্বন্ধেই এ রকম দৃঢ়তার সঙ্গে অবর্ণনীয় বিপদ ও দৈহিক দুরবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলেই নিশ্চিন্তে উপস্থিত থাকার কাহিনী সম্ভবত নেই—এই যুগে এবং ভিন্ন অবস্থায় লেনিন, হো চি মিন, মাও সে-তুং ও ফিদেল কাস্ত্রো কিছুটা ব্যতিক্রম।]

পরিশিষ্ট—১০

।। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পুরুষকার ও শক্তির উৎস ঃ এস. এ. আইয়ার ।।

ভারতে এবং বহির্ভারতে, তাঁর পঁচিশবর্ষ ব্যাপী দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বহু অবর্ণনীয় দুঃখভোগ ও আত্মত্যাগ করেছেন, ভয়াবহ প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছেন, বিপজ্জনক বিপত্তির মোকাবিলা করেছেন এবং নিরতিশয় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। ···তাঁর স্বাধীন মনোবৃত্তির জন্য ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে তাঁর গুরুতর সংগ্রাম বেধেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল—যেইমাত্র তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশের পরম স্বার্থ রক্ষার জন্য অনন্যাধীন কার্যধারার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের সময় হিটলারের অধীনস্থ জার্মান সরকার এবং পরবর্তী সময়ে জাপান সরকারের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ বেধেছিল।

পূর্ব এশিয়ায় নানান ব্যাপারে নেতাজীকে কি পরিমাণ মানসিক যন্ত্রণা পোহাতে হয়েছিল, সে সম্পর্কে আমার কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল যখন বর্মা সীমান্তে আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান ঘাঁটির দ্বিতীয় ডিভিসনের কিছু অফিসার আমাদের ছেড়ে শত্রু সৈন্যদলে গিয়ে ভিড়লো। নেতাজীর কাছে, সমগ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়ের কাছে এটা ছিল

কলঙ্কজনক। জাপানীদের কাছে এরজন্য নেতাজীকে লজ্জায় পড়তে হয়েছিল।

সর্বশেষ এবং সর্বাধিক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি দেখা দিল (১২ই আগস্ট, ১৯৪৫) যখন নেতাজী খবর পেলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান আত্মসমর্পণ করছে। যখন জাপান যুদ্ধে হেরে ছিটকে বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামও অচলাবস্থায় এসে দাঁড়ালো। এর অর্থ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করার নেতাজীর যে স্বপ্ন তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। সম্ভবত নেতাজীর ঝঞ্ঝাময় রাজনৈতিক জীবনে এটা ছিল তাঁর কাছে অন্ধকারতম ক্ষণ। তখন থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজকে অস্ত্র সংবরণ করতে হলো এবং রূপকার্থে নেতাজী যেন স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র হয়ে দাঁড়ালেন।

কিন্তু নিবিড়তম তমসাময় মুহূর্তেও নেতাজীর পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। তাঁর জীবনের মিশন বিফলতার মুখে, চতুর্দিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, কিন্তু নেতাজী তাতে বিন্দুমাত্র অভিভূত না হয়ে, নিজের অন্তরদেশের অক্ষয় আধ্যাত্মশক্তির বলে নিজেকে সাহসিকতার উচ্চতম প্রদেশে উত্থিত রাখলেন। পরাজয়ের ফলে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি এটাকে ক্ষণিকের পরাজয় বলে মেনে নিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন একজন কর্মযোগী, ফলাফল সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিস্পৃহ। তিনি তাঁর সর্বোত্তম চেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং অনমনীয়ভাবে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। এরপর তাঁর মনে এই প্রশ্ন এল ঃ 'অতঃ কিম্' ? তিনি তৎক্ষণাৎ পরিকল্পনা তৈরী করে ফেললেন—এমন একটা বিশ্বশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে যার সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তিনি চালিয়ে যেতে পারবেন—এমন একটা জায়গা থেকে যেখানে ইঙ্গ-আমেরিকান সম্মিলিত শক্তি আক্রমণ করতে পারবে না। তাঁকে শান্ত সমাহিত মনে হল এবং তাঁর নিঃসংশয় প্রতীতি হল যে আই. এন. এ. ভারতকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করার পূর্বেই যুদ্ধে ইঙ্গ-আমেরিকান শক্তির যদিও জয় হয়েছে—তথাপি ভারতের স্বাধীনতার আর দেরী নেই।

পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার সময় পঁচিশমাস ব্যাপী নেতাজী যে কষ্ট দুর্দৈবের মধ্যে পর্বতের মতন অটলভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, এর মূল কারণ তিনি বিবেকানন্দ সম্প্রচারিত কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এটাই ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ নৈতিক সাহসের গোপন কারণ, যার জন্য তাঁর কাছে পরাজয়ও রূপান্তরিত হয়েছে বিজয়ে। নেতাজী ছাড়া অন্য কোন 'পার্থিব মানুষ' হলে তিনি যুদ্ধকালীন সময়ের চিন্তা-দ্বন্দ্বে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যেতেন।

পূর্ব এশিয়ায় যারা নেতাজীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের সকলেরই এটা সুবিদিত ছিল যে, নেতাজী প্রায়ই মাঝরাতে সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে গাড়ী চালিয়ে যেতেন। সেখানে বেশ পরিবর্তন করে তিনি গরদের ধুতি পরতেন এবং একাকী একটি কক্ষে আসনে বসতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতো পরিপূর্ণ

আত্মপ্রত্যয়দীপ্ত এক পুরুষ—ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ষোলআনা বিশ্বাস অক্ষত রেখে। তাঁর আত্মিক সাহসিকতা এমনই ছিল যে, যারা তাঁর চার পাশে থাকতো তারাও তাদের সব হারানোর মুহূর্তে আবার নতুন করে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতো।

এটা সকলেরই ভাল করে জানা আছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম দিনগুলোতে যখন জাপানীদের সামনে পরাজয় প্রকটভাবে দেখা দিচ্ছে, তখন তারা সহানুভূতি ও প্রেরণাপ্রদ কথার জন্য নেতাজীর দ্বারস্থ হতেন। তাঁর দুর্লভ মানসিক স্থৈর্য ও অক্ষুব্ধ ব্যক্তিসত্তার কাছে এসে তারা স্বস্তি ও প্রেরণা পেত। জাপানীরা নিজেরা হল অসমসাহসিক জাত, রণক্ষেত্রে জীবন দিতে তারা কিছুমাত্র পরোয়া করে না। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রচণ্ড দুর্দৈবের মধ্যে তাঁর মৃত্যুঞ্জয় আশাবাদ দেখে তারা বিমুগ্ধ হয়ে যেত এবং তাঁর দৈহিক ও মানসিক নির্ভয়তার উৎস-সন্ধানে গিয়ে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ত। তারা তাঁর আধ্যাত্ম শক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত। জয়ে তিনি অযথা উল্লসিত হতেন না। পরাজয়ে তিনি ভেঙে পড়তেন না। তিনি শ্রীমদ্ভগবদগীতায় উক্ত ও বিবেকানন্দ-সম্প্রচারিত কর্মযোগেরই সাধনা করেছিলেন।

[ইংরেজী হতে অনুদিত]

পরিশিষ্ট—১১

॥ ছাত্রজীবনে সুভাষচন্দ্র ॥

“…আমার সুচিন্তিত অভিমত হল, সুভাষচন্দ্র জন্মেই ছিলেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, তাহল—পরদেশীয় কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করা। সেই উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য সর্বশক্তিমান বিধাতাপুরুষও প্রভূতভাবে তাঁকে দিয়েছিলেন অখণ্ড ভগবৎ বিশ্বাস ও একান্ত ঈশ্বর নির্ভরতা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ধী, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত নিঃসার্থভাবে স্বদেশ সেবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা। পরিপূর্ণভাবে তিনি ছিলেন একজন কর্মযোগী।

“তাঁর চরিত্রের আর একটি অপূর্ব দিক হল উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবময়তা। অসংখ্য মানুষের চোখে এটা ধরা পড়েছিল। এদের মধ্যে এক চেক-মহিলাও আছেন। তিনি তাঁর লেখা Subash Chandra Bose—As I Know Him গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলেছেন : ‘এই ছিল প্রথম দেখা। নিঃসন্দেহে আমি দেখলুম একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে—একজন মিস্টিক—একজন প্রকৃত দার্শনিককে, একজন প্রাজ্ঞ হিন্দু…সুনিশ্চিত একজন আধ্যাত্মিক পুরুষকে। …আমি বুঝলাম ইনি কদাপি নিছক রাজনীতিক নন, ইনি সর্বোপরি একজন দার্শনিক। দেশের মুক্তির জন্য যদিও ইনি শৌর্যপূর্ণ সংগ্রামে লিপ্ত তত্রাচ তিনি

সমানভাবে আগ্রহী—মানুষের, সমগ্র মানব জাতির ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে'।'—লেখিকার এই মন্তব্য পড়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারি না এবং আমিও তা বিশ্বাস করি।

"…যখন প্রায় ন'বছর বয়স সুভাষচন্দ্র ভোর চারটের সময় উঠতেন এবং প্রাতকৃত্য শেষ করে বাড়ীর ছাদে উঠে গিয়ে ধ্যানে বসতেন। বাড়ীর আর সকলে তখন গভীরভাবে ঘুমুতো। পরবর্তী কয়েক বছরে তিনি আরো তিন-চারজনকে নিয়ে, একটি অর্ধ-গুপ্ত স্থান ছিল, সেখানে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, আলোচনা এবং ধ্যান অভ্যাস করতেন। বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন দিক থেকে স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন তাঁর আদর্শ। স্বামীজীর মানবসেবা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং যতদূর সম্ভব তা বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা করতেন। সেই সঙ্গে তিনি বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে দুঃস্থদের চিকিৎসা এবং সেবা-শুশ্রূষা ও তাদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। এই ধরনের সব কাজকর্ম বয়স ও সময়ের সঙ্গে যত বেড়ে উঠল, স্বাভাবিকভাবে তত তাঁর পড়াশুনা ব্যাহত হতে লাগল। কিন্তু এমনই প্রখর বুদ্ধি ও মেধাশক্তি তাঁর ছিল যে, ক্লাসে প্রথম স্থান থেকে নিচুতে নেমে আসতে হয়নি। বাস্তবিক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় পড়াশুনায় অবহেলা রীতিমত বাড়াবাড়ি রকমের হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিহার ও উড়িষ্যার সমস্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি প্রথম হয়েছিলেন।

"…ধর্মপ্রাণতা তাঁর জন্মগত সংস্কার থাকায় একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে তিনি গৃহত্যাগ করলেন এবং হিমাচল প্রদেশে একজন সদগুরুর খোঁজে ঘুরে বেড়ালেন। প্রায় বাইশ দিন কোনরকম খবরাখবর না পেয়ে আমার মা এতদূর ভেঙে পড়লেন যে, তিনি শুধু জানতে চাইলেন সুভাষ বেঁচে আছে কিনা। ‥পরবর্তীকালে বেলুড় মঠের স্বামী শঙ্করানন্দ আমাদের বলেছিলেন, একদিন বারাণসীর মিশন বাড়ীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ) যখন বসেছিলেন, তখন মহারাজ দেখতে পান একটি ছেলে এসে ঢুকলো। মহারাজ বললেন, জানকীবাবুর ছেলে মনে হচ্ছে। যদি তাই ঠিক হয় তবে ছেলেটির যেন যথাযথ দেখাশোনা করা হয়। বিকেলবেলা মহারাজের কাছে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তাঁকে গৃহে ফিরে যাবার উপদেশ দেন এবং বলেন তাঁকে তাঁদের মতন সন্ন্যাস নিতে হবে না। দেশ তাঁর কাছ থেকে প্রভূত জিনিস প্রত্যাশা করছে। সুভাষচন্দ্র যথাসময়ে গৃহে ফিরে এলেন এবং টাইফয়েড জ্বরে পড়লেন। গুরুর সন্ধানে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানোর সময় অনিয়ম এবং কৃচ্ছ্র সাধন এর কারণ বলে মনে হয়।

"…সুভাষচন্দ্র বললেন, বিলেতে পৌঁছনর পর আটমাস মাত্র হাতে থাকবে পরবর্তী আই. সি. এস. পরীক্ষার। সে কারণে পাশ করার সম্ভাবনা সামান্য। আর যদি তিনি কোনভাবে পাশ করে যান তবে তিনি চাকরী থেকে পদত্যাগ করবেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের দাসত্ব করবেন না। তাঁর গুরুজনেরা তাঁর এই প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং তিনি তদনুযায়ী বিলেত

যাত্রা করলেন। সময়টা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে, তাই ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যারা সব সামরিক কর্তব্য পালন করতে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, তারা আবার বিভিন্ন কলেজে ফিরে এসেছে। তাই তাঁর জন্য সেখানে জায়গা পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ল। কলকাতায় ছাত্রজীবনে তিনি যে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, এ সময় এটা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করল এবং কেম্ব্রিজে ফিটজ উইলিয়ম হলে তিনি একটি আসন পেলেন। এখানে তিনি ট্রাইপস ও আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করতে লাগলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাস করলেন এবং চতুর্থস্থান অধিকার করলেন। তারপর তিনি ক্রমশ আনুষঙ্গিক সমস্ত পরীক্ষাগুলোতে উত্তীর্ণ হলেন এবং পূর্বসঙ্কল্পমত পদত্যাগ করলেন। …এই পদত্যাগের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। গান্ধীজীর অহিংসা এবং অসহযোগ আন্দোলন ভারতের জনগণের জাগরণ এনেছিল পূর্বেই। যখন সুভাষ বোস আই. সি. এস. থেকে পদত্যাগ করলেন দেশের স্বাধীনতার কাজ করবার জন্য—বেশ কিছু ব্রিটিশ আই. সি. এস. অফিসার শঙ্কিত হলেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পারলেন উপরোক্ত কারণে অনতিদূরবর্তী কালের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং তাঁদের দেশে ফিরে চলে যেতে হবে। …আমাদের বাবার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন স্যার উইলিয়াম ডিউক। তিনি ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস. অফিসার। লণ্ডনে তিনি একটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের খবর পেয়ে তিনি অতিশয় ব্যথিত হলেন। আমাদের বড়দাদা সতীশচন্দ্রের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করলেন। বড়দা তখন লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পড়ছিলেন। তাকে তিনি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারে প্ররোচিত করতে অনুরোধ করলেন। অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি যতদূর করার করলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ ফিরিয়ে নিতে রাজী হলেন না।

“সুভাষচন্দ্র কেম্ব্রিজ থেকে ট্রাইপস পাশ করে যথাকালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। বোম্বাইতে নেমেই তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধীর অস্পষ্ট কথাবার্তা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কলকাতায় এসে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বাধীনেই শুরু হল তাঁর কর্মজীবন।”

[*সুরেশচন্দ্র বসু* নেতাজীর অগ্রজ এবং জানকীনাথ বসুর তৃতীয় পুত্র।
—ইংরেজী হতে অনূদিত]

পরিশিষ্ট—১২

।। দুই ধর্মগুরুর বিশ্লেষণে সুভাষচন্দ্রের স্বরূপ ।।

বিপ্লবী সঙ্গী অন্নদাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—"তুমি আমায় কি দিতে পার"? অন্নদা বল্লেন "আপনি কি চান"? সুভাষচন্দ্র: "তোমার জীবনাহুতি"। "কৃতার্থ হয়ে গেলাম আমি। বল্লাম—'তাই দিলাম' বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম।" (অসীমানন্দ সরস্বতীর আত্মকথা—"আমার জীবন")। বিপ্লবী অন্নদা চক্রবর্তী পরবর্তী কালে স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী রূপে আশ্রম জীবনে পরিচিত।

পুরুলিয়ার পাহাড় জঙ্গলাকীর্ণপথে দ্রুত গাড়ীতে ছুটে চলেছেন সুভাষচন্দ্র, সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লবীদের মধ্যে অন্নদা চক্রবর্তী। সম্ভবত সেটা ১৯৩৭ সাল। গোয়েন্দা-পুলিশ এক গোপন সংবাদে পেছনে ধাওয়া করেছে; হঠাৎ রাতের অন্ধকারে গাড়ীর ধাক্কায় একজন আছড়ে পড়লো। সুভাষচন্দ্র সঙ্গীদের নিয়ে নেমে পড়ে লোকটিকে তুলে দেখলেন—সে অন্ধ। তার সেবা শুশ্রূষা ও হাসপাতালে পাঠানো পর্যন্ত ব্যস্ত রইলেন। পুলিশের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হলে সুভাষচন্দ্র ভ্রূক্ষেপও করলেন না। বললেন, 'অন্নদা, আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ছি—কিন্তু এদের দেখবে কে? এদের জন্য, সমাজে পীড়িত অবহেলিত মানুষের জন্য গঠনমূলক, সেবামূলক কাজের যে প্রয়োজন।' অন্নদা চক্রবর্তী সংসার ত্যাগ করলেন, হলেন স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী। দুর্গম বনাঞ্চলে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রিলিফ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর গুরুর স্মরণে। পুরুলিয়ার সেই বিস্তীর্ণ বন-জঙ্গলে রামচন্দ্রপুর গ্রামে জন্ম নিল এক চক্ষু-হাসপাতাল, সুভাষচন্দ্রের সেই রাতের মহৎ স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি নামকরণ করলেন 'নেতাজী চক্ষু হাসপাতাল'। জঙ্গলের পাহাড়ী গণ্ডগ্রামে আজকের বিরাট এক আশ্চর্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতাল—স্বামী অসীমানন্দের জীবনের মহৎ কীর্তি। (লাইট হাউস ফর ব্লাইণ্ড-এর সার্জেন ডাক্তার অনুতোষ দত্ত এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রিলিফ সোসাইটির সেক্রেটারী নন্দলাল চক্রবর্তীর অভিভাষণ)।

স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী তাঁর 'সুভাষচন্দ্রের সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেছেন, "... সুভাষচন্দ্রের স্থান কেন এত উচ্চে—এই ঘটনা তাঁর জীবনের সহস্র ঘটনার অন্যতম। আমাদের কয়েকজন কর্মী সুভাষচন্দ্র কলকাতায় ফিরেছেন শুনে তাঁকে একটু দেখার আশা নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর দরজায়। কিন্তু তাঁর কাছে যাবার সুযোগ তাঁরা পাননি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে দাঁড়িয়ে আছেন। সুভাষচন্দ্রের শয়নকক্ষে একলা আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের কথাবার্তা শেষ হলে আমি বল্লাম—'আপনি যদি একটু জানালার পাশে দাঁড়ান।' সুভাষবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—'কেন?' আমি ছেলেদের কথা তাঁকে বল্লাম—অসুস্থ সুভাষচন্দ্র শুয়ে শুয়েই কথা বলছিলেন আমার সঙ্গে। শুনেই তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন আর বললেন—'সত্য

বক্সীকে ডাক।' সত্যদাদার সঙ্গে আরও কয়েকজন এলেন। সুভাষচন্দ্র বললেন—'দেখ, আমি আজ কংগ্রেসের সভাপতি। আমার কত মান-সম্মান। বড়লোকের ছেলে, পয়সার অভাব ছিল না। বিলেতে গেলাম, ICS পাস করলাম, চাকরী নিলাম না। হু হু করে আমার নাম বেরিয়ে গেল। আর এই ছেলেরা গ্রামে বাস করে। কারো হয়তো খাবার জোটে না। আমাদের ডাকে এরা বেরিয়ে আসে। পুলিশের গুঁতো খায়, জেলে যায়, ফিরে এসে দেখে হয়তো কারো মা মারা গেছে, বাপ মারা গেছে, কারো হয়তো জমিজমা বিক্রী হয়ে গেছে। কিন্তু অভিযোগ করে না, একটি কথা বলে না। আবার যখন আমরা ডাক দিই হাসিমুখে বেরিয়ে আসে, 'না' বলতে জানে না, এদেরই জন্য আমাদের নেতৃত্ব। এরাই আজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এর চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল ছিল। এখনি এদের আমার কাছে নিয়ে এসো।' সত্যদাদা সকলকে ডেকে নিয়ে এলেন। সুভাষচন্দ্র সকলকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন, করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন আর বললেন—'তোমরা আমার অপরাধ ক্ষমা কর।' জীবনে কারো পায়ে মাথা ঠেকাইনি, আজ এই প্রথম সুভাষচন্দ্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম।"

স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী 'নেতাজী আয়েঙ্গে' প্রবন্ধে লিখেছেন—"... মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানের রিপোর্ট, শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র বসুর রিপোর্ট পরস্পর বিরোধী। এখন পণ্ডিত জওহরলাল থেকে আরম্ভ করে ভারতের সমস্ত দিকপাল নেতারাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, নেতাজীর মৃত্যুর কোন প্রমাণ নেই। ভারতে ৪৫ কোটি নরনারীর অন্তরও নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করতে চায় না। সকলেরই অন্তর বলে ওঠে—নেতাজী বেঁচে আছেন। তিনি নিশ্চয়ই একদিন ফিরে আসবেন।

"নেতাজী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা আজ ভারতবর্ষের ৪৫ কোটি নরনারীর অন্তরে যেভাবে আলোড়ন তুলেছে, এ পর্যন্ত কোন নেতার সম্পর্কে এরূপ আলোড়ন আমরা দেখিনি। বস্তুতপক্ষে এভাবে জনচিত্তকে অধিকার করবার মত পুরুষ এক সুভাষচন্দ্র ছাড়া আর আমরা কাকেও দেখতে পাই নে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে তাঁর জীবনের শত শত ছোটখাটো ঘটনার মধ্যে আমাদের ফিরে যেতে হয় এবং সেই ঘটনাগুলো আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি তাঁর জীবনকে কেমনভাবে অতি ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ জীবনসমষ্টির মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। বড়রাও তাঁকে বন্ধু ও আত্মীয়রূপে পেয়েছিলেন, ছোটরাও তেমনি তাঁকে তাদের মত করেই পেয়েছিল। রোগীর শয্যাপার্শ্বে, অনাথ-আতুরের অশ্রুজলে জনসেবার বৃহত্তম ক্ষেত্রে, কৃষক, শ্রমিক-মজুরের দুঃখপূর্ণ জীবনের মাঝখানে আমরা তাঁর যে স্নেহ-করুণ মূর্তি দেখেছি তার তুলনা হয় না। তিনি ছিলেন একদিকে যেমন ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, তেমন ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংগঠক, তেমনি ছিলেন তরুণের প্রতীক, ছাত্রদের বন্ধু, অসহায়ের সহায়, দরিদ্রের সম্বল, হিমাচলের মত উন্নতশীর্ষ ভাবগম্ভীর বিরাট পুরুষ। শৌর্যে, বীর্যে, প্রতিভায় যেমন ছিলেন প্রদীপ্ত—তেমনি ছিলেন

পরম সাধক, সন্ন্যাসী, অমৃতের উপাসক, মৃত্যুঞ্জয়ী বীর।

"তাঁকে বোঝাতে গেলে আমাদের সাধারণ বুদ্ধি কূল পায় না। যে তাঁকে না দেখেছে, তাঁর সঙ্গে না মিশেছে, কাজ না করেছে, যে তাঁর অন্তরের সত্যরূপ লাভ না করেছে, তাঁর পক্ষে সুভাষচন্দ্রের জীবন চিত্রকে ফুটিয়ে তোলা একেবারেই অসম্ভব। আজ যখনই কোন সমস্যা আমাদের সামনে আসে, তখনই এই একটি মানুষের কথাই মনে পড়ে। মনে হয় বর্তমান সময়ে একমাত্র তিনিই আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তুলে নিয়ে যেতে পারেন।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী ভাস্বরানন্দ —'নেতাজীকে যেমন দেখিয়াছি'—প্রবন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন :

"...শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কাজের শৃঙ্খলা বাড়িতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি হইল। ঝান্সীরানীর আদর্শ লইয়া মেয়েদের সহায়তায়ও একটি Regiment তৈরী হইয়া গেল। তাহাতে সহস্রাধিক নারী ও বালিকা যোগদান করিলেন এবং পুরুষের অনুকরণে বন্দুক ধরিতে শিখিলেন। মাতৃশক্তির উদ্বোধনে সকলের ভিতর এক নবজাগরণের সৃষ্টি হইল। উৎসাহ ও উদ্যমে জনসাধারণের মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিল। ...সকল ভারতবাসীই এই সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নেতাজীর আহ্বানে সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ সাড়া দিল।... ।

"এইরূপে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি হইল। এখন সুভাষবাবুর নিকট সমস্যা দাঁড়াইল এই বাহিনীর আবশ্যকীয় পোশাক, খাদ্য ও হাতিয়ার প্রভৃতি সংগ্রহ করা। স্বেচ্ছাসেবকসহ সৈন্যসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজারে পরিণত হইয়াছিল। এইসব সৈন্যের জন্য বন্দুক, গোলাগুলি, Armoured Car, Tank, Anti-air-craft-gun, Bomber এবং Fighter অনেক পরিমাণে জাপানীদের সহায়তায় সংগ্রহ হইয়া গেল। পোশাকও জোগাড় হইল। কিন্তু অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিস ও খাদ্য সরবরাহের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত তিনি প্রায়ই বিরাট সভার আয়োজন করিতেন। এই সকল সভাতে ভারতীয় আবালবৃদ্ধবনিতার উপস্থিতি অনিবার্য ছিল। সভায় তিনি সর্বসাধারণকে তাঁহার কার্যের প্রসার সম্বন্ধে বিবৃতি দিতেন। কোন কোন সভাতে বক্তৃতার সময় তাঁহার অন্তর্নিহিত ঐশীশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। বক্তৃতাগুলি প্রায়ই হিন্দুস্থানী ভাষাতে হইত।

"একবার সিঙ্গাপুরের এক ময়দানে মালয়-প্রবাসী ভারতীয়গণের এক বিরাট সমাবেশ হয়। ঐ সভায় শতাধিক মাল্য দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়। সভার বক্তৃতান্তে সুভাষবাবু ঐ মালা বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে অনেকেই এক একটি মালার জন্য একলক্ষ ডলারও দিয়াছিলেন।

"...সিঙ্গাপুরে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া নেতাজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনবাটীতে আসিয়াছিলেন। সেইদিন ঠাকুর-ঘরে তিনি প্রায় আধঘণ্টাকাল ধ্যানাবিষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন। পরে

পূজান্তে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া আলাপ-আলোচনাদি করেন। প্রায় এক ঘণ্টাকাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর তিনি একখানা 'চণ্ডী'র জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় আমি আমার চণ্ডীখানি তাঁহাকে উপহার দেওয়ায় তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ···নেতাজী যখন দেখিলেন যে, প্রায় ৫০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী রণাঙ্গনে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তখন তিনি অনতিবিলম্বে তাঁহার কর্মকেন্দ্র সিঙ্গাপুর হইতে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করিলেন এবং বিভিন্ন পথে সৈন্যদল সিঙ্গাপুর হইতে রেঙ্গুনে সমবেত হইতে লাগিল। সেখানে উপযুক্ত সৈন্য-শিবির তৈরী হইল ও খাদ্য সরবরাহের সুবন্দোবস্ত হইতে লাগিল। প্রত্যেক সৈন্যদলকে সীমান্তে পাঠাইবার পূর্বে নেতাজী তাহাদের জন্য Tea Party-র ব্যবস্থা করিতেন এবং স্বয়ং স্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাহাদের 'See off' করিতেন। ইহাতে সৈন্যদল বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইত। নেতাজীর মুখ হইতে আশ্বাসবাণী পাইয়া তাহাদের প্রাণে অস্বাভাবিক শক্তির সঞ্চার হইত। সীমান্ত হইতে প্রত্যাগত অনেক যোদ্ধার মুখে শুনিয়াছি তাহারা নেতাজীকে তাহাদের পিতামাতা ও দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করে এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। কে বলিবে নেতাজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবের মূল কারণ কি ছিল ? প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ—রাজচক্রবর্তী হইতেও যে তাহার স্থান অতি উচ্চে তাহা সহজেই অনুমিত হইত।

"রেঙ্গুন হইতে দলে দলে আজাদ হিন্দ ফৌজ মণিপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নেতাজী মাঝে মাঝে কার্য-পর্যবেক্ষণের জন্য সীমান্তে যাইতে লাগিলেন। দ্রুত অভিযানের বার্তা সিঙ্গাপুরে পৌঁছিতে লাগিল। পেলেম, কোহিমা প্রভৃতি অধিকারের সংবাদও আসিল। ইম্ফলও প্রায় পতনোন্মুখ হইল। কিন্তু বিধাতার চক্র মানববুদ্ধির অগোচরে কোন পথে ঘূর্ণিত হইতেছিল কে জানিত।

"এদিকে ব্রিটিশ সৈন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া এবং জাপানীদের আক্রমণের ভয়ে যখন ইম্ফল হইতে বিমানযোগে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করিতেছিল, তখন চারজন কুচক্রী আজাদ হিন্দ ফৌজ হইতে অজ্ঞাতসারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইম্ফলে যাইয়া জাপানী ও ভারতীয় ফৌজের খাদ্য ও ঔষধাদি সরবরাহের অপ্রাচুর্যের কথা তাহাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া দেয়। এই গুপ্ত খবর পাইয়াই ব্রিটিশ সৈন্য ইম্ফল পরিত্যাগ না করিয়া শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হইতে থাকে। সেই সময় বাস্তবিকই জাপানী ও ভারতীয় সৈন্যদের অবস্থা খুব শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছিল। তাই শত্রুর আক্রমণে নিরুপায় হইয়া ভারতীয় সৈন্যদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিতে হইতেছিল···তিনি ব্যাঙ্কক হইতে বিমানযোগে সিঙ্গাপুর পৌঁছিয়াই এক সভায় উৎকণ্ঠিত জনতাকে প্রত্যাবর্তনের কারণ জানাইয়া পুনরায় ভীষণতর বেগে শত্রুকে আক্রমণে তৈরী হইতে বলিলেন। সকলেই অবাক হইয়া তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ······"।

পরিশিষ্ট—১৩

।। নেতাজী ও কম্যুনিজম এবং ফ্যাসিজম ।।

"...সর্ববিষয়ে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিতে সোভিয়েত রাশিয়া একদিন কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীকেই প্রাধান্য দিয়াছিল। কিন্তু কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষককুলের প্রতি সহৃদয় দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের সমস্যা শ্রমিকের সমস্যা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূনতর নহে।

"মহামতি কার্ল মার্কস (Karl Marx) বিপ্লবান্দোলনে দেশের অনুন্নত অর্থনীতিকেই সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু ভারতে অর্থনীতিকেই মুখ্য বা গৌণ কোন পর্যায়ে ফেলা যায় না। সংস্কৃতির পীঠস্থান ভারতে মানব-জীবনের আরও একটা দিক আছে। আমার মনে হয়, ভারতের অর্থনৈতিক চিন্তা হওয়া উচিত জাতীয়তাবাদী সমাজবাদ ও সমভোগবাদের মধ্যবর্তী একটি সংশ্লেষণ (A synthesis between National Socialism and Communism)."

[*টোকিও ইম্পিরীয়াল ইউনিভারসিটির ছাত্রদের প্রতি* নেতাজীর ঐতিহাসিক অভিভাষণের প্রয়োজনীয় অনূদিত অংশ—নভেম্বর ১৯৪৪]

২। সোভিয়েত রাশিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কোন সময়েই ভারতের মুক্তিযোদ্ধাদের সক্রিয় বা সশস্ত্র সাহায্য করেছেন এমন নজির সম্ভবত নেই—তথাপি অত্যাচারী জারতন্ত্রের পতনের পর সাম্যবাদী রাশিয়ার ভারতের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতির আশায় নেতাজী সেখানে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে—রোম ও বার্লিনে চলে যেতে বাধ্য হন। *সোভিয়েত সংবাদপত্র ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি*—সেজন্য তাঁকে ফ্যাসিস্ট আখ্যা দেন—কিন্তু পরবর্তী সময়ে উভয়েই তাঁদের ভুলের স্বীকারোক্তি করেন এবং নেতাজীর প্রতি তাঁদের ধারণার পরিবর্তন করেন। আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের পক্ষে নেতাজী ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সময় রাশিয়া ও চীন, ব্রিটিশ মিত্রশক্তির সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই দুই গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। কারণ রাশিয়া ও চীন সমাজবাদী দেশ এবং নেতাজী নিজে যথার্থ সমাজবাদী রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন ও তাঁর পররাষ্ট্রনীতি সেই মৌলিক নীতিকেই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন।

ডক্টর পদ্দুবনী ও প্রফেসর রাইকভ (*Doctor Poddubani and Prof. Raikav) নামে ভারত-বিশেষজ্ঞ দুই রাশিয়ান*, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আই. এন. এ. সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁরা লিখেছেন যে, মার্কসীয় আদর্শ ও রুশ-সফলতা গভীরভাবে নেতাজী বোসের অন্তর স্পর্শ করেছিল। নেতাজী 'ফ্যাসিজিম' ও 'নাজীজিম' (হিটলার ও মুসোলিনীর মতবাদ)-এর সহমর্মী ছিলেন—এ মতবাদ খণ্ডন করে ডঃ পদ্দুবনী দেখিয়েছেন যে, যখন নাজী-জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করে (১৯৪১-এর

জুন মাস) নেতাজী তখন রোমে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে—জার্মানীর পররাষ্ট্র মন্ত্রকের স্টেট সেক্রেটারী হের উত্তরমান-এর মারফৎ ১৭ই জুলাই মন্ত্রী রিব্বেনট্রফকে এক চিঠিতে তিনি জানান—জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধে ভারতের সহানুভূতি রাশিয়ার অনুকূলেই থাকবে। তাছাড়া উক্ত ভারত-বিশেষজ্ঞ রুশ পণ্ডিত আরও প্রকাশ করেছেন, নেতাজীর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত জার্মানীতে ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন (আই. এল. এ.) সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করার নির্দেশ প্রত্যাখান করেছিল। কারণ নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদ্দেশ্যে সাবমেরিন যাত্রার প্রাক্কালে এই প্রত্যাখ্যানের সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করে গিয়েছিলেন। এমনকি মণিপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ-এর পরাজয়ের পরও তিনি মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

[Sheel Bhadra Yajee : Paper on Netaji and INA 22.10.85. INA Memorial, Moirang]

৩। ভারতের *মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, জ্যোতি বসু* "রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে তাঁর (নেতাজীর) সম্বন্ধে কিছু অন্যায় ও ভুল অতিশয়োক্তি তাঁরা করেছিলেন।" ১৯৭৯-এর জানুয়ারীতে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, সে সময় (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে তাঁরা কিছু মাত্রাতিরিক্ত অসুন্দর এবং ভুল জিনিস নেতাজী সম্বন্ধে বলেছিলেন—"We said certain exaggerated unfair and wrong things about him (Netaji).···আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, জার্মানী বা জাপান নিজেদের গরজে আমাদের সাহায্য করলেও এদেশে একবার ঢুকতে পারলে শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর চেপে বসবেই। তবে সেক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র যে তাদের আধিপত্য মেনে নিতেন না—তাঁর বন্দুক যে জাপানীদের বিরুদ্ধেও তুলে ধরতেন—সেটা বুঝতে আমরা ভুল করেছিলাম। The error seems to be just there."

[Netaji and Indian Communists : The Oracle, Jan., 1979, Netaji Research Bureau]

৪। নেতাজী সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতবাদ বিশেষত রাশিয়া ও লণ্ডনে অবস্থিত এই দলের মুখপত্র ও মুখপাত্রের মূল বক্তব্য, অন্যদিকে কম্যুনিজম ও ফ্যাসিজম-এর দার্শনিকতা ও প্রয়োগবিধি বিষয়ে নেতাজীর চিন্তাধারার কিছু কিছু নথিপত্রের ইঙ্গিত :

১৯৩১ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত 'অল্ ইণ্ডিয়া নওজওয়ান ভারত সভা'র সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র তাঁর স্থির লক্ষ্য সম্বন্ধে ঘোষণা করেন—"Socialist Republic" designed to achieve "complete all-round...and tenant, between capitalist and wage-earner, between the so-called

upper and depressed classes, between men and women.…" "সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই মূল লক্ষ্য—যা হবে জমিদার ও প্রজার মধ্যে, পুঁজিপতি ও জনমজুরের, তথাকথিত উপরের তলার ও বঞ্চিতদের মধ্যে এবং স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের মধ্যে আপোষকামী কংগ্রেসী নীতির বিপরীতধর্মী।"

৫। *১৯৩৩ সালের ১০ই জুন, লণ্ডনের ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টি আয়োজিত 'ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল কনফারেন্সে' সভাপতি* রূপে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে তাঁকে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় তাঁর সভাপতির লিখিত ভাষণ, 'ফ্রায়ারস হলে'র অধিবেশনে পাঠ করা হয়। এই ভাষণে, তাঁর থিসিস 'Hindustani Samyavadi-Sangha'-এর উল্লেখ ছিল। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবের কথা খোলাখুলিভাবে লণ্ডনে তাঁর প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না—লণ্ডন-বক্তৃতায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তাঁর নীতি ও সংগ্রামের ওপর ব্যাখ্যা ছিল। বলেছিলেন, গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে কিছুটা পঙ্গু করতে সক্ষম হতে পারে—কিন্তু তা আদৌ যথেষ্ট নয়, আয়ারল্যাণ্ডে সফলতার মত 'গেরিলা ওয়ার-ফেয়ার' তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন—তাই তিনি গান্ধী-বিরোধী কংগ্রেসীদের 'হিন্দুস্থানী সাম্যবাদী সংঘে'র মঞ্চে সংগঠিত হতে শক্তি নিয়োগ করতে বলেন। এই সাম্যবাদী-নীতিতে শুধুমাত্র তাঁর রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা নয়—ভারতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুস্পষ্ট সুর নিহিত ছিল।

৬। সুভাষচন্দ্র যথার্থই ভারতে একটি সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করে সশস্ত্র বিপ্লব অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে, তাঁর ইউরোপে অবস্থান-কালে, তিনি রাশিয়ার 'কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' বা 'কমিণ্টার্ন'-এর সাহায্য পেতে চেয়েছিলেন, যদিও কমিণ্টার্নের অধীনস্থ অংশরূপে নয় অথচ *'কমিণ্টার্নের' সরকারী মুখপত্র 'International Press Correspondence'* সুভাষচন্দ্রের লণ্ডন বক্তৃতার কঠোর সমালোচনা করেন। "The New Party of Bose and What Should be Our Attitude to It" (International Press Correspondence—Sept. 1933)—এই শিরোনামায় লেখা হয়: "The programme of Bose does not present a way to liberate India. Bose proposes to limit the struggle to some economic measures which will 'paralyse the activity of the Government machine and thus force the British imperialists to give way'." Page 7. "Through economic measures alone it is impossible to obtain the Independence of India. It is necessary to raise the fight for power ; prepare the people for revolution." ব্রিটিশ-ভারতের মধ্যে পরাধীনভাবে বসবাস করে সশস্ত্র বিপ্লব আয়োজনের এ রুশ-বক্তব্য এক অবাস্তব চিন্তার পরিচয়। আরও লেখা হয়, "Mr. Bose does not agree with such Marxism and fights against it." (Bose's speeches P. 79) "We should remind all over-enthusiatic followers of Karl Marx that……according to the great German thinker capitalism and industrialisation must precede socialism.' অর্থাৎ "কার্লমার্কস যা শিখিয়েছিলেন সেই মতবাদ অনুসরণ করলে রাশিয়া যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তা হতে পারত না, কারণ মহান জার্মান চিন্তানায়ক মার্কস-এর মতে পুঁজিবাদ ও শিল্পবিপ্লব সমাজবাদের অবশ্যই পূর্বানুবর্তী হবে"— এই ছিল সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা। আসলে নেতাজী কম্যুনিজমের বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর স্বাধীন সত্তায় দৃঢ় থেকে ভারতের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে ভারতকে Socialist Republic রূপে গড়তে চেয়েছিলেন।

৭। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভিয়েনায় যখন চিকিৎসার জন্য অবস্থান করছিলেন তখনো *ভিয়েনা জার্মানীর সোস্যালিস্ট পার্টি দ্বারা শাসিত, কম্যুনিস্ট পার্টিকে হিটলার-গভর্নমেণ্ট তখনো বেআইনি ঘোষণা করেননি। সে সময় নেতাজী চেয়েছিলেন রাশিয়ায় চলে যেতে* ও ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের জন্য কম্যুনিস্ট রাশিয়ার সাহায্য লাভ করতে। তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন। সেই অনুযায়ী সে সময়ে মিউনিখে গবেষণারত নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র অশোকনাথ বসু সেখানকার কম্যুনিস্ট সেক্রেটারী এম. মাথুরকে নেতাজীর নিকট উপস্থিত করান যাতে করে সোভিয়েত রাশিয়া যাওয়ার ভিসা সংগ্রহ হয়। কিন্তু মস্কোর শাসকবর্গ নেতাজীর ওপর খুশী ছিলেন না—তাই তাঁকে ব্যর্থ হতে হয়।** তাছাড়া,

** 'হিন্দুস্থানী সাম্যবাদী সঙ্ঘ'—বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের রচিত থিসিস ১৯৩৩ সালে মিউনিখে কমিণ্টার্নের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেন এবং ১৯৩৯ সালে ভারত থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয়নাথ বসু (পরবর্তীকালে ব্যারিস্টার ও রাষ্ট্রদূত) মারফত ইংলণ্ডে সোভিয়েত রাশিয়ার একজন এজেন্টের হাতে তাঁর অতি গোপনীয় মেসেজ মস্কোতে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবেমাত্র শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও মস্কোর গভর্নমেণ্টের নিকট—উত্তর সীমানা দিয়ে এক বন্ধু হিসেবে রাশিয়ার সশস্ত্র সৈন্য সমাবেশ ও ভারতের ভেতরে প্রবল আকারে পূর্ণভাবে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার তাঁর এই অতি গুপ্ত প্রস্তাব দেন। তাহলে এই দুয়ের মাঝখানে পিষ্ট হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-শক্তি ভারত ছাড়তে বাধ্য হবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যাবে। ১৯৭২ সালের ৬-ই মার্চ এম. এস. বাটলিওয়ালা লিখেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই ১৯৩৯-এর অক্টোবরে সুভাষচন্দ্র বোসের সঙ্গে অধিবেশনে আমি ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করি। তিনি (সুভাষচন্দ্র) বললেন—'আমি সোভিয়েত রাশিয়াকে বিশ্বাস করি, কারণ সে ভারতকে উপনিবেশরূপে গড়ে তোলার পক্ষপাতী হবে না। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কামড় থেকে আমাদের উদ্ধার করতে আমি তার মিলিটারী সাহায্যকে সাগ্রহে আহ্বান

দ্বিতীয়বার ভারত ত্যাগের সময় রশিয়ায় যেতে চাইলেও রুশ-ইংরেজ চুক্তির অজুহাতে স্ট্যালিন-গভর্নমেণ্ট নেতাজীকে সাহায্য করেননি। ইতিহাসের ধারায় দেখা যায়—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে গোপনে ও প্রত্যক্ষভাবে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবে জার্মানীই বারে বারে সাহায্য দান করে এসেছে ভারতের স্বাধীনতার জন্য—তথাপি হিটলারের উগ্রজাতীয়তাবাদ, ইহুদী অত্যাচার ও রাশিয়া আক্রমণের বৃহত্তর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে নেতাজী বিশ্বাস রাখতে পারেননি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধে বিপর্যয়ের পরও সেই সাম্যবাদী রাশিয়াই তাঁর লক্ষ্যস্থল। রুশ-জনগণের অবর্ণনীয় অত্যাচার-ভোগ ও রক্ত স্রোতের ওপর বিপ্লবী সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম। সেই দেশের ওপর নেতাজী বিশ্বাস হারাননি. মহা মনীষী কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ও মহান লেনিনের সৃষ্টির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল গভীর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কিংবা যুদ্ধকালীন অথবা শেষ মুহূর্তেও ঐ দিকেই তাঁর সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তথাপি ইতিহাস যথাযথ অনুধাবন না করেই শত্রু দেশগুলোর মত কম্যুনিস্টগণও নেতাজীকে রাজনৈতিক. বিশ্লেষণে কখনো 'ফ্যাসিস্ট', বলে অভিহিত করেছেন, আবার কম্যুনিস্ট বিরোধীগণ কেউ বা তাঁকে 'কম্যুনিস্ট' নামে ভূষিত করেছেন। ইতিহাসে এ এক বিচিত্র ঘটনা!

৮। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণকালে বেনিটো মুসোলিনীর সঙ্গে নেতাজীর সাক্ষাৎ হয়। বিশ্বশান্তি স্থাপনে পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের সুফল সম্বন্ধে মুসোলিনীর মনোভাব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত নেতাজীকেও মুগ্ধ করে - যদিও হিটলারের জার্মান জাতিতত্ত্ব এবং শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ-প্রীতি তাঁকে হতাশ করেছিল। তিনি বলেছিলেন, *ফুয়েরারের আত্মজীবনী "মাইন কাম্ফ"-এ তাঁর মন্তব্য* ('as a German would rather see India under British domination than that of any other nation') was an attempt to "curry favour with the British." নেতাজী এমনও পর্যন্ত মন্তব্য করেছিলেন, Hitler was "severe as well as

---

জানাবো। আমি আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত একটি সৈন্যবাহিনীর সাহায্য ছাড়া ভারতের মুক্তির পথ দেখি না' ("I represented the Communist Party of India in the meetings with Subhas Chandra Bose in October 1939—after the Second World War had just commenced. He said "I trust Soviet Russia as one State which will not be interested in colonising India. So I will be ready to welcome military help from Soviet Russia to secure our (India) freedom from the claws of the British Imperialists ... ... I do not see any possibility of securing our freedom without the help of a modern equipped army."—(Bose Brothers and the Indian Struggle - Amiya Nath Bose)

dangerous psychopathic personality in whom satan dominated." (হিটলার একজন কঠিন এবং একই সঙ্গে এক বিপজ্জনক মনরোগগ্রস্ত ব্যক্তিত্ব যার ওপর শয়তান প্রভুত্ব বিস্তার করে আছে।) তথাপি ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান্ধী-নেহরুও নেতাজীকে সে সময় ফ্যাসিস্ট আখ্যা দিয়েছিলেন। বিচিত্র এই মানব মনের সংস্কার! বিচিত্রতর তার রাজ্য-রাজনীতি ও কূট-কৌশলের ধারা! আসলে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ছিল ইংলণ্ডের গোপন চুক্তি, আবার জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যেও ছিল গোপন চুক্তি—কিন্তু যেই মুহূর্তে জার্মানী রাশিয়াকে আক্রমণ করে বসলো, রুশ-ইংরেজ ও পরে মার্কিনী মিত্রজোট গড়ে উঠলো এবং যেহেতু নেতাজী ইটালী-জার্মানীর সাহায্যে তখন বার্লিনে 'ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন' গড়ে তুলেছেন—তিনি তাদের চোখে 'ফ্যাসিস্ট'।

৯। ১৯৩৮ সালে ইংল্যাণ্ডের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান রজনী পাম দত্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন—তা লণ্ডনের 'ডেইলি ওয়ার্কার' পত্রিকায় ১৯৩৮ সালের ২৪-শে জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। এই সাক্ষাৎকারে নেতাজী তাঁর মূল বই 'দ্য ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' (ভারতের মুক্তি সংগ্রাম)-এ ফ্যাসিজম ও কম্যুনিজম সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আপনার 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থের শেষ অংশে ফ্যাসিজম সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন সে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। ফ্যাসিজম সম্পর্কে আপনার মত সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন কি? ঐ অংশে কম্যুনিজম সম্বন্ধে আপনার সমালোচনা বিষয়েও অনেক বিতর্ক হচ্ছে। সে বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ তিন বছর আগে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তার পরে আমার চিন্তাধারা অনেক পরিণতি লাভ করেছে। আমি সঠিক যা বলতে চেয়েছিলাম তা হল—আমরা ভারতবাসী, জাতীয় স্বাধীনতা কামনা করি এবং তা অর্জন করার পর সোস্যালিজম অর্থাৎ সমাজবাদের পথে অগ্রসর হতে চাই। 'কম্যুনিজম ও ফ্যাসিজম-এর মধ্যে সমন্বয়' বলতে আমি এ-কথাই বুঝিয়েছিলাম। হয়তো আমার ব্যবহৃত শব্দগুলি সুষ্ঠু হয়নি। কিন্তু আরও একটা কথা মনে করা দরকার। আমি যখন বইটি লিখেছিলাম তখনও ফ্যাসিজম সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের পথে অগ্রসর হতে শুরু করেনি। এবং আমার কাছে এটাই জাতীয়তাবাদের এক উগ্ররূপ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল।

আমি এ-কথাও বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে যাঁরা কম্যুনিজমের পক্ষপাতী, তাঁদের একটি বড় অংশ কম্যুনিজমের যে-রূপ প্রদর্শন করেন, তা জাতীয়তা-বিরোধী বলেই আমার ধারণা। এবং তাঁদের কয়েকজন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি যে শত্রুতা করছেন, তাতে আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়। যাইহোক, বর্তমান পরিস্থিতির অনেক মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে।

আমি আরও বলতে চাই যে, আমি সর্বদাই উপলব্ধি করেছি যে কম্যুনিজম—মার্কস এবং লেনিনের রচনায় যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং কম্যুনিজম ইন্টারন্যাশনালের নীতির সরকারী ঘোষণাপত্রে যেভাবে প্রচারিত হয়েছে, তা জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করে। বর্তমানে আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের ভিত্তিতে সুসংগঠিত করতে হবে। এবং এই কংগ্রেসের লক্ষ্য হবে দ্বিবিধ—রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র।

[শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড : পৃষ্ঠা ২২৩—২২৪]

১০। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এর কৃতবিদ্য ইংরেজ *অধ্যাপক টম নসিটার—তাঁর 'মার্কসীয় প্রেক্ষাপটে সুভাষচন্দ্র বোস'* (*Subhas Chandra Bose: A Marxist Perspective*) †† বিষয়ে নেতাজীর বিশ্ববিখ্যাত বই—'The Indian Struggle' (ভারতের মুক্তি সংগ্রাম)-এর "নানা জায়গা উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, নেতাজী যখন তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইটির শেষাংশ রচনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে ফ্যাসিজম-এর নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ শুরু হয়নি। সে সময় ফ্যাসিজম বলতে বোঝাত বড় জোর এক ধরনের জঙ্গী জাতীয়তাবাদ। ফ্যাসিজম-এর এই অস্পষ্ট জাতীয়তাবাদের আদর্শ নেতাজীর মত দেশের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর একজন নেতার মনে হয়তো ক্ষণকালের জন্য কিছুটা আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু তাই বলে আজ এতদিন পরে তাঁর স্বদেশবাসীর পক্ষে নেতাজীর মতাদর্শের পূর্ণ মূল্যায়নে কোন রকম বিভ্রান্তি ঘটা উচিত নয়। আসলে নেতাজী চাইতেন ভারতবর্ষ সত্বর স্বাধীনতা লাভ করুক এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে কম্যুনিজমের কিছু কিছু আদর্শও বাস্তবে রূপ লাভ করুক। মার্কস এবং লেনিনের লেখা এবং কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের ঘোষণাসমূহে কম্যুনিজমের যে লক্ষ্য ও পথ বিবৃত হয়েছিল নেতাজীর মনে তা যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল।"

(লাডলী মোহন রায়চৌধুরী—'সুভাষচন্দ্র : নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে' যুগান্তর সাময়িকী ৯-২-৮৬)

---

†† Tom Nossiter : 'Subhas Chandra Bose : A Marxist Perspective' Seminar on 2-12-83 at Netaji Institute for Asian Studies.

পরিশিষ্ট—১৪

॥ নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস ॥

প্রত্যেক দেশে, বিশেষ করে সে দেশের গভর্নমেন্ট যখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তার সৈন্যবিভাগে 'সিক্রেট সার্ভিস' বা গুপ্তচর বিভাগ অত্যন্ত সক্রিয় করা হয় এবং বিশেষ ট্রেনিং-এর পর দুঃসাহসিক, মৃত্যুভয়হীন, স্বেচ্ছায় যোগদানকারী সৈনিক নিয়ে সিক্রেট সার্ভিস গড়ে তোলা হয়। সৈন্যবিভাগের বাইরের থেকেও নারী-পুরুষদের অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থ দিয়ে এই গুপ্তচর পাওয়ার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু তাদের অনেকে 'ডাবলএজেন্ট' বা দুপক্ষের হয়ে অতি গোপনে কাজ করে, বিশ্বাসঘাতকতাও করে। আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট ও সৈন্যবাহিনী দূরদেশে গড়ে উঠেছিল এবং পরাধীন মূল ভারতভূখণ্ড থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে উচ্ছেদের জন্য শতসহস্র পর্বত-সমুদ্র-বনজঙ্গল পেরিয়ে যুদ্ধ-আক্রমণ করেছিল। তাই তার গুপ্তচর বিভাগের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আই.এন.এ.-র গুপ্তচর বিভিন্ন দলকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জল, স্থল ও বিমান পথে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। সিঙ্গাপুরে-রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ শিবিরে পাঠানো গোপন বেতার চ্যানেল তৈরী করে তারা। আর একটা প্রধান কাজ ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের সংবাদ প্রচার ও বিপ্লবের দ্রুত প্রস্তুতি। এ কাজ অবশ্যই ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এবং দুরূহ। আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্ত বহিনীর ১৩০ জন সৈন্য চট্টগ্রামের পার্বত্য পথে বর্মার মধ্য দিয়ে নৌকায় ও পায়ে হাঁটা পথে ছদ্মবেশে ভারতে প্রবেশ করেছিলো, কিন্তু সকলেই বন্দী হয়। ১৯৪২ সালে মালয় থেকে ৪০ জন প্রথমে ডুবোজাহাজে করে ভারতে এসে আজাদ হিন্দের বাণী প্রচার করেছিলেন; এদের মধ্যে মাদ্রাজ উপকূলে বন্দী হয়ে সত্যেন্দ্র বর্ধনের ফাঁসী হয়। ১৯৪৩ সালের মার্চে এক প্যারাসুট বাহিনী নামানো হয়েছিল; তাদের কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় কোন বেতারবার্তা আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট পায়নি। ১৯৪৩-এর অক্টোবরে নেতাজী আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট ও ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর গুপ্তচর বিভাগকে তিনি পুনর্গঠিত করেন, নামকরণ হয় 'বাহাদুর গ্রুপ'। কর্নেল বুরহানুদ্দিনের নেতৃত্বে এই বাহাদুর গ্রুপের সৈন্যগণ স্থলপথে ভারতের অভিমুখে রওনা হন এবং বুথিডং-এ ইংরেজ বাহিনীর হাতে বন্দী হন। কর্নেল বুরহানুদ্দিনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হলেও, পরে দ্বীপান্তর হয় এবং ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি মুক্ত হন।

নেতাজীর নিজস্ব পরিচালনায় তাঁর সিক্রেট সার্ভিস-এর পাঁচটি শিক্ষা কেন্দ্র পেনাং-এ খোলা হয়েছিল। এই সার্ভিসের ডিরেক্টর ছিলেন মেজর এন. গোপালস্বামী। তিনি বার্লিন থেকে নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাবমেরিন যোগে পৌঁছে যাবার পর অন্য একটি ইউ বোটে জার্মানী থেকে এসেছিলেন। পেনাং-এ গুপ্ত বাহিনীর শিক্ষা শিবিরের নাম ছিল

'স্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট'—এটা ছিল ইংরেজের পূর্বতন একটি মিলিটারী ক্যাম্প। এখানে শিক্ষার বিষয় ছিল (১) বেতারবার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ, (২) ট্রান্সমিটার তৈরী, (৩) প্রচার অভিযান, (৪) বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী ও তার ব্যবহার, (৫) গুপ্ত আন্দোলন পরিচালনা, (৬) শত্রুর ক্ষতিসাধন ও ধ্বংসাত্মক কাজ, (৭) শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহ, (৮) প্রয়োজনীয় ছদ্মবেশ গ্রহণের কলাকৌশল এবং ড্রিল, দৌড়ান, সমুদ্রে সাঁতার, নৌকা চালানো, রাইফেল, রিভলবার, হাতবোমা ও টমিগান চালানো।

১৯৪৩-এর ৮ই ডিসেম্বর এস. এন. চোপরার নেতৃত্বে ৪জন আজাদ হিন্দের সৈনিক নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস শিবির স্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট থেকে ডুবোজাহাজে বোম্বে ও করাচীর মাঝখানে আরবের উপকূল কাথিয়াওয়াড়ে অবতরণ করেন। বেতার ট্রান্সমিটিং পাওয়ার প্যাক, রিসিভিং সেট-এর জটিল যান্ত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় তাঁদেরই প্রথম সফলতা এবং ওঁদের কাছ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে সার্থক যোগাযোগ নেতাজীকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছিল। পরের বছর কলকাতার বেহালা গোপন কেন্দ্র থেকে পবিত্রমোহন রায় ও তাঁর সহযোগীরা সংবাদ পাঠাতে সফল হয়েছিলেন। এর পরবর্তী দলে ১২ জন মুসলিম গুপ্ত বাহিনীর দল করাচীর কাছে পুসনিতে ১৯৫৪-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী সাবমেরিনে ভারতে আসে, কিন্তু দলবদ্ধভাবে ব্রিটিশ পুলিশের কাছে গিয়ে সকলেই আত্মসমর্পণ দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু বিপ্লবী ডঃ পবিত্রমোহন রায়ের নেতৃত্বে দুঃসাহসী চারজনের বাহিনী ১৯৪৪-এর-১৩-১৪ মার্চ পুরী ও কোনারকের কাছে ঝড়-জলের রাতে সাবমেরিন থেকে অবতরণ করেন। এই দলে সর্দার মাহেন্দ্র সিং, সর্দার অমৃক সিং গ্রীল এবং তুহিন মুখার্জী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তুহিন মুখার্জী পুরীতে অবতরণের পর আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের দেওয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ, গোপন কোড-এর একটি অপরিহার্য যন্ত্রাংশ ও ট্রান্সমিটিং সেটসহ অদৃশ্য হয়ে যায় ও পরে সরকারী চাকুরী নেয়। আর ডঃ পবিত্রমোহন রায়-এর কলকাতায় তাঁর কাজে সর্বপ্রধান সহযোগী হরিদাস মিত্র (নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী বেলা মিত্রের স্বামী) এবং তাঁর সহযোগী জ্যোতিশচন্দ্র বসু ও অমৃক সিং-এর বিচারের সময় প্রধান রাজসাক্ষী হয়ে তুহিন মুখার্জী ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকের কাজ করে আই.এন.এ.-র প্রতিনিধিদের ফাঁসীর মঞ্চে তুলে দেয়। অন্যান্যদের মধ্যে লাহোর ফোর্টে মাহেন্দ্র সিংকে নির্যাতনের মধ্যে ব্রিটিশ-ভারতীয় পুলিশ হত্যা করে। কলকাতার রেডিও স্টেশন থেকে বাংলার সে সময়ে গভর্নমেণ্ট জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সতর্ক থাকার ঘোষণা করতেন।—সাবধান বহু জাপানী গুপ্তচর এদেশে ঢুকেছে, তারা নানা কাজের অছিলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ওদিকে আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্রে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ঘোষণায় সমানে বলা হচ্ছিল—আজাদ হিন্দ বাহিনীর লোক নানা প্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ওদের সাহায্য করুন।

১৯৪৪ সালে প্রচার কাজে জটিলতা ও জনযোগাযোগের সুবিধার জন্য সুদক্ষ বেশী লোকের প্রয়োজনের সংবাদ পেয়ে পেনাং শিবির থেকে ১৫ই

ডিসেম্বর ডঃ প্রফুল্লকুমার দত্ত, পাঞ্জাবের আলিবাবা ও আকবর উড়িষ্যার উপকূলে ডুবোজাহাজে পৌঁছান। কটকে ধৃত ডাক্তার দত্তের অন্যতম পাঞ্জাবী মুসলমান সঙ্গী ইংরেজ পুলিশে ধরা না দিয়ে নিরুপায় হয়ে পটাসিয়াম সাইয়ানায়েড বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। আলিপুর জেলে সর্দারা সিং-এর ফাঁসী হয়, আর ঐ জেলে পবিত্রমোহন রায় ও হরিদাস মিত্রের এবং প্রেসিডেন্সী জেলে জ্যোতিশচন্দ্র বসু ও অমৃক সিং-এই চারজনের ফাঁসীর হুকুম হয়। এঁদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ ছিল এঁরা ইংরেজের শত্রু ও আজাদ হিন্দ সরকারের লোক এবং দ্বিতীয় অভিযোগ তাঁরা ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ থেকে উৎখাতের জন্য যুদ্ধের তোড়জোড় করেছিলেন।*

'নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস' পুস্তকে ডঃ পবিত্রমোহন রায় লিখেছেন—
"...সুদূর মালয়ে আজাদ হিন্দ আন্দোলনে ভারতীয়দের মনে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল, তা স্বচক্ষে দেখেছি, দেখেছি আজাদ হিন্দ সৈন্যদের নির্ভীক প্রতিজ্ঞা—দেশকে স্বাধীন করতেই হবে, দেখেছি নেতাজীর একটি আদেশের জন্য ধনিক-বণিক সবাই অপেক্ষা করে আছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এসে সহযোগিতার আশায় এভাবে দরজায় দরজায় ঘুরে ক্লান্ত, অবসন্ন হতে হবে সে কথা কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। সাবমেরিনে চেপে, সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে অনেক স্বপ্ন নিয়ে আমার বাংলাদেশে, আমাদের প্রিয় নেতাজীর দেশে যে এভাবে ব্যর্থ হব, তা কখনও কল্পনাও করিনি। সেই ভদ্রলোক তখনও না আসায় অব্যক্ত এক যন্ত্রণার মধ্যে ছটফট করতে করতে মনে হয়েছিল, পরাধীনতার বেদনা বাঙ্গালীর বুকে এখনও এতটুকু বাজেনি। যাঁরা এখানে নেতাজীর অনুসারী বলে নিজেদের জাহির করেন তাঁরা প্রায় সকলেই কোন না কোন ভাবে নেতাজীর নামের সুযোগটুকুই গ্রহণ করছেন। এক যুগ পর ভারতবর্ষে ফিরে এসে প্রথমে আমার এই তিক্ত করুণ অভিজ্ঞতাই হয়েছিল। ...ভারতের কোটি কোটি মানুষ তখনও জানে না, চিরদিন গর্ব করার মত কি এক ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার নেতাজী তাদের জন্য রেখে যাচ্ছেন।"

---

* হরিদাস মিত্রসহ ৪ জন ফাঁসীর হুকুমপ্রাপ্ত বন্দীদের বিষয়ে শ্রীমতী বেলা মিত্র গান্ধীজীর সঙ্গে বোম্বাই ও পুনায় আলোচনা করেন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনাপতির লালকেল্লায় বিচারে কংগ্রেসের অংশগ্রহণের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে যাওয়ায় (আই.এন.এ. কোর্ট মার্শাল ১৯৪৫-এর ৫ই নভেম্বর আরম্ভ) গান্ধীজীর প্রভাব ও হস্তক্ষেপে ১৯৪৫-এর ৪ঠা নভেম্বর এই ৪ জনের ফাঁসী রদ হয় এবং তার পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে হরিদাস মিত্র পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ডেপুটি স্পীকারের পদ অলংকৃত করেছিলেন।

পরিশিষ্ট—১৫

।। এক নৌবিদ্রোহীর টেস্টামেন্ট ।।

ইং ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমি রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীর (Royal Indian Navy) বয়েজ নেভীতে যোগদান করি। আমার অফিসিয়াল নং ছিল ৩৬১৭০। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কলকাতা থেকে আমাকে করাচীতে পাঠান হয়। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী বোম্বেতে যখন নৌবিদ্রোহ শুরু হয়, তখন করাচীতে অবস্থিত 'হিন্দুস্থান' জাহাজ থেকে ইংরেজ সৈনিকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা জাহাজের কামান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করি। এই নৌবাহিনীর বিদ্রোহ যাকে সাধারণতঃ R.I.N. Mutiny বলা হয়—তার আগেই আমাদের মধ্যে I.N.A. Trial-এর কথা জানতে পেরেছিলাম—আমাদের ইনস্ট্রাকটর মেনন সাহেবের কাছে; আমার বয়স তখন প্রায় ১৫ বৎসর। ইংরেজী ও অঙ্ক শেখাতেন তিনি আমাদের। মেনন সাহেবের হাতে জওহরলাল নেহরুর কাছে আই. এন. এ. ট্রায়ালের কাজ চালাবার জন্য আমরা ৫০০ টাকা দিয়েছিলাম। আমরা বয়েজ নেভীতে ট্রেনিং পিরিয়ডে মাসে ১২ টাকা করে পেতাম—তা থেকে এই পাঁচশ টাকা পণ্ডিত নেহরুর কাছে পাঠাতে পেরে আমরা নিজেদের খুবই ধন্য মনে করেছিলাম। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী আমাদের প্রাণের মধ্যে খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমরা নেতাজীর ছবি, তাঁর আই.এন.এ. এ্যাকটিভিটি জানবার জন্য উদ্বেলিত হয়ে উঠেছি তখন করাচীতে। মেনন সাহেবের কাছে নেতাজীর নাম ও বীরত্ব আমাদের করাচীতে নৌবিদ্রোহে প্রচণ্ড শক্তি ও উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। এছাড়া গান্ধীজী, জিন্নাসাহেব, জওহরলাল, আবুল কালাম আজাদ—এঁদের বিষয়ে যে সব তথ্য আসতো তা আমাদের আনন্দিত করতো। অনেক আশা করতাম বিদ্রোহ করে রয়্যাল নেভীকে জাতীয় নেভীতে পরিণত করে স্বাধীন ভারতের হাতে তুলে দেবো।

বোম্বের ন্যাভাল স্ট্রাইক কমিটির শর্তানুসারে আমরা দাবী করলাম, আই.এন.এ-র কোর্ট মার্শালে সকলকে মুক্তি দিতে হবে। ফিলিপাইনস প্রভৃতি দেশে অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অবিলম্বে ভারতীয় সৈন্য তুলে আনতে হবে, নেভীতে ভারতীয় রেটিংদের সম্মানজনক সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি দিতে হবে।—তা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মানলেন না এবং ব্রিটিশ টমী দিয়ে আমাদের ঘিরে ফেললো, এমন কি রাত্রিতে করাচীর ডক ইয়ার্ডের কাছে সব বাড়ী থেকে লোক সরিয়ে গোপনে কামান-মেশিনগান ফিট করে সকালে সারেণ্ডার করার হুকুম দিল। আমরা সেদিন রাগে দুঃখে বিপ্লবের আবেগে জ্বলে উঠেছিলাম। মরতে আদৌ ভয় হয়নি কারুরই। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা কেউই আমাদের সাহায্যে শেষ মুহূর্তেও এগিয়ে এলেন না। নিজেরাই আমাদের জাহাজে যা সামান্য মেশিনগান, রাইফেল ছিল, (কামানের 'কি'গুলো আগেই ওরা সরিয়ে নিয়েছিল) তারই শেষ

গুলিটি পর্যন্ত ব্যবহার করেছিলাম। ৪০ মিনিট ধরে একটানা ইংরেজ সৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ চলে। একটা খুব মূল্যবান কথা হচ্ছে—কামানে গোলাবর্ষণের আগে ইংরেজের চিরকালের বিশ্বস্ত গুর্খা রেজিমেন্ট, বালুচ রেজিমেন্ট আমাদের হিন্দুস্থান জাহাজের নৌবিদ্রোহীদের ওপর গুলি চালাতে কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল।

আমাদের জাহাজের বহু সৈনিক যুদ্ধে নিহত হলেন, হিন্দুস্থানের ডেক রক্তে ভেসে যেতে লাগলো, ভাটার টানে আমাদের জাহাজ কাত হয়ে পড়লো এবং কামানের গোলায় জাহাজে আগুন ধরলো। আমাদের রাইফেল-মেশিনগানের গুলি নিঃশেষ হয়ে গেলে—ন্যাভাল ব্যাটারীর গোলার সামনে অন্য জাহাজ থেকে সাহায্য এসে পৌঁছানো হয়ে উঠলো না। আমরা আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হলাম। জীবিত ও আহত সকলকে গ্রেপ্তার করে করাচীর উত্তর প্রান্তে মালির Concentration Camp-এ নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা জানতাম আমাদের অনেকেরই Court Martial হবে। কিন্তু তখনো আমরা মনোবল হারাইনি।

সেদিনের সে R.I.N. Mutiny ছিল ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, সত্যই অতুলনীয়। সর্বপ্রকার আত্মত্যাগের মাধমে, সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে অমিত বিক্রমে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল ভারতীয় নৌ-সৈনিকরা—যা ছিল শৌর্যে ও দৃঢ়তায় অসামান্য। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ষড়যন্ত্রের ফলে তাহা এক হতাশাময় দুর্ভাগ্যে পরিণত হয়। আজ যখন ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহের শহীদদের আত্মা শুনতে পায় ভারতের স্বাধীনতা আনলো কে? 'কংগ্রেস, একমাত্র কংগ্রেস'—তখন তাহাদের মৃত আত্মা অট্টহাস্য করে ওঠে। যাহাদের বুকের রক্তে আরব সাগরের লবণাক্ত নীল জলরাশি লালে লাল হয়ে গেল, যাহাদের প্রতিটি গোলার আঘাতে ব্রিটিশ শাসকদের বনিয়াদ গেল ভেঙে, যাহাদের আত্মাহুতিতে ভারতের স্বাধীনতাকে করলো ত্বরান্বিত, ব্রিটিশ শাসকদের করলো বিচলিত—আজ তারাই স্বাধীনতার সংগ্রামে অনুল্লেখ্য। আজাদ হিন্দ ও নৌবিদ্রোহীদের অনেকে পাকিস্তানের স্থল ও নৌবাহিনীতে যোগদান করে উচ্চপদে উন্নীত হয়েছেন, কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে তাঁরা কেউ কেউ দোকানপাট, ক্যানটিন, ড্রাইভারী করেন, যুদ্ধ বিভাগে স্থান দেওয়া হয়নি। তাই সেই কলঙ্কময় বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেস সরকারের নিকট স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে Pension চাইতে আমি বিবেকের দংশন অনুভব করি। তাই আমি সরকারের নিকট Pension-এর আবেদন জানাইনি, জানাবো না।

শুধু ঐতিহাসিক, গবেষক এবং ন্যায়নিষ্ঠ দেশবাসী এবং তরুণ সমাজের নিকট আবেদন—সত্য এবং ইতিহাসের পথ থেকে বিচ্যুত হবেন না, স্বাধীনতার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করুন, আমাদের দেশ যেন বড় হয়। জয় হিন্দ।

সুনীল ব্যানার্জী : নৌবিদ্রোহী, ১৯৪৬
No 36170 Jellico Division : H.M.I.S. Bahadur (Karachi)
Present Address : 39/1, Bose Para Road : P.O. Barisha (Behala)

পরিশিষ্ট—১৬

।। পঞ্চাশের মন্বন্তরে নেতাজীর ভূমিকা ও ব্রিটিশ নিষ্ঠুরতা ।।

(ব্রিটিশ ওয়ার ক্যাবিনেট-এর গোপন দলিলভুক্ত)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার দুর্ভিক্ষে (বাংলা সন ১৩৫০ ইংরেজী ১৯৪৩-৪৪) বিভিন্ন হিসেব অনুযায়ী ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ বাঙালীর নিষ্ঠুর প্রাণবলি হয়েছিল। এ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছিল—যা মানব ইতিহাসে ইংরেজ শাসকগণের এক অমার্জনীয় অপরাধের কলঙ্কিত রূপ। ঐ দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যে প্রয়াস—সে বিষয়ে নথিপত্র ব্রিটিশ যুদ্ধবিভাগ ত্রিশ বৎসরকাল বিশ্ববাসীর নিকট থেকে লণ্ডনে গোপন রেখেছিল। ব্রিটিশ 'ওয়ার ক্যাবিনেট' কি ভাবে ঐ সময় নেতাজীর সাহায্য প্রেরণের সমস্ত প্রস্তাবকে বারে বারে প্রত্যাখ্যান করে পৌনে এককোটী মানুষকে ক্ষুধার জ্বালায় পথে-ঘাটে-রাজপথে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করেছিল—সে-তথ্য ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর অংশীদার—কানাডার পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক রিচার্ড স্টিভেনসন তাঁর 'BENGAL TIGER AND BRITISH LION—AN ACCOUNT OF THE BENGAL FAMINE OF 1943'—পুস্তকে প্রকাশ করেছেন। সঙ্গেসঙ্গে নেতাজীর ব্রিটিশ-ভারতের পথে ঐতিহাসিক অভিযানের ভয়ে একদিকে বাংলাকে পরিপূর্ণ রিক্ত, নিষ্প্রাণ করে তার সমূহ খাদ্য সম্ভার মিলিটারীর জন্য গুদামজাত করেছিল ব্রিটিশ যুদ্ধবিভাগ, আর নেতাজীর মহাপ্রাণতাকে তাঁর দেশবাসীর নিকট শুধু নয়, সমগ্র পৃথিবীর নিকট সুকৌশলে গোপন করেছিল। বাংলা-আসাম খণ্ডে তখন ভারতের চাল গমজাত খাদ্যবস্তু যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও ১৮ মাসব্যাপী নব্বই হাজার গ্রামে দুর্ভিক্ষের মারণযজ্ঞে ঐ পৌনে এক কোটী বাঙালী পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিল। গান্ধী-নেহরু প্রভৃতি ভারতের কোন নেতাই এই দুর্ভিক্ষ ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কুকীর্তির বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি—পরবর্তীকালেও না। ভারত ভাগ বা স্বাধীনতার ইতিহাসে শত সহস্র পৃষ্ঠার মধ্যে বাংলার মহাতঙ্ক এই দুর্ভিক্ষ বিষয়ে দু-একটি বাক্যের স্থান হয়েছে কিনা সন্দেহ—এই সমূহ বিষয়ই রিচার্ড স্টিভেনসন নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন ঃ

'According to no less an authority than Lord Linlithgow himself, the loss of the Burma rice supply after the conquest of Burma by the Japanese had only a minor effect on the subsequent rice shortage in Bengal. In any event, the rice in Burma was controlled by Subhas Chandra Bose and shipment of rice from Burma to alleviate the famine conditions had been offered. The offer, kept secret by the British, appears in an annex to a War Cabinet Document.

'It is reported that the Indian Independence League at Bangkok has decided to enlist the help of Japan, Thailand and Burma to export rice to India and thus improve the food situation. Though it is normally impossible to send rice to India from Japanese occupied territory, the League is prepared to do so if the British Government approves the proposal and gives an undertaking that the food so sent will not be reserved for military consumption or exported from India. The gesture of the League is expressive of the sympathy of Indians in East Asia and their desire to relieve the suffering of their Indian brethren. If the British do not accept this generous offer they will be betraying their true intentions.' (Broadcast from Germany, August 14, 1943)—Vol-IV : 'The Transfer of Power' p. 273.

'If the offer was not genuine it would have been extremely easy for the British to call Bose's bluff. On the other hand, if the offer was genuine the undoubted propaganda advantage to be gained by the Indian Independence League could have been countered by handling the food shipments under neutral auspices, such as those of the Red Cross.

'However, the British most definitely did not want help from abroad. The Canadian Prime Minister Mr. Mackenzie King offered to send a ship-load of wheat as a gift from Canada. The offer was most unwelcome and was stone-walled by Churchill himself on the grounds that the diversion of a ship-loaded with grain would upset the careful logistical planning that was going into the War effort.' Vol-IV : p 366 : 'The Transfer of Power'

ভাবানুবাদ :

অন্য কেউ নয়, স্বয়ং লর্ড লিনলিথগো-র (বড়লাট) মতে জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকারের পর ব্রহ্মদেশ থেকে চাল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলায় চাল ঘাটতিতে তার খুব সামান্য প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। যে অবস্থাই হোক,ব্রহ্মদেশের চাল তখন সুভাষচন্দ্র বোসের কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে, এবং বাংলার দুর্ভিক্ষ লাঘব করতে তিনি জাহাজ জাহাজ চাল বাংলায় পাঠাবার প্রস্তাব দেন। তাঁর এই প্রস্তাব বিষয়ে কাগজপত্র অতি গুপ্তভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চেপে রেখেছিল, যা তাদের ওয়ার ক্যাবিনেট বা যুদ্ধ বিভাগীয় দপ্তরের একটি দলিলে সংযুক্ত ছিল। প্রকাশ পেয়েছে যে, ব্যাঙ্ককে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ ভারতে চাল সরবরাহ করে খাদ্যসঙ্কট দূর করতে জাপান, থাইল্যাণ্ড এবং

ব্রহ্মদেশ থেকে চাল সাহায্য সংগ্রহ করেছে। যদিও সাধারণ অবস্থায় জাপান-অধিকৃত দেশ থেকে ভারতে চাল পাঠানো অসম্ভব, তথাপি স্বাধীনতা সংঘ তা করতে প্রস্তুত এই শর্তে যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সে প্রস্তাব মেনে নিয়ে অঙ্গীকার করবে যে, ঐ খাদ্যবস্তু মিলিটারীর কাজে খরচ করা হবে না এবং ভারতের বাইরে রপ্তানী করা হবে না। সংঘের এই কাজ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় প্রবাসীগণের তাঁদের স্বদেশবাসী ভারতীয় ভাই-বোনেদের দুর্গতি লাঘব করার জন্য সহানুভূতির একটা প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত। যদি ব্রিটিশপক্ষ এই মহৎ প্রস্তাব গ্রহণ না করে তাহলে তারা তাদের সৎ অভিপ্রায়ের প্রতি নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করবে। (জার্মানী হ'তে বেতার ভাষণ, ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৩)।

যদি প্রস্তাব সত্য না হয়, ব্রিটিশের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের এই বক্তব্যকে একটা ধাপ্পা বলে চালানো চূড়ান্তভাবে সহজ হবে। আর যদি তাঁর জাহাজ বোঝাই চাল সাপ্লাই-এর অফার বা প্রস্তাব সত্য হয়, তাহলে ইণ্ডিয়ান ইনডিপেণ্ডেন্স লীগ বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ তাঁদের ঐ প্রচার সুযোগের জন্য যে নিঃসন্দেহে সুফল লাভ করবে সে সুবিধালাভকে নিষ্ফল করে দেওয়া যাবে ঐ খাদ্য সম্ভার বোঝাই জাহাজগুলোকে নিরপেক্ষ রেডক্রস প্রভৃতি দেশ বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালনা করে। (৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩—'ক্ষমতা হস্তান্তর')

যাই হোক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, সুনির্দিষ্টভাবেই বলা যায়, বাইরের থেকে পঞ্চাশের মন্বন্তরে সাহায্য সম্ভার আসতে দেননি, তবু কানাডার প্রধানমন্ত্রী ম্যাকেনজিস কিং কানাডা থেকে জাহাজ ভর্তি গম বাংলার দুর্ভিক্ষে উপহার দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই অনুদান অত্যন্ত অনভিপ্রেত ছিল ইংরেজের কাছে এবং স্বয়ং চার্চিল নিজেই তা বাতিল করে দিয়েছিলেন এই অজুহাতে যে, খাদ্য-সামগ্রীর জাহাজ যুদ্ধ পরিকল্পনায় সমুদ্রে যুদ্ধসামগ্রী যথাযথ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বানচাল করতে পারে। [রিচার্ড স্টিভেনসান: বেঙ্গল টাইগার এ্যাণ্ড ব্রিটিশ লায়ন—এ্যান্ এ্যাকাউন্ট্ অব্ দ্য বেঙ্গল ফেমিন্ অব্ নাইন্‌টিন ফরটি-থ্রি : পৃষ্ঠা ১২৪-১২৫]

"In Bengal and Assam there was a large surplus of food available for the military. Some of this was shipped abroad, but most of it was taken up by the extremely large army that had been recruited to fight the Japanese. It has been suggested, although not proved, that a 'Scarcity' in the mofussil was desired by the military for recruiting purposes. With respect to food purchases, Mr. Nalini Ranjan Sarkar, who was the Commerce Member of the Viceroy's Executive Council, and a Director of several industrial and financial concerns, said on September 7, 1942 :

'Large-scale purchases are made on behalf of the Army for

the increasing requirements of our Defence Forces. We have also to meet certain demands in respect of our neighbouring countries like Ceylone whose stability is essential to the defence of the country ··· Provincial and State Governments have to build up strategic reserves as a safeguard against emergency conditions.' (K. C. Ghosh, FAMINES IN BENGAL—1770-1943 INDIA)"—Stevenson—p. 126.

ESTIMATE OF DEATH TOLL IN BENGAL FAMINE 1943

"Individual observers always felt that the death toll was greatest in the areas they had seen. Thus K. C. Ghosh* feels that mortality was highest in the 24 Parganas and Midnapore Districts. Bishop Blair feels that there were more deaths in East Bengal, where he lived during the time. But it appears that high rates of mortality were uniform over the whole province ···

"Estimate of the number who died from starvation and from disease related to the Famine are not particularly rewarding or informative. It is sufficiently dreadful that one individual should die from starvation. The estimate of the (1) Famine Inquiry Commission was that the excess mortality in Bengal was approximately 1·5 million. ('Excess mortality' is an interesting concept when applied to a population which is normally on the verge of starvation. It is defined as being the difference between (: 3) actual mortality, meaning this year's guess, and normal mortality, last year's guess) (2) A statistical survey carried out by members of Calcutta University suggested that total mortality (not 'excess') in 1943 was 3·5 million. (3) K. C. Ghosh was of the opinion that the death roll of the Famine was 6 million. (4) Communist party sources in Bengal seem to prefer the figure of 12 million.

* জনসাধারণের নিকট প্রাপ্ত নথিপত্র ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য ছাড়াও কে. সি. ঘোষ বহু পরিবারে নিজে অনুসন্ধানের পর তাঁর 'ফেমিনস ইন বেঙ্গল ১৭৭০-১৯৪৩ ইণ্ডিয়া' বই-এর নিখুঁত পাণ্ডুলিপি সঙ্কলন করেন। কিন্তু পুলিশ সে পাণ্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করে এবং বই প্রকাশ ৬ মাস নিষিদ্ধ থাকে। তাঁর সংগৃহীত তথ্যাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নির্ভুল প্রমাণিত হওয়ায় পঞ্চাশের মন্বন্তর পুলিশের এক্তিয়ার থেকে মুক্তি লাভ করে। তিনিই এবিষয়ে পথিকৃৎ।

(5) Census statistics showing the growth of population from 1900 to 1961 have a sharp dip in the curve for the mid 1940's and support an estimate that by 1951, there were approximately 9 million in spite of a vast increase in the birthrate after the War.

"The Famine lasted for 18 months, and took place mainly in the 90,000 villages of the mofussil. The average population of a village was about 650 soul, and about 60% of them were 'at risk' in the sense that they had little or no assets to see them through the hyperinflation. If we guess that one person per week per village died as a result of the famine, the cumulative death toll is sligtly over 7 million. It is known that during the Famine death did not just nibble away at the villages, it usually swept away the whole population...."

—Stevenson—pp. 149-150

"K. C. Ghosh is of the opinion that the Indian leaders of the time were completely duped by the British. Subhas Chandra Bose, in his offer to supply Burmese rice, appears to have been the only Indian of any political or public importance to take note, (other than those politicians tolerated by the British). Neither Gandhi nor Nehru nor any of the other Congress leaders made any statements about the Famine at that time or later. The Famine plays a negligible role in Indian historical opinion receiving a sentence of description for each hundred pages about Independence or Partition."

—Stevenson—p. 171

ভাবানুবাদ :

বাংলা ও আসামে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত খাদ্য-শস্য তখন মজুত ছিল এবং মিলিটারীর জন্য তা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তার কিছু কিছু বিদেশেও জাহাজে করে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু এর বেশীর ভাগই বিশাল আয়তন মিলিটারীর জন্য খরচ করা হয়—যে মিলিটারীর জাপানী সৈন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা। প্রমাণ না দিতে পারলেও এটা বলা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে 'খাদ্যাভাব' সৃষ্টি করা যুদ্ধ বিভাগের অভিপ্রায় ছিল, যাতে করে ক্ষুধার্ত মানুষ সৈন্যবিভাগে নাম লেখাতে বাধ্য হয়।

বাজার থেকে খাদ্যদ্রব্য কিনে নেওয়া সম্পর্কে ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য এবং কতিপয় শিল্প ও অর্থনৈতিক সংস্থার তদানীন্তন ডাইরেক্টর মিস্টার নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯৪২-এর ৭ই সেপ্টেম্বর বলেন —আমাদের ক্রমবর্ধমান ডিফেন্স ফোর্স (সৈন্যবাহিনী)-এর জন্য স্থলবাহিনীর

পক্ষে বিরাট বিরাট পরিমাণ কেনা-কাটা করা হয়। দেশের প্রতিরক্ষার জন্য, প্রতিবেশী দেশগুলোর যেমন—সিংহলের শক্তি ও স্থিতি বজায় রাখা যা ছিল আমাদের পক্ষে অপরিহার্য, সে চাহিদাও মেটাতে হয় ···, প্রদেশ ও রাষ্ট্রীয় সরকারকে জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্য এই সামরিক উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হয়। [কে. সি. ঘোষ : ফেমিনস ইন বেঙ্গল—১৭৭০-১৯৪৩ ইণ্ডিয়া]

১৯৪৩-এর বাংলার দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হিসেব

পর্যবেক্ষকগণ সব সময়ই মনে করেছেন যে, তাঁদের দেখা অঞ্চলগুলোতে মৃত্যুর হার সর্বাধিক। এইভাবে কে. সি. ঘোষ মনে করেন ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলায় দুর্ভিক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক মানুষের মৃত্যু হয়। বিশপ ব্লেয়ার যিনি সেই সময় পূর্ববঙ্গে বাস করেছিলেন, তাঁর মতে ওখানে মৃতের সংখ্যা অধিকতর। কিন্তু প্রতীয়মান হয়—সমগ্র প্রদেশেই মৃত্যুর উচ্চ সংখ্যা প্রায় একই ধরনের।

অনাহার এবং রোগ দুর্ভিক্ষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ; তা থেকে শুধু অনাহারে মৃত্যু সংখ্যা নিরূপণ খুব সুবিধাজনক নয়। এইটেই ভয়ঙ্কর কথা যে শুধু না খেতে পেয়ে একজনও মানুষ মৃত্যুকে বরণ করে। (১) দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন বলেছেন বাংলায় দুর্ভিক্ষে মোটামুটি ১৫ লক্ষ প্রাণ গিয়েছে। (২) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান জরিপ অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ। (৩) কে. সি. ঘোষের বিশ্লেষণে এই সংখ্যা ৬০ লক্ষ। (৪) বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টির বক্তব্য—বাংলায় এই দুর্ভিক্ষে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের প্রাণবলি হয়। (৫) ভারতীয় সেন্সাস স্ট্যাটিসটিক্স বা লোক গণনা বিভাগের হিসেবের যে প্রক্রিয়া তাতে দেখা যায় ১৯০০ থেকে ১৯৬১ সালের 'গ্রাফ' অনুযায়ী হঠাৎ ১৯৪০ থেকে ১৯৫১ এই দশকের জন সংখ্যার সাধারণ ঊর্ধ্বগতি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে বাংলায়। এই প্রদেশে মোটামুটি ৯০ লক্ষ জন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

দুর্ভিক্ষ ১৮ মাস কাল তার বিভীষিকার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল বাংলার প্রধানত ৯০ হাজার গ্রামে। প্রতি গ্রামের গড় লোক সংখ্যা ছিল ৬৫০ জন এবং তাদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ 'বিপজ্জনক অবস্থায়' অর্থাৎ তাদের অতি নগণ্য বা প্রায় কিছুই সম্পদ ছিল না, যার সাহায্যে এ আতঙ্কজনক অবস্থাকে অতিক্রম করতে পারে। আমরা যদি ধারণা করে নিই, প্রতি সপ্তাহে প্রতি গ্রামে একজন করেও মানুষ ঐ দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়, তাহলে মোট প্রাণনাশের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০ লক্ষের কিছু বেশী। এটা জ্ঞাত যে, ঐ দুর্ভিক্ষের সময় মৃত্যু শুধু গ্রামাঞ্চলেই একটু একটু করে তার কামড় বসিয়ে যায়নি. সমগ্র জনসাধারণের ওপর দিয়েই দ্রুতবেগে ধ্বংসের আঘাত করে গিয়েছে। অতএব এটা বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায়, যে প্রত্যেকে, এমন কি কম্যুনিস্টগণও, ঐ দুর্ভিক্ষে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে প্রকৃত মূল্যায়ন অপেক্ষা কম করেই দেখিয়েছেন। [স্টিভেনসন—পৃষ্ঠা-১৪৯-১৫০]

কে. সি. ঘোষ মনে করেন তদানীন্তন ভারতীয় নেতৃবর্গ ব্রিটিশ কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র বোস তাঁর প্রস্তাবিত বর্মা-চাউল সাপ্লায়ের অফারের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছেন যে, উল্লেখযোগ্য ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একক তিনিই জন-চক্ষে অবিসংবাদিত ভারতীয় ব্যক্তিত্ব যাঁকে পরমতম শত্রুও অবহেলা বা প্রতারিত করতে পারেনি। গান্ধীও নন, নেহরুও নন অথবা কংগ্রেসের অন্য কোন নেতারা বাংলার এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সেই সময় অথবা পরে কখনো কোন বক্তব্য রাখেননি। স্বাধীনতা বা ভারত ভাগের শত-সহস্র পৃষ্ঠার রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতায় এই দুর্ভিক্ষ অতি নগণ্যতম গুরুত্বও লাভ করেনি!

[স্টিভেনসন—পৃষ্ঠা-১৭১]

পরিশিষ্ট—১৭

।। শৌলমারীর সাধু সারদানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ।।

আজ থেকে ২৮ বছর আগে এক সবল দেহ স্পষ্টভাষী প্রৌঢ় সন্ন্যাসী এই বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে কুচবিহারে ফলাকাটা থানার শৌলমারী গ্রামে এসে স্থানীয় চিকিৎসক শ্রীরমণীমোহন দাসের কাছে হঠাৎ আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের কাহিনী ধীরে ধীরে এমন পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে যে, 'সুভাষবাদী জনতা' নামে এক সংগঠন বলিষ্ঠ ভাব-ভাষায় লেখা ও বক্তৃতায় শৌলমারী আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ সারদানন্দজীকেই ছদ্মবেশী নেতাজী নামে আখ্যাত করেন। ১৯২৮-এর বিস্ময় সৃষ্টিকারী সুভাষচন্দ্রের ভলান্টিয়ার বাহিনীর মেজর সত্য গুপ্ত জনসাধারণের নিকট এই ঘটনার প্রথম পরিবেশক। কে এই সাধু! পণ্ডিচেরী আশ্রমের এক সময়ের আশ্রমিক, ডক্টর গোপগুরু বক্‌স, যিনি শৌলমারী আশ্রমে প্রায় তিন বৎসর কাল প্রধান কর্মকর্তার পদে কর্মরত ছিলেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ৪৫-এর বিমান দুর্ঘটনায় কিছুতেই নেতাজীর মৃত্যু হয়নি এবং শৌলমারীর সাধু সারদানন্দজী-ই নেতাজী। অথচ আশ্রম কর্তৃপক্ষ পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন—আশ্রম-সাধু নেতাজী নন। কে এই সন্ন্যাসী, কি-ই বা তাঁর সাধনার বিষয়, কি তাঁর পূর্ব-জীবনের পরিচয়—সে বিষয়ে রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার একেবারেই নির্বাক।

এই পটভূমিকায় একদিন অনেক আশা নিয়েই পাড়ি দিলুম শৌলমারীর পথে। শিলিগুড়ি রেল স্টেশন হয়ে 'ডুয়ার্স কুইন' বাসে একশ দশ মাইল উত্তর-পূর্ব প্রান্তে কুচবিহারের ফলাকাটা ও জলপাইগুড়ির মাথাভাঙা থানার সীমানায় শৌলমারী আশ্রম। ১৯৬৪ সালের ৭ই জুন সকাল এগারোটায়

ফলাকাটা বাজারে বাস থেকে নেমে রিক্সা সম্বল করে আধ ক্রোশ দূরের আশ্রমের সীমানায় হাজির হলুম। সেখানে যানবাহনের প্রবেশ নিষেধ। নিজের কাঁধেই হোল্ড-অল নিয়ে আশ্রমের অফিসে পৌঁছলুম। সূর্য তখন পুরোপুরি মাথার ওপর। অফিস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি অতিথি অতএব আইন বহির্ভূত হলেও অফিস কক্ষে আমার প্রবেশাধিকার মিললো। চারপাশ খুবই পরিচ্ছন্ন, ফুল-পাতাবাহার, আম-কাঁঠালের গাছ-গাছড়ায় সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এই আশ্রম। সেখানে কৃষক-শ্রমিক, শিশু-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, গরু-বাছুর, কৃষিকাজ এবং লেখাপড়া ইত্যাদি নিয়ে এই আশ্রম রাজ্য। অনতিদূরে গ্রাম, চা-বাগান, পথ, হাট-বাজার। 'হোলি ফাদার' সারদানন্দের সাক্ষাৎলাভের জন্য নিজ নিজ ফটোসহ আবেদনপত্র পাঠানোর সাধারণ কোন ব্যবস্থা আমি করিনি বলে আমার পক্ষে 'দর্শন' লাভ নাকি অসম্ভব। সুতরাং আমাকে বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। শুধু আমার মত সাধারণ ব্যক্তিই নয়, বহু বিখ্যাত ব্যক্তিরাও—যেমন মন্ত্রী, দেশনেতা থেকে আরম্ভ করে বসু পরিবারের ব্যক্তিদের ভাগ্যেও 'হোলি ফাদারের' দর্শন লাভের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আমার ক্ষুব্ধ চিত্তে প্রচণ্ড উত্তেজনা অনুভব করলুম। অফিসের কর্মীদের সঙ্গে কিছুটা বচসাও করলুম—যাতে আমার সম্পর্কে তাঁরা নিজেরা কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে স্বয়ং হোলি ফাদার কিংবা নিদেনপক্ষে তাঁর সচিবের হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দেন। ফল ফলতে দেরী হলো না। পরিচয়পত্র দানের পর সচিব মশায়ের পক্ষ থেকে উত্তর এলো, "বাবা" এখন 'মেডিটেশনে' (ধ্যানস্থ) আছেন। অতএব নীরব প্রত্যাবর্তন ছাড়া আর কি হতে পারে!

"বাবা আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়েছেন, এক্ষুণি আপনি দর্শন পেয়ে যাবেন,—আপনার পরম সৌভাগ্য"—জনৈক আশ্রমবাসীর এই আচম্বিত উক্তিতে অফিস ঘর থেকে বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে পড়লুম। বেশ কয়েক বিঘা পেরিয়ে আশ্রমের সীমানা ছাড়িয়ে রাজপথে পৌঁছতে গিয়ে চলার গতি ঘণ্টায় ছ' মাইল হয়ে দাঁড়ালো। দেখলুম, একজন ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্ক সাধু একটি শিরিষ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। উচ্চতায় সাড়ে পাঁচ ফিটের মত, পাকা চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাথায় ছাতা, হাতে একটি ডালডা টিনের বালতি, এক বগলে দলিল-দস্তাবেজের মত খবরের কাগজে মোড়া কোন বস্তু। পরনে হালকা গেরুয়া আর সাদা ফতুয়া—একধার দিয়ে সেলাই করা। কোমরে ফিতার দড়ি, পায়ে কালো ক্যাম্বিসের জুতো, হাতে ক্যাপস্টান সিগারেট। নত মস্তকে নমস্কার জানালুম। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন,—কে আপনি? এখানে কেন? সবিনয়ে জানালুম—'আশ্রম দেখার জন্যেই এসেছি। আমার বহুদিনের ইচ্ছা।'

প্রশ্ন—'শুধুই আশ্রম দেখতে? সত্য করে বলুন, অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই আপনার?'

উত্তরে সত্য উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করলুম এবার,—'শৌলমারী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ সারদানন্দই নাকি স্বয়ং নেতাজী—এই প্রচারের সত্যতা যাচাই করা। তাই আপনাকে দর্শন করার প্রবল ইচ্ছা নিয়েই এসেছি।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দুটো বেশ বড়ো বড়ো ধুনুচি এলো। তাতে মুঠো মুঠো ধুনো দেওয়া হচ্ছে আর ক্যাপস্টান সিগারেটের শেষ টুকরোগুলো সারদানন্দজীর হাত থেকে ধুনুচির মধ্যে মিলিয়ে যাবার আগেই তিনি আর একটি, তারপর আর একটি করে সিগারেট টেনে চলেছেন। রাজপথে ভীড় ঘন হয়ে উঠেছে, আশ্রমিক স্ত্রী-পুরুষ বহুজনের সজল চোখে আবেদন বাবার পায়ের তলায়—'ফিরে চলুন।' পাশে দাঁড়িয়ে আশ্রমের 'ফাউণ্ডার সেক্রেটারী' ছোটখাটো চেহারার খদ্দর পরিহিত ডাক্তার রমণীমোহন দাস,—তাঁরও চোখে জল। আর এক দিকে ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী দেবেন্দ্রনাথ ভৌমিক, পরাধীন ভারতের এককালে অনুশীলন দলের স্বেচ্ছাসেবক। পথচারী, গাড়ির চালক, বালক, বৃদ্ধ, গ্রামবাসী সকলে ব্যথিত চিত্তে শিরিষ গাছের তলায় 'বাবাকে' ঘিরে দাঁড়িয়ে। প্রায় একঘণ্টা কালব্যাপী আমার সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যেই একটি চেয়ার সেখানে এলো, সঙ্গে পাখা ও জলের ঘটি—আশ্রমের নির্দিষ্ট স্ত্রী-পুরুষদের মাত্র যা স্পর্শ করবার অধিকার! সারদানন্দজী উপবেশন করলেন। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টাকালে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে প্রায় শতাধিক প্রশ্নোত্তর। আশ্রমিকদের উদ্দেশ্যে তাঁর উক্তি—"আমার পথ রোধ করো না তোমরা। এইটুকু 'কমনসেন্স' যখন তোমাদের 'ডেভেলপ' করলো না, আমাকে নিয়ে কি হবে তোমাদের। আমাকে শতাধিক মাইল পথ যেতে হবে কোন পাহাড়ে অথবা নদীর পথে। পথ ছেড়ে দাও, আমার বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। তবে পনের দিনের মধ্যেই আমার সংবাদ পাবে—কোথায় আছি।"

সাধুজী আমাকে বললেন, "কেন তোমাদের এই ভ্রান্তি ? কি দুঃখের কথা, কি বেদনার কথা! আশ্রম থেকে পুনঃপুনঃ ঘোষণা সত্ত্বেও কেন তোমাদের এই বিভ্রান্তি।"

উত্তর আমারও প্রস্তুত ছিল। বহুজনের বহু উক্তি—বিশেষ করে তাঁরই প্রাক্তন প্রধান কর্মসচিব ডঃ গোপগুরু বক্সের কথা, মেজর সত্যগুপ্তের কথা, 'ডাক' ও 'জাগৃহি' পত্রিকার কথা উল্লেখ করলুম আমি। সাধুজী বললেন, "বিবেকানন্দের কথায়ই বলি,—'It is not the multitude, but the individual that counts' " অন্যান্য ব্যক্তিদের যেমন—বিশ্বজিৎ দত্ত, ডঃ গোপগুরু বক্স প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "ওরা সব সরকারী গোয়েন্দা এবং অতি বেদনার কথা যে, সরকারী অর্থে তিন তিনজন গোয়েন্দা ফলাকাটায় শুধু আমার জন্য নিযুক্ত। অথচ দেশের কি দুরবস্থা।" ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভও এর পেছনে সক্রিয় বলে তাঁর ধারণা। তিনি জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, আমাকে নেতাজী বলে সন্দেহ করার কারণ কি তোমাদের ?'

উত্তরে জানালুম, ছাত্রজীবনে নেতাজীর সন্ন্যাসী হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় গৃহত্যাগ, মায়ের কাছে পত্রাবলীতে গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসের পরিচয়, এমনকি কোহিমার রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও যাঁর ব্যাগের ভেতর তুলসীর মালা ও ক্ষুদ্রাকৃতি গীতা পাওয়া যায়, উত্তরজীবনে সেই সুভাষচন্দ্রের মহৎ ধর্মগুরুরূপে প্রকাশের

মধ্যে অপ্রাকৃত কিছু দেখি না। বিশেষ করে অগ্নিযুগের মহীয়ান অরবিন্দ ঘোষ যখন মহান ঋষি হয়ে ওঠেন, তখন দুর্জয় গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়ে ঘর ছাড়ার সেই সঙ্গীন মুহূর্তে স্বগৃহে, গলিতে, রাজপথে, ব্রিটিশ গোয়েন্দা ও পুলিশ পরিবৃত হয়েও দক্ষিণেশ্বরের মহাশক্তির আশীর্বাদী ফুল সংগ্রহ করেন অতি স্থিরচিত্তে। গীতার কর্মযোগের শ্লোক পাঠ করতে সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণেও যাঁর অন্তরলোক স্থির ও অচঞ্চল থাকে, কালের আবর্তনে তাঁর মত অধ্যাত্মবাদীর পক্ষে সন্ন্যাসী-ঋষিরূপে প্রকাশের মধ্যে বিস্ময় কোথায়!

আমার এই কথায় সারদানন্দজী মাথা দুলিয়ে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে ওঠেন, "অরবিন্দের কথা আলাদা, কিন্তু পঞ্চাশ বছর বয়সে যাঁর বিবাহের প্রয়োজন হয়—তাঁকে ধর্মগুরুর আসন দিতে পারি না।" নেতাজীর বিবাহ-বিষয় এখনও অনৈতিহাসিক এবং অসমর্থিত বলে মৃদু প্রতিবাদ করলুম।

এদিকে দর্শকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ প্রখর তেজ নিয়ে আমার ওপর যেন বহ্নিজ্বালা সৃষ্টি করছে। কিন্তু আমার মানসলোকে তার চেয়েও প্রবল উত্তেজনা। চোখের ও মনের সকল অনুভূতি একত্রীভূত করে দণ্ডায়মান সাধুর প্রতি আমি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছি।

"আরও শুনবে?" সাধুজী বলে চলেন, "দিল্লী থেকে এক সর্বভারতীয় নেতা আশ্রমে অতিথি হয়ে আসেন। আমি নেতাজী, এই স্বীকারোক্তিতে আমাকে নগদ এক কোটি টাকা এবং এই মর্মে দলিলে স্বাক্ষর করলে পুনরায় ন' কোটি টাকা তাঁরা দিতে প্রস্তুত"—অর্থাৎ নেতাজী বলে স্বীকৃতি দিলে এবং আশ্রমের বাইরে কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোন কাজ-কর্মে যোগ না রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বাক্ষর করলে এই অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থ দেবার ব্যবস্থা তাঁরা করতে প্রস্তুত। শুনে আমার সমস্ত বাকশক্তি রহিত প্রায়। স্তব্ধ হয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মনে হল তাঁকে। ঈষৎ রক্তিম চোখের চাহনি বহুদূরে স্থির। প্রশ্ন করলুম, "এই ভয়ঙ্কর প্রস্তাবের গূঢ় উদ্দেশ্য কি?"

উত্তর করলেন, তাঁর 'এ্যাসোসিয়েট'দের অনেকের এই ধারণা যে, নেতাজী হয়তো জীবিত। কিন্তু যদি শৌলমারীর সাধুর লিখিত স্বীকারোক্তি দেশবাসীর সামনে রাখা যায়, আর নেতাজীর সত্যকার একদিন আবির্ভাব ঘটে, তাঁকে (নেতাজীকে) তখন 'ইম্‌পস্টার (প্রতারক) রূপে ঘোষণা করার আইনগত সুবিধা হবে।

আমি অস্থির হয়ে উঠলুম, কি ভয়ঙ্কর কথা! "এই দেখ, এই, এই—আমার সঙ্গে নেতাজীর কোন মিল খুঁজে পাচ্ছো তুমি?" দাড়ি তুলে, মাথায় হাত দিয়ে, পেছন ঘুরে তিনি নিজেকে দেখাতে লাগলেন। বহু দর্শক মন্ত্রমুগ্ধের মত আমাদের কথোপকথন ও এই দৃশ্যের দর্শক ও শ্রোতা। আলিপুরদুয়ারের কোন এক ভট্টাচার্য কর্তৃক নেতাজীর ছবিতে দাড়ি-গোঁফ এঁকে শৌলমারীর সাধুকে নেতাজীরূপে প্রচার করে অর্থ রোজগারের হীন অপচেষ্টার কাহিনী শুনিয়ে তিনি বলে চললেন, "আমি তোমাকে বলছি,

আমি সুভাষচন্দ্র বসু নই। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, পদ্মার পূর্বতীরে আমার জন্মস্থান—এ আমার পরিচয়।"

সারদানন্দজীর প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতি অঙ্গভঙ্গি আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে লাগলুম, আর মনে পড়লো কলকাতার খবরের কাগজে সবল দেহ, দীর্ঘায়িত ললাট বিশিস্ট শৌলমারী সাধুরূপে নেতাজীর একটি প্রতিকৃতি প্রকাশের কথা—যার ফলে পুলিশ বিভাগীয় সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিরা শৌলমারী ধাওয়া করেছিলেন। সে অবশ্য কয়েক বৎসর পূর্বেরই কথা। ইতিমধ্যে ধুনুচিতে মুঠো মুঠো ধুনো দেওয়া চলেছে, ক্যাপস্টান সিগারেটগুলো একইভাবে পুড়তে পুড়তে অবশেষে ধুনুচির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সারদানন্দজী আর আমার মধ্যে মাত্রই তিনহাত পরিমিত ব্যবধান। রাজপথে কয়েকশত স্ত্রী-পুরুষ তখন শিরিষ গাছের তলায় নিথর।

"দেবেন, এই ছেলেটির আহারের ব্যবস্থা করে দাও। তুমি আজ এখানে থাকবে।" উল্লেখ করতে পারি যে, বক্তার বয়সের অর্ধেক লেখকের বয়ক্রম পরিমাণ। সস্নেহ ভাষায় তিনি আমাকে বললেন কথাগুলো। প্রথম আলাপের কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাত্র দু-একটা বাক্যবিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই 'আপনি' 'তুমি'-তে পরিণত হয়েছে। সবিনয়ে জানালুম, "না, আমার কাছে তৈরী খাবার রয়েছে, বিছানাপত্রও আপনাদের অফিসঘরে। আমি আজ আলিপুরদুয়ারে থাকবো ভেবেছি। আপনার আশ্রমে থাকার কল্পনাও আমি করতে পারিনি।"

"কেন, তুমিতো আমার আশ্রম দেখতে চেয়েছিলে। দেবেন, ও আজ আমাদের 'গেস্ট'। ওর এখানে থাকবার সব ব্যবস্থা করে দাও। যাও, তুমি বিশ্রাম করবে।" তারপর সাধুজী সখেদে জানালেন, জনৈক পাঞ্জাবীকে একবার তার সর্বভারতীয় লাইসেন্সড-রিভলবারসহ আশ্রমের অতিথিভবনে আটক করার কথা। কিন্তু পুলিশ তাকে পাগল বলে মুক্তি দেয়—তাও দিল্লীর নির্দেশে, যার নাকি নকল এখনও পাওয়া যাবে কোন্ অফিসে। তাছাড়া আশ্রম ধ্বংসের চেষ্টা, সারদানন্দজীকে বলপূর্বক নেতাজীরূপে প্রকাশের ষড়যন্ত্র এবং সরকারী কর্মচারী হিসেবে সেই সব অপরাধী ব্যক্তির মুক্তিলাভের কাহিনীও সেদিন নির্বাক হয়ে শুনতে হয়েছে সাধুজীর কাছে। অবশেষে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন, "তবে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতাকে হত্যা করে, এমন ক্ষমতা পৃথিবীতে কারুরই নেই।"

"বেশ, নেতাজী সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ?" আমি প্রশ্ন করলুম।

"তিনি বিবাহ করেছেন, শরৎবাবু ভিয়েনা থেকে ফিরে এসে একথা বলেছেন। কেন, তোমাদের অনিতা বোস সুভাষবাবুরই তো মেয়ে।"

নেতাজী ভবনে এক সভায় অনিতা বোস নাম্নী শাড়ী পরিহিতা এক বিদেশী মেয়েকে খুব কাছের থেকে আমি একঘণ্টা কালেরও বেশী সময় খুব ভালভাবেই নিরীক্ষণ করেছিলুম। যুক্তি-তর্কে আমার নিজস্ব মন্তব্য ও প্রতিবাদ তিনি গ্রহণ করলেন না। তিনি উত্তর দিচ্ছেন বটে কিন্তু প্রতিটি কথার মধ্যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ যে প্রচ্ছন্ন আছে সেটা তাঁর উত্তরের ভঙ্গী থেকেই বোঝা যায়।

"কিন্তু তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে ?"

"He was shot dead by Japanese spies—" জাপানী গোয়েন্দাদের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

"কিসের ওপর 'বেসিস' করে একথা বলছেন,—অর্থাৎ এ উক্তির পেছনে আপনার যুক্তি কি ?"

"আমার দৃঢ় ধারণা।"

"আর Air Crash-এর ব্যাপার ?"

"তা জানিনা।'

"আচ্ছা অনুগ্রহ করে যদি বলেন, আপনি এতবড় আশ্রম চালাতে finance করছেন কি ভাবে ?"

"এই যাদের দেখছো, এরা সকলে সমস্ত জমিজমা, অলঙ্কার সব নিঃশেষে এখানে দান করেছে। অতি সাধারণভাবে শুধু খাওয়ার ব্যাপারেই প্রতিদিনের খরচ আটশত টাকা। আমি দরকার মত 'লোন' করি।"

"কিন্তু সে 'লোন' পরিশোধ হবে কিভাবে ?"

"তা জানি না। তবে যার বিশ্বাস আছে, সেই দেয়।"

কিছুটা হেঁয়ালিময় মনে হলো তাঁর কথাবার্তা। প্রায় ১৭৫টি পরিবার এবং প্রায় ১২শত অধিবাসী এই আশ্রম রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা। ফল-ফুলের বাগান, কিছু চাষ-আবাদ আর গরু-বাছুরের সেবাযত্ন এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত এই প্রায় স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিদের নিয়ে এই আশ্রম রাজ্য। 'ডায়নামো'র সাহায্যে ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো, অফিসে খবরের কাগজ, আশ্রমের প্রবেশমুখে ইঁট গেঁথে অখণ্ড ভারতের মানচিত্র, সুরকী বাঁধানো পথ, ফুল-পাতাবাহারে সাজানো পরিচ্ছন্ন বাগান, শতাধিক একর ভূমির ওপর আশ্রমের খড়ে-ছাওয়া সিমেন্ট-বাঁধানো বারান্দা দেওয়া কুটির শ্রেণী। গান্ধী-আশ্রম ও অভয় আশ্রমের প্ল্যানে তৈরী গ্রাম্য-গৃহ পরিবেশ মনে শান্তি আনে। দুঃসাহসে ভর করে প্রশ্ন করলুম—"দেশের এক প্রান্তে এই গ্রামে বসে আপনি বিশাল দেশের মঙ্গল কিভাবে করবেন আশা করেন ?"

ভাব-গম্ভীর কণ্ঠে সাধুজী বললেন, "দেশ ছাড়াও অন্য জিনিস আছে। তবে দেশের লোক তা একদিন বুঝতে পারবে।"

"আচ্ছা, যারা আপনার আশ্রম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছে এবং আপনাকে নেতাজী-রূপে পরিচিত করার অপচেষ্টা করছে বলে মনে করেন, তাদের অভিযুক্ত করছেন না কেন ?"

"ঠিকই বলেছ। সেজন্য প্রায় আড়াইশোর মত মোকদ্দমা করতে হয়। লাখ পাঁচেক টাকার প্রয়োজন। তবে তুমি জানবে, কেউ বাদ যাবে না। একে একে সকলকে একদিন আদালতে উঠতে হবে। দেখেন, লেখো তো।"

একান্ত অনুগত আশ্রম সেক্রেটারী একটি বাঁধানো Excercise খাতায় কলম নিয়ে তাঁর 'ডিকটেশন' লিখতে লাগলেন। তাঁর প্রতিটি ইংরেজী বাক্য সেই মুহূর্তে আমার ভিতর স্থায়ী হয়ে গেল, যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়—"ভারতীয় দণ্ডবিধির পাঁচশো পঁচিশ ধারার মামলা ··· পত্রিকার

বিরুদ্ধে নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে স্থানান্তর করা হোক ··· দত্ত, ··· থানার অফিসার ইনচার্জ ও পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে 'সমন'জারি করা হোক। নীহারেন্দুকে এই বিষয়ে অবিলম্বে সংবাদ দেওয়া হোক।"

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি পণ্ডিত—বুঝতে পারলুম। বাংলা বাক্যের শেষাংশে পূর্ববঙ্গীয় Intonation খুবই স্পষ্ট, কণ্ঠস্বর মধুর। প্রশ্নের মাধ্যমে আমার পেশা, অবস্থান ইত্যাদি জেনে এবং বিশেষ করে তিনি নিজে থেকে দেশপ্রাণ শাসমলের নাম উল্লেখ করে খুবই তৃপ্তি ও আনন্দ প্রকাশ করলেন। সূর্যদেবের ঢলে পড়া অবস্থার কথা ভেবে পুনরায় আমার আহার-বিশ্রামের জন্যে ভারপ্রাপ্তদের নির্দেশ দিলেন। প্রচণ্ড দৈহিক ক্লান্তি সত্ত্বেও 'Guest house'-এর দিকে চললুম। তখনও জানি না শৌলমারী আশ্রমের আতিথেয়তা কত অন্তরস্পর্শী।

ফুল-পাতাবাহার ঘেরা অতিথি ভবনের দুয়ার-বারান্দায় তাঁদের দেওয়া গরম চায়ের পেয়ালা হাতে আশ্রম-সচিবকে প্রশ্ন করলুম,—"আপনাদের 'হোলি ফাদার'-এর mission কি?—মানে শ্রীমৎ সারদানন্দজীর কি উদ্দেশ্য এই আশ্রম গড়ার?"

উত্তরে দেবেন বাবু অতি সহজভাবে বললেন,—"পৃথিবীর সকল দর্শন-বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞানী আমাদের 'হোলি ফাদার'। সমগ্র মানব সমাজের আত্মিক উন্নতিই তাঁর 'মিশন' এবং আশ্রমের স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সকল ব্যক্তির উপর 'উইল ফোর্স' প্রয়োগ করে তিনি তা সম্পন্ন করতে সচেষ্ট।"

বৈকালিক আসরে খুব রুচি-সম্পন্ন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আলাপ হলো স্থানীয় চা-বাগানের জনৈক কর্মচারী এবং আশ্রমবাসিনী জনৈকা মহিলার দুই পুত্রের সঙ্গে—যারা শহর আলিপুরদুয়ারের Multi-purpose School-এর উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্র,—সকলেই সহজভাবে আলাপ করলেন। কলকাতার ভবানীপুরের জনৈক যুবক এসে হাজির হলেন অনেকগুলি ক্যাপস্টান সিগারেটের প্যাকেট হাতে—যা 'হোলি ফাদারের' একমাত্র প্রিয় বস্তু, যার শেষাংশ ধুনুচিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তবে বাবা কোন বস্তুই, এমনকি অর্থ পর্যন্ত—সে ঋণ হোক কিংবা সাহায্য হোক—নিজ হাতে গ্রহণ করেন না।

॥ গ্রন্থ-বিবরণী ॥

1. An Indian Pilgrim—Subhas Chandra Bose
2. The Indian Struggle—Subhas Chandra Bose
3. Fundamental Questions of Indian Revolution—Subhas Chandra Bose
4. The Springing Tiger—(Subhas Chandra Bose)—Hugh Toye
5. The Last Years of British India—Michael Edwards
6. The Last Days of British Raj—Leonard Mosley
7. Freedom At Midnight—Larry Collins and Dominique Lapierre
8. The Outline of History—H.G. Wells
9. Dissentient Report—Subhas Chandra Bose
10. The Story of I.N.A.—Kusum Nair
11. Un to Him A Witness—S.A. Ayer
12. Netaji in Germany (A little known chapter)—N.G. Ganpuley
13. India's Struggle For Freedom—Major General A.C. Chatterjee
14. Manipur And World War II—Sanasam Gourhari Singh
15. Selected Speeches of Subhas Chandra Bose—Publications Division, Government of India
16. The Men From Emphal—Abid Hasan Safrani
17. The Struggle In East India—John A Thivy
18. The Discovery of India—Jawaharlal Nehru
19. Bose Brothers And the Indian Struggle—Amiyanath Bose
20. The Second World War—Sir Winston Churchill
21. Three Phases of India's Struggle For Freedom—Dr. R.C. Majumder
22. Netaji Subhas In Self Exile—S.N. Bhattacharyya
23. Subhas Chandra Bose—The British Press, Intelligency And Parliament—Nanda Mukherjee
24. The Mutiny of the Innocent—B.C. Dutt
25. My Uncle Netaji—Dr. Ashoke Nath Bose
26. Congress In Evolution—A Supplementary 1935-1940 —D. Chakrabarty, C. Bhattacharyya

27. The New Era—1931-1932—Albert Institute
28. Netaji Collected Works—Netaji Research Bureau
29. Famines in Bengal 1770-1943 India—K.C. Ghosh
30. Bengal Tiger And British Lion—An Account of the Bengal Famine of 1943—Richard Stevenson
31. Netaji—Pictorial Biography—Netaji Research Bureau
32. Vivekananda—His Call To The Nation—Advaita Ashrama
33. India Wins Her Freedom—Maulana Abul Kalam Azad
34. Manipur's Contribution To The Freedom Struggle Of The I.N.A. (Thesis)—M. Kairang Singh, Manipur
35. I.N.A. And Its Netaji's Role In The Freedom Struggle of India (Thesis)—Sheel Bhadra Yajee
36. The Callected Works of Mahatma Gandhi—The Publications Division, Govt. of India
37. Rashbihari Basu—His Struggle for India's Independence : Biplabi Mahanayak Rashbihari Basu Smarak Samity
38. India As I Knew It 1885-1925—Sir Michael O' Dyer
39. তরুণের স্বপ্ন—সুভাষচন্দ্র বোস
40. শ্রীসুভাষচন্দ্র সমগ্র রচনাবলী—সম্পাদনা ঃ শিশিরকুমার বসু
41. আমার বন্ধু সুভাষ—দিলীপকুমার রায়
42. জয়তু নেতাজী—মোহিতলাল মজুমদার
43. বীর সাভারকর—মণি বাগচী
44. আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী—মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান
45. স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
46. স্রোতের তৃণ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল
47. স্বাধীনতার অগ্রদূত—পাবলিকেশনস ডিভিশন, গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া
48. নেতাজী সুভাষচন্দ্র—শ্রীমতী অনিতা দেবী
49. সুভাষ ঘরে ফিরে নাই—শ্যামল বসু
50. নেতাজী অন্তর্ধান রহস্য—বরুণ সেনগুপ্ত
51. মহানিষ্ক্রমণ—শিশিরকুমার বসু
52. বিপ্লবী জ্যোতিশ জোয়ারদার রচনা সংগ্রহ—শ্রীসাধন কর
53. নেতাজী রহস্য—ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ
54. বিবেকানন্দ চরিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
55. ব্যাঘ্র কেতন—সুভাষ মুখোপাধ্যায়
56. নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়
57. নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ—নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী
58. ইতিহাস পুরুষ নেতাজী—কালীপদ সরকার

।। সংবাদপত্র ও সাময়িকী ।।

1. আনন্দবাজার পত্রিকা
2. অমৃতবাজার পত্রিকা
3. যুগান্তর
4. স্টেটসম্যান
5. নিশানা
6. জনমন জনমত
7. ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট
8. পরিবর্তন
9. জয়শ্রী
10. দেশ
11. বসুমতী
12. মডার্ন রিভিউ
13. ছাত্র

।। সাক্ষাৎকার ।।

1. আই.এন.এ. অফিসার
2. শৌলমারী আশ্রমগুরু সারদানন্দ
3. রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ
4. ফিল্ড মার্শাল কে. এম. কারিয়াপ্পা
5. নাগারানী গাইদালু
6. নৌবিদ্রোহী—শ্রীবিশ্বনাথ বসু ও শ্রী এস. ব্যানার্জী
7. ডঃ অশোকনাথ বসু, শ্রীঅমিয়নাথ বসু, ডঃ শিশিরকুমার বসু (নেতাজীর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর তিনপুত্র) ; শ্রীমতী মীরা বসু (ডঃ অশোকনাথ বসুর স্ত্রী), শ্রীরঞ্জিৎকুমার বসু (কার্তিক) ও শ্রীঅরবিন্দ বসু (নেতাজীর অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসুর পুত্রদ্বয়)
8. শ্রীশান্তি গাঙ্গুলী (উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান ও পার্বত্য জাতির মধ্যে বি. ভি.-র সংগঠক)